ইসলামের ইতিহাসে যুদ্ধ

নববী যুগ থেকে বর্তমান

সাদিক ফারহান

ইসলামের ইতিহাসে যুদ্ধ

নববী যুগ থেকে বর্তমান

সাদিক ফারহান

ইসলামের ইতিহাসে যুদ্ধ

নববী যুগ থেকে বর্তমান

সাদিক ফারহান

উৎসর্গ–

আমার উসতাদ, আমার প্রেরণার বাতিঘর
মাওলানা নাঈম সাহেব হাফিজাহুল্লাহ–এর করকমলে
যার হাতে গড়েছি আমার হৃদয়ের মৃত্তিকা...

ভেতরের পাতায়

উমাইয়া খিলাফত

আব্বাসি খিলাফত

আন্দালুসের যুগ

আইয়ুবি যুগ

মামলুক যুগ

উসমানি যুগ

সংকলকের কথা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তাআলার। আমি তাঁরা প্রশংসা করছি, তার সাহায্য, ক্ষমা এবং হিদায়াত কামনা করছি। তার কাছে আশ্রয় চাইছি প্রবৃত্তির অনিষ্ট ও আমাদের মন্দ আমলের আগ্রাসন থেকে! বস্তুত তিনি যাকে পথ দেখান, তাকে কেউ বিপথে নিতে পারে না; আর তিনি যাকে বিপথে রাখেন, তাকে পথে আনার কেউ নেই! সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই; তিনি একক— তাঁর কোন শরীক নেই। আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

আদি-অন্তের, সর্বকালের সমূহ প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের; যিনি অনুসারী ও তাকওয়াবানদের সম্মানিত করেন, আদেশবিরোধী ও অবাধ্যদের করেন লাঞ্ছিত অপদস্থ। যিনি প্রচণ্ড ক্ষমতাধরের উপর প্রভাব খাটান, হিংস্র দাম্ভিকের দম্ভকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেন। যে তাঁর অনুগত হয়, তাকে লাঞ্ছিত করেন না; যে তাঁর সাথে শত্রুতা দেখায়, তাকে মর্যাদা দেন না। যে তাঁর দীনের সহায়তা করে, তিনি তাকে সহায়তা করেন; তার অসন্তোষে অসন্তুষ্ট হন, আর তার সন্তোষে হন সন্তুষ্ট।

যুদ্ধ। বিশ্ব ভূখণ্ডের এক অনিবার্য বাস্তবতার নাম। যে ভিতে দাঁড়িয়ে আছে পৃথিবীর সভ্যতা, শৃঙ্খলা ও তাবৎ ব্যবস্থাপনা। মানুষ যতই শান্তিকামী আর সহনশীলই হোক না কেন—কোন না-কোন দিন তাকে যুদ্ধের পতাকা হস্তে ধারণ করতেই হবে; এতে তার সামান্য আগ্রহ থাকুক, বা না-থাকুক। বরং বলা চলে, উত্তম চরিত্রের অপরিহার্য দাবি হলো—এমনকি তা একজন অমুসলিমের ক্ষেত্রেও—নিজেকে যোদ্ধা হিসেবে দাঁড় করানো। পরিপূর্ণ সচ্চরিত্রবান মূলত সে-ই, যে মনে করে, যুদ্ধের ময়দানে শত্রুপক্ষের কাউকে হত্যা করার যে সম্মান ও গৌরব—পৃথিবীর অন্য কোন গর্ব ও মর্যাদা, এর বরাবর হতে পারে না। যদি সেই প্রতিপক্ষ শত্রু তার ও তার দীনের সম্মান বিনষ্ট করে, তার বিশ্বাসের অনিষ্ট সাধনে সচেষ্ট হয় বা তার মর্যাদা হরণের অপচেষ্টায় রত হয়—তাহলে হাত গুটিয়ে বসে থাকা বা প্রতিপক্ষের এমন অযাচিত কর্মকাণ্ড এড়িয়ে চলা, কোনভাবেই কারো জন্য উত্তম ও উন্নত

চরিত্রের নিদর্শন হতে পারে না।

যুগান্তরের অন্ধকার ও ইতিহাসের নানামাত্রিক বাঁকবদলে যেখানে পূর্ববর্তী নবিদের যুদ্ধের ঘটনাবলী বিকৃত এবং বিবর্জিত হয়ে গেছে, সেখানে আমাদের প্রিয় রাসূল মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুদ্ধ-জিহাদের ইতিহাস যেন অনন্তকালের নথিপত্রে লিখিত হয়ে আছে। চৌদ্দশত বছর পরেও তা সটান, অবিকৃত এবং পথনির্দেশক হয়ে রয়ে গেছে। আজও, এই একবিংশ শতাব্দীতে এসেও যা নির্দ্বিধ প্রমাণ করছে, রাসূলের যুদ্ধগুলোর সত্য ও সততা। স্পষ্ট বলছে, রাসূল কোন জাতিগোষ্ঠী নির্মূলে যুদ্ধ করতেন না; তিনি যুদ্ধ করতেন অহংকারী এবং চিরদাম্ভিকদের বিরুদ্ধে। যারা একমাত্র খোদার প্রণীত সত্য ধর্ম ইসলামের বিরুদ্ধে শত্রুতা ও শঠতা দেখাতো; যারা তাঁর ও তাঁর বাহিনীর বিপক্ষে বাহিনী জোগাতো, এবং যারা এক আল্লাহর পথে আহ্বানকারী কণ্ঠ রোধ করার অপলিপ্সা লালন করতো। এ-জন্য শুধুমাত্র প্রতিপক্ষ হবার সুবাদে রাসুল কাউকে হত্যা করার নির্দেশ দিতেন না, যতক্ষণ না সে ইসলামের বিপক্ষে তলোয়ার তোলে; অথবা যদি সে এমন হয়, যার যুদ্ধে অংশ নেবার সামর্থ্য নেই, অথবা যে রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধের চিন্তা করছে না—রাসূল তাদেরকে হত্যার অনুমতি দিতেন না কখনোই। তিনি স্পষ্ট নিষেধ করতেন প্রতিপক্ষের নারী, সেবাদাস, শিশু এবং বৃদ্ধদের হত্যা করতে; আপাতদৃষ্টিতে যাদের ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ইচ্ছে নেই, বা ইচ্ছে থাকলেও বাস্তবায়নের শক্তি নেই।

ইসলামি যুদ্ধের ইতিহাস, রীতিবিধান ও সমরকৌশলের পাঠ আমাদেরকে জানায়, ইসলাম ক্ষেত-খামার, গাছপালা এবং জনবসতি ধ্বংসের অনুমতি দেয় না। যাতে পৃথিবীবাসী বুঝতে পারে, এ ধর্ম ও শরিয়তব্যবস্থা আসমান থেকে আগত; পৃথিবীর কোন বনবাদাড়ে ঘটা করে এর কাঠামো গঠন হয় নি, তেমনি শক্তিশালীর পক্ষ থেকে দুর্বলের উপর চাপিয়ে দেয়া কোন স্বৈরবিধানও ইসলাম নয়। বরং এ ধর্মের অধিকাংশজুড়ে কেবল দুর্বলের সাহায্যবিধান এবং ক্ষমতাসীনদের হিংস্রতা থেকে তাদেরকে বাঁচানোর তাগিদ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কুরআনুল কারিমে ইরশাদ করেন:

وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ ٱلْوَٰرِثِينَ

> *'সে দেশে যাদেরকে হীনবল করা হয়েছিল, আমার ইচ্ছা তাদের প্রতি অনুগ্রহ করার, তাদেরকে নেতৃত্ব দেয়ার এবং দেশের উত্তরাধিকারী করার'* [১]

পৃথিবীর ইতিহাস কোন সেনাবাহিনীকে যুদ্ধবন্দীদের সাথে এতটা নমনীয় দেখে নি; যতটা কোমল ও নমনীয় দেখেছে ধর্মীয় নিয়মনীতি মেনে চলা মুসলিম মুজাহিদ বাহিনীকে। কারণ, আমাদের নবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে যুদ্ধবন্দীদের সাথে উত্তম ও নম্র আচরণ করার উৎসাহ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন: 'তোমরা যুদ্ধবন্দীদের সাথে কল্যাণের আচরণ কোরো'। [২]

বর্তমানের শিয়রে দাঁড়িয়ে যদি কেউ উম্মাহর জীর্ণ শরীরে তাকায়, পাশাপাশি অতীত ইতিহাসের সাথে এর আনুপাতিক তুলনা করে—নিঃসন্দেহে আক্ষেপে তার হৃদয় ভরে উঠবে। সে আফসোস করবে যখন দেখবে, যে উম্মত একসময় পুরো বিশ্বের একমাত্র অনুসৃত নেতা হয়ে উঠেছিল, সেই উম্মত এখন অন্যের অনুসরণ করে জাতে উঠতে চায়। তার চোখমুখে জেগে উঠবে একটি অনুভব; সে বলতে চাইবে, সবকিছু ছেড়ে পুরো উম্মাহর এখন উচিত, রাসূলের সিরাতে ফিরে যাওয়া; নববি জীবনের কোণায় কোণায় ঘুরে ঘুরে আলোকিত শিক্ষা ও উপদেশ নিংড়ে আনা। রাসূলের মত ও পথ থেকে উন্নত শিষ্টাচার, উত্তম চরিত্র, স্বচ্ছ আকিদা-বিশ্বাস, সুষ্ঠু উপাসনা, আত্মার পরিশুদ্ধি, জিহাদ ফি-সাবিলিল্লাহ এবং খোদার পথে শহিদ হবার অদম্য বাসনা কুড়িয়ে আনা।

আমরা মুসলমানদের যুদ্ধের ইতিহাসে আলো ফেললে দেখতে পাই, রণক্ষেত্রে তাদের ইস্পাতকঠিন চিন্তা, নিপুণ কৌশল, সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা, নব্য আবিস্কৃত অস্ত্র ও যুদ্ধসরঞ্জাম কতোটা সর্বজনবিদিত। যদি দীনের স্বার্থে পৃথিবীর সামনে হাজির করা তাদের বড় বড় সামরিক বিজয়গুলোকে দেখি, যদিও ইসলামের শত্রুরা অন্তর্নিহিত বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে সেগুলোকে নিছক ঐতিহাসিক স্খলন ও ভ্রান্তি হিসেবে উল্লেখ করে এবং বলে, সে-সব কেবলই মুসলমানদের সাম্রাজ্য দখলের

[১] সুরা কাসাস: আয়াত—০৫

[২] *মুজামুল কাবির:* ইমাম তাবারানি—১৮৮২৯, *মুজামুস সাগির:*—৪০৯; ইমাম হাইসামি রহ. বলেন: হাদিসটির সনদ 'হাসান' পর্যায়ের, *মাজমাউয যাওয়ায়েদ:* ৬/১১৫

কারবার ছিল। তাদের কথা আপাতত মেনে নিয়েও যদি সে-সব অমর বিজয়গাঁথার দিকে চোখ মেলি, তাহলে দেখি—কত রাজ্য তার শাসকের শোষণে নিষ্পেষিত হচ্ছিল, শোষকের ক্রোধ আর ক্ষমতার আগুনে ঝলসে যাচ্ছিল কত দেশ ও দেশের মানুষ—ইসলাম দূর আরব থেকে এসে তাদেরকে সেই অপশাসন থেকে রক্ষা করেছে। শুধু বলি, যুদ্ধ বা রাষ্ট্র জয়ের পর আহলে কিতাবদের সাথে মুসলমানরা যে উত্তম চরিত্রের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছে, ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে কেবল সেটাই যথেষ্ট। শুধু এই একক ক্ষেত্রের ঘটনাগুলোতে চোখ ফেরালেই বিশ্ববাসী জানতে পারবে, কেন আমরা ইসলামের বিজয়গুলোকে, সামরিক সাফল্যের আগে—মানবতার প্রকৃত বিজয় বলতে চাই। একমাত্র মুসলমানরাই দ্বিপাক্ষিক স্বল্পসংখ্যক লাশের বিনিময়ে তাদের ধর্মের প্রসার করেছে। আর যদি মিশর, লিবিয়া, পশ্চিমাঞ্চলসহ উত্তর আফ্রিকার আরও বেশকিছু রাজ্যের তৎকালিন ইতিহাসের দিকে চোখ ফেরাই, তাহলে দেখতে পাই—মুসলমানদের বিজয়ের পূর্বে এ-রাষ্ট্রগুলো ছিল অবৈধ উপনিবেশবাদীদের হাতে। তারা রাজ্যগুলোর সম্পদ লুট করছিল, এতদাঞ্চলের অধিবাসীদের ভূমি দখল করছিল; সুদীর্ঘকাল ধরে এ অঞ্চলগুলোর শাসকশ্রেণীর সাথে জনগণের আচরণ ছিল বৈরিতা, কঠোরতা আর তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যে ভরা। এরপর সময়ের কাঁধে চড়ে স্বাধীনতার পরোয়ানা নিয়ে সেখানে ইসলাম এলে, মুক্তিপাগল জনগণ তাদেরকে সাদর সম্ভাষণে বরণ করে নেয়। ইসলাম তাদেরকে মুক্ত করে এবং জাতিগত উন্নতির জন্য প্রস্তাব করে এমন সুন্দর নীতিমালা, সময় ও পরিবেশের উপযোগিতায় যার বস্তুনিষ্ঠতা ও মহানুভবতা নিয়ে প্রশ্ন তোলার কোনও সুযোগ নেই।

ইতিহাস যে-কোন জাতির ঐতিহ্যের দর্পণ, চেতনার শেকড়। ইতিহাসবিস্মৃত কোন জাতিই যুগ ও সময়মানসের শিখর ছুঁতে পারে না। আর পৃথিবীর আবহমানকালের ইতিহাসের ভেতর শির উঁচু করে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে মুসলমানদের গৌরবের অতীত; গর্বময় ঐতিহ্য। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, যুগের পালাবদলে বর্তমান মুসলমানরা ধর্মীয় অন্যান্য অনুষঙ্গের পাশাপাশি ইতিহাসের প্রতি ঔদাসীন্য দেখিয়েছে অনেক বেশি। যে উদাসীনতার সময়কাল নির্ধারণ করতে 'কয়েক বছর' বলেও ক্ষ্যান্ত দেয়া যায় না, বরং বলতে হয়—'কয়েক শতাব্দি'। হ্যাঁ, বিগত কয়েক শতাব্দিকাল ধরেই ইসলামি ইতিহাসের প্রতি আমাদের সীমাহীন অমনোযোগ পরিলক্ষিত হয়েছে। অতীত-দর্পনের আলোচনা ও তা বাস্তবায়নে আমাদের এমন অমার্জনীয় অবজ্ঞার অনিবার্য ফলাফল হিসেবে, আমাদের ঐতিহ্যের অলি-গলিতে ঢুকে গেছে প্রাচ্য ও

প্রতীচ্যের বহু 'ইতিহাস-চোর'। ইসলামের শাশ্বত সুন্দর ইতিহাসকে তারা খেলার বস্তু বানিয়ে ছেড়েছে। নিজেদের মনমতো মুসলমানদের চিরন্তন অতীতের বাস্তবতা বদলে চিরসুন্দর গোলাপগুলোকে পাল্টে দিয়েছে কষ্টদায়ক কাঁটায়। আমাদের কোমল-মায়াময় 'বিগতকালের' কপালে লেপ্টে দিয়েছে বিকৃতির কালিমা। ইতিহাসের স্নিগ্ধ-সপ্রাণ চিত্রকে এরা আহত করেছে শত্রু-স্বভাবী কালি ও কলমের নখর আঁচড়ে। এতে সবচে শোচনীয় যে ক্ষতি আমাদের হয়ে গেছে তা হলো, তাদের এসব বিকৃতির ভেতর দিয়ে আমরা হারিয়েছি ইতিহাসের শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণের মনন-মানস। ফলে আমাদের কাছে ইতিহাস হয়ে গেছে নিছক 'শাস্ত্রীয় অধ্যয়ন' বা 'বৈষয়িক গবেষণা'; পাঠকের আত্মার খোরাক ও আধ্যাত্মিক চেতনাগঠন যেখানে চরম উপেক্ষিত। এতে আমাদের টেবিল থেকে নেমে গেছে ইতিহাসের বই, শেলফ থেকে বাদ পড়েছে অতীতের বিশ্বকোষ এবং—ইতিহাসের দৈনন্দিন পঠনপাঠনে আমরা হয়ে গেছি অনাগ্রহী এবং নিরানন্দ।

কিন্তু ইতিহাসের আরেক অমোঘ ও অনস্বীকার্য সত্য হলো, সময়ের অতিবাহনে পরিস্থিতি ঘোলাটে ও ঘোরতর হয়ে উঠলে—কালের কতিপয় সন্তানের বুকে আলো জ্বলে ওঠে। ধূলোধূসরিত বর্ণিল ইতিহাসের সুষ্ঠু পুনরুদ্ধারে, উম্মাহর কিছু আত্মমর্যাদাবান সেনাসন্তানের ধমনীতে ছলকে ওঠে পৌরুষ। তাদের বুকের ভেতর দরদ উথলে ওঠে সে-সব যুবকদের নিরাপদ পাড়ে টেনে তোলার, যারা মিথ্যে জড়ানো ইতিহাস পড়ে হারিয়ে যাচ্ছিল অসত্যের অতলে। তাদের চোখে ধরা পড়ে, দিশাহীন এই উদাস প্রজন্মের পুনর্গঠনে তাদেরকে একটি উপযোগী পাটাতনে তুলে দেয়া দরকার—যেখানে তারা উম্মাহর প্রকৃত অবিমিশ্র ইতিহাস পড়তে পারবে। আমি যদি বলি, 'মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে, সকলের জন্য ইসলামের সুমহান অতীত ইতিহাস জানা প্রয়োজন' তবু হয়ত সেটা অত্যুক্তি হবে না। পৃথিবীর কোন জাতি, কোন ধর্ম বা কোন গোষ্ঠী—তাদের অতীতকথায় এমন সৌন্দর্য, এমন নিপুণ নান্দনিকতা দেখাতে পারবে না; আমরা যা দেখি আমাদের বিগতকালের সমুন্নত কীর্তিগাঁথায়।

বক্ষমান এ গ্রন্থটিও, উম্মাহর প্রয়োজনীয়তা পূরণে একজন দুর্বল তবে সচেতন মুমিন পুরুষের প্রজন্মরক্ষার দরদী প্রয়াস। গ্রন্থটি মূল্যবান এ-জন্য যে, এটি ইসলামি ইতিহাসের অনন্য জ্বলজ্বলে কর্মময় অধ্যায়গুলোর মলাটবদ্ধ অনিন্দ্য সমন্বিত রূপ। তদুপরি কেবল কাছাকাছি মর্মবাহী শব্দদ্বৈতের বহুল বিপুল তথ্য ও তত্ত্বের একত্রকরণই, এ গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা বৃদ্ধি করে নি; বরং গুরুত্বপূর্ণ প্রতিটি

যুদ্ধ থেকে তুলে আনা হয়েছে উপকারী শিক্ষা ও উপদেশ, যা ইতিহাস অনুধাবনে পাঠকের মেধাকে শাণিয়ে আরও বিস্তর ও গভীর পাঠের প্রতি উৎসাহিত করবে। ইতিহাস উপস্থাপনের এক ভিন্ন মাত্রা ও বিশেষ আঙ্গিক, স-বিষয়ে প্রচলিত অন্যান্য গ্রন্থ থেকে এটিকে আলাদা করবে বলেও মনে করি। বইটিকে সংক্ষেপ ও সংহতকরণে সুচিন্তিত কৌশলে আমারে এর ভাষা ও বিন্যাসে মন দিতে হয়েছে। এমনকি, মাঝেমধ্যে মাত্র চার কি পাঁচ পৃষ্ঠায় আমাকে তুলে দিতে হয়েছে ইতিহাসের ভয়াবহ কোন যুদ্ধের আদ্যোপান্ত; তবে আশা করি আপনার আর মনে হবে না, যুদ্ধটি সম্পর্কে আর কিছু জানার প্রয়োজন আছে। অথচ সে-রকম একটি যুদ্ধের উপস্থাপনে, শাস্ত্র-বিশেষজ্ঞদের ধারণামতে—কোন ইতিহাসবিদের পক্ষে একটি বৃহৎ কলেবর লিখে ফেলা সম্ভব।

বইটির আরও একটি মৌলিক বিশেষত্ব যদি বলি, তা হলো, যুদ্ধের ধারাবাহিকতা রক্ষার ক্ষেত্রে ক্ষিপ্রতার সাথে ইসলামি ইতিহাসের নানা স্তরে এর যথার্থ আবর্তন। বিষয় ও শিক্ষার ধারাবিন্যাসের প্রয়োজনে নববি যুগ থেকে শুরু করে, একটু উপযোগী বাঁকে এসে আমি মোড় নিয়েছি অন্যান্য যুগের ইতিহাসে। এরপর চকিত নয়নে হেঁটে বেড়িয়েছি খিলাফতে রাশিদা, উমাইয়া, আব্বাসি, আইয়ূবি, মামলুক এবং উসমানি সাম্রাজ্যের ময়দানে ময়দানে। তেমনিভাবে এ বিচরণে উপেক্ষা করিনি ভৌগোলিক বিচারে ইতিহাসবিজড়িত বিশ্বের নানা স্থান ও রাজ্য। ঘটনার প্রয়োজনে কখনো ছুটে গেছি পূর্ব দিকে, সেখান থেকে হিন্দুস্তানের যুদ্ধগুলো তুলে নিয়ে সময়ের দায়বোধে আবার দৌড়ে গেছি পশ্চিমে—সাবলীল ভাষায় সেখান থেকে উঠিয়ে আনতে চেয়েছি আন্দালুসের বিখ্যাত সব যুদ্ধের শব্দফসল।

তেমনি গ্রন্থটির আরেক বিশেষ দিক হিসেবে বলবো, এতে এমন কিছু বিরল তবে ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধের কথা উঠে এসেছে; যেগুলো সম্পর্কে এতদাঞ্চলের মুসলমানরা বিস্তর কিছু জানে না। বরং যদি বলি, 'সার্বিকভাবে মুসলমানদের সে যুদ্ধগুলোর নাম পর্যন্ত জানা নেই' তবেও তা অতিবাচন হবে বলে মনে হয় না। যে যুদ্ধ ও জয়ের পৃষ্ঠাগুলোতে দীর্ঘদিন ধরেই জমে ছিল ধূলোর আস্তরণ, যথেষ্ঠ যত্নের সাথে সেগুলোর ধুলোবালি সরিয়েছি আমি; তুলে দিতে চেয়েছি আড়াল করে রাখা পর্দার সকল প্রতিবন্ধক।

তবে উল্লিখিত সকল দিকবিচার ছাপিয়ে আরও যে দুটি বিষয় এ গ্রন্থটিকে ইসলামি পাঠাগারভর্তি ইতিহাসের অন্যান্য গ্রন্থাদি থেকে আলাদা ও অনন্য করে দেবে বলে মনে হয়, তা হলো:

এক.

এ-গ্রন্থে আমি কেবল মুসলমানদের বিজয়ের ইতিহাসকেই সীমাবদ্ধ করি নি; পাশাপাশি অত্যন্ত কৌশল ও নিরপেক্ষতা বজায় রেখে ঐতিহাসিক সত্য হিসেবে, দুঃসাহসের সাথে সে-সব যুদ্ধগুলোর উল্লেখও করেছি—যেগুলোতে মুসলমানদের বাহ্যত বা সাময়িক পরাজয় ঘটেছে। যেমন: উহুদ, বালাত এবং ইকাবের যুদ্ধ ইত্যাদি। এটা করতে হয়েছে আমার সত্যান্বেষার দলিল হিসেবে এবং ঘটনার বিবরণে পাঠকের কাছে লেখকের দায়বোধের সততা রক্ষার তাগিদ থেকে। তেমনি কালপরিক্রমায় জাতিগোষ্ঠীতে জয়-পরাজয়ের যে দ্বিরূপ ধারার আগমন ঘটে—প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া উল্লেখের সৎসাহসে সেটাই প্রকৃষ্ট করে তুলতে চেয়েছি। সর্বোপরি আপাত পরাজয়ের এসব ইতিহাস থেকেও, পাঠকের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণের সুযোগ রাখা জরুরি মনে করেছি আমি।

দুই.

ইতিহাসের অধিকাংশ লেখক ও সংকলকের মতো এ গ্রন্থের সংকলনে ঘটনার ধারাবিবরণে ছেদ কাটি নি আমি। যোগসূত্র বা পূর্বযোগাযোগ ছাড়াই শিরোনামের নিরস অবতারণাও করিনি কোথাও; বরং অবিরাম বলে গেছি অনেকটা গল্পকথকের মতো। আবার কেবল ইতিহাসের উল্লেখ করেই ক্ষ্যান্তি দিই নি সবখানে; বরং প্রাসঙ্গিক প্রয়োজনে ঘটনার গভীরে ঢুকেছি, সে-সময়ের পরিবেশ, অনুঘটক, রাজা ও সর্বসাধারণের চেতনার জগতে ঘুরে বেড়িয়েছি; জয়ের মূলমন্ত্র ও পরাজয়ের আসল কার্যকারণগুলো খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছি। ফলে এ-কথা জোর দিয়েই বলা যায় যে, বইটি পাঠে পাঠক একইসাথে কোন জাতি-রাষ্ট্রের উত্থান ও পতনের মৌলিক প্রভাবক বিষয়গুলো জানতে পারবেন। এবং এতেই ইতিহাসের বইগুলোর এত এত গল্প-ঘটনা উল্লেখের মূল সাফল্য ও সার্থকতা নিহিত। আমাদের রব মহান আল্লাহ তাআলা তাঁর পবিত্র গ্রন্থ কুরআনে যেমন বলেছেন:

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ

> *'তাদের গল্প-কাহিনীতে বুদ্ধিমানদের জন্য রয়েছে শিক্ষা ও উপদেশ'।* [১]

তেমনি বইয়ের কেবল ভাষাগত উৎকর্ষ ধরতে গিয়ে, লেখার স্বাভাবিক সৌন্দর্য ও

---

[১] সুরা ইউসুফ: আয়াত—১১১

তরতর প্রবাহকে ব্যহত করিনি। বরং সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি, বইটির ভাষা সুগঠিত রেখে শব্দ ও বাক্যচয়নে অভিনবত্ব আনতে এবং ঘটনার উপস্থাপনা যথাসাধ্য সহজ ও উপভোগ্য করতে।

উম্মতের এ মহান ইতিহাসগুলো পড়া, অনুধাবন করা এবং মুসলিম সমাজের সামনে তা উপস্থাপন করার চিন্তা পেয়েছিলাম সময়ের নন্দিত লেখক ও ইতিহাসবিদ আলিম মাওলানা ইমরান রাইহান এবং মাকতাবাতুল আসলাফের মুহতারাম ভাই আবদুর রহমান মুয়াজের থেকে। এরপর বইটি রচনার প্রধান সহযোগী হিসেবে সার্বিক পরামর্শের পাশাপাশি আরববিশ্বের সাড়াজাগানো লেখক ড. রাগিব সারজানির ভূমিকাসম্বলিত, উসতাদ তামির বদর লিখিত '*আইয়ামুন লা তুনসা*' বইটি আমার হাতে তুলে দেন। বইয়ের বিন্যাস, বর্ণনা ও সাধারণ তথ্যযোগে এই বইটি আমাকে যথেষ্ট সহযোগিতা করেছে।

বইটি সংকলনের পুরোটা সময়, আমি চেষ্টা করেছি বিবাদ-বিরোধ এড়িয়ে অতি প্রয়োজনীয় যুদ্ধগুলোকে উম্মাহর সামনে নিয়ে আসতে; যেন তারা সেগুলোর সার ও সর জীবনে বাস্তবায়ন করত তাদের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করতে পারে। এবং জানতে পারে, কোন পরশপাথরের ছোঁয়ায় তাদের অতীত ছিল বিজয়মণ্ডিত। কেন তারা নিখিল বিশ্বের এতগুলো দেশ ও রাজ্যের ক্ষমতা হাতে পেয়েছিল, কেন শত্রুপক্ষ তাদের নাম শুনলে থরথর করে কেঁপে উঠত। পাশাপাশি কোন জিনিসের অভাবে ইতিহাসের বিভিন্ন ময়দানে আমাদের পরাজয় হয়েছিল, কেন বিদেশী প্রভুরা আমাদের উপর জেঁকে বলেছিল সময়ে সময়ে, কেন আমাদের সম্মান হরণের সাহস পেয়েছিল কাফের মুশরিকের দল! ইতিহাসপাঠের এমন মহান লক্ষ্যকে সামনে রেখেই, আমি আমার সাধ্যমতো এ গ্রন্থে ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধগুলোর বৃত্তান্ত তুলে ধরার চেষ্টা করেছি—যেগুলো যুগ-যুগান্তরের জন্য পৃথিবীর রাজনৈতিক মানচিত্র বদলে দিয়েছিল।

আমার কলমের তল অতিক্রম করেও বইটি মাড়িয়েছে ভাই ইমরান রাইহানের টেবিল; যা তথ্যের বিচারে বইটিকে আরও মজবুত করেছে।

আশা করি এ-গ্রন্থটি আমার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রাথমিক নমুনা হয়ে থাকবে। তেমনি ইসলামের সামরিক ইতিহাসের গবেষণায় গ্রন্থটি গবেষকদের উদ্যম ও কৌতূহলের সূচনা করবে। সর্বোপরি মানুষের স্বভাবজাত ভুল থেকে যেহেতু আমিও নিরাপদ নই; তাই থেকে যাওয়া ভুল ও অপূর্ণতার সংশোধন সাধনে মন্তব্য, টিকা

ও সংযোজন থেকে অমুখাপেক্ষী দাবি করি না কোনভাবেই। যে কোনরকম অসঙ্গতি পাঠকের নজরে আটকে গেলে, বিনীত হৃদয়ে তা বইসংশ্লিষ্ট যে কোন মাধ্যমে পৌঁছানোর অনুরোধ করছি।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি সে-সব পূর্বসূরি মহান আলিমদের প্রতি, যারা গ্রন্থটির উপকারী গ্রন্থনায় যে-কোনভাবে অংশ নিয়ে আছেন; অথবা যারা চোখের আড়াল হয়েও, প্রয়োজনীয় সত্য-সুন্দর আহ্বান ও নির্দেশনাদানে অকৃপণ ছিলেন। আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের সার্বিক হাল-হালাতের সংশোধন করুন, তাদেরকে যাবতীয় অনিষ্টকর ফিতনা থেকে বাঁচান এবং আমাদের সর্দার মুহাম্মদে আরাবির উপর শত-কোটি-বার শান্তি ও রহমত বর্ষণ করুন!

আমার এ কাজকে তিনি তাঁর সন্তুষ্টির প্রতি নিষ্ঠ করুন, আমার লিখিত প্রতিটি হরফের বিনিময় পৌঁছে দিন আমার পুণ্যের পাল্লায়; এবং তিনি উত্তম প্রতিদান দিন আমার সে-সব ভাইদের, যারা তাদের সাধ্যের সীমায় থেকে এ-গ্রন্থের পূর্ণতাদানে, আমাকে যে-কোনভাবে সহযোগিতা করেছেন।

—সাদিক ফারহান

৭ জিলকদ, ১৪৪১ হিজরি

নবাবি যুগ

বদর যুদ্ধ
BATTLE OF BADR

তারিখ:	২য় হিজরি/৬২৪ খ্রিস্টাব্দ
স্থান:	বদর কূপ সংলগ্ন প্রান্তর; মদিনা শহর থেকে প্রায় ১২০ কি. মি. দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত
ফলাফল:	মুসলমানদের সম্মানজনক বিজয়

পক্ষ-বিপক্ষ:	মুসলমান	কুরাইশ
সেনাপ্রধান:	রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম	আমর ইবনু হিশাম ইবনুল মুগিরা আল-মাখযুমি
সেনাদল:	খাযরাজ গোত্রের ১৭০ জন, ৭১ জন আওস, ৭৩ জন মুহাজির সাহাবি মিলে সর্বমোট ৩১৪ জন	৯০০ পদাতিক সেনা এবং ১০০ অশ্বারোহী মিলে মোট ১০০০ জন
নিহতের সংখ্যা:	১৪ জন শহিদ	৭০ জন। বন্দি: ৭০ জন কুরাইশ

বদর। ইসলামের প্রথম মহিমান্বিত যুদ্ধ ও জয়ের সাক্ষী। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেতৃত্বে মুসলমানরা মদিনার পূর্ব দিকে বদর প্রান্তরে আমর ইবনু হিশাম ইবনুল মুগিরা আল-মাখযুমির (ইতিহাসে যে আবু জাহাল নামে প্রসিদ্ধ) সঞ্চালিত কুরাইশ বাহিনীর মুখোমুখি হয়। ২য় হিজরির ১৭ই রমাদান (১৩ই মার্চ, ৬২৪ খ্রি.) সংঘটিত এ যুদ্ধটি ইতিহাসে 'বদরের বড় যুদ্ধ' বা 'বদরের প্রধান যুদ্ধ' [১] বলে পরিচিত। মুসলমানদের বিজয় ও কুরাইশ-সর্দার আমর ইবনু হিশাম ইবনুল মুগিরা আল-মাখযুমির মৃত্যুর মধ্য দিয়ে এ যুদ্ধটি সমাপ্ত হয়।

যুদ্ধের পটভূমি

মক্কার মরুপ্রান্তরে ইসলাম ছড়িয়ে পড়লে সাহাবায়ে কেরাম নিজেদের মতো ধর্ম পালন করছিলেন। কিন্তু মক্কার মুশরিকদের তা কোনোভাবেই সহ্য হচ্ছিল না। দিনদিন রাসূলের আনীত ধর্মের প্রসার এরা কিছুতেই মেনে নিতে পারছিল না।

[১] 'বদর যুদ্ধ' হিসেবে প্রসিদ্ধ এবং প্রধান ২য় হিজরির এ যুদ্ধটিকে 'বদরের বড় যুদ্ধ' বলার কারণ হলো, ৪র্থ হিজরিতে উহুদের ময়দানে দেয়া পূর্বপ্রতিশ্রুতিমতে আবু সুফিয়ানের মক্কার বাহিনীর সাথে বদর প্রান্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি যুদ্ধের কথা ছিল। ৬২৬ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারিতে রাসূল আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহাকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে, প্রায় পনেরোশো সাহাবি নিয়ে দুই বছর আগে সংঘটিত মূল বদর যুদ্ধের জায়গাতেই হাজির হন। কিন্তু আবু সুফিয়ান যুদ্ধক্ষেত্রের কাছাকাছি কোথাও এসে মুসলিম বাহিনী এবং রাসূলের উপস্থিতির খবর নিয়ে ভয় পেয়ে যায়। মোকাবেলার সাহস না পেয়ে সেখান থেকেই সে তার বাহিনী নিয়ে মক্কা ফিরে যায়। এদিকে রাসূল পূর্বনির্ধারিত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে কুরাইশ বাহিনীর অপেক্ষায় সেখানে ৮ দিন অবস্থান করেন। বদর অভিমুখে রাসূলের এই অভিযানকে 'বদরের ছোট যুদ্ধ' বলে স্মরণ করা হয়। পাশাপাশি উহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের সামরিক পরাজয়ের পিঠে, মনস্তাত্ত্বিক অবিচলতার দলিল হিসেবে, অনেকে ৪র্থ হিজরির এ যুদ্ধকে উপস্থাপন করে থাকে। বিস্তারিত জানতে পড়ুন—*যাদুল মাআদ*: ২/১১২, *সিরাতে ইবনে হিশাম*: ২/২০৯

শুরু হয় রাসূল ও তাঁর সাহাবাদের উপর অকথ্য নির্যাতন। জুলুম, শাস্তি আর কষ্টের পরিমাণ দিনদিন বাড়তে থাকে। রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে নির্দেশ আসে হিজরতের। সাহাবারা সে-আদেশকে সামনে রেখে নিজেদের মাতৃভূমি ত্যাগ করতে সম্মত হয়ে যান। যে-ভূমিতে তাদের বাবা-মার কবর, যেখানে কেটেছে তাদের সোনালি শৈশব, যে মক্কার বালি-মাটিতে জড়িয়ে আছে তাদের হাজারও সুখ-দুঃখের গল্প—কেবল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রেম বুকে নিয়ে তারা ছেড়ে যান সে শহর। পেছনে রেখে যান নিজেদের বাড়ি-ঘর, ক্ষেত-খামার, সহায়-সম্পদ। গন্তব্য—মদিনার নতুন আবাস, যেখানে কোনো স্বজন নেই; নেই পূর্বপরিচিত কোনো বন্ধুবান্ধব।

মুসলমানরা মক্কা ছেড়ে যেতেই মুশরিকরা তাদের রেখে যাওয়া সম্পদ কুক্ষিগত করে নেয়। সেগুলোকে পুঁজি করে ব্যবসার উদ্দেশ্যে দ্রুত বেরিয়ে পড়ে শামের দিকে। বাণিজ্যের পর্ব চুকিয়ে তখন কুরাইশরা অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হয়ে উঠছিল। পূর্বশত্রুতা এবং যুদ্ধের সম্ভাবনা থেকে রাসূল চাচ্ছিলেন, যে-কোনোভাবে তাদের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রা থামিয়ে দিতে। কারণ, ময়দানে নেমে আসার আগেই শত্রুকে আর্থিকভাবে কাবু করে ফেলার চিন্তা ও চেষ্টা করা একজন সচেতন এবং বিজ্ঞ রাষ্ট্রনায়কের আবশ্যিক কর্তব্য।[১]

কাফেলার পশ্চাদ্ধাবন

মদিনায় আসার পর সর্বকালের শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনায়ক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশদের বিরুদ্ধে তিনটি প্রধান সামরিক পদক্ষেপ নিয়ে রেখেছিলেন। প্রথমত, তিনি মদিনার বিধর্মী গোত্রগুলির সাথে শান্তিচুক্তি স্থাপন করেন; দ্বিতীয়ত, কুরাইশ ও তাদের মিত্রদের তথ্য সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন পয়েন্টে গোয়েন্দা নিযুক্ত করেন; তৃতীয়ত, মদিনার পাশ দিয়ে সিরিয়াগামী মক্কার বাণিজ্য কাফেলাগুলোতে অভিযান চালান।

৬২৩ সালের নভেম্বর বা ডিসেম্বরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিরিয়া অভিমুখী মক্কার একটি বড় বাণিজ্যিক কাফেলার বিরুদ্ধে অভিযানে নেতৃত্ব দেন। এই কাফেলায় কুরাইশদের অনেক মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী ছিল। মুসলিম বাহিনীর সদস্য ছিল ১৫০ থেকে ২০০ জন এবং আরোহণের উট ছিল ৩০টি।

[১] দেখুন: *সিরাতে ইবনু হিশাম*: ৩/১৫২

রাসূল তাদেরকে নিয়ে যুল-উশাইরাহ পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন। কিন্তু মুসলিমরা পৌঁছানোর কয়েকদিন পূর্বেই, কুরাইশরা সে পথ অতিক্রম করে চলে যাওয়ার কারণে রাসূল সেবার তাদের পথরোধ করতে পারেনি। এই অভিযানটি ইতিহাসে গাজওয়াতুল উশাইরা নামে পরিচিত। ইবনে ইসহাকের মতে, এই অভিযানের জন্য রাসূল ২য় হিজরির জামাদিউল আওয়াল মাসের শেষে বের হয়ে জামাদিউল আখির মাসের শুরুতে ফিরে এসেছিলেন।

এরপর ৬২৪ সালের জানুয়ারিতে (২য় হিজরির রজব মাসে) মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারো জন মুহাজিরের একটি দল গঠন করেন। বাহিনীর প্রতি দুইজনের আরোহণের জন্য একটি করে উট বরাদ্দ দেন। আবদুল্লাহ ইবনে জাহশকে বাহিনীর আমির নিযুক্ত করে, তার হাতে একটি চিঠি তুলে দেন। বলেন, দুই দিনের রাস্তা অতিক্রম করার পর এই চিঠি পড়বে, এর আগে না। নির্দেশ মোতাবেক দুইদিনের পথ অতিক্রম করার আবদুল্লাহ ইবনে জাহশ চিঠিটা পড়েন।

এতে এই বলে নির্দেশ দেয়া হয় যে, চিঠি পড়ার পর যাতে তারা অগ্রসর হয়ে মক্কা ও তাইফের মধ্যবর্তী নাখলা নামক স্থানে পৌঁছায়। এরপর কুরাইশ কাফেলার আগমনের অপেক্ষা করে এবং তাদের অবস্থা ও অবস্থান সম্পর্কে জরুরি ভিত্তিতে মদিনায় অবহিত করে। চিঠির নির্দেশ পড়ার পর তারা নাখলার দিকে অগ্রসর হন। তবে পথিমধ্যে সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস ও উতবা ইবনে গাজওয়ানের উট হারিয়ে যাওয়ার ফলে তারা দল থেকে পিছিয়ে পড়েন।

আবদুল্লাহ ইবনে জাহশ তার বাহিনীকে নিয়ে নাখলা পৌঁছলে সেখানে কুরাইশদের একটি কাফেলা দেখতে পান। এতে আবদুল্লাহ ইবনে মুগিরার দুই ছেলে উসমান ইবনে আবদুল্লাহ, নওফাল ইবনে আবদুল্লাহ এবং মুগিরার আজাদকৃত দাস আমর ইবনে হাদরামি ও হাকিম ইবনে কাইসানকে দেখা যাচ্ছিল। তবে দিনটি ছিল রজব মাসের শেষ দিন। রজব যুদ্ধনিষিদ্ধ মাস ছিল বিধায়, তাদের উপর তাৎক্ষণিকভাবে আক্রমণ করার সুযোগ ছিল না। অন্যদিকে মাস শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলে, কাফেলাটি মক্কার হারাম সীমানায় প্রবেশ করে ফেলবে। তাহলে তাদের উপর আর আক্রমণ করা সম্ভব হবে না। এই পরিস্থিতিতে মুসলিম বাহিনীটি মদিনার স্বার্থকে সামনে রেখে পরস্পর পরামর্শের পর, কাফেলাটিতে আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেয়। আক্রমণের শুরুতেই তিরের আঘাতে আমর ইবনে হাদরামি নিহত হন। মুসলিমরা উসমান ইবনে আবদুল্লাহ এবং হাকিম ইবনে কাইসানকে গ্রেপ্তার করে ফেলে। তবে নওফাল ইবনে আবদুল্লাহ তাদের হাত ফসকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

রজব মাসে আক্রমণ করার কারণে মুসলিম দলটি ফিরে আসার পর রাসূল খানিক ক্ষুব্ধ হন। তিনি বলেন, আমি তো তোমাদেরকে হারাম মাসে যুদ্ধের অনুমতি দিইনি। তিনি কাফেলা থেকে অর্জিত সম্পদ এবং বন্দিদের গ্রহণে অসম্মতি জানান। অন্যদিকে রজব মাসে আক্রমণের কারণে কুরাইশ শিবিরেও মুসলিমদের কটূক্তি শুরু হয়। তারাও চূড়ান্ত ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। এরপর কুরআনের অবতীর্ণ আয়াতে (সুরা বাকারা: ২১৭) বলা হয় যে, পবিত্র মাসের বিধান লঙ্ঘন করার চেয়ে মক্কার লোকেদের অত্যাচার এবং আল্লাহর পথে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা আরও বেশি নিকৃষ্ট। এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূল কাফেলা ও বন্দিদেরকে গ্রহণ করেন।

কিছুদিন পর উসমান ও হাকিমের মুক্তি চেয়ে কুরাইশরা বার্তা পাঠায় এবং বিনিময় হিসেবে পণ্য প্রদানের কথা বলে। কিন্তু ইতিপূর্বে নিখোঁজ হওয়া সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস ও উতবা ইবনে গাজওয়ান তখনও ফিরে আসেননি। কুরাইশদের হাতে তাদের জীবনের আশঙ্কা থাকায় তিনি তখনই তাদের প্রস্তাবে রাজি হননি। এরপর তারা দুইজন মদিনায় ফিরে এলে, পণ্য গ্রহণ করে বন্দিদের মুক্তি দিয়ে দেন। বন্দি দুজনের মধ্যে হাকিম ইবনে কাইসান ইসলাম গ্রহণ করে মদিনায় থেকে যান। পরবর্তীতে বিরে মাউনার যুদ্ধে তিনি শহিদ হয়েছিলেন। অপর বন্দি উসমান ইবনে আবদুল্লাহ চুক্তি মেনে মক্কায় ফিরে যান।

ইতিপূর্বে গাজওয়ায়ে উশাইরা থেকে বেঁচে যাওয়া সম্পদ নিয়ে আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে কুরাইশদের আরেকটি কাফেলা সিরিয়া যায়। আসার পথে শামফেরত এই কুরাইশ কাফেলার খবর পৌঁছে যায় মদিনার মাটিতে; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কানে। রাসূল তাদের মক্কা ফেরার তথ্য সংগ্রহের জন্য তালহা ইবনে উবাইদিল্লাহ ও সাইদ ইবনে জাইদকে উত্তর দিকে প্রেরণ করেন। তারা হাওরা নামক স্থানে পৌছে কুরাইশ কাফেলার আগমনের অপেক্ষা করতে থাকেন। কাফেলাটি এই স্থান অতিক্রম করলে, তারা দ্রুত মদিনায় ফিরে রাসূলকে ঘটনা অবহিত করেন। বলেন, কাফেলাটিতে প্রায় এক হাজার উট এবং এসব উটে ৫০,০০০ স্বর্ণমুদ্রা এবং সমমূল্যের মালামাল আছে। রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কাফেলায় রক্ষী হিসেবে দেখা গেছে ৪০ জনের মতো কুরাইশ সেনা।

সবকিছু জেনে আবু সুফিয়ানের এই কাফেলায় আক্রমণের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিমদের প্রতি আহ্বান জানান। তবে ময়দানে বৃহদাকার কুরাইশ বাহিনীর সম্মুখীন হতে হবে, এমন কোনো দূরতম আশঙ্কা না

থাকায়, তিনি এতে সকলের অংশগ্রহণ জরুরি বলে উল্লেখ করেননি। ফলে অনেক মুসলিমই যুদ্ধকে অতখানি জরুরি মনে না করে মদিনায় থেকে যান।

বদরের যাত্রা

হিজরতের দ্বিতীয় বছর, রমজানের সতের তারিখ। ৩১৩ জন সাহাবাকে সঙ্গে নিয়ে রাসূল বের হয়ে পড়েন। যাদের হাতে পতপত করে উড়ছিল ইসলামের পতাকা আর গায়ে শোভা পাচ্ছিল মুসলমানের স্বীকৃত বেশভূষা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে রওনা করা ইসলামের সর্বপ্রথম বৃহৎ যুদ্ধের দিকে এগিয়ে যাওয়া এ-মুসলিম বাহিনীতে ছিলেন সাহাবি হযরত আবু বকর, উমর ইবনুল খাত্তাব, আলি ইবনে আবি তালিব, হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব, মুসআব ইবনে উমাইর, যুবাইর ইবনুল আওয়াম, আম্মার ইবনে ইয়াসির এবং আবু যার আল-গিফারি রাদিয়াল্লাহু আনহুম। স্ত্রীর অসুস্থতার কারণে যুদ্ধে যেতে পারেননি উসমান ইবনে আফফান। সালমান ফারসি এ সময় অন্যের দাস ছিলেন, তাই তিনিও যুদ্ধে অংশ নেননি। বাহিনীতে সর্বমোট সৈনিক সংখ্যা ছিল ৩১৩ জন। এর মধ্যে মুহাজির ছিলেন ৮২ জন এবং আওস গোত্রের আনসার ছিলেন ৬১ জন ও খাযরাজ গোত্রের ১৭০ জন। মুসলিম বাহিনীর সাথে ৭০টি উট এবং দুইটি ঘোড়া ছিল। ফলে তাদের অনেকের জন্য পায়ে হেঁটে যাওয়া বা প্রতি দুই-তিনজনের জন্য একটি উট ব্যবহার ছাড়া গত্যান্তর ছিল না। ফলে একটি উটে পালাক্রমে তারা দুই বা তিনজন আরোহণ করতেন। এই বণ্টন হিসেবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আলি ইবনে আবি তালিব এবং মারসাদ ইবনে আবি মারসাদের জন্য একটি উট বরাদ্দ করা হয়েছিল।

সার্বিক নেতৃত্বের জন্য মুসআব ইবনে উমাইরকে রাসূল একটি সাদা পতাকা প্রদান করেন। মুহাজির ও আনসারদের জন্য একটি করে কালো পতাকা যথাক্রমে আলি ইবনে আবি তালিব এবং সাদ ইবনে মুয়াযকে প্রদান করা হয়। বাহিনীর ডান ও বাম অংশের প্রধান হিসেবে যথাক্রমে যুবাইর ইবনুল আওয়াম ও মিকদাদ ইবনে আমরকে নিযুক্ত করা হয়। মুসলিম বাহিনীতে থাকা দুইটিমাত্র ঘোড়ায় তারা আরোহণ করেছিলেন। পেছনের অংশের প্রধান হিসেবে কাইস ইবনে আবিকে নিয়োগ দেয়া হয়। আর সমগ্র বাহিনীর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব নেন খোদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

কুরাইশি কাফেলা

আক্রমণের আশঙ্কায় কুরাইশ কাফেলার নেতা আবু সুফিয়ান যাত্রাপথে সাক্ষাত লাভ করা বিভিন্ন কাফেলাগুলির কাছ থেকে মুসলিম বাহিনীর সম্ভাব্য অভিযানের ব্যাপারে তথ্য নিচ্ছিলেন। তিনি রাসূলের আগমনের খবর পান। এ মুহূর্তে মুসলিম বাহিনীর মোকাবেলা করার মতো পর্যাপ্ত নিরাপত্তাব্যবস্থা নেই দেখে, সাহায্য চেয়ে যমযম ইবনে আমর গিফারিকে বার্তাবাহক হিসেবে মক্কা পাঠিয়ে দেয়। সে দ্রুতবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে মক্কা পৌঁছায়। শহরে ঢুকেই তৎকালীন আরবরীতি অনুযায়ী উটের নাক চাপড়ে, আসন উল্টিয়ে, নিজের জামাকাপড় ছিঁড়ে এই বলে ঘোষণা করে যে, 'কুরাইশগণ, কাফেলা আক্রান্ত, কাফেলা আক্রান্ত। আবু সুফিয়ানের সাথে তোমাদের সম্পদ রয়েছে, তার উপর আক্রমণ চালানোর জন্য মুহাম্মাদ ও তার সঙ্গীরা এগিয়ে আসছে। তাই আমার মনে হয় না যে, তোমরা তা পাবে। তাই সাহায্যের জন্য এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো।'

মক্কার বাহিনী

এই খবর শোনার পর মক্কায় আলোড়ন শুরু হয়ে যায়। দ্রুত ১৩০০ সৈনিকের এক শক্তিশালী বাহিনী গড়ে তোলা হয় এবং আবু জাহল বাহিনীর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব নেয়। এই বাহিনীতে অসংখ্য উট, ১০০ ঘোড়া এবং ৬০০ লৌহবর্ম ছিল। নয়জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কুরাইশ বাহিনীর যাবতীয় রসদ সরবরাহের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সেনাদের জন্য দৈনিক কখনো ৯টি এবং কখনো ১০টি উট জবাই করার প্রতিশ্রুতি দেন।

আবু জাহল, উতবা ইবনে রাবিয়া, শাইবা ইবনে রাবিয়া, আবুল বাখতারি ইবনে হিশাম, হাকিম ইবনে হিজাম, নওফেল ইবনে খুয়াইলিদ, হারিস ইবনে আমির, তুয়াইমা ইবনে আদি, নাদার ইবনে হারিস, যামআ ইবনে আসওয়াদ ও উমাইয়া ইবনে খালাফসহ মক্কার অনেক অভিজাত ব্যক্তি এই বাহিনীতে যোগ দেন। এমন আকস্মিক যুদ্ধে এত লোকের অংশগ্রহণের কারণও ছিল। এদের কেউ কাফেলায় নিজেদের সম্পদ রক্ষা করতে চেয়েছিলেন, কেউ-বা ইবনে আল-হাদরামির মৃত্যুর বদলা নিতে চেয়েছিলেন। এছাড়া মুসলিমদের বিরুদ্ধে সহজে জয়ী হওয়া যাবে, এই বিশ্বাসেও অনেকে আনন্দের সাথে সেনাযাত্রায় যোগ দেয়। কুরাইশের আরেক

নেতা, রাসূলের চাচা আবু লাহাব নিজে সরাসরি যুদ্ধে অংশ না নিয়ে, তার কাছে ৪০০০ দিরহাম ঋণগ্রস্থ থাকা আসি ইবনে হিশাম ইবনে মুগিরাকে ঋণের বিনিময়ে যুদ্ধে পাঠিয়ে দেন। অন্যদিকে উমাইয়া ইবনে খালাফ প্রথমে যুদ্ধে অংশ না নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এতে উকবা ইবনে আবু মুয়াইত তাকে নারী হিসেবে সম্বোধন করে বলে, 'ঘরে চুড়ি পরে বসে থাকো।' তার কথায় উমাইয়া ইবনে খালাফ লজ্জিত হয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু নিতে শুরু করে। তবে কুরাইশদের মধ্যে বনু আদি গোত্রের কেউই এই যুদ্ধে অংশ নেয়নি বলে জানা যায়।

অন্যদিকে আবু সুফিয়ান ক্রমাগত মুসলিম বাহিনীর খবরাখবর সংগ্রহ করছিলেন। বদরের নিকটে পৌঁছার পর মাজদি ইবনে আমর নামক এক ব্যক্তির সাথে তার সাক্ষাত হয়। তাকে তিনি মদিনার বাহিনী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে মাজদি স্পষ্ট করে কিছু বলতে পারেননি। তবে জানান যে, দুইজন উষ্ট্রারোহীকে তিনি টিলার পাশে উট বসিয়ে মশকে পানি পূর্ণ করতে দেখেছেন। আবু সুফিয়ান সতর্কতা হিসেবে সেখানে যান এবং উটের গোবর ভেঙে দেখেন। গোবর থেকে প্রাপ্ত খেজুরের বিচি দেখে বুঝতে পারেন, এগুলি মদিনার খেজুর। ফলে আশেপাশে মুসলিমদের উপস্থিতির ব্যাপারে তার আর সন্দেহ থাকে না। এরপর তিনি কাফেলাকে নিয়ে সমুদ্র উপকূলের দিকে ইয়ানবুতের পথে নেমে যান। মক্কার বাহিনী জুহফা নামক স্থানে পৌঁছার পর আবু সুফিয়ান একজন দূত পাঠান সেখানে। প্রেরিত বার্তাবাহক এসে জানায়, কাফেলা নিরাপদে বিপদসীমা পার হয়ে গেছে, তাই আর সামনে অগ্রসর হওয়ার দরকার নাই।

কাফেলা বিপদ পার হয়ে যাবার খবর পেয়ে মক্কার বাহিনীর অধিকাংশ ফিরে যাওয়ার পক্ষে মত দেয়। কিন্তু বাহিনীর প্রধান আবু জাহল যুদ্ধ না করে ফিরে যেতে অসম্মতি জানান। এরপর বনু যুহরা গোত্রের মিত্র ও গোত্রপ্রধান আখনাস ইবনে শারিকও তাকে ফিরে যাওয়ার পরামর্শ দেন। কিন্তু নেতাদের অধিকাংশ তার পক্ষে সায় না দেয়ায় তিনি বনু যুহরা গোত্রের ৩০০ সদস্য নিয়ে মক্কায় ফিরে আসেন। এর ফলে মক্কার বাহিনীতে সেনাসংখ্যা কমে দাঁড়ায় ১০০০। ইতিহাস বলে, পরবর্তীতে বনু যুহরা গোত্রের সদস্যরা আখনাসের এই সিদ্ধান্তের কারণে আনন্দ প্রকাশ করেছিল।

একইভাবে বনু হাশিমও মক্কায় ফিরে যেতে চায়। কিন্তু আবু জাহলের জেদের কারণে তারা যুদ্ধে অংশ নিতে বাধ্য হয়। এরপর কুরাইশ বাহিনী অগ্রসর হয়ে বদর

উপত্যকার একটি টিলার পেছনে গিয়ে আশ্রয় নেয়।[১]

মুসলিম বাহিনী

রাসূলের কানে আসে কাফেলা বাঁচাতে কুরাইশ বাহিনীর অগ্রযাত্রার খবর। মুসলমানদের এই সেনাদল মূলত কাফেলায় হামলা করার জন্য গঠিত হয়েছিল; স্বভাবতই ব্যাপক কোনো যুদ্ধের জন্য তারা প্রস্তুত ছিল না। ফলত কুরাইশ বাহিনীর আগমনের খবরে শত্রুর মুখোমুখি না হয়ে ফিরে যেতে পারত; কিন্তু এতে কুরাইশদের সাহস বৃদ্ধি পেত এবং তারা অগ্রসর হয়ে মদিনায়ও আক্রমণ করে বসতে পারত। অন্যদিকে বাহিনীতে সংখ্যাগরিষ্ঠ মদিনার আনসাররা 'বাইয়াতে আকাবায়ে উলা' বা আকাবার প্রথম শপথ[২] অনুযায়ী মদিনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করতে বাধ্য ছিল না; অধিকন্তু এ অভিযানের ব্যয়ভারও তাদের উপরই বেশি ছিল। তাই উদ্ভূত পরিস্থিতি সমাধানে করণীয় সম্পর্কে আলোচনার জন্য রাসূল জরুরি যুদ্ধসভার আহ্বান করেন।

---

[১] *আস-সিরাহ:* ইবনু কাসির—২/৩৮০

[২] আকাবার প্রথম শপথ বলতে বোঝায় ৬২১ খ্রিস্টাব্দে মদিনা থেকে আসা একদল সাহাবার ইসলামের উপর অটল থাকা এবং ইসলাম প্রচারের কাজে সাহায্য করার শপথ নেওয়ার ঘটনা। মূলত মক্কায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবারা ইসলামের শুরুর দিকে, ধর্ম প্রচারের জন্য সকল জনসমাগমে হাজির হতেন। তারা হজের মৌসুমে বিভিন্ন দেশ ও শহর থেকে আগত মানুষদের কাছেও ইসলামের দাবি ও আবেদন তুলে ধরতেন। এর ফলে ইয়াসবির (মদিনার পূর্ব নাম), সিরিয়া, মিশরসহ অনেক এলাকাতেই ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে যায়।

পরবর্তীতে ৬২১ খ্রিস্টাব্দে (নবুয়তের দ্বাদশ বছরে) রাসূল হজের সময়ে মদিনা থেকে আগত একদল লোকের সাথে সাক্ষাত করেন। এই দলের ১২ জন সদস্যের মধ্যে ১০ জনই ছিলো মদিনার উল্লেখযোগ্য গোত্র বনু খাযরাজ ও বনু আউসের লোক। তারা মিনার কাছে আকাবা উপত্যকায় উপস্থিত হয়ে রাসুলের নিকট ইসলামের শপথবাক্য পাঠ করেন। সেই শপথবাক্যে তারা ছয়টি বিষয়ে রাসূলের কাছে অঙ্গিকার করেন:

(১) আমরা একমাত্র আল্লাহর উপাসনা করব। (২) আমরা ব্যভিচারে লিপ্ত হব না। (৩) আমরা চুরি-ডাকাতি বা কোনোরূপ পরস্ব আত্মসাৎ করব না। (৪) আমরা সন্তানহত্যা বা বলিদান করব না। (৫) কারও প্রতি মিথ্যা অপবাদ বা দোষারোপ করব না। (৬) প্রত্যেক সৎকাজে আল্লাহর রাসুলকে মেনে চলব এবং কোনো ন্যায় কাজে তাঁর অবাধ্য হব না।

নবদীক্ষিত মদিনাবাসির এই শপথ বা বাইয়াতকে আল-আকাবার প্রথম শপথ বা বাইয়াতে আকাবা উলা নামে স্মরণ করা হয়। মদিনাবাসির এই বাইয়াত বা শপথ পরবর্তীতে ইসলাম প্রসারকে ত্বরান্বিত করেছিল। ফলশ্রুতিতে এরপরে আকাবায় আরও দুটি শপথের ঘটনা ঘটে। এরপর রাসূল প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে মদিনাবাসীর আবেদনে মুসআব ইবনে উমাইরকে মদিনায় পাঠান, তাদেরকে ইসলাম ও কুরআন শেখানোর জন্যে।

রাসূল আহুত সেই সভায় প্রসিদ্ধ ও নেতৃস্থানীয় সাহাবারা দাঁড়িয়ে কথা বললেন, তারা এই যুদ্ধকে কল্যাণ হিসেবে দেখলেন এবং নিজেদের সৌভাগ্যের কারণ মনে করলেন। মুহাজিররা যেমন সন্তোষজনক মতামত দিলেন, আনসাররাও যুদ্ধের অনুকূল সিদ্ধান্ত জানালেন। আনসারদের সর্দার সাদ বিন মুয়ায রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন: 'ইয়া রাসূলুল্লাহ, আনসাররা কখনোই আপনাকে লাঞ্ছিত হতে দেবে না, কিছুতেই আপনাকে আশাহত করবে না। আপনি যদি তাদেরকে সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে বলেন, আপনার সাথে তারা নির্দ্বিধায় সমুদ্রে ঝাঁপ দিতেও প্রস্তুত। আপনি আমাদের নিয়ে সামনে চলুন, আল্লাহ বারাকাহ দিবেন—ইনশাআল্লাহ' এই বলে তিনি বক্তব্য শেষ করলেন।

যুদ্ধের পূর্বাভাস

সাহাবাদের ইতিবাচক মতামত পেয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে নিয়ে বদর প্রান্তরে এগিয়ে গেলেন। স্থানীয় এক বৃদ্ধের মাধ্যমে তাঁর কাছে খবর এল, আবু সুফিয়ান কাফেলা নিয়ে নিরাপদ দূরত্বে চলে গেছে; তবে উপত্যকার ওপাশে কুরাইশের বাহিনী হাজির। আবু জাহাল কাফেলা নিরাপদ জেনেও ইঙ্গিতে কুরাইশদের বলেছে, তারা এখনই ফিরে যাবে না। বরং বদর প্রান্তরে গিয়ে তারা পশু জবেহ করবে, আনন্দভোজনের আয়োজন করবে এবং মদপানের আসর জমাবে; যাতে আরবরা তাদের এমন সাহসের খবর শুনে ভীতবিহ্বল হয়ে পড়ে এবং সবসময় তাদের ভেতর কুরাইশদের ভয় ও প্রভাব জিইয়ে থাকে।

দিন পেরিয়ে সন্ধ্যা নেমেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলি ইবনে আবি তালিব, যুবাইর ইবনুল আওয়াম ও সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাসকে তথ্য সংগ্রহের জন্য আশপাশে ঘুরে দেখতে পাঠান। তারা বদরের কূপে দুইজন পানি সংগ্রহরত ব্যক্তিকে বন্দি করেন। জিজ্ঞাসাবাদের পর তারা ভয় পেয়ে যায় এবং জানায়, তারা মক্কার বাহিনীর সদস্য এবং বাহিনীর জন্য পানি সংগ্রহ করছিল। রাসূল তখন নামায আদায় করছিলেন। উপস্থিত সাহাবিদের তাদের কথার সত্যতা সম্পর্কে সন্দিহান হলে তারা তাদের মারধর করেন এবং বারবার একই প্রশ্ন করতে থাকেন। চাপের মুখে তারা ভোল পাল্টে ফেলে। বলে, আমরা কুরাইশ বাহিনীর নয়, বরং আবু সুফিয়ানের কাফেলার লোক।

রাসূল নামায শেষ করে আসতে আসতে বলেন, 'তারা সত্যই বলছিল অথচ

এরপরও তাদেরকে তোমরা মারধর করলে কেন?' তাঁর চেহারায় বিরক্তি ফুটে ওঠে। এরপর তিনি নিজে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তারা উপত্যকার শেষ প্রান্তের টিলা দেখিয়ে বলে যে, কুরাইশরা তার পেছনে অবস্থান করছে এবং প্রতিদিন নয় বা দশটি উট তাদের সেনাদের জন্য জবাই করা হয়। একথা শুনে রাসূল অনুমান করে বলেন, তাহলে তাদের সেনাসংখ্যা ৯০০ থেকে ১০০০ হবে। এরপর বন্দি দুজন বাহিনীতে আগত সম্ভ্রান্ত কুরাইশ নেতাদের নামও বলে দেয়। রাসূল বুঝতে পারেন, যুদ্ধ না করে কুরাইশরা ময়দান ছেড়ে যাবে না। দেরি না করে তিনি বাহিনীকে বদরের দিকে যাত্রা শুরু করার নির্দেশ দেন।

কুরাইশরাও তাদের শিবির ভেঙে বদরের দিকে রওয়ানা হয়। মুসলিম বাহিনীর আগে প্রান্তরে পৌছে তারা উমাইর ইবনে ওয়াহাবকে রাসূলসেনাদের খবর সংগ্রহের জন্য পাঠায়। উমাইর পর্যবেক্ষণ করে এসে জানান, মুসলিমদের বাহিনী ছোট এবং আপাতত সাহায্যের জন্য নতুন কোন সেনাদল আসার সম্ভাবনাও নেই। তবে তারা সুবিন্যস্তভাবে যুদ্ধের জন্য তৈরি হয়ে আছে এবং তারা কুরাইশদের বিশেষ লোকদেরকে হত্যা করে ফেলতে পারে। এভাবে তিনি কুরাইশদের পক্ষে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা ব্যক্ত করেন। আরব যুদ্ধে হতাহতের পরিমাণ বেশি হত না, তাই এমন শঙ্কার কথা শুনে কুরাইশদের মনোবল নড়ে যায়। তারা মুসলমানদের মোকাবেলা করা না-করা নিয়ে পুনরায় তর্কে জড়িয়ে পড়ে। কুরাইশদের অন্যতম নেতা হাকিম ইবনে হিজাম আরেক নেতা উতবা ইবনে রাবিয়াকে ফিরে যেতে অনুরোধ জানায়। জবাবে উতবা বলেন, তিনি ফিরে যেতে রাজি আছেন এবং নাখলায় নিহত আমর ইবনে হাদরামির রক্তপণ নিজে পরিশোধ করতেও সম্মত আছেন। কিন্তু আবু জাহল কিছুতেই রাজি হচ্ছে না বলে তিনি হাকিমকে বলেন যে-কোনো মূল্যে তাকে রাজি করাতে। এরপর উতবা উপস্থিত কুরাইশদের উদ্দেশ্য করে বলেন, 'এই যুদ্ধে আমাদের হাতে হয়তো নিজেদের ভাইয়েরাই নিহত হবে; তাই যুদ্ধে বিজয়ী হলেও, নিহতদের লাশ দেখতে আমরা অবশ্যই পছন্দ করব না এবং চাইব না যে, আমরা আরববাসীর কাছে আত্মীয় হত্যাকারী হিসেবে পরিচিত হই!' কিন্তু তার কথায় কারও বোধোদয় হয়েছে বলে মনে হলো না। হাকিম ইবনে হিজাম এসময় আবু জাহলের কাছে গিয়ে পুনরায় তাকে ফিরে যাওয়ার পরামর্শ দেন। কিন্তু আবু জাহল কঠোরভাবে জানান, যুদ্ধ না করে কিছুতেই তিনি ফিরে যাবেন না। সেইসাথে উতবার ফিরে যাওয়ার পরামর্শকে ধিক্কার দিয়ে অভিযোগ করে বলেন, 'তোমার ছেলে মুসলিমদের দলে রয়েছে বলে তুমি ছেলেকে

বাঁচানোর জন্য যুদ্ধ না করার পরামর্শ দিচ্ছ, হ্যাঁ?'[১] আবু জাহলের এ-কথায় উতবা প্রচণ্ড বিব্রত হন এবং বলেন, 'আমি কাপুরুষ নই; মুহাম্মাদের সাথে চূড়ান্ত বোঝাপড়া না হওয়া পর্যন্ত আমি উতবা মক্কায় ফিরে যাবো না।' অন্যদিকে আবু জাহল নাখলায় নিহত আমরের ভাই আমির ইবনে হাদরামির কাছে গিয়ে অভিযোগ করে বলেন, 'উতবা যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে চলে যেতে চায়; তাই তোমার ভাইয়ের মৃত্যুর বদলা নেয়া সম্ভব হবে না বোধহয়!' এ-কথা শুনে আমির সারা শরীরে ধুলো মেখে কাপড় ছিঁড়তে ছিঁড়তে নিহত ভাইয়ের জন্য মাতম করতে থাকে। আবু জাহলের একগুঁয়েমি এবং মিথ্যা প্রচারণার ফলে যুদ্ধ বন্ধের জন্য হাকিমের সব তৎপরতা এখানেই ব্যর্থ হয়ে যায়।

প্রথম মৃত্যু

যুদ্ধ শুরুর প্রাক্কালে কুরাইশ সেনা আসওয়াদ ইবনে আবদুল আসাদ মাখযুমি এগিয়ে এসে 'মুসলিমদের পানির জলাধার দখল করে নেবে নাহয় এজন্য নিজের জীবন দেবে' বলে ঘোষণা দেয়। এ-কথা শুনে রাসূলের চাচা হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব অগ্রসর হয়ে তার সাথে লড়াই করেন। লড়াইয়ে আসওয়াদের পা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আহত অবস্থা আসওয়াদ চৌবাচ্চার দিকে এগিয়ে যায় এবং প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য চৌবাচ্চার সীমানার ভেতর ঢুকে পড়ে। হামযা তাকে নিবৃত্ত করতে সেখানেই হত্যা করেন। ঐতিহাসিকদের মতে, এটিই ছিল বদর যুদ্ধের প্রথম মৃত্যুর ঘটনা।

ওদিকে রাসূলের নেতৃত্বে মুসলমানরা উপত্যকার কাছাকাছি কিছুটা নিচু জায়গায় বাহিনী স্থির করার সুযোগ পায়। আশপাশে কোন পানির কূপ বা ঝরনা ছিল না; এমন সময় আল্লাহ তাআলা মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। ভারি বর্ষণের ফলে উপত্যকা বিশুদ্ধ পানিতে ভেসে যায়। প্রান্তরের বালু পানি শুষে নেবার আগেই মুসলমানরা তৃষ্ণা মিটিয়ে পাত্রগুলোতে প্রয়োজনীয় পানি ভরে রাখেন। বিক্ষিপ্ত বালুকাময় ভূমি বৃষ্টির সুবাদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবাদের পায়ের তলে এসে জমাট বেঁধে যায়; এতে তাদের চলাচল সহজ ও সুবিধাজনক হয়ে আসে। এদিকে অসময়ের বৃষ্টিতে কাফেরদের পায়ের তলের বালু সরে গিয়ে সেখানকার মাটি কর্দমাক্ত হয়ে ওঠে, এতে তাদের চলাচল খুবই বিরক্তিকর হয়ে যায়। মাটিতে

[১] উতবার ছেলে আবু হুযাইফা ইবনে উতবা ইসলাম প্রচারের প্রাথমিক যুগে মুসলিম হয়েছিলেন

পা ফেলতেই তা আলগোছে দেবে যাচ্ছিল, হাঁটু গেড়ে যাচ্ছিল সাথে থাকা বাহন ও যুদ্ধঘোড়াগুলোরও। ফলে তাদের আক্রমণ বাধাগ্রস্ত এবং বিলম্বিত হতে থাকে। এদিকে রাসূল তাঁর বাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসেন। সঞ্চিত জলাভূমির কাছে এসে অবস্থান নিয়ে তিনি একটি হাউজ নির্মাণের নির্দেশ দেন, যেখানে বাহিনীর প্রয়োজনীয় পানি সংরক্ষিত থাকবে। হাউজটির পাড় ঘেঁষে চারপাশে একটু নিচু করে কিছু কূপ খননেরও সিদ্ধান্ত দেন। এতে মুশরিকদের জন্য মুসলমানদের ডিঙিয়ে পানি সংগ্রহের আশা একেবারে শূন্যে চলে যায়। ময়দানের উঁচু থেকে সব পানি এসে জমে যায় রাসূলের পায়ের কাছে, নিচু ভূমিতে। খানিকটা উঁচু টিলামতন একটি জায়গায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য রণক্ষেত্রমুখী একটি তাঁবু স্থাপন করা হয়।

যুদ্ধ যখন হলো

হিজরি দ্বিতীয় বর্ষের ১৭ই রমজান ভোরবেলা উভয় বাহিনী মুখোমুখি হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে তাঁর বাহিনী কাতারবদ্ধ করেন। তাদেরকে সীসাঢালা প্রাচীরের মতো সুসংহত করে তিনি কুরাইশ বাহিনীর দিকে তাকান। উচ্চস্বরে বলেন: 'হে আল্লাহ, এই কুরাইশের মুশরিক বাহিনী তাদের অহংকার ও বিদ্বেষবশত আপনার বিরুদ্ধে জড়ো হয়েছে, আপনার রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। হে আল্লাহ, আমাদেরকে আপনার প্রতিশ্রুত বিজয় দান করুন, আর এই সকাল—তাদের ধ্বংস ও নির্মূলের সকাল করে দিন।'[১]

এরপর মুশরিকদের দল থেকে তিনজন ময়দানে নেমে আসে: উতবা ইবনু রাবিআ, তার ছেলে ওয়ালিদ এবং তার ভাই শাইবা। ময়দানে এসে তারা আহ্বান করতে থাকে, কে আছে তাদের মোকাবেলা করবে! তাদের আহ্বানে সাড়া দিতে মুসলিম বাহিনী থেকে বেরিয়ে আসেন তিন আনসার সেনা: আওফ ইবনু হারিস, মুয়াব্বিজ ইবনু হারিস এবং আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা। কিন্তু তারা বলে, আমরা আমাদের সমগোত্রীয় কুরাইশিদের দেখতে চাই। এ-কথা শুনে ময়দানে বেরিয়ে আসেন তিন কুরাইশি সেনা: হামযা ইবনু আবদিল মুত্তালিব, উবাইদা ইবনুল হারিস, আলি ইবনু আবি তালিব (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)। হামযা রা. দাঁড়ান শাইবার সামনে, উবাইদা রা. উতবার সামনে আর আলি রা. দাঁড়ান তুলনামূলক যুবক—ওয়ালিদের সামনে।

[১] *সিরাতে ইবনে হিশাম:* ৩/১৬৮

হামযা ও আলি রা. তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বীকে সহজেই ভূপাতিত করে ফেলেন কিন্তু উবাইদা রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীকে আঘাত করেছেন, তবে ধরাশায়ী করতে পারেননি। বিপরীতে উতবাও তাঁকে শক্ত আঘাত করেছে। আলি ও হামযা তাদের হাতসাফাই শেষে উবাইদার প্রতিদ্বন্দ্বী উতবার উপর আক্রমণ করে তার ইহকাল সাঙ্গ করে দেন এবং আহত উবাইদাকে তুলে মুসলিম বাহিনীর কাতারে নিয়ে রাখেন। কিছুক্ষণ পরই তিনি আহত অঙ্গের রক্তক্ষরণে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন—রাদিয়াল্লাহু আনহু।

একক মুখোমুখি লড়াইয়ের পর দুই দল একযোগে যুদ্ধে জড়িয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিকল্পনা ছিল, মুসলমানরা আগে যুদ্ধ শুরু না করুক, যাতে কাফেররা আগ বেড়ে মারতে এলে তাদেরকে নিজেদের বেষ্টনীর মধ্যে আটকে ফেলা যায়। তখন যুদ্ধক্ষেত্রের চারপাশের উঁচু টিলাগুলো থেকে আত্মগোপনকারী তিরন্দাজরা বের হয়ে মুহুর্মুহু তির ছুড়ে প্রতিপক্ষ সেনাদলের অগ্রভাগ ধরাশায়ী করে ফেলতে পারবে। মুসলমানদের পরিকল্পনামতে এমনটাই ঘটল!

যুদ্ধ তখন তুঙ্গে। দু পক্ষের সেনাদের তরবারি ক্রমাগত আঘাত করছে, সূর্যের আলোর সাথে সাথে চমকে উঠছে তাদের উন্মুক্ত বর্শাগুলো। বাতাসে উড়ছে বিক্ষিপ্ত ধুলোর দল, মুহূর্তেই ময়দান হয়ে উঠেছে সীমাহীন উত্তপ্ত। সাহাবাদের মুখে উচ্চারিত হচ্ছে বীরত্বের স্লোগান—আল্লাহু আকবার। বদরের পানিসঞ্চিত ভূমির অধিকার নিয়ন্ত্রণে নেবার সুবাদে মুসলামানরা চারপাশে কিছু কূপ ও উঁচু টিলা তৈরি করেছিল। যুদ্ধের একপর্যায়ে কাফিররা পানি পান করতে কূপের কাছে এলেই মুসলমানরা টিলাগুলোতে বসে একের পর এক তাদের বধ করেছে। মুয়ায ইবনে আমর এবং মুয়ায ইবনে আফরা নামক দুই কিশোর মুজাহিদ, কুরাইশপক্ষের সর্বাধিনায়ক আবু জাহলকে হত্যা করে ফেলে। বিলালের হাতে নিহত হয় তার সাবেক মনিব উমাইয়া ইবনে খালাফ। উমর ইবনুল খাত্তাব তার মামা আস ইবনে হিশাম ইবনে মুগিরাকে হত্যা করেন।

তবে সবচে বড় মদদ ছিল অন্যকিছু; আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদেরকে বিজয়ের ফেরেশতা পাঠিয়ে সাহায্য করেছিলেন। এর অল্প কিছুক্ষণের ব্যবধানে কাফিররা পরাজিত হয়ে পিঠ দেখিয়ে পালাতে শুরু করে। মুসলিম বাহিনী তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে এবং হত্যা ও বন্দির মাধ্যমে তাদেরকে আতঙ্কিত করে রাখে। তারা কুরাইশদের সত্তরজনকে হত্যা করে এবং অপর সত্তরজনকে আটক করে নেয়। নিহতদের মধ্যে

মুশরিকদের বেশ কয়েকজন নেতাব্যক্তিও ছিল।

যুদ্ধ তখন শেষ

যুদ্ধ পুরোপুরি শেষ হয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শহিদদের দাফন করার নির্দেশ দেন। মুসলমানদের মধ্য হতে মাত্র ১৪ জন সেনা সেবার শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করার সৌভাগ্য লাভ করেন—রাদিয়াল্লাহু আনহুম।

বদর প্রান্তরে যুদ্ধ সমাপ্ত হলে শহিদদের দাফনকার্য সেরে রাসূল নির্দেশ দেন গনিমত সংগ্রহ করার। কুরাইশ নেতাদের নিহত দেহগুলোকে পাশের এক কূপে নিক্ষেপ করার হুকুম দেন। একজন লোককে মদিনায় পাঠান শহরবাসীকে বিজয়ের সুসংবাদ দিতে। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গনিমতের মাল ও বন্দিদের নিয়ে মদিনায় ফিরে আসেন। বন্দিদের সাথে মুসলমানরা সদ্ব্যবহার করেন। নিজেরা খেজুর খেয়ে তাদেরকে রুটি খেতে দেন। শহরে পৌঁছে প্রথমে রাসূল গনিমত হিসেবে প্রাপ্ত সম্পদ নিয়মানুসারে মুজাহিদদের মধ্যে বণ্টন করে দেন; শহিদদের উত্তরাধীকারীদের জন্য তাদের অংশ হেফাজতে রাখেন। বন্দিদের ব্যাপারে করণীয় সম্পর্কে তিনি সাহাবিদের সাথে পরামর্শ করেন। সভায় আবু বকর মত দেন যে, বন্দিদের সবাই মুসলিমদেরই ভাই, একই বংশের সদস্য অথবা নিকটাত্মীয়। তাই আমার কাছে মনে হয়, তাদের থেকে মুক্তিপণ নিয়ে তাদেরকে ছেড়ে দেয়া উচিত; যাতে মুসলিমদের তহবিলে অর্থ সঞ্চিত হয় এবং বন্দিরা ভবিষ্যতে ইসলাম গ্রহণের সুযোগ পায়। উমর ইবনুল খাত্তাবের মত ছিল, বন্দিদের প্রতি কোনোপ্রকার অনুকম্পা প্রদর্শন না করে মুসলিমদের প্রত্যেককে, বন্দিদের মধ্যে নিজ নিজ আত্মীয়কে হত্যা করার নির্দেশ দেয়া হোক; যাতে এটা প্রমাণ হয় যে, মুশরিকদের ব্যাপারে মুসলিমদের মনে কোনো দুর্বলতা নেই। তবে রাসূল আবু বকরের মত মেনে নিয়ে সিদ্ধান্ত জানান, তাদেরকে হাতে রেখে কুরাইশদের থেকে মুক্তিপণ আদায় করবেন। সে-মতে মক্কায় 'মুক্তিপণ বাবদ বন্দিমুক্তির' বার্তা পাঠালে কুরাইশরা তা গ্রহণ করে এবং মুক্তিপণ দিয়ে তাদের বন্দিদের ছাড়িয়ে নেয়। পুরুষ বন্দির বিনিময়ে মুসলমানদের ধার্যকৃত মুক্তিপণ ছিল, গোত্রে তাদের অবস্থান অনুযায়ী এক হাজার থেকে চার হাজার দিরহাম পর্যন্ত। আর যারা মুক্তিপণ আদায়ে সমর্থ ছিল না, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে পড়ালেখা জানতো—তাদেরকে রাসূল মুক্তিপণ হিসেবে মুসলমানদের দশজন কিশোরের শিক্ষাদানের দায়িত্ব প্রদান করেন।

বন্দিদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেয়ে যায়নাব বিনতে মুহাম্মাদের স্বামী আবুল আসও ছিল। 'যায়নাবকে মদিনা আসতে বাঁধা দেবে না' এই শর্তে আবুল আসকে সেবার মুক্তি দেয়া হয়েছিল। মক্কার সুবক্তা হিসেবে পরিচিত সুহাইল ইবনে আমরও ছিলেন যুদ্ধবন্দিদের সাথে। উমর সুহাইলের সামনের দুটি দাঁত ভেঙে ফেলার প্রস্তাব দেন, যাতে সে আর মুসলিমদের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিতে না পারে। কিন্তু রাসূল উমরের এই প্রস্তাব গ্রহণ করেননি। পরবর্তীতে হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় এই সুহাইল কুরাইশপক্ষের প্রতিনিধি ছিলেন। আরও কিছু পরে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

বদরের যুদ্ধে কুরাইশদের নিহত সেনাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল: আবু জাহল ইবনু হিশাম, উমাইয়া ইবনু খালাফ, উতবা ইবনু রাবিআ, শাইবা ইবনু রাবিআ, হানযালা ইবনু আবি সুফিয়ান, ওয়ালিদ ইবনু উতবা এবং জাররাহ।[১] মুসলমানদের মধ্যে যারা শহিদ হয়েছিলেন, তাদের মধ্যে ছিলেন ছয়জন মুহাজির এবং আটজন আনসার সাহাবি।[২]

বদরের প্রভাব

বদরের এই অসম যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় সুদূরপ্রসারী প্রভাব সৃষ্টি করেছিল। যুদ্ধ জয়ের ফলে নেতা হিসেবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কর্তৃত্ব বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। এর ফলে অন্য আরব গোত্রগুলি মুসলিমদেরকে নতুন শক্তি হিসেবে দেখতে শুরু করে। মদিনার অনেক বিধর্মী এ-সময় ইসলাম গ্রহণ করে নেয়। বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুসলিমদেরকে পরবর্তী সময়ে খুবই সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হয়।

অন্যদিকে হাইসমান ইবনু আবদিল্লাহ নামক এক কুরাইশ সেনা পরাজয়ের খবর মক্কায় পৌঁছে দেয়। নেতৃস্থানীয় এতগুলো লোকের মৃত্যুর খবরে সেখানে শোকের মাতম পড়ে যায়। যুদ্ধে আবু জাহলসহ মক্কার অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তির মৃত্যুর ফলে আবু সুফিয়ান নতুন নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন এবং শোকের পরিবেশ সামলে তিনি প্রতিশোধের জন্য সকলকে শক্তি সঞ্চার করতে বলেন। পরবর্তীতে বেশ

[১] সাহাবি আবু উবাইদা রাদিয়াল্লাহু আনহুর পিতা, যাকে কেবল দ্বীনের দাবিতে আবু উবাইদা রা. নিজে হত্যা করেছেন; পিতা জাররাহ তাকে হাতের কাছে পেয়েও দূরে সরে যাওয়া সত্ত্বেও।

[২] *সিরাতে ইবনে হিশাম*: ১/৭০৭, *মারিফাতুস সাহাবা*: ১৬/২৬৫, *যাদুল মাআদ*: ৩/১৬০

কিছু যুদ্ধে মুসলিমদের বিরুদ্ধে তিনি পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে কুরাইশদের নেতৃত্ব দিয়েছেন।

এ যুদ্ধ ছিল মুসলমানদের বিজয়ের প্রথম মাইলফলক। এমন অভাবনীয় সাফল্য তাদের জন্য ছিল পরম গৌরবের। বদরের এ যুদ্ধে তাদের সেনাসংখ্যা ছিল কম, প্রস্তুতি ছিল সামান্য; অপরদিকে মক্কার মুশরিকরা সংখ্যায় ও সামগ্রীতে ছিল তুলনামূলক অনেক এগিয়ে। তারপরেও এমন অসামান্য বিজয় সে-সব মুসলমানদের প্রতি আল্লাহর অবারিত দান ও অনুগ্রহের প্রকৃষ্ট দলিল, যারা দৃঢ়প্রত্যয়ী হয়; যাদের হৃদয় ভরা থাকে আল্লাহর প্রতি ভরসায়, রাসূলের জবানিতে শোনা আল্লাহর বিজয় ও সাফল্যের প্রতিশ্রুতিতে—যাদের মনে থাকে অগাধ বিশ্বাস।

বদর প্রান্তরে মুসলমানদের এমন মহিমাময় জয় ও কুরাইশ বাহিনীর শোচনীয় পরাজয়ের ফলে পুরো আরববাসীর অন্তর্জগতে রাসূল ও সাহাবাদের ভয় ঢুকে যায়। ফলে পরবর্তী সময়ের জন্য এ বিজয় মুসলমানদের সম্মান, প্রভাব ও শক্তির প্রতীক হয়ে ওঠে। সমস্ত প্রশংসা উভয় জাহানের একক সৃষ্টিকর্তার!

উহুদ যুদ্ধ
BATTLE OF UHUD

তারিখ:	৩য় হিজরি / ৬২৫ খ্রি.
স্থান:	উহুদ, মদিনা মুনাওয়ারা
ফলাফল:	অমীমাংসিত সমাপ্তি

পক্ষ-বিপক্ষ:	মুসলমান	কুরাইশ (সাথে তিহামা ও কিনানার কিছু মিত্রজোট)
সেনাপ্রধান:	রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)	আবু সুফিয়ান ইবনু হারব
সেনাসংখ্যা:	৭০০	৩০০০
ক্ষয়ক্ষতি:	৭৫ জন শহিদ	২২ জন নিহত

উহুদ। এক নির্মম বাস্তবতার স্বচোখ সাক্ষী। ৩য় হিজরির শাওয়াল মাসের সাত তারিখ (২৩শে মার্চ, ৬২৫ খ্রি.) রোজ শনিবার এ স্থানেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেতৃত্বে মুসলমানদের সাথে মক্কাবাসী এবং তিহামা ও কিনানা গোত্রভূত তাদের কিছু অনুসারীদের মধ্যে ঐতিহাসিক উহুদ যুদ্ধটি সংঘটিত হয়।

এ-যুদ্ধে মুসলমানদের সাময়িক বিজয় লাভ হলেও আবু সুফিয়ানের বাহিনী ফিরে এসে অতর্কিত হামলা করে সেবার তাদের সামরিক কর্তৃত্ব ছিনিয়ে নেয়। মূলত বিজয় সুনিশ্চিত ভেবে মুসলমানরা যখন গনিমতের মাল সংগ্রহ করতে ব্যস্ত হয়ে যান এবং সে কারণে পূর্বপরিকল্পিত আত্মরক্ষার ঘাঁটিগুলো প্রহরাশূন্য হয়ে পড়ে—তখনই মুশরিকরা সুযোগ বুঝে আক্রমণ করে এবং যুদ্ধ নিজেদের পক্ষে নিয়ে যায়।

যুদ্ধের পূর্বকথা

বিগত বছরে বদর প্রান্তরে মুসলমানদের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হবার পর, মক্কার কুরাইশদের দাম্ভিকতা ধুলোয় মিশে যায়। ক্ষণে ক্ষণে তারা অনুভব করে লাঞ্ছনাকর পরাজয়ের অসহনীয় তিক্ততা। ফলে তারা দ্বিতীয়বার মুসলমানদের মোকাবেলা করার সর্বাত্মক প্রস্তুতি নিতে শুরু করে। তাদের চোখ তাতিয়ে উঠছিল বিশ্বের বুক থেকে মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলার হিংস্র ক্রোধে, যাতে নিজেদের গা থেকে পূর্বপরাজয়ের ধুলো পুরোপুরি ঝেড়ে ফেলা যায়।

সে-মতে সাফওয়ান ইবনু উমাইয়া, ইকরিমা ইবনু আবি জাহল এবং আবদুল্লাহ ইবনু রাবিআ মিলে আবু সুফিয়ানের কাছে গিয়ে সৈন্য প্রস্তুত করার জন্য শামফেরত কাফেলার সম্পদ কামনা করে। মূলত এই বাণিজ্যিক কাফেলাকে কেন্দ্র করে মক্কার এত সব নেতারা মারা যাওয়ায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যয়ের জন্য কাফেলার সকল সম্পদ বিক্রি করে যথোপযুক্ত সুযোগের আশায় আবু সুফিয়ানের কাছে জমা রাখা

হয়। পুঞ্জীভূত সেই মুনাফার পরিমাণ ছিল প্রায় এক হাজার উট এবং পঞ্চাশ হাজার দিনারের মতো। মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য আবু সুফিয়ান পুরোটা মুনাফাই তাদেরকে দিয়ে দিতে সম্মত হয়ে যায়। এরপর তারা একযোগে মক্কার গোত্রগুলোতে লোক পাঠাতে লাগল, যাতে শহরের সকল পুরুষকে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করা যায়। বদরের রোমহর্ষক পরাজয়ের মাত্র এক বছর পার হলেও তারা কুরাইশ ও তাদের মিত্র গোত্রগুলো থেকে প্রায় তিন হাজার সেনা একত্র করতে সক্ষম হয়। অংশগ্রহণ করে আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ বিনতে উতবাসহ আরও ১৫ জন মহিলা। ৩০০০ উট এবং ২০০ ঘোড়াসহ সম্মিলিত সেই বাহিনী নিয়ে মুশরিকরা উহুদ পাহাড়ের উপকণ্ঠে 'আইনাইন' নামক স্থানে গিয়ে সমবেত হয়।[১] এ-সময় হিন্দ বিনতে উতবা প্রস্তাব দেন যে, মুহাম্মদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মায়ের কবর যাতে ধ্বংস করে দেয়া হয়। কিন্তু এর পরিণাম ভয়াবহ হতে পারে ভেবে নেতারা এমন প্রস্তাবে সম্মত হননি।

হিজরি তৃতীয় সালের ৬ শাওয়াল, রোজ জুমাবার। মদিনার ঘরে ঘরে পৌঁছে গেল কুরাইশ বাহিনীর উপস্থিতির খবর। নতুন যুদ্ধের আগমনী বার্তায় অনেককে সন্তুষ্ট দেখা গেল; বিশেষত যারা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি, ফলে গনিমতেরও কোন অংশ পাননি, তাদের কেউ কেউ বলছিল: 'ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি আমাদেরকে নিয়ে মদিনার বাইরে গিয়ে শত্রুদলের মোকাবেলায় চলুন; যাতে তারা না ভাবে যে, আমরা দুর্বল কাপুরুষ হয়ে গেছি।' আর কিছু মুসলিম (যাদের মধ্যে মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবনু উবাই ইবনু সালুলও ছিল) চাচ্ছিল, মদিনার ভেতরে থেকে কুরাইশদের প্রতিরোধ করা হোক এবং ঘটনাক্রমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিন্তাও ছিল এমন। তিনি ভাবছিলেন, মদিনার বাইরে না গিয়ে ভেতরে শক্ত প্রতিরক্ষা গড়ে তোলাই শ্রেয়। কারণ, তিনি আগের রাতে স্বপ্নে দেখেছিলেন, তাঁর তরবারির আগা ভেঙে গেছে; তাঁর একটি গরু জবেহ হয়ে গেছে এবং তিনি একটি শক্ত বর্মে হাত ঢুকিয়ে রেখেছেন।[২] সে-মতে রাসূল

[১] আইনাইন: কারও মতে উহুদ পাহাড়ের একটি উঁচু টিলার নাম; কেউ বলেন, উহুদ মূলত কয়েকটি পাহাড়, বেশকিছু উপত্যকা যেগুলোকে ভাগ করে দিয়েছে—উহুদ পাহাড়ের বিচ্ছিন্ন অংশগুলোর একটি, এই 'আইনাইন'। ইয়াকুত হামাবি: *মুজামুল বুলদান*—৪/১৭৪

[২] দেখুন: বিভিন্ন সনদে বর্ণিত একটি হাদিস, *নাসায়ি*: ৭৬৪৭, *মুসনাদে আহমাদ*: ২৪৪৫, *দারিমি*: ২১৫৯, *মুস্তাদরাকে হাকেম*: ২৫৮৮, *আস-সুনানুল কুবরা*: ইমাম বায়হাকি—১৩০৬১; শাইখ শুয়াইব আরনাউত বলেন: হাদিসটির সনদ হাসান পর্যায়ের; শাইখ হুসাইন সালিম আসাদ বলেন: ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী হাদিসটির সনদ 'সহিহ' পর্যায়ের।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদেরকে বাইরে গিয়ে তাদের মোকাবেলা না করে শহরে শক্ত অবস্থান নিতে বললেন, যাতে তারা শহরের কাছাকাছি হলে যেন প্রবেশপথের মুখগুলোতে দাঁড়িয়ে তাদের সাথে যুদ্ধ করা যায়। রাসূলের এই সিদ্ধান্তের সাথে আবদুল্লাহ ইবনু উবাই ইবনু সালুলও সম্মত হলো। তবে আনসারি সাহাবিদের অনেক যুবকই যেন এটা মেনে নিতে পারছিল না। তারা বরং যে-কোনো মূল্যে শহরের বাইরে গিয়ে শত্রুদের মোকাবেলা করার পক্ষে। এতে আল্লাহ যাকে শাহাদাতের মর্যাদা দিতে চান, সে শহিদ হয়ে যাবে; আর যা বেঁচে ফিরতে পারবে, সে জয়ীর বেশে ফিরবে। রাসূল তাদের এমন চিন্তা দেখে কিছু বললেন না। সোজা তাঁর ঘরে প্রবেশ করলেন। নিজের যুদ্ধবর্মটি গায়ে জড়িয়ে বেরিয়ে এলেন।

দিনটি ছিল জুমাবার। রাসূলকে বর্ম পরে বের হতে দেখে, যারা শহরের বাইরে যাবার গোঁ ধরেছিল, তারা খুব লজ্জিত হলো। বলল, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনার ইচ্ছে হলে ফিরে যেতে পারেন।' রাসূল বললেন: 'কোনো নবীর জন্য বর্ম পরিধানের পর যুদ্ধ না করে ফিরে যাওয়া শোভাকর না।'[১] এই বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাজার সাহাবি নিয়ে উহুদ অভিমুখে যাত্রা করলেন। তাঁর অবর্তমানে অবশিষ্ট মুসলমানদের নামাযের ইমামতির জন্য দায়িত্ব দিয়ে গেলেন ইবনু উম্মি মাকতুমকে।

কিন্তু মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবনু উবাই ইবনু সালুল—সে ছিল খাযরাজ গোত্রের সর্দার এবং মুসলমানদের মধ্যকার মুনাফিকদের নেতা—সিদ্ধান্ত নিলো, সে তার অনুসারীদের নিয়ে মদিনা ফিরে যাবে। তার কথা ছিল: 'জানি না কীসের নেশায় আমরা আত্মহত্যা করতে যাচ্ছি!' তিনশো যোদ্ধা তার অনুসরণ করে পথিমধ্য থেকে চলে আসে।

যুদ্ধক্ষেত্রে নবীজি

উহুদ পাহাড়ের উপত্যকায় গিয়ে মুসলমানরা অবস্থান গ্রহণ করে। বাহিনীর মুখ শহরের দিকে করে পেছনে রাখা হয় উহুদ পাহাড়ের সুউচ্চ টিলাগুলোকে। এ-সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৫০ জন দক্ষ তিরন্দাজের

[১] *মুসনাদে আহমাদ*: ১৪৮২৯, শাইখ শুয়াইব আরনাউত বলেন: ইমাম মুসলিমের শর্ত মোতাবেক হাদিসটির সনদ 'সাহিহ লি-গাইরিহি' পর্যায়ের। ইমাম হাইসামি বলেন: এ-হাদিসের বর্ণনাকারীগণ সহিহ পর্যায়ের, *মাজমাউয যাওয়ায়েদ*: ৬/১৫২

একটি বিশেষ দল গঠন করেন। সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনু জুবাইর ইবনুন নুমানের নেতৃত্বে এই বাহিনীকে তিনি নির্দেশ দেন, মানাত উপত্যকার দক্ষিণ পাশে 'রুমাত' পাহাড়ের ১৫০ মিটার উপরদিকে ঠায় প্রহরায় থাকতে। রাসূল তাদেরকে বিশেষ করে বলে দেন: 'যদি দেখো, পাখিরা আমাদের লাশগুলো ঠুকরে খাচ্ছে, তবু আমার আদেশ ছাড়া এখান থেকে নড়বে না। আর যদি দেখো আমরা শত্রুদের পরাজিত করে একেবারে পদদলিত করে ফেলেছি, তবুও আমাদের নির্দেশ ছাড়া এ জায়গা ত্যাগ করবে না।'[১] সে-দলের নেতা আবদুল্লাহ ইবনু জুবাইরকে নির্দেশ দিলেন, 'মুশরিকদের প্রতি ক্রমাগত তির নিক্ষেপ করতে থাকবে, যাতে তারা কোনোভাবেই তার পেছন থেকে উঠে আসতে না পারে।' এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর অবশিষ্ট সেনাদেরকে যুদ্ধের জন্য কাতারবদ্ধ করেন। বাহিনীর ডান পার্শ্বের নেতৃত্বে মুনজির ইবনে আমর ও বাম পার্শ্বে যুবাইর ইবনুল আওয়ামকে রাখেন। মিকদাদ ইবনে আসওয়াদকে নিযুক্ত করেন যুবাইরের সহকারী হিসেবে। মূলত এই বাম পার্শ্বে অধিক গুরুত্ব দেয়ার কারণ হলো, এদিকটার দায়িত্ব ছিল কুরাইশ বাহিনীর ডান পার্শ্বের নেতৃত্বে থাকা খালিদ বিন ওয়ালিদের অশ্বারোহীদের প্রতিরোধ করা। এ যুদ্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিম বাহিনীর পতাকা তুলে দিয়েছিলেন বনু আবদিদ-দার গোত্রের বিখ্যাত সাহাবি হযরত মুসআব ইবনু উমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাতে।

ওদিকে মুশরিকদের বাহিনী ছিল তিন হাজার সেনার, যাদের মধ্যে দুইশো ছিল অশ্বারোহী। কারও মতে, মুসলমানদের মধ্যে ঘোড়সওয়ার পঞ্চাশ জন এবং তিরন্দাজ ছিল পঞ্চাশ জন। কুরাইশরা তাদের সেনাদলের ডান অংশের অশ্বারোহীদের নেতৃত্বে রেখেছিল খালিদ বিন ওয়ালিদকে; আর বাম পাশে রেখেছিল ইকরিমা ইবনু আবি জাহলকে। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে আনসারদেরকে আবু সুফিয়ান বার্তা পাঠিয়ে জানান যে, তারা যদি মুহাজির মুসলিমদেরকে ত্যাগ করে, তাহলে তাদের কোনোরকম ক্ষতি করা হবে না এবং মদিনা শহরেও আক্রমণ করা হবে না। কিন্তু আনসাররা তার এই প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে এবং রাসূল ও তাঁর মুহাজির সেনাদের জন্য জান কুরবান করার অঙ্গিকার করেন।

---

[১] *বুখারি*: ২৮৭৪, *আবু দাউদ*: ২৬৬২, *নাসায়ি*: ১১০৭৯, *মুসনাদে আহমাদ*: ১৮৬১৬

যুদ্ধের বিবরণ

মদিনাত্যাগী আবু আমর মক্কার পক্ষে মুসলিম বাহিনীতে প্রথম আক্রমণ চালায়। কিন্তু সাহাবাদের তিরের বৃষ্টিতে আবু আমর ও তার লোকেরা টিকতে না পেরে কুরাইশ সারির একেবারে পেছনের দিকে সরে আসে। এরপর মক্কার পতাকাবাহক তালহা ইবনে আবি তালহা আল-আবদারি এগিয়ে গিয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান করে। সাহাবি যুবাইর ইবনুল আওয়াম তার আহ্বান শুনে এগিয়ে যান এবং তাকে হত্যা করে ফিরে আসেন। এটা দেখে তালহার ভাই উসমান ইবনে আবি তালহা এগিয়ে গিয়ে পড়ে যাওয়া শিরকের পতাকা তুলে নেয়। মুসলিমদের মধ্যে থেকে রাসূলের চাচা হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব এগিয়ে এসে তাকেও পরপারে পাঠিয়ে দেন। মক্কার পতাকা বহনের দায়িত্ব তাদের পরিবারের উপর ন্যস্ত ছিল। একারণে তালহার ভাই ও পুত্রসহ মোট ছয়জন, একের পর এগিয়ে আসে এবং সবাই মুসলিম সেনাদের হাতে নিহত হয়।

দ্বন্দ্বযুদ্ধের পর দুই বাহিনীর মধ্যে মূল লড়াই শুরু হয়। যুদ্ধে আগত কুরাইশ নারীরা দফ বাজিয়ে সেনাদের উৎসাহ জুগিয়ে যায়। মুসলিমরা মক্কার সৈনিকদের সারি ভেঙে ফেলতে সক্ষম হওয়ায় শুরুতেই কুরাইশ বাহিনীর মনোবল ভেঙে পড়ে। খালিদ বিন ওয়ালিদের নেতৃত্বে মক্কার অশ্বারোহীরা পরপর কয়েকবার মুসলিম বাহিনীর বাম পার্শ্বে আক্রমণ চালাতে চেষ্টা করে, কিন্তু জাবালে রুমাতের উপর মোতায়েন করা তিরন্দাজদের আক্রমণের কারণে তারা বেশি ভেতরে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ পায়নি। এর ফলে যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলিমরা সুবিধাজনক অবস্থান লাভ করে এবং বিজয়ের নিকটে পৌঁছে যায়। এমনকি, একসময় ময়দানে নিজেদের আধিপত্য দেখে তারা ভেবে বসে যে, যুদ্ধ তো শেষ। সে-মতে তারা পরাজিত মুশরিকদের ফেলে যাওয়া গনিমত গোছাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এ-সময় পাহাড়ে দায়িত্বে থাকা তিরন্দাজ বাহিনী রাসূলে পাকের নির্দেশ বিস্মৃত হয়ে গনিমত সংগ্রহের কাজে অংশ নিতে তাদের স্থান ত্যাগ করে নিচে নেমে আসে। তাদের কেউ বলে, 'এখন আর দাঁড়িয়ে থেকে কী লাভ?'; তারা তাদের প্রতি রাসূলের নির্দেশনা ভুলে যায়। দলনেতা আবদুল্লাহ ইবনু জুবাইর তাদেরকে রাসূলের নির্দেশ স্মরণ করিয়ে দিলেও তারা তার কথায় ভ্রুক্ষেপ না করে দ্রুত গনিমতের মাল গোছাতে নেমে আসে। ফিরে যেতে যেতে খালিদ বিন ওয়ালিদ খেয়াল করে পাহাড়ের এই গুরুত্বপূর্ণ জায়গাটি থেকে দায়িত্বরত তিরন্দাজরা নেমে যাচ্ছে। সে বিলম্ব না করে একদল মুশরিককে সাথে নিয়ে পাহাড়ের পাশে জড়ো হয়; এরপর সুযোগ বুঝে মুসলমানদের উপর

পেছন থেকে অতর্কিত হামলে পড়ে। আকস্মিক এ আক্রমণে মুসলমানরা অপ্রস্তুত হয়ে ভয়ে পেছনে সরে আসে। ধীরে ধীরে ময়দান চলে যায় মুশরিকদের দখলে, শিরকের পতাকা ক্রমশ উঁচু হতে থাকে। দূর থেকে নিজেদের পতাকা উত্তোলিত দেখতে পেয়ে আবু সুফিয়ানের মূল বাহিনীও পুনর্বার ময়দানে ছুটে আসে এবং একযোগে হামলা চালায়।

এক মুশরিক সেনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লক্ষ করে একটি পাথরখণ্ড ছুড়ে মারলে প্রিয় রাসূলের দাঁত মোবারক শহিদ হয়ে যায়। এদিকে তিনি আহত হয়ে একটি গর্তে পড়ে যান, যে গর্তটি খুঁড়েছিল আবু আমের আর-রাহিব; সে গর্ত খুঁড়ে মাটি ও ঘাস-পাতা দিয়ে তা ঢেকে দিয়েছিল। এ-যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথা মোবারক ফেটে যায়। তিনি আঘাতের স্থান থেকে রক্ত মুছতে মুছতে বলেন: 'সে-জাতি কীরূপে সফল হবে, যারা তাদের সেই নবীর মুখাবয়ব রক্তে রঞ্জিত করে দেয়, যে নবী তাদেরকে প্রতিপালকের দিকে আহ্বান করে!' [১]

তবে কারও কারও মতে, কুরাইশদের বিখ্যাত বাহাদুর আবদুল্লাহ বিন কামিয়া মুসলিম সেনাদের কাতার ভেঙে সামনে এগিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মুবারকের উপর তলোয়ার দ্বারা আঘাত করে। এতে তাঁর শিরস্ত্রাণের দুটি কড়া চেহারায় ঢুকে যায় এবং একটি দাঁত শহিদ হয়ে যায়। হযরত সিদ্দিকে আকবার রাদিয়াল্লাহু আনহু কড়া দুটি বের করার জন্য সামনে অগ্রসর হলে হযরত আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে কসম দিয়ে বলেন, আল্লাহর জন্য এই খিদমত আমাকে করার সুযোগ দিন। এই বলে তিনি হাতের পরিবর্তে নিজের মুখ দ্বারা কড়াটি সজোরে টান দিতেই একটি কড়া বের হয়ে আসে। সাথে টানের তীব্রতায় তার একটি দাঁতও উপড়ে যায়। এটা দেখে দ্বিতীয় কড়া তুলতে আবু বকর এগিয়ে আসলে আবু উবাইদা পুনরায় তাকে কসম দেন এবং অপর কড়াটিও নিজে তুলে নেয়ার আবেদন করেন। আবারও মুখ দ্বারা টান দিলে দ্বিতীয় কড়াটিও বের হয়ে আসে। কিন্তু আগের মতো এবারও তার আরেকটি দাঁত উপড়ে যায়।

পরিস্থিতি ভয়াবহ দেখে রাসূলের প্রেমে প্রাণোৎসর্গকারী সাহাবারা তাঁকে চারপাশ

[১] *আস-সুনানুল কুবরা:* ইমাম নাসায়ি—১১০৭৭, *ইবনু মাজাহ:* ৪০২৭, *মুসনাদে আহমাদ:* ১২৮৫৪; শাইখ শুয়াইব আরনাউত বলেন: ইমাম বুখারির শর্তমতে হাদিসটির সনদ সহিহ পর্যায়ের

থেকে ঘিরে ফেলেন। চারদিক থেকে রাসূলকে লক্ষ করে মুশরিকদের তির তলোয়ার বৃষ্টির মতো উড়ে এল, কিন্তু সাহাবারা সব নিজেদের গায়ে নিয়ে নেন। হযরত আবু দুজানা রাদিয়াল্লাহু আনহু নবীজির দিকে ঝুঁকে আক্রমণের সামনে ঢাল হয়ে গেলেন। উড়ে আসা তিরগুলো একে এক তার পিঠে বিদ্ধ হতে লাগল। অপরপাশে দাঁড়িয়ে গেলেন হযরত তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু। শত্রুদের দিকে মুখ করে দাঁড়ালে রাসূলের দিকে পিঠ হয়ে যায়, তাই তিনি রাসূলের দিকে মুখ করে তির-তলোয়ারের সামনে পিঠ পেতে দেন। ডান দিক থেকে তলোয়ারের আঘাত এলে তিনি নবীজিকে বাঁচাতে হাত পেতে দেন; তার হাতটি কেটে মাটিতে পড়ে যায়। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে দেখা যায়, হযরত তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহুর শরীরে সত্তরোর্ধ আঘাতের চিহ্ন ছিল। [১] হযরত আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু একটি ঢাল হাতে রাসূলের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন।

রাসূল যখনই মাথা তুলে ময়দানের দিকে তাকাতে চাইতেন, আবু তালহা বলতেন: 'ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি মাথা তুলবেন না। শত্রুর কোন তির যদি আপনার গায়ে বিদ্ধ হয়ে যায়? সেটা গ্রহণ করার জন্য আপনার সামনে তো আমার বুক পাতা আছে!' কুরাইশ পাষণ্ডরা নির্দয়ভাবে একের পর এক রাসূলকে লক্ষ করে আক্রমণ করতে থাকে। অথচ রাসূল সেই মুহূর্তেও মুখে আওড়াতে থাকেন, 'হে আল্লাহ, আমার কওমকে ক্ষমা করুন! তারা জানে না; তারা বুঝে না।'

হঠাৎ কুরাইশরা ময়দানে গুজব ছড়িয়ে দেয় যে, মুহাম্মদ এবং তার সাথিদ্বয় উমর ও আবু বকর মারা গেছে। এতে লড়াইরত সাহাবাদের মধ্যে হতাশা দেখা দেয় এবং তারা যুদ্ধের ময়দানে অমনোযোগী হয়ে পড়েন।

কিন্তু সহসা রাসূল জীবিত আছেন বলে জানা যায়। সাহাবাদের হাতের মুঠি পুনরায় শক্ত হয়ে আসে এবং তারা কাফিরদের শক্ত মোকাবেলা করতে শুরু করেন। কিন্তু ততক্ষণে ময়দানের চিত্র পাল্টে গেছে। তীব্র সম্মুখযুদ্ধের পর অধিকাংশ মুসলিম উহুদ পর্বতের ঢালে এসে জমায়েত হয়ে যান। রাসূল এবং অন্যান্য নেতৃস্থানীয়

[১] পাঠক এখানে একটু কল্পনা করুন। একটু চোখ বন্ধ করে ভাবুন। রাসূলের প্রেমে আপনার কি চোখ ভিজে আসে? আপনার কি শরীরে শিহরণ তৈরি হয়? কষ্ট লাগে? কান্না লাগে? একটু কি ভাবতে পারি, তারা যুদ্ধের এমন ঘোরতর মুহূর্তেও, রাসূলের প্রতি আদব প্রদর্শনে কতটা তৎপর এবং সচেতন ছিলেন? নিঃসন্দেহে তাঁরা রাসূলের সাহাবি হবার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে নির্বাচিত ছিলেন। নতুবা আমাদের মতো সাধারণ হলে এত বড় ত্যাগ, প্রেমের এত কঠিন প্রাণোসর্গ—হয়ত সম্ভব হতো না। রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম আজমাইন!

সাহাবারাও পর্বতের উপরের দিকে এসে আশ্রয় নেন।

মক্কার সেনারা মুহাম্মদের খোঁজে পর্বতের দিকে অগ্রসর হয়; কিন্তু হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব এবং মুসলিমদের একটি সাহসী সেনাদলের প্রতিরোধের কারণে তারা বেশিদূর এগোতে সক্ষম হয়নি। ফলে লড়াই সেখানেই থেমে যায়।

হিন্দ ও তার সঙ্গীরা এ-সময় নিহত মুসলিমদের লাশ টুকরো করে লাশের কান, নাক কেটে পায়ের গয়নার মতো করে পরিধান করে। যুদ্ধ চলাকালীন হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব ইথিওপীয় দাস ওয়াহশি ইবনে হারবের বর্শার আঘাতে শহিদ হয়ে যান। 'হামযাকে হত্যা করতে পারলে দাসত্ব থেকে মুক্তি দেয়া হবে' এমন প্রতিশ্রুতি পাওয়ার কারণে ওয়াহশি হামযাকে টার্গেট করে হত্যা করেছিলেন। পরবর্তীতে হিন্দ অত্যন্ত নির্দয়ভাবে নিহত হামযার কলিজা বের করে চিবিয়ে খেয়েছিলেন বলে ইতিহাসে বর্ণনা পাওয়া যায়।

মুসলিমরা পর্বতে আশ্রয় নেয়ার পর আবু সুফিয়ানের সাথে উমরের কিছু উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় হয়। কথোপকথনের সময় আবু সুফিয়ান এই দিনকে বদরের প্রতিশোধ বলে উল্লেখ করেন। প্রতিউত্তরে ইবনুল খাত্তাব বলেন, 'আমাদের নিহতরা জান্নাতে এবং তোমাদের নিহতরা জাহান্নামে চলে গেছে।' আবু সুফিয়ান বলেন, 'আমাদের সাথে লাত-উজ্জা-মানাত আছে; আর আছে এত এত সম্পদ ও সেনা।' উমর বলেন, 'আর আমাদের সাথে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আছেন, আমাদের আর কিছুরই প্রয়োজন নাই।' এরপর কুরাইশরা ময়দান ত্যাগ করে মক্কাভিমুখে যাত্রা করে। আর মুসলিমরা নিহত সৈনিকদেরকে যুদ্ধের ময়দানে দ্রুত দাফন করে দেন।

ফলাফল

প্রথম দিকে মুসলিমরা সুবিধাজনক অবস্থায় থাকলেও একপর্যায়ে যুদ্ধের নিয়ন্ত্রণ চলে যায় কুরাইশদের হাতে। বিশৃঙ্খল অবস্থায় পড়ে যাওয়া মুসলিমরা এরপর অনেক কষ্টে পর্বতে জমায়েত হতে সক্ষম হয়। তবে বিস্ময়করভাবে কুরাইশরা এরপর আর সামনে অগ্রসর হয়নি এবং যুদ্ধক্ষেত্রে বিজয়ীদের তিনদিন অবস্থানের তৎকালীন রীতিও পালন করেনি। বরং তখনই তারা অনেকটা আতঙ্ক বুকে নিয়েই পেছনে ফিরে চলে যায়। ফলে শেষপর্যন্ত মুসলিমদের তুলনামূলক বেশি ক্ষয়ক্ষতি এবং কুরাইশদের সুবিধাজনক অবস্থান সত্ত্বেও যুদ্ধের ফলাফল অনেকাংশে

অমীমাংসিতই রয়ে যায়।

তবে যুদ্ধে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেনাপতি হিসেবে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। উহুদকে যুদ্ধক্ষেত্র হিসেবে বেছে নেয়া ছিল তাঁর একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল। মুসলিমদের ইচ্ছানুযায়ী তিনি শহরের বাইরে খোলা ময়দানে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নিলেও কুরাইশ বাহিনীর অধিক চলাচল-সক্ষমতার ব্যাপারে সচেতন ছিলেন। খোলা ময়দানে লড়াইয়ের ফলে মুসলিম পদাতিকদের পার্শ্বগুলি শত্রুদের অশ্বারোহী তিরন্দাজদের আক্রমণের মুখোমুখি হওয়ার সমূহ আশঙ্কা ছিল। তাই তিনি বাহিনীর পেছনের দিকে উহুদ পর্বতকে রেখে সেনাবিন্যাস করেছিলেন। এর ফলে সেইদিক থেকে শত্রুদের কোন আক্রমণ আসেনি। তাছাড়া সামনের অংশের বিস্তৃতি ছিল প্রায় ৮০০ থেকে ৯০০ গজ (৭৩০ থেকে ৮২০ মি)। বাহিনীর এক পার্শ্বভাগকে পর্বতের পাশে এবং অন্য পার্শ্বভাগকে পর্বতের গিরিপথের দিকে মোতায়েন করেছিলেন রাসূল। তাই সামরিক দিক থেকে উভয় অংশ মক্কার অশ্বারোহীদের থেকে একেবারেই নিরাপদ ছিল। একমাত্র যে-পথে আক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, সেদিকে তিনি তিরন্দাজদের বিশেষ বাহিনী দাঁড় করিয়েছিলেন। অশ্বারোহীপ্রধান কোনো বাহিনীর বিরুদ্ধে পদাতিকপ্রধান বাহিনীর কিভাবে লড়াই করা উচিত, এই যুদ্ধে রাসূল তার উত্তম নমুনা দেখিয়েছেন।

পাশাপাশি এই যুদ্ধে খালিদ বিন ওয়ালিদ একজন দক্ষ সেনাপতি হিসেবে নিজের সামর্থ্য প্রমাণ করেছেন। মুসলিম তিরন্দাজদের ভুল পদক্ষেপ নজরে পড়ার পর তিনি সুযোগ হাতছাড়া করেননি। ফলে মুসলিমরা তার এই বিচক্ষণতার দরুন ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিলেন। পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণের পর পারস্য ও সিরিয়া বিজয়ের সময় খালিদ সবচেয়ে সফল মুসলিম সেনাপতি হিসেবে সবিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন।

যুদ্ধের পর

বিগত বছরের প্রতিশোধ নিতে আসা এ যুদ্ধ শেষ হয় মুসলমানদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির মধ্য দিয়ে। বদরের নিহত সত্তর জন কুরাইশির বদলায় এ-যুদ্ধে কুরাইশরা সত্তর জন মুসলমানকে শহিদ করে দেয়। সেবারের সত্তর কুরাইশ-বন্দির পরিবর্তে এবার তারা সমসংখ্যক মুসলমানকে বন্দি করে নিয়ে যায়। সুরা আলে-ইমরানের ১৬৫ নম্বর আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এ-ঘটনার দিকে ইঙ্গিত দিয়ে বলেন:

أَوَلَمَّآ أَصَٰبَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

> *'কী ব্যাপার, যখন তোমাদের উপর মুসিবত আসল, তখন তোমরা বললে, এটা কোথা থেকে এল? অথচ তোমরা তো দ্বিগুণ বিপদ ঘটিয়েছিলেন। তাহলে বলে দাও, এ কষ্ট তোমাদের উপর পৌছেছে তোমারই পক্ষ থেকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।'*

এদিকে এ-যুদ্ধে কুরাইশদের সাকুল্যে ক্ষয়ক্ষতি ছিল ২৩ জন সেনা নিহত হওয়া।

উহুদের প্রান্তরে শোচনীয় পরিস্থিতির পরদিন শাওয়াল মাসের ৮ তারিখ রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের একটি বাহিনী নিয়ে 'হামরাউল আসাদ' যুদ্ধে যান। সেখানে মক্কার দিকে ফিরে যাওয়া আবু সুফিয়ানের বাহিনীকে তিনি ধাওয়া করেন। ঐতিহাসিকরা হামরাউল আসাদ অভিমুখে রাসূলের এ আক্রমণের বেশকিছু তাৎপর্য উল্লেখ করেছেন। যেমন:

- এ আক্রমণ মূলত বিপর্যস্ত সেনাদের মানসিক আরোগ্যের উদ্দেশ্যে রাসূলের কৌশলী প্রচেষ্টা ছিল। কারণ, রাসূল এ মোকাবেলায় কেবল সে-সব সাহাবাদের সাথে নিয়েছিলেন, যারা উহুদে তাঁর সাথে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। তাছাড়া এ যাত্রায় বের হওয়া অধিকাংশজন—এমনকি খোদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও—ছিলেন আহত। এ-সময় প্রিয় নবীজির চেহারা, ঠোঁটের নিম্নভাগ এবং দুই হাঁটু আঘাতপ্রাপ্ত ছিল।

- মক্কাবাসীর কাছে ইঙ্গিত পাঠানো যে, উহুদের ঘটনা মুসলমানদের শিবিরে হতাশা ছোঁয়াতে পারেনি; তাদের মনোবল ভেঙে দেয়নি।

- মদিনার আভ্যন্তরীণ বিরোধী পক্ষগুলোর কাছে এ-বার্তা তুলে ধরা যে, কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এখনো শক্ত, অবিচল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিয়ন্ত্রণে আছে।

কেন এই বিপর্যয়?

- যুদ্ধের ময়দানে কিছু মুসলিম সেনাকর্তৃক সেনাপ্রধানের আদেশ অমান্য করার মাশুল দিতে হয়েছে পুরো বাহিনীকে। যেমনটা আমরা দেখেছি, পাহাড়ে প্রহরায় থাকা তিরন্দাজ বাহিনী সেনাপতি রাসূলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুমতি ছাড়া তাদের স্থান ত্যাগ করে নিচে নেমে আসে।

- সামাজিকভাবে ইয়াসরিব (মদিনার পূর্বনাম) শহরে তখনও ইসলাম ছিল নতুন; সেখানে তাদের নিয়ন্ত্রণ ততটা শক্ত হয়ে ওঠেনি। এমনকি কতিপয় মুসলমান উহুদের যুদ্ধে বের হয়েছিল কেবল কোনো মুশরিকের সাথে তার পুরনো শত্রুতার প্রতিশোধ নিতে। ঐতিহাসিক সুহাইলি বলেন: হারিস ইবনু সুওয়াইদ ইবনুস সামিত উহুদে গিয়েছিল মাজযার ইবনু যিয়াদের সাথে তার পুরনো হিসেব চুকোতে; কারণ, মাজযার ইসলামপূর্ব আওস-খাযরাজের যুদ্ধে হারিসের বাবাকে হত্যা করেছিল। বিষয়টা কেবল আনসারদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং যুদ্ধ যখন উত্তপ্ত, সে-সময় 'রাসূল নিহত হয়ে গেছেন' মর্মে কোনো চিৎকার শুনে অনেক মুহাজির সাহাবারাও হাল ছেড়ে দিয়ে আত্মসমর্পণ করে ফেলেছিল।[১]

- ইসলাম ও মুসলিম রাজ্যের প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন হলো, এমন এক প্রচণ্ড ঝাঁকুনির—যাতে জাতির ভেতর লুকিয়ে থাকা মুখোশধারী শয়তানগুলো আলাদা হয়ে ঝরে পড়বে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের প্রজ্ঞা ও হিকমাহর দাবি ছিল, উহুদে মুসলমানদের সেই পরিশোধন হয়ে যাক। তিনি ইরশাদ করেন:

مَّا كَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ

> *'অসৎকে সৎ থেকে পৃথক করে দেয়া পর্যন্ত তোমরা যে অবস্থায় রয়েছ, আল্লাহ ঈমানদারগণকে সে অবস্থাতেই ছেড়ে দিতে পারেন না। অদৃশ্য সম্পর্কে আল্লাহ*

[১] *আর-রাওদুল উনুফ: সুহাইলি*—৩/৫২, ৪/২০৯, ৬/১৩

তোমাদেরকে অবহিত করবার নন।'[১]

উহুদ যুদ্ধের এই ঝাঁকুনি মদিনায় ঘাপটি মেরে থাকা মুনাফিকদেরকে মুমিনদের থেকে আলাদা করে দিয়েছে। এ-যুদ্ধের ঘটনার মধ্য দিয়ে আবদুল্লাহ ইবনু উবাই ইবনু সালুলের নেতাগিরির সাধ টুটে গেছে। এমনকি জুমআর নামাযের পর সে তার অনুসারীদের রাসূলের আনুগত্যের উপদেশ দিতে উদ্যত হলে মুসলমানরা তার কাপড় টেনে ধরে। বলে, 'বসে পড়, হে আল্লাহর শত্রু! তুই এমনটা উপদেশ দেবার যোগ্য কেউ না।'

উহুদ: বিজয় নাকি পরাজয়

এখানে একটি বিষয়ে আলোচনা টানা জরুরি মনে করছি। অনেক প্রাচ্যবিদ ঐতিহাসিক উহুদের যুদ্ধকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের একমাত্র পরাজয়ের ইতিহাস বলে উল্লেখ করে থাকেন। তাদের সাথে একই মত দেন কিছু মুসলিম গবেষকও। তারা মনে করেন, সাহাবিদের কিছু মানবিক ভুল এবং ঠুনকো ত্রুটির কারণে, উহুদের ময়দানে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে পরাজয়ের সম্মুখীন করেছেন। তাছাড়া সার্বিক বিবেচনায় একটি জাতিকে প্রশিক্ষিত হয়ে উঠতে হলে কেবল জয় নয়, কিছু পরাজয়েরও দরকার। এতে রণক্ষেত্রে তারা আরও সচেতন এবং দীক্ষাবান হয়ে ওঠে।

কিন্তু আহলুস সুন্নাহর উলামায়ে কেরাম কতিপয়ের এই আবেগঘন গবেষণাকে নানা কারণে গ্রহণ করতে নারাজ। এমনকি মালেকি মাযহাবের কিছু আলেম উহুদকে পরাজয় বলে অভিহিত করাকে কুফরি বলেও উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া এটাকে মুসলমানদের জন্য পরাজয় মেনে নিলে আবশ্যিকভাবে আল্লাহর রাসূলের পক্ষেও পরাজয় বলে স্বীকার করতে হয়। আর রাসূলের পরাজয় হলে পরাজয় ঘটে মহান আল্লাহ তাআলার। অথচ তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় কুরআনুল কারিমে বলেন:

كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا۠ وَرُسُلِىٓ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِىٌّ عَزِيزٌ

'আল্লাহ নিশ্চিত স্থির করে নিয়েছেন, আমি এবং আমার রাসূলগণ অবশ্যই

[১] সুরা আলে-ইমরান: আয়াত—১৭৯

বিজয়ী হব। নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিধর, পরাক্রমশালী।' [১]

এই আয়াতের দাবিমতে, উহুদে প্রিয় নবীজির উপস্থিতি সত্ত্বেও সেটাকে পরাজয় মনে করার কোন সুযোগ নেই। সেক্ষেত্রে বিষয়টা ব্যক্তির আকিদাকে আঘাত করবে এবং সেই সূত্র ধরে অনেকে, তাদের কুফরির আশংকা করেছেন। কথা হলো, তাহলে আমরা এ যুদ্ধকে কী বলব? অবস্থাদৃষ্টে তো উহুদকে সরাসরি বিজয়ও বলার সুযোগ নেই। হ্যাঁ, উহুদ একটি অমীমাংসিত যুদ্ধ ছিল। উহুদে প্রথমভাগে মুসলিম বাহিনী বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে চলে গেলেও পাল্টা আক্রমণে সেই বিজয় হতাশায় পরিণত হয়; মুসলমানদের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়, কিন্তু সেটা কখনোই পরাজয় নয়। কেন পরাজয় নয়, সে আলোচনাকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করেছি।

প্রথমে দেখব, কুরআন এই যুদ্ধকে কোন শব্দে স্মরণ করে। কুরআন কি কোথাও এটাকে বিজয় বা পরাজয় বলেছে? নাকি অন্য কোন ভাষায় উহুদকে হাজির করেছে? সুরা আলে-ইমরানের ১৬৫ নম্বর আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন:

أَوَلَمَّآ أَصَٰبَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا قُلْ هُوَ
مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

'যখন তোমাদের উপর একটি মুসিবত এসে পৌঁছল, অথচ তোমরা তার পূর্বেই দ্বিগুণ কষ্টে পৌঁছে গিয়েছ—তখন কি তোমরা বলবে, এটা কোথা থেকে এল? তাহলে বলে দাও, এ কষ্ট তোমাদের উপর পৌঁছেছে তোমারই পক্ষ থেকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ের উপর ক্ষমতাশীল।'

আল্লাহ তাআলা বলছেন, উহুদে তোমাদের উপর মুসিবত এসেছিল। তিনি সেদিনের ঘটনাকে মুসিবত বা বিপদ হিসেবে আখ্যায়িত করছেন। পাশাপাশি সেদিনের দুঃখজনক পরিস্থিতির দায় হিসেবে কতিপয় সেনাদের আনুগত্যহীনতা বা ভুল বোঝাবুঝিকে দায়ী করছেন। বলছেন, এ বিপদ তোমাদের নিজেদের কর্মের কারণেই এসেছে।

ঠিক একই সুরার ১৫৫ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা সে-সব সাহাবাদের ত্রুটি

[১] সুরা মুজাদালাহ: ২১

ক্ষমা করে দিয়ে বলছেন, আসলে তারা কোনো দোষ করেনি; শয়তান তাদের পদস্খলন ঘটিয়েছিল। তিনি ইরশাদ করছেন:

إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْاْ مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواْ وَلَقَدْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

> *'তোমাদের যে দুটি দল লড়াইয়ের দিন বিমুখ হয়েছিল, মূলত শয়তান তাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিল, তাদেরই চিন্তার দরুন। অবশ্য আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাপরায়ণ ও পরম-সহনশীল।'*

অতএব কতিপয় সাহাবার কর্ম ও শয়তানের প্রচারণাপ্রসূত বিচ্যুতির দায়ে নেমে আসা বিপর্যয়কে কোনোভাবেই আল্লাহর নবীর পরাজয় হিসেবে আখ্যা দেয়ার সুযোগ নেই। তবে যুদ্ধের ময়দানে মানবজাতির জন্য আল্লাহর কিছু সুন্নাহ বা রীতিশৃঙ্খল আছে। বাহিনীর একাংশ যখন ভুল করেছে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদেরকে শিক্ষা দেবার জন্য পরিস্থিতির মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছেন। গনিমত সংগ্রহের তাড়না বা সেনাপতির নির্দেশ অমান্য করার দুর্মূল্য খেসারত তাদেরকে দিতে হয়েছে।

এবার দেখি সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে ঐতিহাসিক বিবেচনা কী বলে। উহুদ যুদ্ধ এবং তার আগপর আরও কিছু ঘটনা বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট হয়ে যায়, এ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর না সামরিক বিপর্যয় হয়েছিল, না মানসিক পরাজয় ঘটেছিল। আমাদের এ দাবির পিছনে বেশকিছু যুক্তি রয়েছে। যেমন:

এক.

তৎকালীন যুদ্ধরীতি অনুসারে কোনো বাহিনী যুদ্ধকালে ময়দান ত্যাগ করলে বিপরীত বাহিনীকে বিজয়ী বলা যায়। তেমনি যদি কোন বাহিনী যুদ্ধ করতে করতে নিঃশেষ হয়ে যায়, তাহলেও প্রতিপক্ষের বিজয় সুনিশ্চিত হয়। কিন্তু উহুদের ঘটনায় আমরা এমন কোনো চিত্র মুসলিম বাহিনীতে দেখিনি। বরং এই দৃষ্টি থেকে কুরাইশদেরকে পরাজিত বললেও সেটা অত্যুক্তি হবে না। যুদ্ধের ধারাক্রমে আমরা দেখেছি, শেষ পর্যন্ত সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে দাঁড়িয়ে প্রতিপক্ষের সাথে মোকাবেলা করেছেন। তারা যুদ্ধ থামিয়ে পালিয়ে যাননি বা যুদ্ধের ময়দানে নিঃশেষ হয়ে যাননি। বরং একপর্যায়ে কুরাইশরাই ময়দান ছেড়ে চলে গেছে।

দুই.

উহুদের ঘটনার পরদিন (মতান্তরে তিন দিন পর) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশঙ্কা করেন, কুরাইশরা যুদ্ধে চূড়ান্ত সফলতা লাভ করতে না পারায় যে-কোনো সময় মদিনায় আক্রমণ করতে পারে। তাই তিনি তাদের পশ্চাদ্ধাবন করার সিদ্ধান্ত নেন। উহুদের যুদ্ধে অংশ নিয়েছে, শুধুমাত্র এমন ব্যক্তিদেরকেই এই অভিযানে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়। কেবল জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু, যাকে তার পিতা বোনদের দেখাশোনার দায়িত্ব প্রদান করে ইতিপূর্বে উহুদ যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি দেননি, তিনি এই অভিযানে যাওয়ার অনুমতি চাইলে রাসূল তাকে অনুমতি দেন।

মুসলিমরা অগ্রসর হয়ে মদিনা থেকে আট মাইল দূরের হামরাউল আসাদে পৌছে শিবির স্থাপন করে। এখানে কুরাইশ বাহিনী থেকে মাবাদ ইবনে আবু মাবাদ আল-খুযাআ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। কুরাইশরা যাতে মদিনা আক্রমণ করতে না পারে, সে উদ্দেশ্যে রাসূল তাকে বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে পুনরায় মক্কার বাহিনীর কাছে যেতে বলেন।

এসময় কুরাইশরা মদিনা থেকে ছত্রিশ মাইল দূরে রাওহা নামক স্থানে শিবির স্থাপন করেছিল। রাসূলের আশঙ্কানুযায়ী সত্যিই তারা মদিনায় আক্রমণ করতে চাইছিল। সংখ্যায় ভারী হওয়া সত্ত্বেও বিজয়ী না হওয়ার ফলে তারা একে আত্মসম্মানের হানি হিসেবে দেখে। এছাড়া লুটপাটের উদ্দেশ্যে যুদ্ধে আসা অন্যান্য গোত্রগুলিও যুদ্ধে সফলতা না পাওয়ায় হতাশ হয়ে গিয়েছিল। কুরাইশ নেতাদের মধ্যে শুধু সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া আক্রমণের বিরোধিতা করেছিলেন। তার মত ছিল, এখন মদিনায় গেলে উহুদে অংশ নেয়নি এমন সেনারাও আমাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমে পড়বে; এতে আমরা প্রতিকূল অবস্থায় পড়ে যেতে পারি। কিন্তু বাকিরা তার মত মেনে নেয়নি এবং মদিনার দিকে ফিরে আক্রমণের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে সে অনুযায়ী ফিকির করতে থাকে।

কুরাইশদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরই সদ্য ইসলাম গ্রহণ করা মাবাদ সেখানে উপস্থিত হন। কুরাইশরা মদিনা আক্রমণ করবে জানতে পারার পর কৌশল হিসেবে তিনি আবু সুফিয়ানকে জানান যে, মুসলিমরা এক বিরাট বাহিনী গঠন করে কুরাইশদের দিকে অগ্রসর হচ্ছে এবং তাতে মদিনার প্রত্যেক মুসলিম যোগ দিয়েছে। এই মুহূর্তে আমাদের উচিত, দ্রুত স্থান ত্যাগ করে মক্কার দিকে চলে যাওয়া। তার কথায়

সেনাপতি আবু সুফিয়ান মদিনার দিকে অগ্রসর না হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং কুরাইশদেরকে মক্কা ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেন।

এ ঘটনা স্পষ্ট প্রমাণ করে, উহুদ কোনো দিক থেকেই পরাজয়ের ইতিহাস ছিল না। বরং প্রথমত ময়দান ছেড়ে আসা এবং দ্বিতীয়ত রাওহা থেকে পুনরায় ভেগে যাওয়ার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে বলতে হয়, এ যুদ্ধে পরাজয়টা কুরাইশেরই হয়েছিল।

তিন.

উহুদ যুদ্ধের শেষ দিকে আবু সুফিয়ান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেছিল, বদরের প্রতিশোধ নিতে আমরা আগামী বছর আবারও বদলে হাজির হবো। সাহস থাকলে তোমরা আমাদের প্রতিরোধ করতে এসো। রাসূল তার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন এবং পরবর্তী বছর নির্দিষ্ট সময়ে সাহাবিদেরকে নিয়ে বদরে গিয়ে হাজির হন। কিন্তু আবু সুফিয়ান ময়দানের কাছাকাছি এসেও রাসূলের পূর্ব থেকে উপস্থিতির কথা শুনে ভড়কে যায় এবং সেখান থেকেই পালিয়ে মক্কা ফিরে যায়।

এই ঘটনাও খুব স্বাভাবিকভাবে দাবি করছে যে, উহুদের যুদ্ধ আমাদের জন্য বিজয়ের ইতিহাস ছিল। এমন আরও বহু দলিল এ-কথার পক্ষে হাজির করা সম্ভব। তবে বুঝতে চাইলে এর যে-কোনো একটি দলিলই যথেষ্ট হতে পারে। যুদ্ধে কোনো বিচ্যুতির কারণে ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ার অর্থ কখনোই পরাজিত হওয়া নয়। আল্লাহ আমাদের সুমতি দান করুন!

খন্দক যুদ্ধ
BATTLE OF THE TRENCH

তারিখ:	৫ম হিজরি / ৬২৭ খ্রি.
স্থান:	মদিনা মুনাওয়ারা
ফলাফল:	অবরোধ প্রত্যাহার এবং শত্রুপক্ষের পলায়ন

পক্ষ-বিপক্ষ:	মুসলমান	কুরাইশ (সাথে তিহামা, সালিম, গাতফান ও কিনানার কিছু মিত্রজোট; তবে মূল আহ্বায়ক বনু নাযির)
সেনাপ্রধান:	রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)	কিনানা গোত্রের নেতা, আবু সুফিয়ান ফাযারা গোত্রের, উয়াইনা ইবনুল হিসন আল-ফাযারি মুররা গোত্রের, হারিস ইবনু আওফ আল-মুররি আশজা গোত্রের, মিসআর ইবনু রাখিলা আল-আশজায়ি
সেনাসংখ্যা:	৩০০০	১০০০০
ক্ষয়ক্ষতি:	৪ জন শহিদ	২ জন নিহত

আহযাব বা খন্দকের যুদ্ধ সংঘটিত হয় ৫ম হিজরিতে, মুসলমান ও কুরাইশ এবং তাদের সহযোগী গাতফান ও কিনানা গোত্রের মাঝে। মুসলমানদের বিজয়, মদিনার অবরোধ মুক্তি এবং শত্রুপক্ষের সম্মিলিত বাহিনীর পলায়নের মধ্য দিয়ে ঐতিহাসিক এ-যুদ্ধটি সমাপ্ত হয়।

যে-সব কারণে যুদ্ধ

মদিনাবাসী ইহুদিদের শাখাগোত্র বনু নাযিরকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেশান্তর করে দিলে তারা খাইবারে গিয়ে শেকড় গাড়ে। এর কিছুদিন পর ইহুদিদের একটি প্রতিনিধিদল অনিষ্ট চিন্তার বিনিময় ঘটাতে মক্কা মুকাররমায় যায়। এ-দলে উল্লেখযোগ্য যে-সব ইহুদিরা ছিল, তারা হলো: বনু নাযির গোত্রের কিনানা ইবনুর রাবি ইবনু আবিল হুকাইক, সাল্লাম ইবনু মিশকাম, হুয়াই ইবনু আখতাব এবং বনু ওয়ায়েল গোত্রের হাওযাহ ইবনু কাইস এবং আবু আম্মার। এরাই ছিল আহযাব বা খন্দক যুদ্ধের মূল হোতা। এরা যুদ্ধের জন্য ইহুদিদের মধ্যে দল গঠন করেছে, তাদেরকে আহ্বান করেছে এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে সমবেত করেছে। এরপর বনু নাযির এবং বনু ওয়ায়িল গোত্রের লোকদের নিয়ে রওনা করেছে মক্কায়। সেখানে তারা কুরাইশদেরকে রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য উস্কে দেয় এবং তাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে যুদ্ধে অংশ নিলে নিজেদের পক্ষ থেকে সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাসও প্রদান করে। মক্কাবাসীরা তাদের এমন আহ্বানে সানন্দে সাড়া দেয়।

মক্কার দিকটা যুদ্ধের পক্ষে সম্মত রেখে ইহুদিদের এই দল গাতফান গোত্রে হাজির হয়। তাদেরকেও মক্কাবাসীর মতো একই কাজের আহ্বান জানায় এবং তারাও কুরাইশদের মতো এদের ডাকে সাড়া দেয়। এরপর চূড়ান্ত পর্যায়ে আবু সুফিয়ান

ইবনু হারবের নেতৃত্বে কুরাইশরা মদিনার দিকে যাত্রা করে। অন্যদিকে ফাযারাহ গোত্রের সর্দার উয়াইনা ইবনু হিসন ইবনু হুযাইফা ইবনু বাদর আল-ফাযারি, বনী মুররা গোত্রের প্রধান হারিস ইবনু আওফ আল-মুররি এবং আশজা গোত্রের গোত্রপতি মাসউদ ইবনু রাখিলার নেতৃত্বে বনু গাতফানও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য বের হয়ে যায়।

এভাবে আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে পঞ্চম হিজরির শাওয়াল মাসে, সাকুল্যে সেবার মদিনার বিরুদ্ধে জড়ো হয় প্রায় দশ হাজার যোদ্ধা।

পরিখা খনন

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এই সংবাদ শুনতে পান, অবিলম্বে তিনি বিচক্ষণ সাহাবা ও যুদ্ধবিষয়ে অভিজ্ঞদের সাথে পরামর্শ করেন। অনেকে অনেকধরনের কথা বললেও সাহাবি হযরত সালমান আল-ফারসি রাদিয়াল্লাহু আনহু[১] শহরের চারপাশে পরিখা খননের পরামর্শ দেন। তার এ পরামর্শ রাসূল

[১] সালমান আল-ফারসি। হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন বিখ্যাত সাহাবি। রাসূল ভালোবেসে তাকে সালমান আল-খায়র নাম প্রদান করেছিলেন। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পূর্বে তার নাম ছিল মাবিহ ইবনে বুজখশান। তিনি বর্তমান ইরানের ইস্পাহান নামক স্থানে জায়্য নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা ছিলেন একজন জরাথ্রুস্টবাদী। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে সালমান খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি ধর্মীয় বিয়য়ে গভীর পাণ্ডিত্য লাভ করেন।

হযরত সালমান সেইসব বিশিষ্ট সাহাবিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যাঁরা রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষ নৈকট্য লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। আম্মাজান হযরত আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বলেন: 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেদিন রাতে সালমানের সাথে নিভৃতে আলোচনা করতে বসতেন, আমরা তাঁর স্ত্রীরা ধারণা করতাম, সালমান হয়তো আজ আমাদের রাতের সান্নিধ্যটুকু কেড়ে নেবে।'

হযরত সালমান থেকে মোট ষাটটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্যে তিনটি মুত্তাফাক আলাইহি, একটি ইমাম মুসলিম ও তিনটি ইমাম বুখারী এককভাবে বর্ণনা করেছেন। আবু সাঈদ খুদরী, আবুত তুফাইল, ইবন আব্বাস, আউস বিন মালিক ও ইবন আজযা রাযিয়াল্লাহু আনহুম প্রমুখ বিশিষ্ট সাহাবি তার ছাত্র ছিলেন।

যুহুদ ও তাকওয়ার তিনি ছিলেন বাস্তব নমুনা। ক্ষণিকের মুসাফির হিসেবে তিনি তার ইহকাল যাপন করেছেন। জীবনে কোন বাড়ি তৈরি করেননি। কোথাও কোনো প্রাচীর বা গাছের ছায়া পেলে সেখানেই শুয়ে যেতেন। বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি তার কাছে ইজাযত চাইল তাকে একটি ঘর বানিয়ে দেওয়ার জন্যে। তিনি নিষেধ করলেন। বারবার পীড়াপীড়িতে শেষে তিনি একটু নমনীয় হয়ে জিজ্ঞেস করলেন,

ও উপস্থিত সাহাবাদের মনঃপূত হয় এবং তারা এটাকে আমলে নেয়। ওদিকে বনু কুরাইযার ইহুদিরাও পূর্বলিখিত চুক্তি মোতাবেক যোদ্ধা ও রসদ সরবরাহ করে কুরাইশদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং নেতৃপর্যায়ের সাহাবারা খননকাজের সার্বিক তদারকি করছিলেন। এ-সময় সালমান আল-ফারসি রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাজে এক প্রকাণ্ড পাথর প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। সেটা সরাতে গিয়ে তার লোহার শাবল ভেঙে যায়। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাথরটির কাছে এগিয়ে এসে 'বিসমিল্লাহ' বলে পাথরটিতে আঘাত করেন। এতে পাথরটি ফেটে চোখ-ঝলসানো এক উজ্জ্বল আলো বেরিয়ে আসে। রাসূল বলে ওঠেন: 'আল্লাহু আকবার, রোম বিজিত হয়েছে; আমি তার লাল প্রাসাদগুলো দেখতে পেয়েছি।' এই বলে তিনি দ্বিতীয়বার আঘাত করলে পাথরটির দ্বিতীয় এক-তৃতীয়াংশ ভেঙে যায়।

রাসূল পুনরায় বলে ওঠেন: 'আল্লাহু আকবার, পারস্য বিজিত হয়ে গেছে; আমি তার সাদা দালানগুলো দেখতে পেয়েছি।' এরপর তিনি তৃতীয় আঘাত হানেন, এতে

কেমন ঘর বানাবে শুনি? লোকটি বলল: এত ছোট যে, দাঁড়ালে মাথায় চাল বেঁধে যাবে এবং শুয়ে পড়লে দেয়ালে পা ঠেকে যাবে। এ কথা শুনে তিনি লোকটির প্রস্তাবে রাজি হলেন। তার জন্য একটি ঝুপড়ি ঘর তৈরি করা হলো। হযরত হাসান রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন: 'সালমান যখন পাঁচ হাজার দিরহাম ভাতা পেতেন, তিরিশ হাজার লোকের উপর যখন তার কর্তৃত্ব তৈরি হয়, তখনও তাঁর পোশাক বলতে একটি মাত্র 'আবা' ছিল। তার মধ্যে ভরে তিনি কাঠও সংগ্রহ করতেন। ঘুমানোর সময় আবাটির এক পাশ গায়ে দিতেন এবং অন্য পাশ বিছাতেন।'

হযরত সালমান রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন অন্তিম রোগ শয্যায়, হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে দেখতে যান। সালমান রাযিয়াল্লাহু আনহু কাঁদতে শুরু করলেন। সাদ বললেন: আবু আবদিল্লাহ, আপনি কাঁদছেন কেন? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো আপনার প্রতি সন্তুষ্ট অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। হাউজে কাওসারের নিকট তার সাথে আপনি মিলিত হবেন। বললেন: আমি মৃত্যুর ভয়ে কাঁদছি না। কাঁদছি, কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, আমাদের সাজ-সরঞ্জাম যেন একজন মুসাফিরের সাজ-সরঞ্জাম থেকে বেশি না হয়। অথচ আমার কাছে এই এতগুলি জিনিসপত্র জমা হয়ে গেছে। এতটুকু বলে তিনি আবারও হু হু করে কাঁদতে শুরু করলেন। হযরত সা'দ বলেন: সেই জিনিসগুলি একটি বড় পিয়ালা, তামার একটি থালা ও একটি পনির পাত্র ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

মহান এই সাহাবি ৬৫৬ খ্রিস্টাব্দে ইরাকের মাদায়েন শহরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে উত্তরাধিকার হিসেবে রেখে যান এক পুত্র এবং তিন কন্যা সন্তান। রাদিয়াল্লাহু আনহু!

পাথরটির শেষ এক-তৃতীয়াংশ ভেঙে পড়ে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: 'আল্লাহু আকবার, ইয়েমেন বিজিত হয়ে গেছে; আমি সানআ শহরের প্রধান ফটক দেখতে পেয়েছি।' আল্লাহ তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং তাঁর প্রতিশ্রুতি সত্য করেছেন। সমস্ত প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালকের তরে!

এদিকে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কাজ শেষ করলেন, ওদিকে তখন কুরাইশরা তাদের সহযোগী কিনানা ও তিহামাবাসীদের নিয়ে মোট দশ হাজার সৈন্য এগিয়ে এসে নাজদের মিত্রদের নিয়ে আসা বনু গাতফানের সাথে মিলিত হয়ে যায়। এরপর একজোট হয়ে তারা অবস্থান নেয় উহুদ পাহাড়ের পাদদেশে। তাদেরকে চোখের দূরত্বে দেখতে পেয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন হাজার সাহাবাদের নিয়ে পরিখার উপকণ্ঠে এসে দাঁড়ান। নিজেদের ও মুশরিকদের মাঝে খননকৃত পরিখা রেখে তিনি মুসলমানদের কাতারবদ্ধ করেন। এবারও তিনি নিজের অবর্তমানে মদিনায় ইবনু উম্মে মাকতুম রাদিয়াল্লাহু আনহুকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করে আসেন।

বনু কুরাইযার চুক্তি ভঙ্গ

বেশ কয়েকদিন কেটে গেল এভাবেই। মুশরিকরা শহরে প্রবেশের কোনো পথ না পেয়ে কোনো ধরনের যুদ্ধ কার্যক্রম ছাড়াই মুসলমানদের মোকাবেলায় দাঁড়িয়ে ছিল।

একপর্যায়ে আল্লাহর শত্রু হুয়াই ইবনু আখতাব কাব ইবনু আসাদ আল-কুরাজির কাছে এল। সে ছিল বনু কুরাইযার[১] গোত্রীয় চুক্তির মুখপাত্র এবং তাদের অন্যতম গোত্রপ্রধান। সে ইতিপূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু হুয়াই ইবনু আখতাব তাকে বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে, নানাভাবে উস্কে—মুসলমানদের সাথে বনু কুরাইযার কৃত চুক্তি ভঙ্গ করতে চেষ্টা করে। হুয়াই জানায়, অন্যান্য গোত্রগুলি মুসলিমরা নিশ্চিহ্ন না হওয়া পর্যন্ত ফিরে যাবে না বলে অঙ্গীকার করেছে। অতএব, মুহাম্মদের পতন আজকে নিশ্চিত। কাব ইবনে আসাদ প্রথমে তার প্রস্তাবে রাজি হননি; বরং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সততা ও বিশ্বাসের প্রশংসা করতে থাকেন। কিন্তু আক্রমণকারীদের

[১] বনু কুরাইযা ছিল খ্রিস্টান ৭ম শতাব্দীতে মদিনার একটি ইহুদি গোত্র। খন্দকের যুদ্ধের পর মুসলিমদের সাথে তাদের সংঘর্ষ সৃষ্টি হয় এবং তারা আত্মসমর্পণ করে। পরে বিচারে গোত্রের প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ সদস্যদের হত্যা এবং নারী ও শিশুদের দাস হিসেবে বন্দি করা হয়।

সংখ্যা ও শক্তির কারণে শেষপর্যন্ত বনু কুরাইযা নিজের মত বদলায় এবং জোটে যোগ দেয়। এর ফলে মুসলিমদের সাথে বনু কুরাইযার চুক্তি ভঙ্গ হয়ে যায়। নিশ্চয়তা হিসেবে হুয়াই অঙ্গীকার করে যে, কুরাইশ ও গাতাফানরা যদি মুহাম্মাদকে হত্যা না করে ফিরে যায়, তবে সে স্বয়ং কুরাইযার দুর্গে প্রবেশ করবে এবং কুরাইযার ভাগ্যে যাই ঘটুক না কেন, সে নিজেও সেই পরিণতি বরণ করে নেবে।

কাব এবং হুয়াইয়ের এই গোপন সাক্ষাতের খবর পৌঁছে যায় রাসূলের কাছে। তাদের এরূপ কর্মকাণ্ডের ফলে তিনি মুসলিম বাহিনীতে ভীতি ও বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ার ব্যাপারে শঙ্কা বোধ করেন। মদিনা সনদ[১] অনুযায়ী বনু কুরাইযার ইহুদিরা মুসলিমদের মিত্র ছিল, তাই তাদের এলাকার দিকে মুসলিমরা কোনো প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। তাছাড়া কুরাইযার অধিকারে ছিল ১৫০০ তলোয়ার, ২০০০ বর্শা, ৩০০ বর্ম ও ৫০০ ঢাল। তারা পেছন থেকে বাগড়া দিলে যুদ্ধের পরিস্থিতি বদলে যাবার সম্ভাবনা ছিল। তাই তিনি খাযরাজপ্রধান সাদ ইবনু উবাদা, আওসপ্রধান সা'দ ইবনু মুয়ায, আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা এবং খাওয়াত ইবনু জুবাইরকে পাঠান এ খবরের সত্যতা নিশ্চিত হতে। রাসূল তাদেরকে বলে দেন: 'বনু কুরাইযার কাছে যাও, আমরা যা শুনলাম, তা যদি সত্য হয়—তাহলে ইঙ্গিতে এমনভাবে আমাকে জানাবে, যাতে আমি ব্যাপারটা বুঝে নিতে পারি; জোরেশোরে জানিয়ে মুসলমানদের মধ্যে ফাটল তৈরির দরকার নেই। আর যদি সংবাদটি সত্য না হয়, তাহলে সবার সামনে সেটা ঘোষণা করে দিয়ো।'

তারা বনু কুরাইযার কাছে পৌঁছে দেখেন, তাদের ব্যাপারে অনিষ্টকর যা শুনেছিলেন এবং রাসূল যা তাদেরকে বলেছিলেন, তারা তারচেয়েও ভয়ঙ্কর দুরভিসন্ধিতে লিপ্ত। রাসূলের পাঠানো সাহাবাদের দেখে তারা বলে উঠল: 'মুহাম্মদের সাথে আমাদের কোন চুক্তি নেই।' এ-কথা শুনে সাদ ইবনু মুয়ায রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদেরকে গালমন্দ করতে লাগলেন; এতে তারাও পাল্টা গালাগালি শুরু করল। ধীরে ধীরে উভয়পক্ষ উত্তপ্ত হতে থাকলে সাদ ইবনু উবাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু সাদ ইবনু মুয়ায রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন: 'আপনি গালমন্দ বন্ধ করে দিন, তাদের সাথে আমাদের গালাগালির চেয়েও শক্ত লেনাদেনা বাকি আছে।' এরপর তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ফিরে আসেন, তাদের সাথে

[১] মদিনার সনদ হলো ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মক্কা থেকে মদিনায় গমনের (হিজরত) পর ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রণয়নকৃত একটি প্রাথমিক সংবিধান। এটি মদিনার সংবিধান নামেও পরিচিত।

আরও কিছু মুসলমান। তারা এসে বলেন: 'ইয়া রাসূলুল্লাহ, আদল আর কারা', অর্থাৎ আদল এবং কারা গোত্র 'আসহাবুর রাজি' তথা খুবাইব এবং তার সঙ্গীদের সাথে গাদ্দারি করেছে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেনাদের দিকে ফিরে বলেন: 'সুসংবাদ গ্রহণ করো, হে মুসলমান সেনাদল।' কিন্তু পরিস্থিতি ক্রমে নাজুক হতে থাকে। বাহিনীতে দ্রুত ভীতি ছড়াতে থাকে। মুসলমানরা একইসাথে বহিশত্রু এবং নিজেদের আন্তঃরাষ্ট্রীয় শত্রুদের টার্গেটে পরিণত হয়ে যায়। সেনাদলে আল্লাহর ফায়সালা নিয়ে নানারকম ধারণা প্রকাশ পেতে থাকে। মুসলমানরা তখন সর্বদিক থেকে আক্রান্ত হয়ে আছে; কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও নেতৃপ্রধান সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের রহমত থেকে একটুও নিরাশ নন; কারণ, তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, আল্লাহ তাদের রক্ষা করবেন!

মুনাফিকদের অবস্থান

এ-যুদ্ধে মুনাফিকরা তাদের বহু গোপন ভেদ প্রকাশ করে দেয়। তাদের কেউ বলে: 'আমার বাড়ি অরক্ষিত পড়ে আছে, আমার ভয় হচ্ছে, আমাকে যেতে হবে।' কেউ বলে: 'মুহাম্মদ আমাদেরকে ওয়াদা দিয়েছিল রোম-পারস্যের গুপ্তধন অর্জন করবে, আর আজকে দেখি মুসলমানদের কেউ টয়লেটে যাওয়াও নিরাপদ মনে করছে না।'

টুকরো টুকরো সংঘাত

পরিখার পাশে অনড় অবস্থানে রইলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ওপাশে মুশরিকরাও শহর ঘেরাও করে পড়ে রইল। মক্কা থেকে আগত কুরাইশ বাহিনী মদিনার নিকটে জুরফ ও জাগাবার মধ্যবর্তী মাজমাউল আসয়াল নামক স্থানে এবং নজদ থেকে আগত গাতাফান ও অন্যান্য বাহিনী উহুদ পর্বতের পূর্বে জানাবে নাকমায় শিবির স্থাপন করে পড়ে আছে।

আরবীয় যুদ্ধকৌশলে পরিখা খনন প্রচলিত ছিল না, তাই মুসলিমদের খননকৃত পরিখার কারণে জোটবাহিনী অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়ে যায়। পরিখা পার হওয়ার কোনো ব্যবস্থা তাদের কাছে হাজির নেই। তারা অশ্বারোহীদের সহায়তায় বাধা

কাটিয়ে ওঠার কয়েকটি চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। দীর্ঘ এ-সময়ে মাঝেমধ্যে দুই বাহিনী পরিখার দুই পাশে এসে সমবেত হতো এবং সামান্য কিছু তির বিনিময় করত। আক্রমণকারীরা পরিখা পার হওয়ার জন্য দুর্বল কোনো স্থানের সন্ধান করে যাচ্ছিল। দিনের পর দিন চলে যায়, তেমন কোনো জায়গা তাদের চোখে ধরা দেয় না।

এই অচলাবস্থায় কুরাইশ সেনারা ক্রমে অধৈর্য হয়ে পড়ে। বিশ দিনেরও অধিক, প্রায় এক মাস পেরিয়ে গেছে—অথচ দুপক্ষের মাঝে কিছু তির ও পাথর নিক্ষেপ ছাড়া যুদ্ধের কিছুই ঘটেনি। তবে কুরাইশদের কিছু অশ্বারোহী, যেমন: বনু আমের গোত্রের আমর ইবনু আবদে-উদ্দ আল-আমেরি, ইকরিমা ইবনু আবি জাহল, হুবাইরা ইবনু আবি ওয়াহব এবং যিরার ইবনুল খাত্তাব, যারা সকলেই কুরাইশের সাহসী অশ্বারোহী হিসেবে প্রসিদ্ধ, এদের একটি দল পরিখার কাছাকাছি এসে বলে: 'যুদ্ধের এমন কৌশল তো আরবে প্রচলিত না, এটা কোন বহিরাগত চিন্তা বলে মনে হচ্ছে।' এরপর তারা পরিখার একটি সংকীর্ণ পথ খুঁজে পেয়ে সেখানে ঘোড়া তুলে দেয়। এতে তারা পরিখা ও প্রতিপক্ষের মাঝখানে পড়ে যায়। এ দেখে আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু মুসলমানদের একটি বাহিনী নিয়ে সেই ছিদ্রপথেই তাদেরকে ধরে ফেলেন, যেখান দিয়ে তারা অতর্কিত ঢুকে পড়েছিল।

এদের মধ্যে আমর ইবনু আবদে-উদ্দ বদর যুদ্ধে মারাত্মক আঘাত পেয়ে উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেনি, তাই খন্দকের এ যুদ্ধে সে চাচ্ছিল তার অবস্থান চেনাতে। সে তার ঘোড়াসহ দাঁড়িয়ে সদম্ভে আহ্বান করল: 'কেউ কি আছো আমার মুখোমুখি হবার সাহস রাখো?' আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু তার আহ্বানে বের হয়ে বললেন: 'হে আমর, শুনেছি তুমি আল্লাহর সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছ যে, কোনো দুটি স্বভাবের দিকে আহ্বান করা হলে তুমি তার যে-কোনো একটি অবশ্যই গ্রহণ করবে?' সে বলল: 'হ্যাঁ।' আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন: 'আমি তোমাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও ইসলামের দিকে আহ্বান করছি।' আমর বলল: 'এর কোনোটাই আমার দরকার নেই।' আলি রাদিয়াল্লাহু বললেন: 'তাহলে এসো মুখোমুখি হই।' আমর বলল: 'ভাতিজা, আমি চাই না তুমি আমার হাতে নিহত হও; কারণ, তোমার বাবার সাথে আমার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল।' আলি রাদিয়াল্লাহু বললেন: 'কিন্তু আল্লাহর কসম, আমি চাই, আপনি আমার হাতে নিহত হন।'

এ-কথা শুনে আমর ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। ঘোড়া থেকে নেমে সে আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর দিকে এগিয়ে যায়। আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুও নেমে এলে দুজনের মধ্যে কিছুক্ষণ চক্রবিক্রম চলে। এরপর দুজনের মাঝখানে ধুলোর পাহাড় জমে প্রতিবন্ধক

হয়ে দাঁড়ায়। যখন সে ধুলো সরে গিয়ে অবস্থা গোচরে আসে, দেখা যায়, আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু আমরের বুকে বসে তার শির ধড় থেকে আলাদা করে ফেলছেন। এ দৃশ্য দেখে আমরের অন্য সাথিরা তাদের ঘোড়াগুলো নিয়ে পড়ি-মরি করে স্থান ত্যাগ করে পালিয়ে যায়।

রাতের বেলায়ও আক্রমণকারী সৈনিকরা পরিখা অতিক্রমের জন্য কয়েক দফা চেষ্টা চালায়। কিন্তু তাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। মুসলিমরা পরিখার অপর পাশ থেকে তির নিক্ষেপ করে পুরোটা সময় তাদেরকে বাধা প্রদান করতে থাকে। পরিখার পুরো দৈর্ঘ্য বরাবর পদাতিকদের মোতায়েন করা যদিও সম্ভব ছিল, কিন্তু সম্মুখযুদ্ধে মুসলিমদের সুবিধাজনক অবস্থানের কারণে তারা এই পদক্ষেপ নেয়নি।

পরিখা খননের সময় তোলা মাটি দিয়ে তৈরি বাধের পেছনের সুরক্ষিত অবস্থান থেকে মুসলিমরা তির ও পাথর ছুড়ে আক্রমণ করার জন্য সদাপ্রস্তুত হয়ে বসে ছিল। ফলে কোনোপ্রকার আক্রমণ হলে, কুরাইশদের ব্যাপক হতাহতের সম্ভাবনা ছিল।

আক্রমণ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে হেঁটে আসতে দেখা যায় নুআইম ইবনু মাসউদ ইবনু আমের আল-আশযায়ি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে। তিনি এসে রাসূলকে বলেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি মুসলমান হয়ে গেছি; কিন্তু আমার গোত্র সে-খবর জানে না। আপনি আদেশ দিলে আমি একটা কিছু চিন্তা করেছি, সেটা বাস্তবায়ন করতে চাই।' রাসূল বললেন: 'আপনি গাতফান গোত্রের একজন পুরুষ; আপনি বেরোলে যদি আমাদের বেরোবার প্রয়োজন না হয়, তাহলে সেটাই আপনার বসে থাকার চেয়ে উত্তম। আপনি যান, যা চান করুন—অনুমতি আছে; কারণ যুদ্ধের অপর নাম, ধোঁকা।'[১]

রাসূলের অনুমতি পেয়ে নুয়াইম এক কার্যকরী কৌশল অবলম্বন করে এগিয়ে যান। তিনি প্রথমে বনু কুরাইযা গোত্রের কাছে গিয়ে তাদেরকে অন্যান্য মিত্রদের দুরভিসন্ধির ব্যাপারে সতর্ক করেন। বলেন, যদি অবরোধ ব্যর্থ হয়, তবে বাকি মিত্ররা ইহুদিদেরকে মুহাম্মাদের হাতে তুলে দিতে পিছপা হবে না। আমার অন্তত তাই মনে হচ্ছে। তাই কুরাইযাদের উচিত, মিত্রবাহিনীর কিছু প্রতিনিধিকে সহায়তার

[১] *আদ-দুরার ফি-ইখতিসারিল মাগাযি ওয়াস-সিয়ার*: ইবনু আবদিল বার রহ.—১৮৬ পৃ.

বিনিময়স্বরূপ তাদের কাছে জামিন হিসেবে রেখে যাওয়ার দাবি করা। নুয়াইমের এই পরামর্শ কুরাইযাদের মনঃপূত হয়। তাদের বুকের ভেতরটা নড়ে ওঠে। তাহলে তো তারা বিরাট বিপদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে! নুআইমের পরামর্শমতো তবে কুরাইশদেরকে এই প্রস্তাবটা করা যায়; নতুবা কিছুতেই যে তাদের ব্যাপারে নির্ভার হওয়া যাচ্ছে না। কুরাইযাদের এ-ধারণা মিত্রবাহিনীর বিরুদ্ধে তাদের ভীতিকে আরও পাকাপোক্ত করে দিল।

এরপর নুয়াইম ইবনু মাসউদ যান মিত্রবাহিনীর নেতা আবু সুফিয়ানের কাছে। তাকে বলেন, 'আপনি কি জানেন কুরাইযাগণ মুহাম্মাদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে? তারা তো আপনাদের সাথে ধোঁকাবাজি করে মুহাম্মদের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করার পণ করেছে। আমি জানতে পেরেছি, ইহুদি গোত্রগুলো সহায়তার বিনিময়ে মিত্রবাহিনীর সদস্যদের জামিন রাখার আবেদন করবে বলে অভিসন্ধি করেছে। আমি সত্য শুনে থাকলে, তারা অচিরেই আসবে। তবে মনে রাখবেন, প্রকৃতপক্ষে তারা জামিন হিসেবে আপনাদের লোক নিয়ে, তাদেরকে মুহাম্মাদের হাতে তুলে দিতে চায়। তাই আপনাদের মিত্রবাহিনী যেন তাদেরকে একটি লোকও জামিন হিসেবে না দেয়, সে ব্যাপারে সতর্ক থাকবেন। আর যদি মুহাম্মদের সাথে তাদের চুক্তির ব্যাপারে আপনাদের খটকা থাকে, তাহলে তাদেরকে অতিসত্বর যুদ্ধের জন্য ময়দানে আসতে বলুন, তবেই সবকিছু সাফ হয়ে যাবে। শুভাকাঙ্খী হিসেবে পরামর্শ দিলাম, মানা না-মানা আপনাদের ব্যাপার।'

ফলে কুরাইশের গাতফান উপগোত্রের লোকেরা ইকরিমা ইবনে আবু জাহলসহ একটি প্রতিনিধিদলের মাধ্যমে ইহুদিদের কাছে খবর পাঠায় যে, কুরাইশদের অবস্থান তেমন ভালো মনে হচ্ছে না, ঘোড়া উট একে একে মারা যাচ্ছে। এ-কারণে তারা চাচ্ছে একযোগে মুহাম্মদের ওপর হামলা করবে। ইহুদিগণও যেন তাদের দিক থেকে হামলা করে এবং পূর্ব চুক্তিমতো কুরাইশদের সাথে মুহাম্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নেয়। ইহুদিগণ প্রত্যুত্তরে বলল, আজ শনিবার। অতীতে যারা এই দিন সম্পর্কে ধর্মীয় নির্দেশ লঙ্ঘন করেছে, তারাই ভয়ানক শাস্তি পেয়েছে। তাছাড়া কুরাইশগণ যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের কিছু লোক জামিনস্বরূপ আমাদের কাছে না দেবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করব না। দূতদল ইহুদিদের এমন জবাব শুনে এসে আবু সুফিয়ানকে জানালে কুরাইশ এবং গাতাফানের সকলে একসাথে বলে ওঠে, 'আল্লাহর শপথ, নুআইম তবে সত্য কথাই বলেছে।' এরপর তারা ইহুদিদের খবর পাঠিয়ে বলল যে, তারা জামিনস্বরূপ কোনো লোক তাদের কাছে পাঠাতে

পারবে না। একথা শুনে কুরাইযা গোত্রের লোকেরা বলল, 'তবে তো নুয়াইম সত্য কথাই বলেছে। এরা তো আমাদের সাথে নেই। ঘটনাক্রমে যদি মুহাম্মদ জিতে যায়, তাহলে আমাদের কী হবে?' এভাবে নুআইম ইবনু মাসউদের বিচক্ষণতায় উভয় দলের মধ্যে অবিশ্বাস, সকল সৈন্যদের মধ্যে হতাশা এবং জোটভুক্ত গোত্রগুলোর মধ্যে ফাটল দেখা দিল।

নুআইম ইবনু মাসউদ তাঁর চিন্তায় পুরোপুরি সফল হয়ে আসেন, অথচ তার গোত্র তার ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে কিছুই জানতে পারেনি। তিনি কুরাইশদের সম্মিলিত বাহিনী এবং বনু কুরাইযা গোত্রের মধ্যে ফাটল তৈরি করে দেন, তাদের অন্তরে পরস্পরের প্রতি সন্দেহ ও সংশয় ছড়িয়ে দেন। এরপর চূড়ান্ত বিজয়ের বার্তা দিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন রণক্ষেত্রে প্রবল বাতাস ছোটান, যা মুশরিকদের তাঁবুগুলো উড়িয়ে দেয়, তাদের খাবারের ডেগগুলো উল্টে দেয় এবং আল্লাহর অনুগ্রহে যুদ্ধের পুরো চিত্রই পাল্টে দেয়।

বিজয়ের বার্তা

এতক্ষণে সম্মিলিত বাহিনীর প্রধান সেনাপতি আবু সুফিয়ান বুঝতে পারে, এখানে এভাবে বসে থেকে আসলেই কোনো লাভ নেই। তাদের রসদ ফুরিয়ে আসছে। ক্ষুধা ও আঘাতের কারণে ঘোড়া ও উটগুলি মারা পড়ছে একে একে। শীতও খুব তীব্র আকার ধারণ করেছে। অবরোধ দিন দিন কেবলই দীর্ঘ হচ্ছে। তাছাড়া প্রচণ্ড বায়ুপ্রবাহের ফলে সেনাদের শিবির খানাখাদ্য সবকিছু তছনছ হয়ে গেছে। তাই সে বাহিনীতে মক্কা ফিরে যাবার নির্দেশ ছড়িয়ে দেয়। বলে দেয়, যে যেখান থেকে এসেছে—সে যেন সেদিকে ফিরে যায়।

রাত নেমে আসে ময়দানে। ঘন আঁধারে তলিয়ে গেছে সব। কুরাইশ বাহিনীর নড়াচড়ার আওয়াজ পেয়ে খন্দকের পাশে অতন্দ্র বসে থাকা মুসলিম সেনারা তির তাক করে। দুয়েকটা তির গিয়ে পড়ে শত্রুদের অবস্থানস্থলে। কিন্তু ততক্ষণে ময়দান খালি হয়ে গেছে। সকালে সূর্য উঠে এলে দেখা যায়, রাতে ছোড়া মুসলমানদের তিরগুলো যেখানে পড়ে আছে, সেখানে শত্রুদের কোনো আনাগোনা নেই। ময়দান ফাঁকা হয়ে গেছে। কুরাইশদের বাহিনী ময়দান ছেড়ে গেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: 'আজকের পর থেকে যুদ্ধ আমরা করবো, তারা নয়।'[১]

[১] *বুখারি:* ৩৮৮৪, *মুসনাদে আহমাদ:* ১৮৩৩৪, *আল-মুজামুল কাবির:* ইমাম তাবারানি—৬৪৯৯

অর্থাৎ, আজকের পর কুরাইশরা কখনোই মদিনায় আক্রমণ করার সাহস করবে না।

খন্দকের যুদ্ধ শেষ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহিনী নিয়ে এগিয়ে যান বনু কুরাইযার দিকে; চুক্তি ভঙ্গ করে কাফেরদের সঙ্গ দেয়ার অপরাধে সেখানে তিনি ইহুদিদের অবরোধ করে রাখেন। অবরোধের মুখে বনু কুরাইযার নেতা কাব ইবনে আসাদ অবরুদ্ধ ইহুদিরদের একত্র করে তাদের সামনে তিনটি প্রস্তাব রাখেন। এক: সকলে মিলে ইসলাম গ্রহণ, দুই: সন্তানদের হত্যা করে নিজেরা সর্বাত্মক যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া; তিন: মুসলমানরা যেহেতু নিশ্চিত জানে যে, শনিবার আক্রমণ হবে না, তাই তাদেরকে ধোঁকা দিয়ে সেদিনই আক্রমণ করা। কিন্তু ইহুদিরা কাব ইবনে আসাদের তিনটি প্রস্তাবের কোনোটিই গ্রহণ করেনি। এতে কাব প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়ে বলেন, 'আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত তোমাদের মধ্যে একটি লোকও জন্মেনি, যে সারা জীবনে একটি রাতের জন্যও স্থির ও অবিচল কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছে।'

ইহুদিদের এমন গোঁ ধরা আলস্য দেখে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া কাবের সামনে আর কোনো উপায় ছিল না। সে প্রথমে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট প্রস্তাব দেয়, যাতে তাদের মিত্র আবু লুবাবাকে পরামর্শের জন্য ভেতরে পাঠানো হয়। আবু লুবাবা সেখানে পৌঁছলে কাব জিজ্ঞেস করে, আত্মসমর্পণ করবে কি না! আবু লুবাবা হ্যাঁ-সূচক জবাব দেন। শাস্তি কী হতে পারে প্রশ্ন করলে আবু লুবাবা হাত দিয়ে কণ্ঠনালির দিকে ইঙ্গিত করে মৃত্যুদণ্ড হতে পারে বলে জানান।

২৫ দিন অবরোধের পর শেষপর্যন্ত বনু কুরাইযা আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত নিয়ে বেরিয়ে আসে। মুসলিম সেনারা তাদের দুর্গ ও সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে নেয়। সেখানে পুরুষদের সংখ্যা ছিল ৪০০ থেকে ৯০০। তাদেরকে গ্রেপ্তার করে মুহাম্মদ ইবনে মাসালামার তত্ত্বাবধানে রাখা হয়। নারী ও শিশুদেরকে রাখা হয় পৃথকভাবে।

ইসলাম গ্রহণের পূর্ব থেকে বনু আউসের সাথে বনু কুরাইযার পূর্বমিত্রতা ছিল। বনু আউসের অনুরোধে এবং বনু কুরাইযার ইচ্ছানুসারে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আউস গোত্রের সাদ ইবনে মুয়াযকে দোষীদের বিচারকার্যের জন্য নিযুক্ত করেন। খন্দকের যুদ্ধের সময় সাদ বেশ আহত হয়েছিলেন। এসময় তিরের আঘাতে তার হাতের শিরা কেটে যায়। যুদ্ধাহত অবস্থায় তাকে বিচারের জন্য রাসূলের সামনে নিয়ে আসা হয়। তিনি তাওরাতের আইন অনুযায়ী গাদ্দারি করার কারণে সমস্ত পুরুষকে হত্যা, নারী ও শিশুদেরকে দাস হিসেবে বন্দি এবং সমস্ত সম্পদ বাজেয়াপ্ত

করার মর্মে সিদ্ধান্ত দেন।

সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর ফায়সালা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে ওঠেন: 'তুমি তাদের ব্যাপারে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের বিধানমতোই ফায়সালা করেছ।'[১] এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনতিবিলম্বে সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর দেয়া সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন করেন।

বন্দিদেরকে বনু নাজ্জার গোত্রের নারী কাইস বিনতে হারিসার বাড়িতে নিয়ে রাখা হয়। এরপর সিদ্ধান্তমতে মদিনার বাজারে গর্ত খুড়ে ৬০০ থেকে ৭০০ পুরুষ বন্দির শিরশ্ছেদ করা হয়। বনু কুরাইযাকে প্ররোচনাদানকারী হুয়াই বিন আখতাবকেও এ-সময় মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। ইতিপূর্বে বনু কুরাইযাকে দেয়া তার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, বনু কুরাইযার ভাগ্য বরণের জন্য হুয়াই তাদের সাথেই অবস্থান করছিল। তার পোশাক যাতে কেউ নিতে না পারে সেজন্য তিনি তার বিভিন্ন জায়গায় ছিদ্র করে রেখেছিলেন। তাকে নিয়ে আসার পর তিনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'আপনার সাথে শত্রুতার জন্য আমি নিজেকে নিন্দা করি না। কিন্তু যে আল্লাহর সাথে যুদ্ধ করে, আসলেই সে পরাজিত হয়।' এরপর লোকেদের দিকে তাকিয়ে সে বলে, 'শোনো লোকেরা, আল্লাহর ফয়সালায় কোনো অসুবিধা নেই। এটা ভাগ্যের অনিবার্য লিখিত ব্যাপার। এটি এমন হত্যাকাণ্ড, যা বনী ইসরাইলের জন্য স্বয়ং আল্লাহ লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন।' এরপর হুয়াই গর্দান নামিয়ে বসে পড়ে ও নিমিষেই তার শিরশ্ছেদ করে দেয়া হয়।

পুরুষদের সাথে এক নারীকেও মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছিল। কারণ, অবরোধের সময় এই নারী কাল্লাদ বিন সুয়াইদের উপর যাঁতা ছুড়ে মেরে তাকে হত্যা করেছিল। অবশিষ্ট বন্দি নারী ও শিশুসহ যুদ্ধলব্ধ সব সম্পদ মুসলিমদের মধ্যে বিতরণ করে দেয়া হয়। তবে মুসলিমের অনুরোধে এ-সময় বেশ কয়েকজন ইহুদিকে ক্ষমা করা হয়। এছাড়াও বনু কুরাইযার কিছু লোক আত্মসমর্পণের পূর্বেই দুর্গ ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করছিল, তাদেরকেও ক্ষমা করা হয়।

আহযাবের এ যুদ্ধ কেবল রণক্ষেত্রের লড়াই বা ময়দানের সংঘাত ছিল না; বরং এ যুদ্ধ ছিল রগে-রেশায়, শিরা-উপশিরায়, এ যুদ্ধ ছিল চিন্তা যাচাইয়ের, চেতনা পরীক্ষার, হৃদয় ও মানসজগত যাচপরতালের—তাই তো এ যুদ্ধে মুনাফিকের দল হেরে গেছে, ব্যর্থ হয়েছে আর সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে সফল হয়ে গেছে ঈমানের

[১] *বুখারি:* ২৮৭৮, *মুসলিম:* ১৭৬৮

বাহিনী।

জোটবাহিনীর অবরোধ ব্যর্থ হওয়ার ফলে নেতা হিসেবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরবে আরও বেশি উল্লেখযোগ্য হয়ে ওঠেন। এদিকে মক্কা এ যুদ্ধে তাদের সর্বশক্তি দিয়ে মদিনা থেকে মুসলিমদেরকে উৎখাত করতে চেয়েছিল, কিন্তু পরাজিত হওয়ার ফলে তারা সিরিয়ায় তাদের বাণিজ্য হারায় এবং সমগ্র আরবে তাদের সম্মান অনেকাংশে নষ্ট হয়ে যায়। বরং হিতে বিপরীত হয়ে এ ঘটনার পর মক্কার লোকেরা ভিন্নভাবে চিন্তা করতে শুরু করে এবং ইসলাম গ্রহণকে ইতিবাচক হিসেবে বিবেচনা করতে থাকে।

হুদাইবিয়ার যুগান্তকারী সন্ধি

TREATY OF HUDAYBIYYAH

ষষ্ঠ হিজরি সাল। নানামাত্রিক বিচ্ছিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে শেষ হয়ে আসছিল বছরটি। হঠাৎ এক রাতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি সুন্দর স্বপ্ন দেখলেন। তিনি দেখলেন, মুসলমানরা মসজিদুল হারামে প্রবেশ করেছে। কাবার চাবি সংগ্রহ করে তিনি সাহাবাদের নিয়ে উমরা পালন করছেন।

ফজরের পর তিনি এ স্বপ্নের কথা তাঁর সাথিদের বললেন এবং একে একটি শুভ আলামত হিসেবে গণ্য করলেন। বললেন, 'আমার বিশ্বাস, খুব শিগগিরই মুসলমানরা তাদের মনের আশা পূরণে সক্ষম হবে।' রাসূলের মুখে এমন বিশ্বাসের কথা শুনে সাহাবাদের আনন্দ যেন ধরে না। তাদের চোখমুখ খুশিতে চিকচিক করে উঠল।

কয়েক দিনের মধ্যেই রাসূল মুসলমানদের উমরার জন্য প্রস্তুতি নেয়ার নির্দেশ দিলেন এবং মদিনার আশে-পাশের যেসব গোত্র তখনও মূর্তিপূজক ছিল, তাদেরও আহ্বান জানালেন চাইলে যেন মুসলমানদের সফরসঙ্গী হয়। মুহূর্তেই এ খবর হিজাযের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল যে, মুসলমানরা যিলকদ মাস নাগাদ উমরার উদ্দেশ্যে মক্কায় যাচ্ছে।

এই আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় সফরের আত্মিক ও নৈতিক কল্যাণের দিক ছাড়াও, সামাজিক এবং রাজনৈতিক স্বার্থের দিকও সন্নিবিষ্ট ছিল। পাশাপাশি তা সমগ্র আরবোপদ্বীপে মুসলমানদের অবস্থানকে সুদৃঢ়করণ ও হিজাযের বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে একত্ববাদী ধর্ম ইসলাম প্রচারের জন্য সহায়ক ছিল। কারণ :

প্রথমত আরবের মূর্তিপূজক গোত্রের লোকেরা ভাবত, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সকল ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানের বিরোধী। এমনকি তাদের অন্যতম প্রাচীন আচার হজ ও উমরারও তিনি বিরোধিতা করেন। এ কারণে তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর প্রচারিত ধর্মের প্রতি প্রচণ্ড

ভীত এবং সন্ত্রস্ত ছিল। এমন সময় রাসূল (সা.) ও তাঁর সঙ্গীদের উমরা পালনের ঘোষণায় তাদের এই অযাচিত ভয় দূর হয়ে গেল। মুহাম্মদ (সা.) কর্মক্ষেত্রে ব্যাবহারিকভাবে দেখিয়ে দিতে চাইলেন, তিনি আল্লাহর ঘরের যিয়ারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা ও একে কেন্দ্র করে আবর্তিত ধর্মীয় আচার ও অন্যান্য স্মৃতিচিহ্নগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের বিরোধী তো ননই, বরং এরূপ কাজকে ফরয মনে করেন এবং আরবদের আদি পিতা হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামের ন্যায় এর সংরক্ষণ ও পুনরুজ্জীবনে সর্বোচ্চ সচেষ্ট আছেন। যারা ইসলামকে তাদের ধর্মীয় ও জাতীয় আচার-অনুষ্ঠানের শতভাগ বিরোধী বলে মনে করত, মুহাম্মদ (সা.) চেয়েছিলেন ঐ সব দল ও গোষ্ঠীকে এ কাজে আকর্ষণ করতে ও তাদের মন থেকে অমূলক ভয় দূর করে দিতে।

দ্বিতীয়ত এভাবে যদি মুসলমানরা শত-সহস্র আরব মুশরিকের সামনে সফলতার সাথে স্বাধীনভাবে মসজিদুল হারামে উমরা পালনে সক্ষম হন, তাহলে তা বিস্তৃত পরিসরে ইসলাম প্রচারের এক বিরাট সুযোগ এনে দেবে। কারণ এ সময়ে আরবের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা মুশরিকরা ইসলামের খবর তাদের নিজ নিজ অঞ্চলে নিয়ে যাবে। ফলে যেসব স্থানে ইসলামের আহ্বান পৌঁছানো মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষে আপাতসম্ভবপর ছিল না, বা ততদিনেও তাঁর পক্ষে কাউকে প্রচারক হিসেবে পাঠানো সম্ভব হয়ে ওঠেনি, সেই শত ক্রোশ দূরত্বেও ইসলামের বাণী পৌঁছে যাবে। কবুল করুক আর না-করুক, অন্ততপক্ষে এর প্রভাব কার্যকর হবে।

তৃতীয়ত মুহাম্মদ (সা.) যাত্রার পূর্বে মদিনায় অবস্থানকালেই হারাম মাসগুলোর কথা স্মরণ করে বলেন : 'আমরা শুধুই আল্লাহর ঘর যিয়ারতে যাব, অন্য কিছু নয়।' তাই তিনি সাহাবিদের নির্দেশ দেন, যেন এই সফরে আরবসমাজে প্রচলিত সাধারণ একটি তরবারি ছাড়া অন্য কোনো অস্ত্র সঙ্গে না নেয়। এ নির্দেশের কথা শুনে স্থানীয় বহু মুশরিক ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়। কারণ, আরবের মুশরিকরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে অপপ্রচার চালাত যে, তিনি কোনো আরবরীতি মানেন না, তারা দেখল, রাসূলও অন্যদের মতো এ মাসগুলোতে যুদ্ধকে হারাম মনে করেন এবং এ মাসের সফরে আরবের প্রাচীন রীতিকে সমর্থন করেন।

নবীজি জানতেন, এবারের সফরে মুসলমানরা সফলতা লাভ করলে তারা বহুল প্রতীক্ষিত একটি লক্ষ্যে পৌঁছতে সক্ষম হবে। তা ছাড়া জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত এ দল বহুদিন পর আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু ও সুহৃদদের সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভের সুযোগ পাবে।

আর কুরাইশরা মক্কায় প্রবেশে মুসলমানদের বাধা দিলে সমগ্র আরবোপদ্বীপের গোত্রগুলোর কাছে অসম্মানের পাত্র হয়ে উঠবে। কারণ, আরবের অন্যান্য নিরপেক্ষ গোত্রগুলোর আগত প্রতিনিধিরা দেখবে, আল্লাহর ঘরের উদ্দেশে ফরয হজ করতে আসা একদল নিরস্ত্র হাজির সঙ্গে কুরাইশরা কীরূপ বাজে আচরণ করেছে; অথচ মসজিদুল হারামের ওপর সব আরবের অধিকার রয়েছে। কুরাইশরা কেবল তার তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব পালন করে, অন্য কিছু নয়।

এতে মুসলমানদের সত্যতার সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটবে এবং কুরাইশদের অবৈধ শক্তি প্রয়োগের বিষয়টি নিরপেক্ষ আরবরা বুঝতে পারবে। ফলে কুরাইশরা পরবর্তীতে ইসলামের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নিলে তাদেরকে সঙ্গী হিসেবে পাবে না।

মহানবী (সা.) বিষয়টির নানা দিক চিন্তা করে উমরার জন্য যাত্রার নির্দেশ দিলেন। চৌদ্দ হাজার, ষোল হাজার বা মতান্তরে আঠারো হাজার হজযাত্রী পথ চলতে চলতে 'যুল হুলাইফা' নামক স্থানে এসে ইহরাম বাঁধেন। কুরবানির জন্য তারা সত্তরটি উট সঙ্গে এনেছিলেন, এখানে সেগুলোর গলায় ঘন্টি পরিয়ে দেন। রাসূল বনু খুযাআর একজন গোয়েন্দাকে আগে আগে পাঠিয়ে দেন কুরাইশদের সংবাদ জেনে আসার জন্য।

কাফেলা উসফানের কাছাকাছি পৌঁছলে গুপ্তচর ফিরে এসে জানায়, কুরাইশরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন-সংবাদ পেয়ে বিশাল সেনাদল গঠন করেছে। কাব বিন লুওয়াই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে শক্তিশালী হুবশিদের সমবেত করেছে।[১]

এ সংবাদ শুনে রাসূল বললেন : 'কুরাইশদের জন্য আফসোস! যুদ্ধ তাদের শেষ করে দিয়েছে। হায়, যদি কুরাইশরা আরবের মূর্তিপূজক গোত্রগুলোর সঙ্গে আমাকে মুখোমুখি হওয়ার সুযোগ দিত! সেক্ষেত্রে ঐ গোত্রগুলো আমার ওপর বিজয়ী হলে তাদের লক্ষ্যে পৌঁছতো; আর আমি তাদের ওপর কর্তৃত্ব পেলে, হয় তারা ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় নিত, নতুবা তারা তাদের বিদ্যমান শক্তি নিয়ে আমার সাথে যুদ্ধ করত। আল্লাহর শপথ, একত্ববাদী এ ধর্ম প্রচারের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা আমি চালাব। হয় এতে আল্লাহ্ আমাদের বিজয়ী করবেন, নতুবা তাঁর পথে আমরা প্রাণ বিসর্জন

[১] হুবশিরা হাবশি নয়; হুবশি মক্কা থেকে ছয় মাইল দূরে মক্কার নিম্নভূমিতে অবস্থিত কয়েকটি গোত্র, যারা আল্লাহর নামে শপথ করেছে: 'যতদিন রাত অন্ধকার থাকবে, দিনে আলো থাকবে আর হুবশি পাহাড় যথাস্থানে দাঁড়িয়ে থাকবে, ততদিন দুশমনদের মোকাবেলায় তারা কুরাইশদের সাথে একই পথের পথিক হয়ে থাকবে'

দেব।'

এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবিদের সাথে পরামর্শ করতে বসেন। যুদ্ধ শুরু করা যায়, আবার এড়িয়ে যাওয়া যায়। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু পরামর্শ দিলেন যুদ্ধ এড়িয়ে যাওয়ার জন্য। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবিরা তো যুদ্ধ করতে আসেননি এবার। তারা এসেছেন উমরা করতে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তবে তোমরা সামনে চলো!' নূরের কাফেলা আবার পথ চলতে শুরু করে।

গোয়েন্দাসূত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খবর পেলেন, খালিদ বিন ওয়ালিদ দুইশো অশ্বারোহী নিয়ে কুরাউল গামিম নামক স্থানে মক্কাগামী প্রধান সড়কের উপর রণসাজে প্রস্তুত হয়ে ওঁৎ পেতে বসে আছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংঘর্ষ এড়াতে অভিজ্ঞ কাউকে বিকল্প পথে কাফেলা এগিয়ে নেয়ার নির্দেশ দেশ। আসলাম গোত্রের এক লোক সামনে এসে পরিচিত রাস্তা ছেড়ে অন্যপথ দিয়ে কাফেলাকে মক্কার নিম্নাঞ্চলে হুদায়বিয়ার উপকণ্ঠে এনে উপস্থিত করেন। এখানে পৌঁছার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বহনকারী উষ্ট্রী হঠাৎ বসে পড়ে। সাহাবিরা তাকে বলতে থাকেন, 'ওঠো, ওঠো!'; কিন্তু সে বসেই থাকে। একপর্যায়ে সাহাবিরা বলেন, 'কসওয়া মনে হয় অবাধ্য হয়ে গেছে।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'কসওয়া অবাধ্য হয়ে যায়নি, আর এটা তার অভ্যাসও নয়; বরং ওকে থামিয়ে দিয়েছেন সেই সত্তা, যিনি থামিয়ে দিয়েছিলেন হস্তিবাহিনীকে। সেই সত্তার কসম, যাঁর কুদরতি হাতে আমার প্রাণ, আল্লাহ তাআলার মাহাত্ম্য অক্ষুণ্ণ থাকে, এরূপ যে কোনো আবেদন কুরাইশরা আমার কাছে করবে, আমি তা মঞ্জুর করে নেব।' এই বলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কসওয়াকে হাঁকালে সে চলতে শুরু করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এদিক-সেদিক সামান্য পথের বাঁক নিয়ে হুদাইবিয়ার শেষ প্রান্তে একটি কূপের পাড়ে এসে অবস্থান নেন।

গ্রীষ্মের মৌসুম। প্রচণ্ড গরম পড়েছে। পিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠাগত। কূপটিতে পানি ছিল খুবই সামান্য। লোকজন অল্প অল্প করে পানি নিচ্ছিলেন, তারপরও অল্পতেই পানি ফুরিয়ে গেল। সাহাবিরা বিষয়টি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানালে তিনি তার তূণীর থেকে একটি তির বের করে কূপের ভেতর ফেলে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। নির্দেশমত তির ফেলা হলে কূপের তলদেশ থেকে উথলে বেরিয়ে আসল

উচ্ছ্বসিত স্রোতধারা।

এ দিকে সময় না গড়াতেই কুরাইশ অশ্বারোহী সেনারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নতুন গমনপথ সম্পর্কে জানতে পেরে হুদাইবিয়ার কাছাকাছি চলে আসে। মহানবী (সা.) যাত্রা স্থগিত না করে অগ্রযাত্রার সিদ্ধান্ত নিলে অবশ্যই কুরাইশ সৈন্যদের রক্ষণব্যূহ ভেদ করে যেতে হতো; সেক্ষেত্রে তাদের হত্যা করে রক্তের ওপর দিয়ে পথ অতিক্রম করা ছাড়া উপায় থাকত না; অথচ সবাই জানে, রাসূল (সা.) উমরা ও কাবাঘর যিয়ারত ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে আসেননি; তাই এমন কিছু ঘটলে মহানবীর ব্যক্তিত্ব ও শান্তিকামী চরিত্রের ভাবমর্যাদার ওপর আঘাত আসতে পারত। উপরন্তু আগত ঐ সৈন্যদের হত্যার মাধ্যমেই ঘটনার যবনিকাপাত ঘটত না। কারণ সাথে সাথেই একের পর এক নতুন সেনাবাহিনী তাঁদের প্রতিরোধের জন্য আসত এবং সংঘাত অব্যাহতভাবে চলতে থাকত। অন্যদিকে মুসলমানরা তরবারি ছাড়া অন্য কোনো অস্ত্রও সঙ্গে আনেননি। এ অবস্থায় যুদ্ধ করা কোনো দিক থেকেই কল্যাণকর হতো না। তাই আলোচনা ও সংলাপের মাধ্যমেই সমস্যার সমাধান বাঞ্ছনীয় বলে মনে করলেন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

রাসূল (সা.) সকাশে কুরাইশ প্রতিনিধিদল

কুরাইশরা কয়েক দফায় রাসূলের কাছে বিভিন্ন ব্যক্তিকে পাঠিয়ে তাঁর সফরের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে চাইল। তাদের ধারণা ছিল, রাসূলকে শান্তিপূর্ণভাবে ঢুকতে দিলে তিনি কোনো ঝামেলা করতে পারেন; তাই আগেভাগে তাঁর উদ্দেশ্য সম্পর্কে তারা জেনে নেয়ার প্রয়োজন মনে করল।

সর্বপ্রথম বুদাইল খাযায়ি নামে এক লোক তার গোত্রের কয়েকজনকে নিয়ে রাসূলের কাছে এল। মহানবী (সা.) তাদের বললেন : 'আমি যুদ্ধের জন্য আসিনি; বরং আল্লাহর ঘর যিয়ারতে এসেছি।' প্রতিনিধিদল কুরাইশ নেতাদের কাছে ফিরে গিয়ে রাসূলের প্রকৃত উদ্দেশ্য খুলে বলল। কিন্তু কুরাইশরা তাদের কথা সহজে বিশ্বাস করতে পারল না। তারা বলল : 'আল্লাহর শপথ, আমরা তাকে কোনো অবস্থাতেই মক্কায় প্রবেশ করতে দেব না, এমনকি যদি সে সত্যিই উমরা করতে আসে, তবুও।'

দ্বিতীয়বার কুরাইশদের পক্ষ থেকে 'মুকরিজ' নামের এক ব্যক্তি রাসূলের সাথে

সাক্ষাৎ করতে আসে। সেও কুরাইশদের কাছে ফিরে গিয়ে বুদাইলের অনুরূপ প্রতিবেদন জানায়। কিন্তু কুরাইশরা তাদের দুজনের কারও কথাই বিশ্বাস করল না। তৃতীয়বার আরবের তিরন্দাজ বাহিনীর নেতা হুলাইস ইবনে আলকামাকে দ্বন্দ্ব-সংশয় অবসানের লক্ষ্যে রাসূলের কাছে পাঠায় তারা। তাকে দূর থেকে দেখেই রাসূল (সা.) মন্তব্য করলেন :

'এই ব্যক্তি আল্লাহর পরিচয় লাভকারী পবিত্র এক গোত্রের মানুষ। তার সামনে কুরবানির জন্য আনা উটগুলো ছেড়ে দাও, যাতে সে বুঝতে পারে আমরা যুদ্ধ করতে আসিনি। উমরা করা ছাড়া আমাদের আর কোনো উদ্দেশ্য নেই।' এই শীর্ণ সত্তরটি উটের উপর হুলাইসের দৃষ্টি পড়লে সে দেখল, সেগুলো খাদ্যাভাবে শুকিয়ে গেছে এবং একে অপরের লোম ছিঁড়ে খাচ্ছে। সে মহানবীর সঙ্গে আর দেখা করারই প্রয়োজন মনে করল না। সেখান থেকেই যত দ্রুত সম্ভব কুরাইশদের কাছে ফিরে গিয়ে বলল : 'আমরা তোমাদের সাথে এ শর্তে কখনোই চুক্তিবদ্ধ হইনি যে, তোমরা আল্লাহর ঘরের যিয়ারতকারীদের বাধা দেবে। মুহাম্মদ যিয়ারত ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে আসেননি। যে খোদার হাতে আমার জীবন, তাঁর শপথ, যদি মুহাম্মদকে প্রবেশে বাধা দাও, তা হলে আমি আমার গোত্রের সব লোক (যাদের অধিকাংশই তিরন্দাজ) নিয়ে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করব।'

হুলাইসের কথায় কুরাইশরা ভয় পেয়ে গেল। কেউ কেউ তাকে বলল : 'শান্ত হও। আমরা এমন পথই অবলম্বন করব, যাতে তুমি সন্তুষ্ট হও।'

অবশেষে তারা চতুর্থবারের মতো বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ও তাদের প্রতি কল্যাণকামী হিসেবে পরিচিত উরওয়া ইবনে মাসউদ সাকাফিকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পাঠাল। তবে সে প্রথমে কুরাইশদের প্রতিনিধি হিসেবে যেতে রাজি হয়নি। কারণ, সে লক্ষ করেছে, পূর্ববর্তী প্রতিনিধিদের তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং তাদের কথা বিশ্বাস না করে মানহানি ঘটিয়েছে। কিন্তু কুরাইশরা তাকে আশ্বস্ত করল এই বলে যে, তাদের কাছে তার বিশেষ সম্মান রয়েছে এবং তাকে তারা কিছুতেই বিশ্বাসঘাতকতার অপবাদ দেবে না।

উরওয়া ইবনে মাসউদ রাসূলের কাছে উপস্থিত হয়ে বলল: 'বিভিন্ন দলকে নিজের চারদিকে সমবেত করেছ এ উদ্দেশ্যে যে, নিজ জন্মভূমি (মক্কা) আক্রমণ করবে? কিন্তু জেনে রাখ, কুরাইশরা তাদের সমগ্র শক্তি নিয়ে তোমার মোকাবেলা করবে এবং কোনো অবস্থায়ই তোমাকে মক্কায় প্রবেশ করতে দেবে না। কিন্তু আমি ভয়

পাচ্ছি, পরিস্থিতি খারাপ হলে তোমার চারপাশে সমবেত এরা তোমাকে একা ফেলে পালিয়ে না যায়, মুহাম্মদ!'

তার এ কথা শুনে মহানবীর পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা প্রথম খলিফা আবু বকর বললেন : 'তুমি ভুল করছ। মহানবী (সা.)-এর সঙ্গীরা কখনোই তাঁকে ছেড়ে যাবে না।'

উরওয়া মুসলমানদের মানসিক শক্তি দুর্বল করার জন্য কূটনৈতিক চাল চালছিল। সে কথা বলার সময় মহানবীকে (স) অসম্মান করার লক্ষ্যে বারবার তাঁর পবিত্র দাড়ি মুবারকে হাত দিচ্ছিল। অন্যদিকে মুগিরা ইবনে শুবা প্রতিবারই তার হাতে আঘাত করে সরিয়ে দিচ্ছিলেন ও বলছিলেন : 'সম্মান ও আদব রক্ষা করে আচরণ করো।' মহানবীর সাথে বেয়াদবি কোরো না।' উরওয়া ইবনে মাসউদ বিরক্ত হয়ে রাসূলকে প্রশ্ন করে: 'এই ব্যক্তিটি কে?' মহানবী (সা.) বললেন : 'সে তোমার ভ্রাতুষ্পুত্র শুবার পুত্র মুগিরা।' উরওয়া রাগান্বিত হয়ে মুগিরাকে বলল : 'হে চালবাজ প্রতারক, আমি গতকাল তোর সম্মান কিনেছি (রক্ষা করেছি)। তুই ইসলাম গ্রহণের পর সাকিফ গোত্রের তেরো জনকে হত্যা করেছিস। আমি সাকিফ গোত্রের সঙ্গে যুদ্ধ করা থেকে রক্ষা পেতে সবার রক্তপণ শোধ করেছি।'

মহানবী তার কথায় ছেদ টেনে তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে একই বর্ণনা দিলেন, যেমনটি পূর্ববর্তী প্রতিনিধিদের কাছে দিয়েছিলেন। এরপর উরওয়ার এতক্ষণের কথার দাঁতভাঙা জবাব দিতে চাইলেন তিনি। নামাযের সময় হয়ে যাওয়ায় তিনি উঠে উযু করতে গেলেন। উরওয়া লক্ষ করল, মহানবীর উযুর পানি মাটিতে পড়ার আগেই কাড়াকাড়ি করে মুসলমানরা তা নিয়ে নিচ্ছেন। উরওয়া সেখান থেকে উঠে কুরাইশদের সমাবেশস্থল 'যি তুয়া'র দিকে যাত্রা করল। কুরাইশদের বৈঠকে প্রবেশ করে রাসূলের আসার উদ্দেশ্য ও সাক্ষাতের বিবরণ পেশ করল। এরপর বলল : 'আমি বড় বড় রাজা-বাদশা দেখেছি। ক্ষমতাবান পারস্য সম্রাট, রোম সম্রাট এবং আবিসিনিয়ার বাদশাহ, সবাইকে দেখেছি। কিন্তু নিজ অনুসারী ও ভক্তদের মাঝে মুহাম্মদের মতো সম্মানের অধিকারী আমি ইতিপূর্বে কাউকে দেখিনি। আমি দেখেছি, তাঁর অনুসারীরা তাঁর উযুর পানি মাটিতে পড়ার আগেই বরকত লাভের উদ্দেশ্যে তা ছোঁ মেরে নিয়ে যাচ্ছে। যদি তাঁর কোনো চুল বা লোমও মাটিতে পড়ে, তারা তা তড়িৎগতিতে তুলে নিচ্ছে। তাই তাঁর এমন বিপজ্জনক মর্যাদাকর অবস্থান সম্পর্কে কুরাইশদের এখনই চিন্তা করা উচিত।'

রাসূলের প্রতিনিধি

নিজেদের আগমনের উদ্দেশ্য বোঝাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কুরাইশ প্রতিনিধিদলগুলোর বৈঠক কুরাইশের হঠকারী মনোভাবের কারণে সফলতা লাভ করেনি। স্বাভাবিকভাবে মহানবী ভাবছিলেন, কুরাইশদের প্রেরিত প্রতিনিধিরা হয়তো সঠিকভাবে তথ্য পৌঁছাতে সক্ষম হয়নি বা কেউ কেউ সঠিক তথ্য সেখানে পৌঁছাক তা চায়নি অথবা মিথ্যুক বলে অভিযুক্ত হওয়ার ভয়ে স্পষ্টভাবে নিজেদের বক্তব্য উপস্থাপন থেকে বিরত থেকেছে। এদিক চিন্তা করে মহানবী সিদ্ধান্ত নিলেন, নিজের পক্ষ থেকে একজন প্রতিনিধি পৌত্তলিক দলের নেতাদের কাছে পাঠিয়ে তাঁর উদ্দেশ্য যে উমরা করা ছাড়া অন্য কিছু নয়, তা জানিয়ে দেবেন।

তিনি প্রথমে খাযায়া গোত্রের একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে এ কাজের জন্য মনোনীত করলেন। তাঁর নাম খিরাশ ইবনে উমাইয়্যা। মহানবী (সা.) তাঁকে একটি উট নিয়ে কুরাইশদের কাছে যেতে বললেন। তিনি কুরাইশদের কাছে গিয়ে তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করলেন। কিন্তু কুরাইশরা কোনো দূতের সাথে সম্মানজনক আচরণের বিশ্বজনীন নীতি অনুসরণের বিপরীতে তাঁর উটটিকে হত্যা করে ফেলল এবং তাঁকেও হত্যা করতে উদ্যত হলো। তবে তিরন্দাজ আরবরা কুরাইশদের এমন অন্যায কাজ থেকে নিবৃত্ত করল। এ কাজের মাধ্যমে কুরাইশরা প্রমাণ করল, তারা শান্তি, সন্ধি ও সমঝোতার পথ অবলম্বন করতে রাজি নয়, বরং যুদ্ধ বাধানোর চিন্তা তাদেরকে পাগল করে দিয়েছে।

এ ঘটনার পরপরই কুরাইশদের প্রশিক্ষিত ৫০ যুবক মুসলমানদের অবস্থানের কাছাকাছি এসে সামরিক মহড়া দেয়ার দায়িত্ব পেল। সেই সাথে সুযোগ পেলে মুসলমানদের সম্পদ লুট করে তাঁদের কয়েকজনকে বন্দি করে কুরাইশদের কাছে নিয়ে যেতেও তাদেরকে বলে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তাদের এ পরিকল্পনা ব্যর্থ তো হলোই; বরং মুসলমানরা তাদের সকলকে বন্দি করে রাসূলের সামনে এনে হাজির করলেন। বন্দি হওয়ার আগে এরা মুসলমানদের তাঁবুগুলোর উদ্দেশ্যে তির ও পাথর ছোড়া সত্ত্বেও মহানবী (সা.) যুদ্ধ এড়াতে তাঁর শান্তিকামী মনোভাবের প্রমাণস্বরূপ তাদের সবাইকে মুক্ত করে দেয়ার নির্দেশ দিলেন; যাতে এবার অন্তত কুরাইশরা বুঝতে পারে, তিনি যুদ্ধের জন্য আসেননি।

মহানবী (সা.) দ্বিতীয়বারের মতো প্রতিনিধি পাঠালেন। এত কিছুর পরও, তিনি

সন্ধি ও সমঝোতার বিষয়ে নিরাশ হলেন না এবং সংলাপের মাধ্যমেই সমস্যার সমাধান করতে চাইলেন। তিনি এমন এক ব্যক্তিকে মনোনীত করার ইচ্ছে করলেন, কুরাইশদের রক্তে যার হাত রঞ্জিত হয়নি। তাই হযরত আলি, যুবাইরসহ ইসলামের যে সব মহাসৈনিক আরব ও কুরাইশদের মুখোমুখি হয়ে তাদের অনেককে হত্যা করেছেন, তাঁদেরকে মনোনীত করা সমীচীন মনে করলেন না। এজন্য তিনি সর্বপ্রথম দ্বিতীয় খলিফা উমর ইবনে খাত্তাবের কথা চিন্তা করলেন। কিন্তু উমর এ দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে অজুহাত দেখিয়ে বললেন : 'আমি আমার জীবন নিয়ে কুরাইশদের ব্যাপারে শঙ্কিত এবং মক্কায় আমার এমন কোনো নিকটাত্মীয়ও নেই, যে আমার পক্ষাবলম্বন করে আমাকে তাদের হাত থেকে বাঁচাবে। তাই আমি এমন এক ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করছি, যিনি এই দায়িত্ব পালনের সব দিক থেকে সক্ষম। তিনি হলেন, উসমান ইবনে আফ্‌ফান। যেহেতু তিনি উমাইয়্যা বংশের লোক এবং আবু সুফিয়ানের নিকটাত্মীয়, সেহেতু তিনি আপনার বাণী কুরাইশদের কাছে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে বেশি উপযুক্ত।' ফলে ভবিষ্যৎ তৃতীয় খলিফা উসমান ইবনে আফফান এ কাজের দায়িত্ব পেলেন এবং মক্কার দিকে রওনা হলেন। তিনি পথিমধ্যে আবান ইবনে সাঈদ ইবনে আসের সাক্ষাৎ পেলেন এবং তার আশ্রয়ে মক্কায় প্রবেশ করলেন। আবান প্রতিশ্রুতি দিল, কেউ তাঁর ক্ষতি করবে না এবং সে তাঁকে নিরাপদে কুরাইশদের কাছে নিয়ে যাবে, যাতে তিনি যথাযথভাবে রাসূলের বাণী পৌঁছাতে পারেন। কিন্তু কুরাইশরা তার সব কথা শুনে বলল : 'আমরা শপথ করেছি মুহাম্মদকে জোরপূর্বক মক্কায় প্রবেশ করতে দেব না। এ শপথের ফলে সংলাপের মাধ্যমেও তাকে মক্কায় প্রবেশ করতে দেয়ার পথ রুদ্ধ হয়েছে।' এরপর তারা শুধু উসমানকে কাবাঘর তাওয়াফের অনুমতি দিল। কিন্তু তিনি রাসূলের সম্মানে তা থেকে বিরত থাকলেন। তবে কুরাইশরা উসমানকে ফিরে যেতে দিল না। সম্ভবত তারা চাচ্ছিল, তাঁর যাত্রা বিলম্বিত করে সংঘাতের কোনো অজুহাত তৈরি করতে।

বাইয়াতে রিদওয়ান

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রেরিত প্রতিনিধির ফিরতে বিলম্ব হয়ে যাচ্ছে। মুসলমানদের মধ্যে চরম উত্তেজনা সৃষ্টি হলো এবং তাঁরা খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। হঠাৎ 'উসমান নিহত হয়েছে' এমন একটি গুজব মুসলমানদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল এবং তাঁরা প্রতিশোধের জন্য গর্জে উঠলেন। মহানবী (সা.) সাহাবাদের এই পবিত্র ও উজ্জীবিত চেতনাকে দৃঢ় করার জন্য তাঁদের উদ্দেশে

বললেন: 'কুরাইশদের সাথে চূড়ান্ত কিছু না করা পর্যন্ত আমি এখান থেকে যাব না।' যেহেতু সে মুহূর্তে মুসলমানরা সমূহ বিপদের আশংকা করছিলেন এবং এজন্য তাঁরা যুদ্ধের মনোভাব নিয়ে সমবেত হয়েছিলেন, সেহেতু মহানবী (সা.) সিদ্ধান্ত নিলেন মুসলমানদের সাথে তাঁর প্রতিশ্রুত শপথ নবায়ন করবেন। তিনি নতুনভাবে তাঁদেরকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করার লক্ষ্যে একটি গাছের নিচে বসলেন এবং সকল সঙ্গীকে বাইয়াত (প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়ার জন্য শপথ) নেয়ার জন্য তাঁর হাতে হাত রাখার আহ্বান জানালেন। তাঁরা রাসূলের হাতে হাত রেখে শপথ করলেন যে, শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত ইসলামের প্রতিরক্ষায় নিবেদিত থাকবেন। এটিই সেই ঐতিহাসিক 'বাইয়াতে রিদওয়ান', যা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে:

لَّقَدْ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَٰبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا

> *'আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন, যখন তারা গাছের নিচে আপনার কাছে শপথ করেছে। আল্লাহ্ অবগত ছিলেন, যা তাদের অন্তরে ছিল। অতঃপর তিনি তাদের ওপর প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদেরকে পুরস্কার দিলেন অত্যাসন্ন (মহান) বিজয়।' (সূরা ফাতহ : ১৮)*

বাইয়াত সম্পন্ন হওয়ার পর মুসলমানরা তাঁদের করণীয় সম্পর্কে নিশ্চিত হলেন। হয় কুরাইশরা তাঁদেরকে আল্লাহর ঘরে যাওয়ার পথ খুলে দেবে, নতুবা তাঁরা মুশরিকদের সাথে চূড়ান্ত যুদ্ধ করবেন। তবে মহানবী (সা.) উসমানের আগমনের প্রতীক্ষায় ছিলেন। হঠাৎ তিনি ফিরে এলেন। তাকে দেখতে পেয়ে রাসূলের মনে সন্ধির সবুজ সংকেত উদিত হলো। তিনি কুরাইশদের অবস্থান সম্পর্কে রাসূল (সা.)-কে বললেন : 'কুরাইশদের সমস্যা হলো, তারা আপনাকে মক্কায় ঢুকতে দেবে না বলে আল্লাহর নামে শপথ করেছে। এ সমস্যার সমাধানের জন্য অচিরেই তাদের প্রতিনিধি আপনার নিকট আসবে।'

সে-মতে কুরাইশদের পঞ্চম প্রতিনিধি হিসেবে সুহাইল ইবনে আমর রাসূলের কাছে আসে, যাতে বিশেষ এক চুক্তির মাধ্যমে উভয়পক্ষের এ অচলাবস্থার অবসান হয়। সুহাইলকে দেখামাত্রই রাসূল (সা.) বললেন : 'সুহাইল কুরাইশদের পক্ষ থেকে আমাদের সাথে সন্ধিচুক্তি করতে এসেছে।' সুহাইল এসে মহানবীর সামনে বসল। একজন ঝানু কূটনীতিকের মতো সে নানা কথা বলে মহানবীর ভাবাবেগকে

উদ্বেলিত করার চেষ্টা করছিল। সে বলল : 'হে আবুল কাসেম, মক্কা আমাদের পবিত্র স্থান এবং আমাদের জন্য সম্মানের বস্তু। আরবের সব গোত্র জানে, তুমি আমাদের সাথে যুদ্ধ করেছ। তুমি যদি এ অবস্থায় জোরপূর্বক মক্কায় প্রবেশ কর, তবে সব আরব গোত্রই জানবে, আমরা দুর্বল ও অসহায় হয়ে পড়েছি। এতে আমাদের বিরোধীরা আমাদের এ ভূমি দখল করার জন্য প্ররোচিত হবে। তোমার সঙ্গে আমাদের যে আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে, তার কসম দিয়ে বলছি, তোমার এ জন্মভূমি মক্কার যে মর্যাদা ও সম্মান রয়েছে...'

সুহাইল এটুকু বলতেই মহানবী (সা.) তার কথায় ছেদ ঘটিয়ে বললেন : 'তুমি আসলে কী বলতে চাও?' সে বলল : 'কুরাইশ নেতাদের প্রস্তাব হলো : তুমি এ বছর মক্কায় প্রবেশ না করে এখান থেকেই মদিনায় ফিরে যাবে এবং উমরা করার জন্য পরের বছর আবার আসবে। তোমার সাথের মুসলমানরাও আগামী বছর আরবের অন্যান্য গোত্রের মতোই হজ করার জন্য কাবাঘরে আসতে পারবে। তবে শর্ত হলো, তারা তিন দিনের বেশি মক্কায় অবস্থান করতে পারবে না এবং সঙ্গে একটি তরবারি ছাড়া অন্য কোনো অস্ত্র আনতে পারবে না।'

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সুহাইলের আলোচনার ফলে মুসলমান ও কুরাইশদের মধ্যে একটি ব্যাপক ও সার্বিক চুক্তি সম্পাদনের সুযোগ সৃষ্টি হলো। কিন্তু চুক্তির শর্ত নির্ধারণ ও ধারা প্রণয়নের ক্ষেত্রে সে বেশ কঠোরতা অবলম্বন করছিল। কখনো কখনো তার প্রস্তাব এতটাই অগ্রহণীয় হয়ে উঠছিল যে, তা সন্ধির সম্ভাবনাই নাকচ করে দিচ্ছিল। কিন্তু উভয় পক্ষই সন্ধির পক্ষপাতী হওয়ায় তা যাতে ঠুনকো কারণে ছিন্ন না হয়, সে চেষ্টাও অব্যাহত ছিল।

অধিকাংশ ঐতিহাসিকদের বর্ণনামতে রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত আলিকে চুক্তিপত্র লেখার নির্দেশ দেন। প্রথমে তিনি তাকে বলেন : 'লেখো—'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।' আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু তা লিখে নিলেন। কিন্তু সুহাইল বলল : 'আমি এ বাক্যের সাথে পরিচিত নই। 'রাহমান' ও 'রাহীম'-কে আমি চিনি না; লেখো— 'বিসমিকা আল্লাহুম্মা'; অর্থাৎ 'হে আল্লাহ, তোমার নামে'।

মহানবী (সা.) সুহাইলের কথা মেনে নিয়ে অনুরূপ লিখতে বললেন। তিনি আবার বললেন : 'লেখো—'এ সন্ধিচুক্তি আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ এবং কুরাইশ প্রতিনিধি সুহাইলের মধ্যে সম্পাদিত হচ্ছে।' সুহাইল বলল : 'আমরা তোমার রাসূল ও নবী হওয়ার বিষয়টি স্বীকার করি না। যদি তা স্বীকারই করতাম, তবে তোমার সাথে

যুদ্ধ করতাম না। অবশ্যই এ বিশেষণ চুক্তিপত্র থেকে মুছে দিয়ে তোমার নিজের নাম ও পিতার নাম লিখতে হবে।' রাসূল এ বিষয়টিও মেনে নিয়ে তাকে ছাড় দেন, কোনো মুসলমানই তা চাননি। কিন্তু মহানবী একটি উচ্চতর লক্ষ্যকে সামনে রেখে সুহাইলের দাবি মেনে নিয়ে হযরত আলিকে 'আল্লাহর রাসূল' শব্দটি মুছে ফেলতে নির্দেশ দিলেন। হযরত আলি অত্যন্ত সম্মান ও বিনয়ের সাথে বললেন : 'হে আল্লাহর নবী, আপনার পবিত্র নামের পাশে নবুওয়াতের স্বীকৃতিকে মুছে ফেলার মতো অসম্মানের কাজ করা থেকে আমাকে ক্ষমা করুন।' মহানবী হযরত আলিকে বললেন : 'ঐ শব্দের ওপর আমার আঙ্গুল রাখো। আমি নিজেই তা মুছে দিই।' আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু তা-ই করলেন এবং রাসূল স্বহস্তে তা মুছে দিলেন।

মহানবী (সা.) এ সন্ধিচুক্তি লিখতে নিজের দিক থেকে যে পরিমাণ ছাড় দিয়েছেন, বিশ্বের ইতিহাসে তা একেবারেই বিরল। তিনি এটা করেছেন, কারণ তিনি প্রবৃত্তির তাড়না ও বৈষয়িক চিন্তার অনুবর্তী ছিলেন না এবং তিনি জানতেন, মহাসত্য কখনো লেখা বা মোছার মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়ে যায় না। তাই সন্ধির ভিত্তি অটল রাখতে সুহাইলের সকল কঠোর শর্তে সমঝোতামূলক মনোভাবের পরিচয় দিয়ে মেনে নিয়েছেন।

হুদায়বিয়ার সন্ধি-শর্ত

সুহাইলের সাথে দীর্ঘক্ষণ আলোচনার পর দ্বিপাক্ষিক যে শর্তগুলোর ভিত্তিতে হুদাইবিয়ার ঐতিহাসিক সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হয়, তা নিম্নরূপ:

- কুরাইশ ও মুসলমানরা সমগ্র আরব ভূ-খণ্ডে সামাজিক নিরাপত্তা ও শান্তি স্থাপনের লক্ষ্যে এ মর্মে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হচ্ছে যে, দশ বছর একে অপরের সাথে যুদ্ধ করবে না ও পরস্পরের অধিকারের ওপর সবরকম হস্তক্ষেপ হতে বিরত থাকবে।

- যদি কুরাইশদের কোনো পুরুষ তাদের অভিভাবকদের অনুমতি ছাড়া মক্কা থেকে পালিয়ে যায় ও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত হয়, মুহাম্মদ অবশ্যই তাকে কুরাইশদের কাছে ফিরিয়ে দেবেন। কিন্তু যদি কোনো মুসলমান মদিনা থেকে মক্কায় পালিয়ে আসে, কুরাইশরা তাকে মুসলমানদের কাছে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য নয়।

- মুসলমান ও কুরাইশরা স্বাধীনভাবে যে কোনো গোত্রের সাথে চুক্তিবদ্ধ হতে পারবেন।
- মুহাম্মদ ও তাঁর সঙ্গীগণ এ বছর এখান থেকেই মদিনায় ফিরে যাবেন। কিন্তু পরবর্তী বছরগুলোয় স্বাধীনভাবে মক্কায় গিয়ে হজ বা উমরা পালন করতে পারবেন। তবে শর্ত হলো, তিন দিনের বেশি মক্কায় অবস্থান করতে পারবেন না এবং সঙ্গে সাধারণত একজন মুসাফির যাত্রী যে ধরনের তরবারি বহন করে, তা ছাড়া অন্য কোনো অস্ত্র বহন করতে পারবেন না।
- মক্কার মুসলমানরা এ চুক্তির অধীনে মক্কায় স্বাধীনভাবে ইসলামী বিধান পালন করতে পারবেন এবং এক্ষেত্রে কুরাইশরা তাদের বাধা দিতে পারবে না। তাঁদের ধর্মান্তরিত করা ও মুসলমান হওয়ার কারণে তিরস্কার করতে পারবে না।
- চুক্তি স্বাক্ষরকারী পক্ষদ্বয় একে অপরের ধন-সম্পদ সম্মানিত মনে করবেন এবং বিদ্বেষমূলক দৃষ্টিতে পরস্পরকে দেখতে বা কোনোরূপ প্রতারণা করতে পারবেন না।
- যেসব মুসলমান মদিনা থেকে মক্কায় আসবেন, তাঁদের জীবন ও ধন-সম্পদের প্রতি সম্মান ও নিরাপত্তা দেয়া হবে।

চুক্তিপত্র দুটি ভিন্ন পত্রে লিখিত হয়। এরপর কয়েকজন কুরাইশ ও মুসলিম প্রতিনিধি সাক্ষী হিসেবে তাতে স্বাক্ষর করেন। পরে তার একটি অনুলিপি মহানবী (সা.)-কে এবং অন্যটি সুহাইলকে দেয়া হয়।

স্বাধীনতার বাণী

এ চুক্তিপত্রের পর্বে পর্বে স্বাধীনতা ও মুক্তির বাণী প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, যার অনুরণন প্রতিটি নিরপেক্ষ বিবেকবান ব্যক্তির কানেই পশবে। কিন্তু সবচেয়ে স্পর্শকাতর ছিল দ্বিতীয় শর্তটি, যা অনেকের ভেতরই অসন্তোষ তৈরি করেছিল। রাসূল (সা.)-এর কোনো কোনো সঙ্গী এ বৈষম্যমূলক শর্তে কষ্ট পেয়েছিলেন এবং এটাকে নিজেদের জন্য সম্মানহানিকর বলে ভেবেছিলেন। অথচ চুক্তিপত্রের এ ধারাটি উজ্জ্বল এক শিখার ন্যায় আজও সমানভাবে প্রজ্বলিত রয়েছে। এই চুক্তিতে ইসলামের প্রসার

ও বিস্তারের ক্ষেত্রে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উন্নত চিন্তাধারার প্রতিফলন ঘটেছে এবং স্বাধীনতা ও মুক্তির মৌলনীতির প্রতি তাঁর অনির্বচনীয় সম্মানের প্রকাশ পেয়েছে।

কোনো কোনো সাহাবির এ আপত্তির ('কেন আমরা মুসলমানদের ফিরিয়ে দেব, অথচ তারা আমাদের থেকে পালিয়ে যাওয়া ব্যক্তিকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য নয়') জবাবে রাসূল বলেন : 'যে মুসলমান ইসলামের পতাকার নিচ থেকে শিরকের দিকে পালিয়ে যায় এবং তাওহিদবাদী ইসলামের পবিত্র পরিবেশের ওপর মানবতার পরিপন্থী শিরকমিশ্রিত পরিবেশকে অগ্রাধিকার দেয়, সুস্পষ্ট যে, তার ঈমান সঠিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়নি এবং সে মন থেকে ইসলামকে গ্রহণ করতে পারেনি। এরূপ কোনো মুসলমান আমাদের কল্যাণে আসবে না। অন্যদিকে আমরা যদি আমাদের কাছে আশ্রয়প্রার্থী ব্যক্তিকে কাফেরদের কাছে ফিরিয়ে দিই, তা হলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আল্লাহ তার মুক্তির পথ তৈরি করে দেবেন।'

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৃষ্টিভঙ্গি বুদ্ধিবৃত্তিক এবং যুক্তিসম্মত ছিল। সময়ের পরিক্রমায় তাঁর গৃহীত ভূমিকার যথার্থতা দারুণভাবে প্রমাণিত এবং প্রতিফলিত হয়। হুদায়বিয়ার ঘটনার অল্পদিন পরেই, কিছু ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এ ধারাটির মন্দ প্রভাব কুরাইশদের উপর গিয়ে পতিত হয়। ফলে তারা নিজেরাই এ ধারা বাতিল করতে বারংবার রাসূলের প্রতি আবদার জানাতে থাকে।

সন্ধির শর্তাবলি তখনও লিখে শেষ করা যায় নি, এমন সময় শেকলপরিহিত অবস্থায় সেখানে হাজির হতে দেখা যায় সদ্য ইসলাম গ্রহণ করা সুহাইলের পুত্র আবু জান্দালকে। মক্কা থেকে পালিয়ে এসেছেন তিনি। ইসলাম গ্রহণের কারণে তার প্রতি অমানুষিক নির্যাতন চালানো হয়েছে। পুত্রকে দেখেই সুহাইল বলল: 'চুক্তি অনুসারে আপনি তাকে আমাদের কাছে রেখে যেতে বাধ্য।' কিন্তু রাসূল বললেন, 'সন্ধির কাজ তো এখনো চলমান; তাহলে এখন এ ধারা প্রয়োগ করতে পারেন না আপনি।' তবে সুহাইল জেদ করল। বলল, 'আবু জান্দালকে সঙ্গে নিলে আমি আপনার সাথে সন্ধিই করব না।' রাসূল খানিকটা নমনীয় হয়ে বললেন, 'আমার খাতিরে তাকে ছেড়ে দাও তুমি।' কিন্তু সুহাইল রাজি হলো না। কোনোভাবেই সে আবু জান্দালকে মুসলমানদের সাথে যেতে দিতে সম্মত না।

সুহাইল উঠে গিয়ে আবু জান্দালের মুখে কষে চড় বসাল। জামার কলার ধরে টেনে তাকে মক্কার দিকে নিয়ে যেতে লাগল। অসহায় হয়ে আবু জান্দাল মুসলমানদের

লক্ষ করে বলল: 'হে মুসলিম সম্প্রদায়, আফসোস, আপনারা আমাকে কাফিরদের হাতে ছেড়ে যাচ্ছেন।' তাঁর কথা শুনে রাসূলের কণ্ঠ ধরে এলো। তিনি কাঁপাকাঁপা গলায় বললেন, 'আবু জান্দাল, ধৈর্য ধরো তুমি। ধৈর্যকেই নিজের সওয়াবের কারণ মনে করো! আল্লাহ তোমার ও তোমার মতো দুর্বল মুসলমানদের জন্য প্রশস্ততা এবং আশ্রয়ের জায়গা করে দেবেন। আমরা কুরাইশদের সন্ধি করেছি। পরস্পর আমরা আল্লাহর নামে কসম করেছি। আমরা এখন এই চুক্তি ভঙ্গ করতে পারি না।'

হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সহ্য করতে পারলেন না। তিনি দ্রুত হেঁটে আবু জান্দালের কাছে গেলেন। তার পাশে চলতে চলতে বললেন, 'ধৈর্য ধরো ভাই আবু জান্দাল। ওরা মুশরিক, ওরা পৌত্তলিক, ওদের রক্ত কুকুরের রক্ত।' এ-কথা বলতে বলতে উমর তার তরবারি আবু জান্দালের কাছে নিয়ে গেলেন। তার আশা ছিল, আবু জান্দাল তরবারি তুলে নিয়ে তার শয়তান বাবাকে শেষ করে দিবেন। কিন্তু আবু জান্দাল তেমন কিছু করলেন না।

আবু জান্দালকে এভাবে ফিরিয়ে দিয়ে সাহাবারা সকলে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েন। হযরত উমর কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারছিলেন না। তিনি রাসূলের কাছে এসে বললেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমরা সত্যের উপর আছি, আর ওরা ভ্রষ্টতার উপর আছে—এ-কথা কি সত্য নয়?' রাসূল বললেন, 'নিশ্চয়ই উমর! এটা সত্য।'

'তাহলে কেন এই অপমান আমরা সহ্য করব?'

'আমি আল্লাহর রাসূল এবং সত্য নবী; আমি তাঁর হুকুমের অন্যথা করতে পারি না। তিনিই আমার সহায়ক এবং সাহায্যকারী।'

'ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি কি বলেন নি যে, আমরা বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করব?'

হযরত উমর কঠিন প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন।

'এটা তো বলি নি যে, এ বছরই তাওয়াফ করব', সহজ কথায় রাসূল তাকে নিরুত্তর করে দিলেন।

কিন্তু উমর প্রশান্ত হতে পারলেন না। তিনি ছুটে গেলেন আবু বকরের কাছে। তাকেও একইরকম প্রশ্ন করলেন। কিন্তু আবু বকর সারাজীবন রাসূলের সবকথা বিনা বাক্যে গ্রহণ করা লোক। রাসূলের মতো একই উত্তর দিয়ে তিনি উমরকে বললেন, আমৃত্যু রাসূলের আনুগত্যে থাকো, উমর!

রাসূল পেছনে তাকালেন। সাহাবাদের সকলের চোখে কৌতূহল। রাসূল তাদেরকে অন্য কাজে ব্যস্ত করতে চাইলেন। বললেন, 'তোমরা তোমাদের পশুগুলো নিয়ে এসো। কুরবানি করতে হবে।' কিন্তু সন্ধির এমন শর্তাবলির কারণে তারা এতটাই বিষণ্ণ ছিলেন যে, তিনবার রাসূল এই কথাটি বলার পরও, তারা উঠলেন না।

সত্যি রাসূল ছিলেন একটি আলো দানকারী প্রদীপ। কিন্তু সাহাবাদের অভিমানের মেঘে আজ সে আলো খানিক আড়াল হয়ে গেল। উমরা করতে না পেরে কারুরই মন ভালো নেই। বিষণ্ণ মনে তারা উদাস ভঙ্গিতে বসে রইলেন। রাসূল কোনো কথা না বলে নিজের তাঁবুর দিকে এগিয়ে গেলেন। সেখানে রাসূলের বুদ্ধিমতী এবং শান্ত স্বভাবের স্ত্রী উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন। তিনি রাসূলকে একটি বুদ্ধি শেখালেন। বললেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি যদি হাদির পশু জবাইয়ের দরকার মনে করেন, তাহলে কাউকে কিছু না বলে নিজের পশু নিজে কুরবানি করে ফেলুন। এরপর বলুন, কেউ যেন আপনার মাথা মুণ্ডন করে দেয়।'

স্ত্রীর বুদ্ধি রাসূলের পছন্দ হলো। তিনি বের হয়ে নিজের হাদির পশু নিজে কুরবানি করে ফেললেন। এরপর মাথা মুণ্ডানোর তোড়জোড় করতে শুরু করলেন। সাহাবারা রাসূলের কোনো কাজ দেখলে তাঁর অনুসরণ না করে থাকতে পারতেন না। এবারও পারলেন না। অভিমানের কালো মেঘ সরিয়ে সকলে উঠে এলেন। যার যার পশু জবাই করলেন এবং মাথা মুণ্ডিয়ে ফেললেন। রাসূল তাদের সকলের জন্য আল্লাহর কাছে মাগফিরাতের দুআ করলেন।

প্রায় দুই সপ্তাহ অবস্থানের পর আল্লাহর ঘরের কাছে এসেও যিয়ারত করতে না পারার বেদনা নিয়ে সাহাবারা মদিনার পথ ধরেন। তাদের মুখগুলো শুকনো, মন ক্ষতবিক্ষত আর চোখজুড়ে অমানিশা। আসার সময় তাদের দেহপল্লবে যে আলোড়ন ও উদ্দীপনা ছিল, ফেরার সময় তা যেন একেবারে মিইয়ে গেল। কাফেলায় যেন প্রাণ নেই, নেই চোখ-জ্বলজ্বলে আলো বা স্বপ্নপূরণের ঝলকানি। তাদের সকলের মন পড়েছিল সন্ধির শক্তিগুলোর মাঝে। তাদের মনে হচ্ছিল, এই চুক্তি তাদের জন্য লজ্জাজনক এবং অপমানকর।

উপরে দয়াময় প্রভু আল্লাহ তায়ালা সব দেখছিলেন। বিশ্বাসীদের হৃদয়ের ক্ষত তিনি সহ্য করতে পারলেন না। এতগুলো আলোকজ্জ্বল চেহারা দ্যুতিহীন হয়ে গেলে একজন মহামহিম কী করে শান্ত থাকেন? তিনি রাসূলের উপর প্রকাশ্য বিজয়ের ঘোষণা দিয়ে জমিন আলোকিত করে সুরা ফাতহ অবতীর্ণ করলেন। আল্লাহর

রাসূল সাহাবাদের মনের দুঃখ দূর করতে প্রফুল্লতার সাথে জানালেন, আল্লাহ কী বলেছেন।

বিজয়ের কথা শুনে সাহাবাদের চোখে আলো ফিরে এলো। তাদের ঠোঁটে হাসি উঠে এলো আর কপালে কুঁচকে এলো কৌতূহল—'ইয়া রাসূলুল্লাহ, এটা কেমন বিজয়?' রাসূল বললেন: 'শপথ সেই সত্তার, যার হাতে আমার প্রাণ, নিশ্চয়ই এটা এক মহান বিজয়।'

সন্ধিচুক্তির তাৎপর্য ও প্রভাব

হুদাইবিয়ার এ সন্ধি মুসলমানদের ভবিষ্যৎ আশ্চর্যভাবে বদলে দেয়। তাদের সামনে খুলে দেয় আলোর দুয়ার। এ সন্ধি পুরো আরবে ছড়িয়ে পড়লে সকলে বুঝে নেয়, মুহাম্মদ এখন আর ছোটখাটো কেউ নেই। সে কুরাইশদের মোকাবেলা করে আজকে তাদেরকে সন্ধি করতে বাধ্য করে ফেলেছে। সন্ধির কারণে বন্ধ হয়ে গেল যুদ্ধবিগ্রহ এবং রক্তপাত। মুসলমানরা সানন্দে নিজেদের কাজ করে যাবার সুযোগ পেয়ে গেলেন। শান্তিপূর্ণভাবে তারা যাকে ইচ্ছে দ্বীনের দাওয়াত দিতে থাকলেন, সন্ধির কারণে তাদেরকে সামান্য বাধা দেবার অধিকার থাকল না কারও।

সাহাবিরা শুরু থেকেই শান্তিপূর্ণ ছিলেন। মক্কায় তারা নিজেদের মতো ধর্ম পালন এবং অন্যদের দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু কুরাইশরা কখনোই সেটা সহ্য করেনি। বরং তাদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালিয়ে তাদেরকে স্বদেশছাড়া করেছে তারা। কিন্তু হুদাইবিয়ার সন্ধির ফলে সেই রাস্তাও আগামী দশ বছরের জন্য বন্ধ হয়ে যায়; যদিও ইতিমধ্যে আল্লাহর কালিমার সামনে বদরে, উহুদে কুরাইশ কাফেররা ব্যর্থ প্রমাণিত হয়ে গেছে।

বস্তুত হুদাইবিয়ার সন্ধির মাধ্যমে কুরাইশরা একটি সুবিধা নিয়ে মুসলমানদের তিন তিনটি সুবিধা দিয়েছে। মক্কায় কোনো মুসলমান চলে আসলে তাকে ফেরত দেয়া হবে না মর্মের যে উদ্ধত শর্ত ছিল, সেটাকে আপাতভাবে তাদের পক্ষের পয়েন্ট ভাবলেও বাস্তবেও এতে মুসলমানদের তেমন কোনো ক্ষতি ছিল না। কারণ, মুসলমান যারা মদিনায় আছেন, স্বাভাবিকতই তাদের মক্কায় যাবার কোনো প্রয়োজন পড়বে না। একমাত্র যদি কেউ ধর্ম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যায়, তাহলে সে পালিয়ে মক্কায় চলে যেতে পারে। আর সত্যিই কেউ এমনটা করলে তার আসলেই মুসলিম সমাজে

থাকার কোনো অধিকার অবশিষ্ট থাকে না।

তেমনি মক্কার যেসব মহিলা মুসলিম হয়েছিলেন, তাদের ক্ষেত্রেও এই শর্ত কোনো ঝামেলা তৈরি করেনি। কারণ, হুদাইবিয়ার পর কিছু মুমিনা নারী রাসূলের কাছে এলে তিনি তাদের গ্রহণ করে নেন। কুরাইশরা আপত্তি জানালে তিনি বলেন, তোমাদের সাথে কৃত চুক্তির এই শর্তে 'পুরুষ' শব্দের উল্লেখ ছিল, অতএব মহিলারা মদিনায় আসলে আমি তাদের ফেরত দিতে বাধ্য নই। এ ব্যাপারে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কুরআনের সুরা মুমতাহিনার ১২ নম্বর আয়াত নাযিল করেন। তিনি বলেন:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰٓ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِٱللَّهِ شَيْـًٔا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَٰنٍ يَفْتَرِينَهُۥ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِى مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُنَّ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

> *'হে নবী, ঈমানদার নারীরা যখন আপনার কাছে এসে (এ মর্মে) আনুগত্যের শপথ করে যে, তারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, তাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, জারজ সন্তানকে স্বামীর ঔরস থেকে আপন গর্ভজাত সন্তান বলে মিথ্যা দাবি করবে না এবং ভাল কাজে আপনার অবাধ্যতা করবে না, তখন আপনি তাদের আনুগত্য গ্রহণ করুন এবং তাদের জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল অত্যন্ত দয়ালু।'*

এ আয়াত নাযিলের পর মহিলারা সকলে মদিনায় থেকে যান। সাহাবারা তাদের অমুসলিম স্ত্রীদের তালাক দিয়ে দেন। কিন্তু তখনও মক্কার পুরুষ মুসলমানদের জন্য প্রিয় নবীর মন কাঁদে। রাসূল তাদের জন্য দুআ করে বলেন, 'আল্লাহ্ তাদের জন্য মুক্তির বন্দোবস্ত করে দিন।' তখন তার চেহারায় বিষণ্ণতা দেখা দেয়, যেন তিনি আবু জান্দালকে চোখের সামনে দেখতে পান। তার অশ্রু যেন বাধ মানতে চায় না।

আবু বাসির রা.: একটি বিকল্প গল্প

আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় রাসূলের দুআ কবুল করে নেন। মক্কার নিপীড়িত মুসলমানদের জন্য তিনি মুক্তির দ্বার খুলে দেন। আবু বাসির নামে এক সাহাবি এ সময় মক্কা থেকে পালিয়ে মদিনায় চলে আসেন। তিনি ছিলেন সাকিফ গোত্রের লোক। কুরাইশদের সাথে তার গোত্রের মিত্রতা ছিল পুরনো। ঘটনা জানতে পেরে কুরাইশরা দুজন লোক পাঠায় মদিনায়। সন্ধিচুক্তি মতে, আবু বাসিরকে ফিরিয়ে দিতে রাসূলের কাছে বার্তা পাঠায় তারা।

রাসূল কোনো অমত করলেন না। সন্ধির প্রতি মর্যাদা দেখিয়ে তিনি আবু বাসিরকে মক্কা ফেরত পাঠিয়ে দেন। এ সময় আবু বাসির অনুনয়বিনয় করলেও রাসূল সেদিকে মনোযোগ দেন না। তাঁর বুক ফেটে যাচ্ছিল, কিন্তু তিনি নিরুপায় ছিলেন। যাবার পথে যুল হুলাইফায় পৌঁছলে মুশরিকরা যাত্রাবিরতি দেয়। ঘোড়া থামিয়ে থলি থেকে খেজুর বের করে খেতে শুরু করে তারা।

আবু বাসির রাদিয়াল্লাহু আনহু একজনের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'বাহ, তোমার তলোয়ারটা তো বেশ সুন্দর।' লোকটা খুশিতে গদগদ হয়ে জবাব দেয়, 'হ্যাঁ, আসলেই এটা সুন্দর। আমিও বেশ কয়েকবার এটাকে পরীক্ষা করে দেখেছি।' 'আমাকে একটু দেখতে দেবে?' আবু বাসির বললেন।

লোকটা বললেন, 'কেন নয়? এই নিন, দেখুন।'

তরবারিটা হাতে পেয়েই আবু বাসির তার কল্লা ফেলে দেন। অপরজন কোনোমতে পালিয়ে মদিনায় চলে যায়। রাসূল মসজিদে নববিতে ছিলেন। লোকটা হন্তদন্ত হয়ে রাসূলের কাছে হাজির হলে তিনি বুঝতে পারেন, সে বিপদে আছেন। কী হয়েছে জিজ্ঞেস করতেই সে বলে, 'আমার সাথিকে হত্যা করা হয়েছে; আমাকেও হত্যা করে ফেলা হবে, আপনি আমাকে বাঁচান।'

ততক্ষণে আবু বাসিরও সেখানে হাজির হন। রাসূলকে লক্ষ করে তিনি বলেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ, আল্লাহ তাআলা আমাকে ফিরিয়ে দেয়ার মাধ্যমে আপনার দায়িত্ব পূর্ণ করেছেন, আবার তিনিই আমাকে তাদের হাত থেকে রক্ষা করেছেন।'

রাসূল বললেন: 'কী মুশকিল হলো! যদি এর কোনো সঙ্গী থাকত, তবে তো রীতিমতো যুদ্ধ বেঁধে যেত।'

আবু বাসির বুঝতে পারেন, রাসূল তাকে আবারও কুরাইশদের হাতে তুলে দেবেন। কোনোমতে সকলের চোখ ফাঁকি দিয়ে তিনি মদিনা থেকে বের হয়ে যান। তড়িৎ গতিতে যেতে যেতে তিনি উপকূলীয় এলাকায় গিয়ে আত্মগোপন করেন। খবর রটে যায় সবখানে। মক্কায় সুহাইলের ঘরেও এ সংবাদ পৌঁছে গেলে হযরত আবু জান্দাল রাদিয়াল্লাহু আনহুও তা শুনতে পান। তখন থেকেই তাঁর মনে পালাবার ইচ্ছে প্রবল হয়। সুযোগ বুঝে মক্কা থেকে বের হয়ে তিনিও আবু বাসিরের সাথে আত্মগোপনে যোগ দেন।

এরপর মক্কার আরও যারা ইসলাম গ্রহণ করতেন, একে একে সকলে আবু বাসিরের সাথে গিয়ে যোগ দিতেন। এভাবে একে একে সেখানে মুসলমানদের একটি দল তৈরি হয়ে যায়। এরা সিরিয়াগামী কুরাইশদের বাণিজ্যিক কাফেলাগুলোতে লুটপাট চালাতে শুরু করে। একের পর এক কাফেলার এদের হাতে লুট হতে থাকলে কুরাইশরা বিতৃষ্ণ হয়ে যায়। কোনোভাবেই যেন এই ছোট্ট বাহিনীকে দমানো যাচ্ছিল না। এতে অনেকটা নিরুপায় হয়ে নিকটাত্মীয়তার দোহাই দিয়ে কুরাইশরা রাসূলের কাছে এ মর্মে পত্র পাঠায় যে, আপনি দয়া করে এদেরকে আপনার কাছে নিয়ে নিন। এরপর থেকে মক্কার কেউ মুসলমান হয়ে আপনার কাছে চলে গেলে আমরা কোনো আপত্তি করব না।

রাসূল এই সুসংবাদ পেয়ে খুবই খুশি হন। সাথেসাথে তিনি আব বাসির বরাবর একটি পত্র লেখেন। কিন্তু এই পত্র যখন তার কাছে পৌঁছে, ততক্ষণে তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে গেছে। পত্রটি হাতে পেয়ে তিনি খুশি হন। তার চেহারায় সে আনন্দ ফুটে ওঠে স্পষ্টভাবে। বুকের উপর রাসূলের পত্র তুলে ধরেই তিনি পরপারে পাড়ি জমান। আবু জান্দাল রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে সেখানেই সমাহিত করে অন্যদের নিয়ে রাসূলের নির্দেশ মোতাবেক মদিনায় চলে আসেন।

রাজা-বাদশাহদের নামে পত্র প্রদান

হুদাইবিয়ায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্ধি যে কতটা ফলপ্রসূ ছিল, ততদিনে তা সকলের কাছে জাহির হয়ে গেছে। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু, যিনি এ শর্তগুলোকে নিজেদের জন্য অপমানব্যঞ্জক মনে করেছিলেন, তিনি সবকিছু দেখে অনেকটা ভীত হয়ে পড়েছিলেন। ভাবছিলেন, কখন না-জানি আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার ব্যাপারে কোনো শাস্তির ফায়সালা আসে, আমি যে

সেদিন রাসূলের সাথে কিছু অমূলক কথা বলে ফেলেছিলাম!

সন্ধির পর দুশমনদের দুশমনি থেকে নিস্তার মিলতেই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের দাওয়াত দিকদিগন্তে পৌঁছে দেয়ার মনস্থ করেন। সে-মর্মে রাজা বাদশাহদের কাছে চিঠি লিখে তা মোহরাঙ্কিত করার নিমিত্তে তিনি 'আল্লাহ-রাসূল-মুহাম্মদ' তিনটি শব্দ দিয়ে নিজের জন্য রূপার একটি আংটি তৈরি করেন। এরপর শুরু হয় রাসূলের পত্র নিয়ে সাহাবাদের দূর-দূরান্তের ছোটাছুটি।

সপ্তম হিজরির শুরুর দিকে রাসূলের পত্র নিয়ে হাবাশার রাজা নাজাশির নিকট পৌঁছে যান সাহাবি আমর ইবনু উমাইয়া। নাজাশির মূল নাম ছিল আসহামা ইবনু আবজার। সত্যানুসন্ধিৎসু রাজা রাসূলের পত্রটি চুমু খেয়ে নিজের চোখের উপর রাখেন। রাজসিংহাসন ছেড়ে নেমে এসে সাহাবির হাত ধরে তখনই ইসলাম গ্রহণ করে নেন।

রোমসম্রাট কায়সারের কাছেও রাসূল পত্র লেখেন। সাহাবি দিহইয়া কালবি রাদিয়াল্লাহু আনহু এই পত্র নিয়ে কায়সারের কাছে যান। বসরার শাসকের মাধ্যমে এ পত্র কায়সারের কাছে পৌঁছানো হয়। বুখারি শরিফের লম্বা এক হাদিসের বিবৃতি অনুযায়ী, সে রাসূলের আহ্বানের সত্যতা স্বীকার করেন। কুরাইশদের এক কাফেলার সাথে বাইতুল মুকাদ্দাসে তার কিছু কথোপকথন হয়। সব মিলিয়ে সে সত্য গ্রহণে তৎপর হয় এবং রাজ্যের সকলকে একত্র করে রাসূলের দাওয়াতের কথা আলোচনা করে। কিন্তু রাজত্ব হারানোর ভয়ে শেষপর্যন্ত সে ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত থেকে যায়।

সাহাবি হাতেব ইবনু আবি বালতাআ রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলের পত্র নিয়ে কিবতিদের রাজা মিশররাজের মুকাওকিসের কাছে যান। তিনি রাসূলের পত্রের প্রতি সম্মান জানান, দূতের সাথে উত্তম আচরণ দেখান এবং পত্রের প্রতিউত্তর লেখেন। রাসূলের জন্য কিবতিদের সম্মানিত দাসী মারিয়া কিবতিয়া এবং সিরিন কিবতিয়া, দুলদুল নামী একটি দামি খচ্চর এবং আরও কিছু মূল্যবান কাপড় হাদিয়া পাঠান।

বাহরাইনের শাসক মুনযির ইবনু সাবির নামেও রাসূল একটি পত্র পাঠান। সাহাবি আলা ইবনুল হাযরামি রাদিয়াল্লাহু আনহু পত্রটি বাহরাইনে নিয়ে যান। তিনি পত্রটি হাতে পেয়ে বাহরাইনের অধিবাসীদের শোনালে তাদের কেউ কেউ ইসলাম গ্রহণ করে নেয়। আবার কেউ কেউ এটাকে অপছন্দ করে এবং অগ্নিপূজাসহ অন্যান্য

শিরকে লিপ্ত থেকে যায়।

সাহাবি সালিত ইবনু আমর আমেরির মাধ্যমে রাসূল একটি চিঠি ইয়ামামার শাসনকর্তা হুযা ইবনু আলির কাছেও পাঠান। সালিত রাসূলের চিঠি পেয়ে দূতকে মোবারকবাদ জানায় এবং রাসূলের আহ্বানের প্রতি তার সন্তুষ্টি প্রকাশ করে। কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করে বিপদে পড়তে না চেয়ে সে মাঝামাঝি অবস্থান গ্রহণ করে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দামেশকের শাসনকর্তা হারিস ইবনু আবি শামির গাসসানির কাছে সাহাবি শুজা ইবনু ওয়াহাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর মাধ্যমে পত্র পাঠান। কিন্তু সে রাসূলের পত্রের প্রতি ঔদ্ধত্য দেখিয়ে সেটা ছিঁড়ে ফেলে। তবে রাসূলের দূতের প্রতি সম্মান দেখিয়ে তাকে কিছু উপঢৌকন দিয়ে বিদায় করে দেয়।

সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনু হুজাফা সাহমি রাসূলের পত্র নিয়ে যান পারস্যসম্রাট কিসরার দরবারে। বাহরাইনের রাজার মাধ্যমে পত্রটি কিসরার কাছে পাঠানো হলে পত্রটি পাঠকালে রাগে-ক্ষোভে সে পত্রটি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে বাতাসে উড়িয়ে দেয়। বলে, 'আমার এ বিশাল রাজ্যের নগণ্য প্রজা হয়ে সে আমার নামের আগে তার নাম লেখার দুঃসাহস দেখিয়েছে!' এ সংবাদ রাসূলের কাছে এলে তিনি বলেন, 'আল্লাহ তার রাজত্বকেও এভাবে টুকরো টুকরো করে দেবেন।' সত্যিই, রাসূলের এ কথা বলার কদিনের মাথায়ই পারস্যে বিদ্রোহীদের উত্থান ঘটে এবং কিসরার রাজত্বের অবসান ঘটে। ছেলে শিরওয়াহর হাতে নিহত হয়ে কিসরা রাসূলের প্রতি অপমানের যথাযোগ্য প্রতিদান পেয়ে যায়।

খাইবার যুদ্ধ
BATTLE OF KHAYBAR

তারিখ:	৭ম হিজরি / ৬২৮ খ্রি.
স্থান:	মদিনা থেকে ষাট বা আশি মাইল দূরে খাইবারে
ফলাফল:	মুসলমানদের বিজয়

পক্ষ-বিপক্ষ:	মুসলমান	খাইবারের ইহুদিরা
সেনাপ্রধান:	রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)	আল-হারিস ইবনু আবি যাইনাব মারহাব ইবনু আবি যাইনাব
সেনাসংখ্যা:	১৪০০ (মতান্তরে ১৬০০)	১৪,০০০ (খাইবার - ১০,০০০ বনু গাতফান - ৪০০০)
ক্ষয়ক্ষতি:	২০ জনের মতো	৯৩ জন নিহত

এলাকাটির চারপাশে অসংখ্য খেজুর গাছ। গ্রীষ্মের মৌসুমে আরবের মরু অঞ্চলের দামি এ ফলে এলাকাটির পরিবেশ মাতোয়ারা হয়ে উঠলেও এখানকার আবহাওয়া খুব একটা সুবিধের না। ঘন গাছে ঢেকে যাওয়া এই এলাকার মধ্যবর্তী স্থানে দাঁড়িয়ে আছে প্রকাণ্ড এক দুর্গ। নিশি রাতের আঁধার ভেদ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চৌদ্দশ সাহাবার এক বিশাল কাফেলা নিয়ে এই দুর্গটির দিকে বাহন ফিরিয়েছেন। অন্ধকারের অমানিশা ছুঁয়ে ভেসে আসছে কারও আবৃত্তির কণ্ঠ। সে কণ্ঠে বেজে উঠছে সুন্দর এক রণসঙ্গীত, যার অর্থ অনেকটা এমন:

'হে আল্লাহ, যদি আপনি না হতেন,
তবে আমরা তো হেদায়াত পেতাম না,
সদকা করতাম না, নামাযও আদায় করতাম না!
আমরা আপনার উপর কুরবান,
সুতরাং আপনি আমাদের ক্ষমা করে দিন,
আমাদের উপর প্রশান্তি নাযিল করুন।
যুদ্ধে অবতীর্ণ হলে আমাদের দৃঢ়পদ রাখুন।
বিপদগ্রস্ত কেউ সাহায্য কামনা করলে আমরা ছুটে যাই;
হে আল্লাহ, বিপদগ্রস্তরা আমাদের সাহায্য প্রার্থনা করছে!'

রাসূল তার আবৃত্তিতে মোহাচ্ছন্ন হয়ে উঠলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'কে আবৃত্তি করছে লাইনগুলো?' সাহাবিরা বললেন, 'আমর ইবনু আকওয়া।' রাসূল তার জন্য মাগফিরাতের দুআ করলেন। বললেন, 'আল্লাহ তাকে রহম করুন।'

সাহাবিরা ভালো করে জানেন, রাসূল যার জন্য রহমতের দোয়া করেন, আসন্ন যুদ্ধে সে শহিদ হয়ে যায়। তাই তাদের ভেতর কৌতূহল চড়ে উঠল। কেউ জিজ্ঞেস

করলেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ, তার মাধ্যমে আমাদেরকে আরও কিছু দিন কেন আনন্দিত হবার সুযোগ দিচ্ছেন না?' রাসূল হাসলেন।

যুদ্ধের প্রাকালাপ

মদিনা থেকে ষাট বা আশি মাইল দূরে খাইবারের অবস্থান। মদিনা থেকে বিতাড়িত অনেক ইহুদি নেতাই এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছে এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে এটাকে ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত এবং সামরিক অভিযানের আখড়া হিসেবে গড়ে তুলেছে। এই খাইবারের অধিবাসীরাই খন্দকের যুদ্ধে মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের ক্ষেপিয়েছিল। কুরাইশদের খুঁচিয়ে নতুন করে সারিবদ্ধ করে মদিনার উপকণ্ঠে এনে দাঁড় করিয়েছিল। এরা বনু কুরায়যাকে রাসূলের সাথে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করতে উৎসাহ জুগিয়েছিল। মদিনায় এদের চলাচল ছিল বিশ্বাসঘাতক মুনাফিকদের সাথে। এরাই ইসলামের বিরুদ্ধে গিয়ে বনু গাতফান এবং আরব বেদুইনের সাথে সম্পর্ক রেখে চলত। অন্যদের ফোলানো ফাঁপানো ছাড়া, এরা নিজেরাও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য পায়তারা করছিল।

হুদাইবিয়ার সন্ধির পর রাসূল ইসলামের সবচে বড় শত্রু কুরাইশদের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত ছিলেন। এ ফাঁকে তিনি চাচ্ছিলেন, মুসলমানদের অন্য সকল শক্তিগুলোকেও একটু দেখে নেয়া যাক। রাসূলের উদ্দেশ্য ছিল, শান্তিপূর্ণ দাওয়াতের পথ পরিষ্কার করা, যাতে ইসলামের অগ্রযাত্রা এদের নাপাক নখরে আক্রান্ত হয়ে না যায়।

হুদাইবিয়া থেকে ফিরে তিনি পুরো যিলহজ এবং মুহাররমের শুরুভাগ মদিনায় অবস্থান করেন। খাইবারে আক্রমণ করার আগে ঘটনাক্রমে এক সাহাবিকে মরুদস্যুরা আক্রমণ করলে ছোট্ট একটি সেনাদল পাঠিয়ে তিনি 'যাতু কারদ' নামে একটি সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন। এরপর সপ্তম হিজরির মুহাররম মাসে তিনি খাইবারের উদ্দেশে রওনা হন।

কুরআনি ইরশাদ

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন খাইবার বিজয়ের সুসংবাদ পাঠান। হুদাইবিয়ার পর থেকে নাযিল হতে থাকা সুরা ফাতহে তিনি ইরশাদ করেন:

وَعَدَكُمُ ٱللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِۦ وَكَفَّ أَيْدِىَ ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَٰطًا مُّسْتَقِيمًا

> *'আল্লাহ্ তাআলা তোমাদেরকে বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদের ওয়াদা দিয়েছেন, যা তোমরা লাভ করবে। তিনি তা তোমাদের জন্যে ত্বরান্বিত করবেন। তিনি তোমাদের থেকে শত্রুদের স্তব্ধ করে দিয়েছেন—যাতে এটা মুমিনদের জন্যে এক নিদর্শন হয় এবং তোমাদেরকে তিনি সরল পথে পরিচালিত করেন।' (সুরা ফাতহ: ২০)*

মুনাফিক ও দুর্বল ইমানের লোকেরা হুদাইবিয়াতে রাসূলের সঙ্গী হতে নারাজ ছিল, এবার খাইবারে বিজয়ের সুসংবাদ আসতেই তারা সাহাবিদের সাথে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করে দেয়। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা সে ব্যাপারে তাঁর রাসূলকে অবহিত করে দেন। তিনি বলেন:

سَيَقُولُ ٱلْمُخَلَّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا۟ كَلَٰمَ ٱللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَٰلِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا۟ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا

> *'তোমরা যখন যুদ্ধলব্ধ ধন-সম্পদ সংগ্রহের জন্য যাবে, তখন যারা পশ্চাতে থেকে গিয়েছিল, তারা বলবে: আমাদেরকেও তোমাদের সঙ্গে যেতে দাও। (বস্তুত) তারা আল্লাহর কালাম পরিবর্তন করতে চায়। বলুন, তোমরা কখনো আমাদের সঙ্গে যেতে পারবে না। আল্লাহ্ পূর্ব থেকেই এরূপ বলে দিয়েছেন। (তখন) তারা বলবে, বরং তোমরা আমাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করছ। পরন্তু তারা সামান্যই বোঝে।' (সুরা ফাতহ: ১৫)*

এ আয়াত নাযিল হওয়ামাত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা দিলেন, এবারের অভিযানে কেবল তারাই যেতে পারবে, যারা হুদাইবিয়ায় রাসূলের সঙ্গী হয়েছিল। অন্য কারও জন্য এবারের যুদ্ধে রাসূলের সাথে যাবার অনুমতি নেই। এতে বাইয়াতে রিদওয়ানে অংশ নেয়া চৌদ্দশ সাহাবি ছাড়া অন্য কেউ খাইবারযাত্রায়

রাসূলের সঙ্গী হবার সুযোগ পেল না।

কিন্তু গনিমতের লোভে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে না পেরে মুনাফিকসর্দার আরেক নতুন ফন্দি করল। সে মুসলমানদের যাত্রা করার পূর্বেই রাসূলের বাহিনীর খবর খাইবারে পাঠিয়ে দিল। তাদেরকে প্রস্তুত থাকতে বলে রাসূলের ব্যাপারে সতর্ক করে দিল। পাশাপাশি বলল, 'শক্ত থাকো ভয়ের কোনো কারণ নেই। মুহাম্মদের বাহিনী তোমাদের চেয়ে ছোট এবং তাদের কাছে তেমন অস্ত্রশস্ত্রও নেই।'

বনু গাতফান নামে আরেক গোত্র ছিল ইহুদি ও মুসলমানদের বিরোধীপক্ষের মিত্র। রাসূলের অভিযানের খবর পেয়ে খাইবার থেকে বনু গাতফানে চিঠি এলো। তারা গোত্রপ্রধান কিনানা ইবনু আবিল হুকাইক এবং হাওযা ইবনু কাইসের কাছে সাহায্য চাইল এবং বলল, এর প্রতিদানে খাইবারে উৎপাদিত শস্যের অর্ধেক তাদেরকে দিয়ে দেয়া হবে।

বের হলো নুরানি কাফেলা

পাহাড়ি আঁকাবাঁকা পথ পেরিয়ে রাসূলের নেতৃত্বে সাহাবাদের বাহিনী রজি উপত্যকায় এসে যাত্রাবিরতি করেন। গাতফান গোত্রের বসতি সেখান থেকে এক দিন এক রাতের দূরত্বে। তারা খাইবারের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বের হয়ে গেল সাহায্যের জন্য। কিন্তু গোয়েন্দা মারফত তারা জেনেছিল, মুসলিম বাহিনীও কাছাকাছি চলে এসেছে। তারা গোত্র ছেড়ে বের হতেই সেখান থেকে চিল্লাফাল্লার আওয়াজ শুনে ভড়কে যায়। তাদের মনে হয়, রাসূল বুঝি তাদের গোত্র খালি পেয়ে সেখানে আক্রমণ করেছেন। তাই খাইবারের যাত্রা ব্যাহত করে তারা আবার কবিলায় ফিরে যায়।

রাসূলের কানে খবর আসে বনু গাতফানের বেরোনো এবং পুনরায় ফিরে আসার কথা। তিনি সাহাবিদের ডেকে পরামর্শ করেন, 'এমন পথ কোনটি, যেদিকে গেলে গাতফানের সম্ভাব্য সাহায্য খাইবারে পৌঁছা রোধ করা যাবে?' দুজন সাহাবির এ দিকটা বেশ চেনাজানা ছিল। তারা বললেন, 'এমন একটা পথ আছে, যে পথে গাতফানের সাহায্যও রোধ করা যাবে আবার খাইবারের লোকদের পলায়নের রাস্তাও বন্ধ হয়ে যাবে।' রাসূল বললেন, 'তবে সেদিকেই যাওয়া হোক!'

বন্ধুর বন্ধুর পথ পাড়ি দিয়ে আলোর কাফেলা এসে দাঁড়াল কয়েক বাঁকের জটিল এক রাস্তায়। রাসূল সেখানে আরেক দফা পরামর্শ করে উপযোগী পথ নির্বাচন করে

খাইবারের কাছাকাছি চলে এলেন। কাফেলা থামাতে বলে তিনি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দ্বারে হাত পাতলেন। বললেন: 'হে সাত আসমান এসব সে-সবের উপরের আল্লাহ, সাত জমিন ও তার বাহিত সবকিছুর মালিক, হে শয়তান ও তার পথভ্রষ্টকৃত লোকদের প্রতিপালক, বাতাস ও তার দ্বারা উত্থিত বস্তুসমূহের খোদা, আমরা এই জনপদের কল্যাণ, এখানকার অধিবাসীদের কল্যাণ এবং অন্য সবকিছুর কল্যাণ কামনা করছি। তদ্রূপ এই জনপদ ও এখানকার সবকিছুর অকল্যাণ থেকে আশ্রয় কামনা করছি।' এভাবে দীর্ঘ সময় কল্যাণ ও বিজয়ের দুআ করে তিনি কাফেলাকে পুনরায় যাত্রা শুরু করতে বললেন।

যুদ্ধের সময়

ঘন খেজুরবাগানে ঘেরা খাইবারে তখন রাত নেমে এসেছে। ভেতরে অবস্থানরত ইহুদিরা জানে না, রাসূল তাদের ঘাড়ের কাছে শ্বাস নিচ্ছেন। চাইলে তিনি রাতের আঁধারে তাদের উপর খাইবারকে ধ্বসিয়ে দিতে পারতেন, কিন্তু তিনি নবী; তিনি রাতের অন্ধকারে ঘুমন্ত লোকেদের উপর হামলা করেন না। তিনি দিনের আলোয় মুখোমুখি যুদ্ধের উপড়ে ফেলেন শিরকের গজানো শেকড়।

ফজরের নামায আগে আগে পড়ে খানিকটা অন্ধকারের আবরণ থাকতেই রাসূল খাইবারের দিকে এগিয়ে গেলেন। স্থানীয় অনেকে না জানে কাস্তে-কোদাল হাতে ক্ষেতে খামারে কাজের জন্য বের হয়। পথে মুসলিম বাহিনী দেখে 'খোদার কসম, মুহাম্মদ সৈন্যসহ হাজির হয়েছেন' বলতে বলতে বিদিশার মতো শহরের দিকে পালাতে শুরু করে।

তাদের দেখে রাসূল বলে ওঠেন: 'আল্লাহর কসম, খাইবার বিরান হয়ে গেছে! আল্লাহু আকবার, খাইবার বিরান হয়ে গেছে! আমরা যখন কোনো কওমের ময়দানে নেমে আসি, তখন সেখানকার ভয়ার্ত লোকদের সকাল মন্দ হয়ে যায়।' এরপর তিনি সেনাদের অবস্থানের জন্য একটি জায়গা নির্ধারণ করে দেন। এ সময় হুবাব ইবনুল মুনযির রাদিয়াল্লাহু আনহু এসে বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, আপনি আল্লাহর নির্দেশে এখানে অবস্থান নিয়েছেন, নাকি রণকৌশলগত কারণে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন?' রাসূল বলেন, 'রণকৌশলগত কারণে নিয়েছি।'

হুবাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'এই স্থান নিতাত দুর্গের খুব কাছে। খাইবারের সব

যোদ্ধারা এই দুর্গেই রয়েছে। ওরা আমাদের অবস্থান সম্পর্কে জানতে পারবে, অথচ আমরা তাদের অবস্থান কিছুই জানতে পারব না। তারা তাদের কৌশল আমাদের উপর প্রয়োগ করতে পারবে, তাদের তির আমাদের দিকে উড়ে আসবে, অথচ আমাদের তির তাদের কাছে পৌঁছবে না। রাতের বেলা তারা চাইলে আমাদের উপর অতর্কিত হামলাও চালাতে পারবে। তাছাড়া এটা খেজুরবাগানের কাছে, নিতান্ত শুষ্ক ও অনুর্বর ভূমি। সব দিক বিবেচনায় এ সব সমস্যা যেখানে নেই, সেখানে সেনাদের অবস্থান করালে উত্তম হতো।' তার অভিমত মেনে রাসূল সাহাবিদের বাহিনী অন্যত্র সরিয়ে নেয়ার নির্দেশ দেন।

খাইবার এলাকার জনবসতি মূলত দুটি অঞ্চলে বিভক্ত ছিল; প্রথম অঞ্চলের নাতাতে মোট তিনটি দুর্গ ছিল: নায়িম, সাব ইবনু মুয়ায এবং যুবাইর। আর শ্বক এরিয়ায় দুর্গ ছিল দুটি: উবাই এবং নাযার। দ্বিতীয় অঞ্চল কাতিবা নামে পরিচিত ছিল। সেখানে মোট তিনটি দুর্গ ছিল, কামুস—যাতে বনু নাযিরের আদিবাসীরা বাস করত; বাকি দুটির নাম ছিল যথাক্রমে ওয়াতিহ এবং সুলালিম। এগুলো ছাড়াও সেখানে ছোট ছোট আরও বেশকিছু দুর্গ ছড়িয়ে ছিল।

যুদ্ধ

যুদ্ধ শুরু হয়। একের পর রাসূলের হাতে ধরা দিতে থাকে খাইবারের দুর্ভেদ্য দুর্গগুলো। ঐতিহাসিকদের বর্ণনামতে, খায়বারের ইহুদিদের সেনাসংখ্যা ছিল প্রায় দশ হাজার। সে তুলনায় মুসলিম বাহিনীর সেনাসংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য। কিন্তু অবিশ্বাস হলেও সত্য, এই নগণ্য সদস্য সংখ্যাই মুসলিমদের সুবিধা করে দিয়েছিল। এই সংখ্যাস্বল্পতার কারণেই মুসলিমরা নীরবে এবং দ্রুতবেগে খায়বারের দিকে মাত্র তিনদিনের মধ্যে অগ্রসর হয়ে আকস্মিকভাবে নগরীতে প্রবেশ করতে পেরেছিলেন। এছাড়া বৃহৎসংখ্যক সৈন্য খাইবারবাসীকে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছিল; ফলস্বরূপ, ইহুদিরা কেন্দ্রীয়ভাবে সংগঠিত হয়ে মুসলিমদের প্রতিহত করতে ব্যর্থ হয় এবং বেকুবের মতো কেন্দ্রীয় কোনো দায়িত্বশীলতা ছাড়াই ইহুদি পরিবারগুলোর হাতে নিজ নিজ দুর্গ রক্ষা করার দায়িত্ব ছেড়ে দেয়। খাইবারের ইহুদিরা মুসলিমদের শক্তিকে ছোট করে দেখার কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষে আপেক্ষিক স্বাচ্ছন্দ্যে একটির পর একটি করে প্রতিটি দুর্গ জয় করা সহজ হয়ে গিয়েছিল এবং সাথে খাদ্য, যুদ্ধাস্ত্র এবং পারিপার্শ্বিক জমিসমূহ মুসলমানদের

দখলে চলে যাচ্ছিল।

খাইবারে মুসলিম বাহিনীর উপর আরেকটি রাত নেমে এলো।রাসূল বললেন, 'কাল আমি এমন একজনের হাতে পতাকা তুলে দেব, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলও তাকে ভালোবাসেন। আর তার হাতেই দুর্গ বিজিত হবে।'

সকাল হয়ে আসে। সাহাবিরা সকলে আনচান। সবার মনে কৌতূহল, পতাকাটা কার হাতে যায়! রাসূল যার প্রেমের ব্যাপারে স্বীকৃতি দেন, কে সেই মহান মর্দ। রাসূল সবাইকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আলি ইবনু আবি তালিব কোথায়?' সাহাবারা বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, তার চোখ উঠেছে।' রাসূল বললেন, 'তাকে এদিকে নিয়ে এসো।' আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নিয়ে আসা হলো।

রাসূল তার চোখে সামান্য থুতু লাগিয়ে দিলেন। তার সুস্থতার জন্য দুআ করলেন। আলি এমন সুস্থ হয়ে উঠলেন যে, মনে হলো তার চোখে কোনোদিন কোনো অসুখই ছিল না। সকল সাহাবার কৌতূহলের অবসান ঘটলো তখন। রাসূল বাহিনীর পতাকা তুলে দিলেন আলি ইবনু আবি তালিবের হাতে। বললেন, 'তাদের ময়দানে পৌঁছা পর্যন্ত নিশ্চিন্তে এগোতে থাকো। প্রথমে তাদেরকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দেবে এবং আল্লাহর অধিকার সম্পর্কে অবহিত করবে। যদি তোমার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা ওদের একজনকেও হেদায়াত দেন, তাহলে সেটা তোমার জন্য বহুসংখ্যক লাল উট অধিকারের চেয়ে উত্তম হবে।'

নায়িম দুর্গের পতন

সর্বপ্রথম মুসলমানদের সামনে এ দুর্গটির পতন নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। দুর্গটির অধিকারে ছিল মারহাব নামের এক দুর্ধর্ষ ইহুদি, যাকে প্রায় এক হাজার যোদ্ধার সমশক্তির লোক বলে মনে করা হতো। আলি ইবনু আবি তালিব সেটা জানতেন। তবে রাসূল তাকে বলেছেন, নিশ্চিন্ত মনে এগোতে। তাই তিনি সে-সব মাথায় না রেখে এগোতে থাকলেন। তিনি দুর্গের সামনে গিয়ে প্রথমে তাদেরকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিলেন। খুব স্বাভাবিকভাবেই দুর্গবাসী তাঁর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করল। বরং শাসক মারহাবের নেতৃত্ব ও নির্ভরতায় তারা মুসলমানদের সামনে যুদ্ধের জন্য কাতারবদ্ধ হয়ে দাঁড়াল।

এক হাজার যোদ্ধার সমান শক্তির অধিকারী হিসেবে মারহাবের অহংকার তাকে মাটিতে পা ফেলতে দেয় না। সিনা উঁচু করে সে ময়দানে নেমে এলো। কে আছে মুসলিম বাহিনীতে, তার মোকাবেলা করে? তার কণ্ঠে স্পর্ধিত শব্দে ফুটে উঠল—

'খাইবার জানে আমি মারহাব,
বর্মধারী বীর, অসীম সাহসী এক যোদ্ধা...'

হযরত আলিকে এগোতে না দিয়ে মুসলিম বাহিনী থেকে বের হয়ে এলেন সেই কবি, পথে যার কবিতায় রাসূল মোহে পড়ে গিয়েছিলেন। মারহাবের আবৃত্তির রেশ কাটিয়ে তিনি বলে উঠলেন,

'খাইবার জানে আমি আমর,
অস্ত্রসাজে সজ্জিত এক অকুতোভয় সৈনিক...'

প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক যুদ্ধের জন্য মুখোমুখি হলে মারহাবের তলোয়ার আমরের ঢালে এসে আঘাত করে। আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাতের তরবারিটি ছিল ছোট। তিনি মারহাবের পায়ে আঘাত করতে গেলে সেটা ঘুরে তাঁর নিজের পায়ে এসে আঘাত করে। এতে তিনি মারাত্মক আহত হয়ে পড়েন। তাকে দ্রুত পেছনে সরিয়ে এনে ময়দানে বাঘের হুংকারে নেমে আসেন শেরে খোদা আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু। বলেন,

'আমি সেই ব্যক্তি, মা যার নাম রেখেছেন সিংহ!
আমি সিংহের মতোই ভীতিপ্রদ এবং ভয়ঙ্কর...'

সময় লাগল না খুব। আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু এই 'এক হাজার যোদ্ধার সমান' লোকের দুর্বল জায়গা খেয়াল করলেন। এরপর ঘুরে তরবারি নিয়ে তার ঘাড়ে এক ঘা মারতেই ইহুদিদের বীর মারহাব মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ কাতরানোরও সুযোগ পেল না সে, সরাসরি চলে গেল জাহান্নামের অতল গহ্বরে।

মারহাবের মৃত্যুতে ময়দানে হাজির ইহুদিদের মুখ শুকিয়ে গেল। এগিয়ে এল মারহাবের ভাই ইয়াসির। আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ইশারায় পেছনে আসতে বললেন হযরত যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু। কয়েক মিনিটে তিনি ইয়াসিরকেও পরপারের টিকেট ধরিয়ে দিলেন।

একে একে এখানে আরও কজন নেতৃস্থানীয় ইহুদি মারা গেলে বাকি সেনাদের মনোবল ভেঙে যায়। তারা মুসলিম বাহিনীর সাথে কিছুক্ষণ যুদ্ধ করে পেছন দিকে

দুর্গে ঢুকে যায়। আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু সাহাবাদের নিয়ে দুর্গের চারপাশে অবরোধ টানেন। বেশ কিছু দিন অবরুদ্ধ থাকার পর ইহুদিরা উপায় না পেয়ে গোপন পথে পাশের দুর্গ সাবে পালিয়ে যায়। এতে অনায়াসে দুর্গ আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাতে চলে আসে।

এ দুর্গ পতনের পর আহত আমর ইবনু আকওয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু শহিদ হয়ে যান। রাসূলের কাছে এ খবর পৌঁছলে তিনি তাঁর দু আঙুল উপরে তুলে বলেন, 'আমরের জন্য দুটি পুরস্কার রয়েছে। সে আমার শ্রেষ্ঠ মুজাহিদ।'

অবরোধ চলাকালীন দুর্গ থেকে এক ইহুদির নিক্ষিপ্ত যাঁতার চাক্কায় আহত হয়ে শহিদ হয়ে যান সাহাবি মাহমুদ ইবনু মাসলামা রাদিয়াল্লাহু আনহুও।

সাব ইবনু মুআয দুর্গের পতন

আসলাম গোত্রের শাখা বনু সাহমের লোকজন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসেন। তাদের চেহারায় খানিক দুশ্চিন্তার ছাপ। রাসূলের কাছে অভিযোগের সুরে তারা বলেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমাদের রসদসামগ্রী শেষ হয়ে আসছে। আমরা আর পারছি না।' রাসূল তাদের জন্য দুআ করেন আর বাহিনীকে পরবর্তী দুর্গে আক্রমণের নির্দেশ দেন। সাহাবি হুবাব ইবনুল মুনযির রাদিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে মুসলিমরা সাব ইবনু মুআয দুর্গে আক্রমণ করেন। এখানেও দুর্গের সামনে কিছু সংঘর্ষ হলো। সন্ধ্যা নামতে নামতে দুর্গে দখল এলো মুসলিম বাহিনীর। এ দুর্গের পতন ঘটাতে মুসলমানরা মিনজানিক ও দাববাব ব্যবহার করেন। ভেতরে ঢুকলে দেখা যায়, এখানে অত অধিক পরিমাণ খাদ্যশস্য মজুদ ছিল, যা খাইবারের অন্য কোনো দুর্গে ছিল না।

যুবাইর দুর্গের পতন

সাব দুর্গের পতনের পর ইহুদিরা পালিয়ে এসে আশ্রয় নেয় যুবাইর দুর্গে। পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত এ দুর্গটি ছিল অত্যন্ত নিরাপদ এবং সুরক্ষিত। দুর্গে ওঠার পথ ছিল খুবই বিপদসংকুল। ঘোড়া তো পরের কথা, পায়ে হেঁটে ওঠাও ছিল নিতান্ত মুশকিল।

মুসলমানরা তিন দিন সেখানে শিবির গেড়ে পড়ে থাকলেন। এমন সময় এক ইহুদি
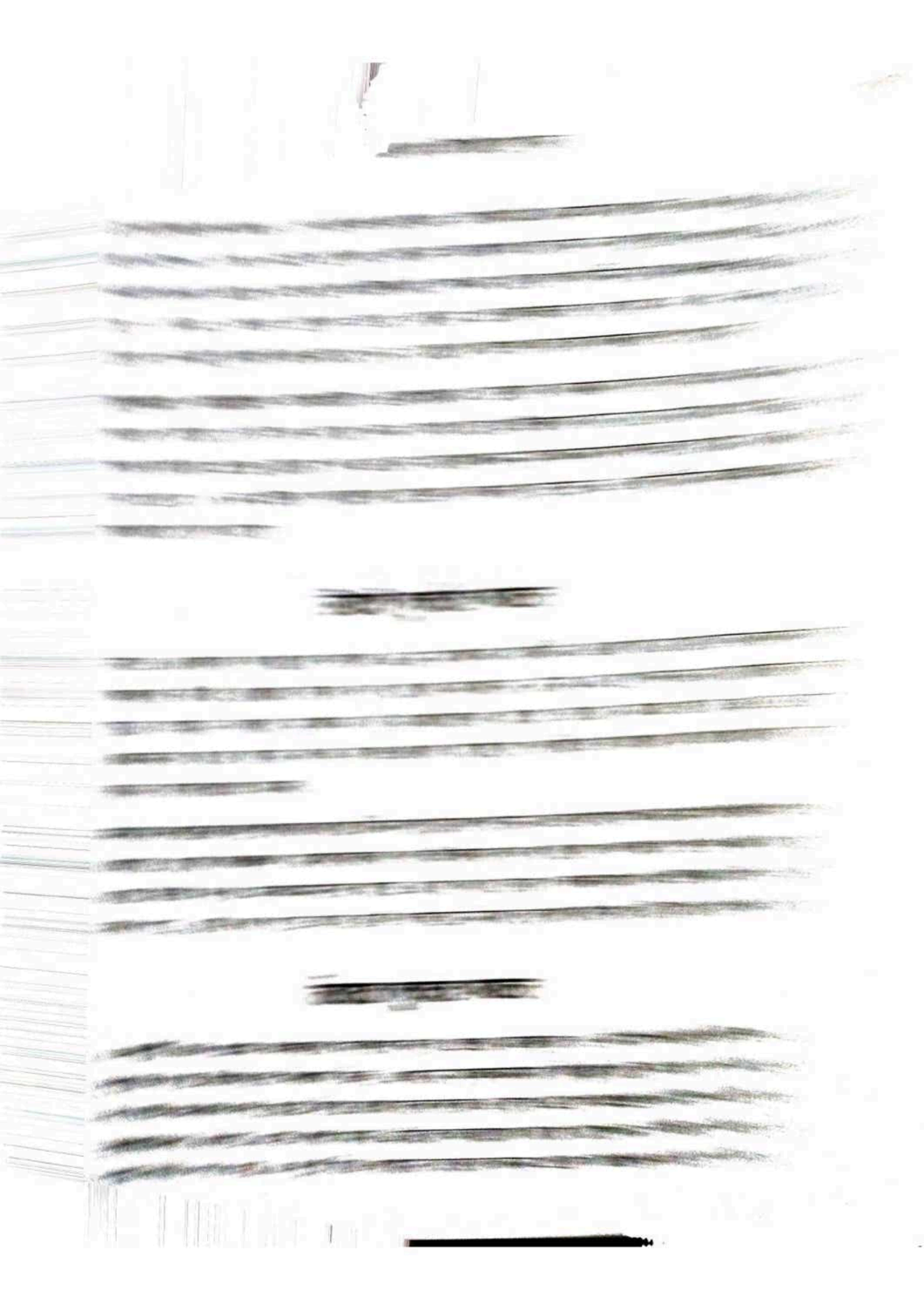
ইহুদিরা সরাসরি ময়দানে এসে মুসলমানদের মোকাবেলা করার সাহস পাচ্ছিল না, কিন্তু উপর থেকে তারা অনবরত তির নিক্ষেপ করে সাহাবাদের দুর্গের আশপাশ থেকে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছিল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ পর্যায়ে সাহাবাদেরকে মিনজানিক ব্যবহার করতে বলেন। বড় বড় কিছু পাথর সজোরে ছুড়ে মারলে দুর্গপ্রাচীরে ফাটল ধরে এবং মুসলিমরা সেখান দিয়ে দুর্গে ঢুকে পড়েন। সেখানে উভয়পক্ষের সামনাসামনি লড়াই চলে কিছুক্ষণ। কাপুরুষের দল পরাজিত হয়ে একপর্যায়ে তাদের নারী-শিশুদের রেখেই পেছন দিক দিয়ে পালিয়ে যায়। মুসলিমরা ধাওয়া দিলে আশপাশের সবগুলো কেল্লা খালি করে তারা দ্বিতীয় অঞ্চল কাতিবায় গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে।

দ্বিতীয় অঞ্চলের পতন

প্রথম অঞ্চলের দুই ভাগ, নিতাত ও শ্বক শেষ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবার দ্বিতীয় অঞ্চলের দিকে এগিয়ে যান। সেখানে বনু নাযিরের বিখ্যাত ইহুদি আবুল হুকাইকের কামুস ওয়াতিহ এবং সুলালিম দুর্গ অবস্থিত। মুসলিম বাহিনী সেখানে পৌঁছে শক্ত অবরোধ আরোপ করেন। একটানা চৌদ্দ দিন তাদের অবরোধ চলতে থাকে। একটি বারের জন্যও ইহুদিরা এ সময় বাইরে আসেনি। এরপর রাসূল দুর্গের প্রাচীর ধসানোর জন্য মিনজানিক বসানোর সিদ্ধান্ত নিলে তড়িৎ ইহুদিরা নেমে এসে সন্ধির প্রস্তাব করে বসে।

আবুল হুকাইক এ সময় রাসূলের কাছে পয়গাম পাঠায়, 'আমি কি আপনার সাথে কিছু কথা বলতে পারি?' রাসূল তাকে অনুমতি দিলে সে নিচে নেমে এসে আলোচনার জন্য বসে। সেখানে সে রাসূলের কাছে দুর্গস্থিত সকলের প্রাণ ভিক্ষা চায়। রাসূল তার আর্জি মেনে নেন। তবে শর্ত দেন, পরনের কাপড় ছাড়া, সোনা-রুপা, ঘোড়া, বর্ম কিছুই কেউ সাথে নিতে পারবে না। সাথে এও বলে দেন, যদি তোমরা কিছু লুকোনোর চেষ্টা করো, তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তোমাদের জিম্মাদারি থেকে মুক্ত।

কিন্তু সম্পদের লোভ তাদেরকে রাসূলের শর্ত ভঙ্গ করতে প্ররোচিত করে। আবুল হুকাইকের দুই সন্তান বেরোনোর আগে প্রচুর ধনসম্পদ লুকিয়ে ফেলে। একটি

চামড়ার থলে তারা সাথে নিয়ে নেয়, যাতে হুয়াই ইবনু আখতাবের অলংকার এবং অন্য কিছু সম্পদও ছিল। বনু নাযিরের বহিষ্কারের সময় হুয়াই এগুলো সঙ্গে নিয়ে এসেছিল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে আবুল হুকাইকের পুত্র কেনানাকে তাঁর সামনে হাজির করা হলো। জানা গেছে, খাইবারের সুপ্ত ধনভাণ্ডারেক তথ্য তার কাছে আছে। রাসূল তাকে জিজ্ঞাসা করলে সে সরাসরি অস্বীকার করে। এ সময় এক ইহুদি এসে জানায়, তাকে বেশিরভাগ সময় একটি পরিত্যক্ত এলাকার আশপাশে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছি। রাসূল কেনানাকে বললেন, সেখানে যদি কিছু পাওয়া যায, তাহলে কিন্তু তোমাকে হত্যা করা হবে। কেনানা সম্মতি জানায়।

রাসূল সেই পরিত্যক্ত জায়গায় তল্লাশি চালান। মাটি খোড়াখুড়ির পর সেখানে সামান্য কিছু সম্পদ পাওয়া যায়। রাসূল জানেন, আরও সম্পদ থাকার কথা। তিনি কেনানাকে এনে পুনরায় জিজ্ঞাসাবাদ করেন। সে অস্বীকার করতে থাকলে রাসূল যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাতে তুলে দেন। বলেন, যেভাবে হোক এর থেকে তথ্য বের করো। যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে আঘাত করতে থাকলে একসময় তার প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে ওঠে। কিন্তু কিছুতেই সে মুখ খোলে না।

এরপর রাসূল এই দুর্বৃত্তকে মুহাম্মদ ইবনু মাসলামা রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাতে তুলে দেন। ইতিপূর্বে সে তাঁর ভাই মাহমুদ ইবনু মাসলামাকে হত্যা করেছিল। প্রতিশোধ হিসেবে মুহাম্মদ ইবনু মাসলামা তাকে হত্যা করে ফেলেন।

ফলাফল

এ যুদ্ধে বিভিন্ন সময় নিহত হওয়া মুসলমানদের শহিদের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৬ জন, ১৮ জন, ১৯ জন বা মতান্তরে ২৩ জন। আর ইহুদিদের মৃত্যুর সংখ্যা ছিল সবমিলিয়ে ৯৩ জন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইচ্ছে ছিল, খাইবার থেকে ইহুদিদেরকে পুরোপুরি বিতাড়িত করে দিবেন। কিন্তু তারা অনুনয় করে বলে, 'মুহাম্মদ, আমাদেরকে এখানেই থাকতে দিন। আমরা এর তত্ত্বাবধায়ন করব; তাছাড়া এই ভূখণ্ড সম্পর্কে আমরা আপনাদের চেয়ে বেশি অবগত।'

এদিকে রাসূল ও সাহাবাদের এ পরিমাণ শ্রমিক বা দাস ছিল না, যাদের দ্বারা তারা

এ জমিন চাষ করাতে পারেন। সে-জন্য 'উৎপাদিত শস্যের অর্ধেক মুসলমানরা পাবে' এমন শর্তে তিনি খাইবারের জমি ইহুদিদের কাছে বর্গা হিসেবে দিয়ে দেন। পাশাপাশি কথা হলো, যতদিন রাসূল চাইবেন, ততদিনই তারা এ সুযোগ পাবে। তিনি চাইলে আবার এটা বন্ধ করে দিতে পারবেন। এরপর তিনি সাহাবি হযরত আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে খাইবারের তদারকির জিম্মাদার নিযুক্ত করলেন।

এ বিজয়ের পরপরই সাহাবি হযরত জাফর ইবনু আবি তালিব বাদশাহ নাজাশির পত্রসহ আশআরি সাহাবাদের নিয়ে রাসূলের কাছে এসে উপস্থিত হন। জাফরকে দেখে রাসূল তাকে বুকে জড়িয়ে নেন। অতিশয় স্নেহের দরুন তিনি তার কপালে চুমু খান এবং বলেন, 'আল্লাহর কসম, আমি জানি না, খাইবারের বিজয়ে আজ আমি বেশি খুশি, নাকি জাফরের আগমনে!'

হাজির হন বিখ্যাত সাহাবি হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি ইসলাম গ্রহণ করে তার আরও কিছু সঙ্গীসহ মদিনায় রাসূলের খোঁজ করতে থাকেন। সেখানে তাদের না পেয়ে সরাসরি খাইবারের দিকে যাত্রা করেন। বিজয়ের পরপর তারা রাসূলের দরবারে উপস্থিত হয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন।

মুবারক বিবাহ

খাইবারের এক দুর্গ থেকে মুসলমানদের হাতে বন্দি হয় বেশকিছু মহিলা। এদের মধ্যে নিহত কিনানা ইবনু আবিল হুকাইকের স্ত্রী সাফিয়্যাহও ছিলেন। সাহাবি হযরত দাহইয়াহ কালবি রাদিয়াল্লাহু আনহু এ-সময় রাসূলের কাছে এসে একজন দাসী কামনা করলে রাসূল বলেন, এখান থেকে কাউকে নিয়ে যেতে পারো। তিনি প্রথমেই সাফিয়্যাহকে পছন্দ করে তাকে সাথে নিয়ে যান।

এরপর এক লোক এসে রাসূলকে বলে, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি বনু কুরায়যা ও বনু নাযিরের সাইয়েদা সাফিয়্যাহকে দাহইয়ার কাছে দিয়ে দিলেন? অথচ সে কেবল আপনারই যোগ্য!' এ কথা শুনে রাসূল দাহইয়াহ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সাফিয়্যাহ ছাড়া অন্য কাউকে গ্রহণের নির্দেশ দেন।

এরপর রাসূল সাফিয়্যাহকে ইসলামের দাওয়াত দেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইসলাম গ্রহণ করে নিলে রাসূল তাকে মুক্ত করে দিয়ে বিবাহ করে নেন। দাসত্ব থেকে মুক্তকরণই

তার মোহর হিসেবে ধার্য করা হয়েছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাসর রাতে তার গালে একটি শ্যামল দাগ দেখতে পেয়ে সেটার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। সাফিয়্যাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, আপনার খাইবার আগমনের পূর্বে আমি একটি স্বপ্ন দেখেছিলাম। দেখি, আকাশের চাঁদ তার নির্দিষ্ট কক্ষ থেকে বিচ্যুত হয়ে আমার কোলে এসে পড়েছে। এর কারণ কী হতে পারে, আল্লাহই তা জানেন। আপনার সম্পর্কে আমার পূর্বে কোনো কল্পনাও ছিল না। আমার স্বামীকে আমি এ ঘটনা জানালে সে আমাকে কষে একটা চড় মেরেছিল। বলেছিল, 'মদিনার বাদশাহর প্রতি তোমার মন আকৃষ্ট হয়েছে, না?'

রাসূলের পাতে বিষ

যুদ্ধ শেষ। সেনাদের বাহু শান্ত হয়েছে। সেনাপতিও স্বস্তিতে বিশ্রাম করছেন। খাইবার অভিযান ছিল রাসূলের জীবদ্দশার অন্যতম একটি দুর্গম যাত্রা। সকলে ক্লান্ত, আকাশে খা খা রোদ্দুর। এ সময় যাইনাব বিনত হারিসা নামক এক ইহুদি মহিলা রাসূলের জন্য ভুনা গোশত হাদিয়া পাঠাল। সে আগেই খোঁজ নিয়েছিল, রাসূল কোন অংশের গোশত পছন্দ করেন। সেই অংশে সে বিষ মিশিয়ে দেয়। তেমনি যে অংশ রাসূলের বেশি পছন্দ, সেখানে আরও বেশি করে বিষ ঢেলে দেয় সে।

রাসূলের সামনে হাজির করা হলো হাদিয়ার গোশত। তিনি আল্লাহর নামে নিজের পছন্দনীয় অংশের গোশত তুলে মুখে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি গোশতের টুকরোটি মুখ থেকে ফেলে দিযে বললেন, 'এই হাড় আমাকে বলে দিচ্ছে, সে বিষাক্ত।'

এদিকে রাসূলের সাথে খেতে বসেছিলেন সাহাবি বশির ইবনু বারা রাদিয়াল্লাহু আনহু। রাসূলের প্রতিক্রিয়া দেখার আগেই তিনি এক লোকমা গিলে ফেলেন এবং বিষক্রিয়ায় ছটফট করে সেখানেই মারা যান।

ইহুদি মহিলাকে ধরে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে সে সত্য যতক্ষণ সব স্বীকার করে নেয়। রাসূল জানতে চান, 'কেন তুমি এ-কাজ করলে?' সে বলে, 'আমি ভেবেছিলাম, যদি এই ব্যক্তি বাদশাহ হন, তাহলে আমরা তার থেকে নিস্তার পাব; আর যদি তিনি নবী হন, তাহলে বিষের খবর তাকে জানিয়ে দেয়া হবে।' রাসূল তাকে ক্ষমা করে দেন। কিন্তু বশির রাদিয়াল্লাহু আনহুর মৃত্যুর কেসাসস্বরূপ

মহিলাকে সেখানেই হত্যা করা হয়।

ফাদাক অভিযান

পার্শ্ববর্তী ইহুদিশাসিত একটি সবুজ গ্রামের খবর আসে রাসূলের কাছে। জায়গাটি উর্বর এবং শ্যামলিমায় ঢাকা। রাসূল সাহাবি মুহাইয়িসা ইবনু মাসুদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সেখানে ইসলামের দাওয়াত দিতে পাঠান। তিনি সেখানে পৌঁছে তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করলে তারা ইসলাম গ্রহণে বিলম্ব করে। কিন্তু খাইবার রাসূলের হাতে বিজিত হয়েছে জেনে তাদের মনে প্রচণ্ড ভয় ঢুকে যায়। তারাও খাইবারের মতো উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক মুসলিমদের দিয়ে দেয়ার শর্তে সন্ধির প্রস্তাব করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা মেনে নেন। এতে বিনা যুদ্ধে বিনা রক্তপাতে ফাদাক মুসলমানদের অধিকারে চলে আসে।

ওয়াদিল কুরা অভিযান

খবর আসে পার্শ্ববর্তী ওয়াদিল কুরা নামক জায়গায় ইহুদিদের আরেকটি ঘাঁটি আছে। রাসূল সেখানে সেনা অভিযানের নির্দেশ দেন। শোনা যায় সেখানে ইহুদিদের সাথে কিছু আরবও যোগ দিয়েছে। মুসলমানরা সেখানে পৌঁছলে ইহুদিরা তিরবৃষ্টি শুরু করে। আগ থেকেই তারা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিল। এতে মিদআম নামী রাসূলের এক দাস মৃত্যুবরণ করেন। সাহাবারা বলেন, তার শাহাদাত মোবারক হোক। কিন্তু রাসূল বলেন, 'কখনোই নয়। সেই সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, খাইবার যুদ্ধে গনিমতের মাল বণ্টন হবার আগেই সে একটি চাদর চুরি করেছিল, সেটা আগুন হয়ে তাকে ঘিরে আছে।'

এরপর রাসূল মুসলমানদেরকেও যুদ্ধের জন্য সারিবদ্ধ করেন। মুসলিম বাহিনীর পতাকা তুলে দেন সাহাবি সাদ ইবনু উবাদার হাতে। ইহুদিদের ইসলামের দাওয়াত দিলে তারা তা প্রত্যাখ্যান করে। যুদ্ধের জন্য তারা একজন বীর যোদ্ধাকে ময়দানে নামিয়ে দেয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবাইর ইবনু মুতইম রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তার মোকাবেলায় পাঠান। তিনি চোখের পলকে ইহুদিকে হত্যা করে ফেলেন। আরেকজন বেরিয়ে এলে তিনি তাকেও হত্যা করেন। এরপর তৃতীয়জন নেমে এলে এগিয়ে যান হযরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু। সহজেই তিনি তাকে হত্যা

করে ফেলেন। এভাবে পর্যায়ক্রমে ১১ জন ইহুদি দ্বন্দ্ব যুদ্ধের জন্য নেমে আসে এবং সকলেই পরাস্ত হয়ে পরপারে চলে যায়। প্রতিজন ইহুদির মৃত্যুর পর রাসূল তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেন, কিন্তু তারা প্রতিবারই তা প্রত্যাখ্যান করেন।

নামাযের সময় হয়ে এলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের নিয়ে নামায আদায় করেন। এরপর আবার তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেন, তারা এড়িয়ে যায়, যুদ্ধ চলতে থাকে। সন্ধ্যা হয়ে যায়, আরবের রীতিমতো দুই পক্ষ যার যার শিবিরে চলে যায়।

পরদিন ভোর। মাথার উপর সূর্য কোমল আলো বিলাচ্ছে। রাসূল সাহাবাদের নিয়ে আবারও মাঠে নেমে আসেন। কিন্তু ইহুদিরা তখনও ময়দানে আসার চিন্তা করেনি। একটু পরে তাদের পক্ষ থেকে সন্ধির আবেদন আসে। রাসূল গ্রহণ করে নেন। এরপর চার দিন সেখানে রাসূল অবস্থান করেন। এখান থেকে মুসলমানদের প্রচুর ধনসম্পদ অর্জন হয়। তবে জমি, খেজুরবাগান এবং অন্যান্য ক্ষেতখামার, খাইবারের মতো স্থানীয় ইহুদিদের চুক্তিতে রেখে দেন।

তাইমার স্বেচ্ছাপতন

খাইবার, ফাদাক এবং ওয়াদিল কুরা পতনের খবর চলে যায় আরেক ইহুদিপ্রধান অঞ্চল তাইমায়। তারা কোনো ঝামেলায় না গিয়ে নিজেরাই রাসূলের সাথে সন্ধির প্রস্তাব পাঠায়। রাসূলও সহজে তা মেনে নেন এবং অন্যান্যদের মতো, তাদের সাথেও চুক্তি করে নেন।

তাইমা বিজয়ের পর সফর মাসের শেষ দিকে বা রবিউল আউয়ালের শুরু ভাগে রাসূল মদিনার পথ ধরেন। প্রত্যাবর্তনকালে এক রাতে দীর্ঘ পথ চলার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের নিয়ে এক জায়গায় শিবির স্থাপন করেন। সকলে ক্লান্ত ছিলেন। রাসূল দেখেন রাত অনেক হয়ে গেছে। সকলে এখন ঘুমিয়ে পড়লে ফজর কাজা হবার সম্ভাবনা ছিল। এ সময় রাসূলের মুআযযিন বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু সকলকে ফজরে ডেকে দেবার দায়িত্ব নিয়ে সকলকে ঘুমাতে বলেন। কিন্তু হেলান দিয়ে বসার কারণে বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুরও নিদ্রাভাব এসে যায় এবং তিনি ঘুমিয়ে পড়েন।

ফজর হয়ে যায়। রাসূলের কাফেলার সকলে ঘুমে আচ্ছন্ন। দায়িত্ব নেয়া বেলালেরও

হদিস নেই। সূর্যের প্রথম কিরণ এসে পড়ল রাসূলের মায়াময় মুখাবয়বে। তিনি আতঙ্কিত হয়ে উঠে পড়লেন। প্রথমে বেলালকে জাগিয়ে বললেন, 'কী হলো, বেলাল! দায়িত্ব ছেড়ে ঘুমাচ্ছ যে?' এরপর সকলকে জাগিয়ে দিয়ে বললেন, দ্রুত এ জায়গা ত্যাগ করতে হবে আমাদের। এরপর খানিক সামনে এগিয়ে গিয়ে রাসূল ফজর নামাযের ইমামতি করেন। [১]

গনিমত বণ্টন

খাইবারে অর্জিত জমি মোট ছত্রিশ ভাগে ভাগ করা হয়। প্রতি অংশ ছিল মোট একশো ভাগের সমন্বয়। এতে সবমিলিয়ে জমির ভাগ দাঁড়ায় তিন হাজার ছয়শো ভাগে। সেখান থেকে অর্ধেক তথা আঠারোশো ভাগ দেয়া হয় সাহাবাদের। অন্যান্যদের মতোই এখানে রাসূলের জন্য বরাদ্দ ছিল মাত্র একটি অংশ। তবে নিয়ম হলো, যে-সব জমি সাহাবিদের উপস্থিতি ছাড়াই বিজিত হয়, সেগুলোর মালিকানা হয় কেবলই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের। সুতরাং ফাদাকের মালিকানা ছিল রাসূলের, অন্য কারও অংশ তাতে ছিল না।

আঠারোশো ভাগ সাহাবাদের দিয়ে বাকি অর্ধেক রাসূল প্রশাসনিক কাজের জন্য রাখেন। জাতীয় প্রয়োজন, আকস্মিক দুর্যোগ বা প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা এড়াতে তিনি সে-সব ব্যবহার করবেন বলে মনস্থ করেন। খাইবারে অংশ নিয়েছিল মোট চৌদ্দশ সাহাবা, যারা হাজির ছিলেন হুদাইবিয়াতেও। মূলত খাইবারের বিজয়কে ধরা হয় হুদাইবিয়ার ঘটনার চূড়ান্ত ফলাফল এবং বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক বিচারে সেটা সত্য বলেই প্রতীয়মান হয়।

মোট চৌদ্দশ সেনার ভেতর ঘোড়সওয়ার ছিলেন দুইশো জন। প্রতি ঘোড়ার জন্য নির্ধারিত হতো দুই অংশ। সে হিসেবে দুইশো জনে নিয়ে নেন ছয়শো ভাগ আর বাকি বারোশো ভাগ বারোশো পদাতিক একেক ভাগ করে নিয়ে নেন।

হাবাশা থেকে আগত জাফর ইবনু আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং তার অন্যান্য সাথিদেরও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গনিমতের অংশ দেন। অংশ দেন মদিনা থেকে আগত সাহাবি হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তার সঙ্গীদেরও। তবে এরা ব্যতীত যুদ্ধে শরিক না হওয়া অন্য কাউকে

[১] তবে এ ঘটনার বেশকিছু বর্ণনা বিচার করলে মনে হয়, এ ঘটনা অন্য কোনো সফরেও হতে পারে

রাসূল গনিমতের কোন অংশ দেননি।

প্রভাব

ইহুদিরা মুসলমানদের হাতে শক্তভাবে দমন হলে পুরো আরব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভয়ে তটস্থ হয়ে পড়ে। দীর্ঘদিন রাসূল ও ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত এ গোষ্ঠীর যবনিকাপাতে ইসলাম তার অগ্রযাত্রা আরও বেগবান করে। খাইবার জয়ে আরব উপদ্বীপে ইহুদিরা যেমন কোণঠাসা হয়ে পড়ে, তেমনি ইসলাম সেখানে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাময়িকভাবে আরও শক্তিশালী হিসেবে আবির্ভূত হয়।

এর আগে মুসলমানরা কখনো পেট পুরে খেতে পারেননি। খাইবার বিজয়ের ফলে তাদের অভাব মোচন হয়ে যায়। মুহাজির সাহাবিরা নতুন করে ক্ষেত ও খেজুরবাগানের মালিক হওয়ার ফলে আনসারি সাহাবিদের সম্পত্তি ফিরিয়ে দেন। এভাবে ক্রমান্বয়ে আরবের মাটিকে ইসলাম অন্যতম প্রাসঙ্গিক শক্তি হয়ে দাঁড়ায়। দৈন্য, দুর্দশা এবং আর্থিক প্রতিকূলতা কাটিয়ে মুসলমানরাও আরও সবল হয়ে ওঠেন।

মক্কা বিজয়
CONQUEST OF MECCA

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে মুশরিকদের দখল থেকে পবিত্র শহর মক্কা অধিকারের ঐতিহাসিক ঘটনা। ঘটনাটি সংঘটিত হয় ৮ম হিজরির (৬৩০ খ্রি.) ২০শে রমজান। ইতিপূর্বে রাসূল মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেছিলেন; মূলত তাঁর হিজরত ছিল নিজস্ব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মূলমন্ত্র এবং বিজয়ীর বেশে মক্কায় পুনর্বার ফিরে আসার সকৌশল সূচনাকর্ম।

ঘটনার অনুঘটক

হুদাইবিয়ার সন্ধির অল্প কিছুদিন পরেই ইসলাম ব্যাপকহারে প্রসারিত হতে শুরু করে, যা কুরাইশদের শঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তারা দেখতে পায়, এভাবে চলতে থাকলে মক্কা ও তার দক্ষিণাঞ্চলের সকল গোত্রগুলো অচিরেই ইসলাম গ্রহণ করে ফেলবে। তাই তায়েফের সাকিফ গোত্র এবং হুনাইনের হাওয়াজিন গোত্রদ্বয়ের সাথে জোটবদ্ধ হয়ে তারা মদিনা আক্রমণের ছক কষতে থাকে। কিন্তু রাসূলের সাথে হুদাইবিয়াতে ১০ বছরের এই চুক্তিবদ্ধ হবার কারণে, তারা কোনো সুবিধা করতে পারছিল না। নিজেদের দুরাভিলাষ বাস্তবায়নে তাই রাসূলের সাথে সন্ধি ভঙ্গ করা ছাড়া তাদের কোনো উপায় ছিল না।

হুদাইবিয়ার সন্ধির অন্যতম একটি ভিত ছিল এই যে, আজকের পর কেউ মুসলমানদের চুক্তিতে যেতে চাইলে যেতে পারবে; তেমনি কেউ কুরাইশের মিত্র হতে চাইলে সেও তা হতে পারবে। সে-মতে 'খুযাআ' গোত্রটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চুক্তিতে দাখিল হয় এবং 'বনু বকর' নামক গোত্রটি কুরাইশদের চুক্তিভূক্ত হয়ে যায়। ঘটনাক্রমে নতুন করে চুক্তিবদ্ধ এ-দুটি গোত্রের মাঝে প্রাচীন আমল থেকে যুদ্ধবিগ্রহ চলমান ছিল। ঐতিহাসিকভাবে যার শুরু

অনেকটা এভাবে যে, ইসলামের আবির্ভাবের বহুকাল পূর্বে বনু হাদরামি গোত্রের জনৈক ব্যক্তি বসবাসের উদ্দেশ্যে খুযাআ গোত্রের এলাকা দিয়ে যাওয়ার সময় অজানা কারণে খুযাআ গোত্রের লোকেরা তাকে হত্যা করে ফেলে। এরপর বনু বকরের লোকেরা প্রতিশোধস্বরূপ খুযাআ গোত্রের এক ব্যক্তিকে হত্যা করে। এর জবাবে আবার খুযাআ গোত্রের লোকেরা বনু বকরের একাংশ বনু দায়েলের সরদার আসওয়াদের তিন সন্তান সালমা, কুলসুম ও যুবাইরকে হারাম শরিফের সীমানার কাছে নির্দয়ভাবে হত্যা করে ফেলে। তখন থেকেই বনু দায়েল তথা বনু বকরের সাথে বনু খুযাআর বিরোধ চলে আসছিল, যা ইসলামের আবির্ভাবের ফলে অনেকটাই স্তিমিত হয়ে যায়। কিন্তু হুদাইবিয়ার সন্ধির পর আবার বনু বকর পুরনো ঝাল মেটানোর সুযোগ খুঁজতে থাকে।

এরই জের ধরে একদিন বুন দায়েল পরিবারের প্রধান নাওফেল ইবনে মুয়াবিয়া বনু খুযাআ গোত্রের মুনাব্বিহ নামক এক ব্যক্তিকে ওয়াতির নামক জলাশয়ের নিকট ঘুমন্ত অবস্থায় হত্যা করে। এতে পূর্বশত্রুতা আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে এবং দুই গোত্রে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হয়। তারা ভেবেছিল, রাসূল এ ঘটনার কিছুই জানতে পারবেন না; তাঁর অগোচরে রাতের আঁধারে খুযাআ গোত্রের সকলকে হত্যা করে এ ঘটনাকে কোনো আততায়ী বা ডাকাতদলের নামে চালিয়ে দিবে। তাই কুরাইশরাও তাদেরকে অস্ত্র ও জনবল দিয়ে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করে। বৃহৎ শক্তির সমর্থন পেয়ে এক রাতে তারা খুযাআ গোত্রে অতর্কিত হামলে পড়ে। এই হামলায় তারা সে-গোত্রের প্রায় বিশজন পুরুষকে নির্মমভাবে হত্যা করে ফেলে।

ঘটনার আকস্মিকতায় খুযাআ গোত্রের লোকেরা প্রাণে বাঁচতে হারাম শরিফের সীমানায় আশ্রয় নিলেও নির্দয় বনু বকরের লোকেরা সেখানেও ঢুকে পড়ে এবং তাদেরকে হারাম শরিফে ফেলেই নির্মমভাবে হত্যা করে।

এই ঘটনার পর খুযাআ গোত্রের আমর ইবনে সালিম, বনু কাব গোত্রের এক ব্যক্তিসহ মোট ৪০ জন উষ্ট্রারোহীকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে সব ঘটনা বিবৃত করেন এবং মিত্র হিসেবে তাঁর সাহায্যের আবেদন জানান। রাসূল তাদেরকে সাহায্য করা হবে বলে আশ্বাস দেন এবং তখনই মক্কা বিজয়ের ব্যাপারে মনস্থির করেন। খুযাআর লোকেরা রাসূলের সাহায্যের প্রতি বিশ্বাস রেখে মক্কায় ফিরে যায়। এরপর রাসূল এই হত্যাকাণ্ডের কঠোর প্রতিবাদ জানিয়ে একটি পত্র লেখেন এবং তিনটি শর্তারোপ করে কুরাইশদের কাছে একজন দূত প্রেরণ করেন। কথা ছিল এই শর্তত্রয়ের যেকোনো একটি মেনে নিতে হবে।

শর্তত্রয় ছিল:

১. খুযাআ গোত্রের নিহতদের রক্তপণ শোধ করতে হবে।

২. অথবা কুরাইশকর্তৃক বনু বকরের সাথে মৈত্রীচুক্তি বাতিল ঘোষণা করতে হবে।

৩. নতুবা স্পষ্ট করে এই ঘোষণা দিতে হবে যে, হুদাইবিয়ার সন্ধি বাতিল করা হয়েছে এবং কুরাইশরা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত আছে।

কুরাইশদের পক্ষ হতে কারতা বিন উমর চরম নির্বুদ্ধিতা হেতু তৃতীয় শর্তটি গ্রহণ করে নেয়। পরবর্তীকালে তারা অবশ্য এর জন্য চূড়ান্ত অনুতপ্ত হয়েছিল। এভাবেই কুরাইশদের শঠতা, হঠকারিতা এবং নির্বুদ্ধিতার কারণে হুদাইবিয়ার সন্ধি টুটে যায় এবং মক্কা বিজয়ের সূচনা ঘটে।

সন্ধি নবায়নের প্রচেষ্টা

প্রকৃতপক্ষে সন্ধিচুক্তি অগ্রাহ্য করে বনু বকরকে সহযোগিতা করাটাই ছিল কুরাইশদের জন্য প্রচণ্ড গর্হিতকর্ম। আর চুক্তি বাতিলের সিদ্ধান্তটিও যে তদনুরূপ আহমকি আর নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক হয়েছে, কুরাইশ নেতারা তা অচিরেই উপলব্ধি করতে শুরু করে। তাই তারা চুক্তি নবায়নের জন্য শীঘ্রই তাদের নেতা ও গোত্রপ্রধান আবু সুফিয়ানকে মদিনায় যেতে পীড়াপীড়ি করতে থাকে। আবু সুফিয়ান কাজটি সহজে আদায় করে নেয়ার লক্ষ্যে প্রথমেই তার কন্যা উম্মে হাবিবার গৃহে যায়। উম্মে হাবিবা ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের একজন। কিন্তু উম্মে হাবিবার গৃহে যেয়ে আবু সুফিয়ান কোনো সুবিধা করতে পারেননি; এমনকি আম্মাজান উম্মে হাবিবা তাকে বসতেও দেননি। কারণ হিসেবে উম্মে হাবিবা তাকে বলেন, 'তার গৃহের এ বিছানাটি আল্লাহর রাসূলের। পিতা হিসেবে আবু সুফিয়ান শ্রদ্ধেয় হলেও মুহাম্মদের বিছানায় একজন নাপাক মুশরিক বসুক—এটা সে একদমই চায় না।' আবু সুফিয়ান এতে মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে বেরিয়ে মেয়ের ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। এরপর রাসূলের কাছে সে সন্ধি নবায়নের প্রস্তাব পেশ করলে রাসূল সরাসরি তাকে কোনো উত্তর দেননি। এরপর সে একে একে আবু বকর, উমর এবং সবশেষে আলির কাছে সুপারিশের জন্য যায়। আবু বকর ও উমর তাদের অপারগতার কথা প্রকাশ করেন এবং হযরত আলি তামাশা করে বলেন যে, 'আপনি কারও উত্তরের অপেক্ষা না করে মদিনার মসজিদে নববিতে

তার প্রস্তাবের কথা ঘোষণা করে চলে যান।' উপায়ন্তর না দেখে আবু সুফিয়ান তা-ই করে এবং ব্যর্থ মনে মক্কায় ফিরে যায়। গাছের গোড়া কেটে গিয়ে ওপরে পানি ঢালার মতো কুরাইশদের সন্ধি নবায়নের এই প্রচেষ্টা পুরোপরি নিষ্ফল হয়ে যায়।

মূলত হুদাইবিয়ার সন্ধির মাধ্যমে যে বিজয়ের সূত্রপাত হয়েছিল তারই চূড়ান্ত রূপই ছিল মক্কা বিজয়। রাসূল জানতেন, মুশরিকদের পক্ষে সন্ধিচুক্তিগুলো বেশিদিন মেনে চলা সম্ভব হবে না। সে-জন্যই সন্ধির পরবর্তী বছর তিনি ২০০০ সাহাবা নিয়ে মক্কায় উমরাতুল ক্বাযা পালন করতে এসেছিলেন। এত বিপুল সাহাবিদের সাথে আনার একটা বড় উদ্দেশ্য ছিল, মক্কাবাসীদের মনে মুসলমানদের ভয় ঢুকিয়ে দেয়া এবং এ-সময়ই তিনি মক্কার কুরাইশদের মধ্যে প্রবল নেতৃত্বশূন্যতা এবং ভীতির ভাব লক্ষ করেন। তাদের ক্ষাত্রশক্তির সঠিক পরিমাপ করতে পেরেছিলেন বলেই তখন থেকে তিনি অধীর হয়ে ছিলেন মক্কা বিজয়ের জন্য। এর ১ বছরের মাথায়ই চুক্তি ভঙ্গের এমন ঘটনার প্রেক্ষিতে আজ তিনি তা সম্পন্ন করার জন্য বের হয়েছেন।

কাফেলা প্রস্তুত হলো

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা অভিমুখে রওনা করার জন্য গোপনে বাহিনী প্রস্তুত করতে লাগলেন। জুহাইনা, বনু গিফার, মুযাইনা, আসাদ, কাইস ও বনি সালিম গোত্র এবং আনসার ও মুহাজির সাহাবা মিলে বিরাট কাফেলা তৈরি হয়ে গেল। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর কাছে দুআ করে বলেন: 'হে আল্লাহ, কুরাইশদের গুপ্তচর ও সংবাদবাহকদের নিবৃত্ত রাখুন, যাতে আমরা তাদের শহরে অকস্মাৎ উপস্থিত হতে পারি।' [১]

রাসূল কাউকে বলেননি, কোথায় অভিযানে বের হবেন; কোন দিক দিয়ে শুরু করবেন বা কাদের শহরে দাখিল হবেন। এমনকি তাঁর ঘনিষ্ঠ সহচর আবু বকর বা তাঁর স্ত্রীদেরকেও কিছু জানাননি। তবে এত গোপনীয়তার পরও একটি উপায়ে তা প্রায় প্রকাশিত হয়ে পড়েছিল। সাহাবি হাতেব ইবনু আবি বালতাআ একটি চিরকুট লিখে এক মহিলার সাথে কুরাইশদের কাছে পাঠিয়ে দেয়; তিনি কুরাইশদেরকে রাসূলের ইচ্ছে সম্পর্কে অবহিত করে দিচ্ছিলেন। মহিলাকে তিনি বলে রেখেছিলেন, চিরকুটটি যেন তার চুলের খোঁপায় গুঁজে রাখে, যাতে কারও নজরে না পড়ে। কিন্তু

[১] *সিরাতে ইবনে হিশাম: ৫/৫২,*

হাতেবের এ কর্মকাণ্ড সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ওহি অবতীর্ণ হয়। রাসূল ঘটনা জানতে পেরে হযরত আলি ইবনু আবি তালিব এবং যুবাইর ইবনুল আওয়ামকে মহিলার পেছনে পাঠান। মহিলা মক্কা পৌঁছার আগেই রওজায়ে খাখ নামক স্থানে তারা তাকে ধরে ফেলেন এবং তার চুলের খোঁপায় চিরকুটটি তালাশ করেন।

এদিকে রাসূল যখন হাতেব ইবনু আবি বালতাআকে ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন, তাকে এমন কাজের জন্য তিরস্কার করলেন; হাতেম তখন অনুনয় করে বলেন, ধর্মত্যাগী হয়ে আমি এ-কাজ করি নি, ইয়া রাসূলুল্লাহ! বরং আমায় ভয় হয়েছিল—যদি আপনি যে-কোনো কারণে মক্কা অভিযানে ব্যর্থ হন—তাহলে মক্কায় থাকা আমার পরিবারের সাথে কী ঘটবে!

পাশেই বসে ছিলেন হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু। পুরো ঘটনা জেনে তিনি বললেন: 'ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমাকে অনুমতি দিন, এখনই এই মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দিই।' রাসূল বললেন: 'সে বদরপ্রান্তরে আমার সাথে হাজির ছিল; তুমি কি জানো, আল্লাহ তাআলা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের ব্যাপারে অবহিত আছেন; তাই তো তিনি বলেছেন: তোমরা যা খুশি করো, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি।'[১] হাতেব ইবনু আবি বালতাআ রাদিয়াল্লাহু আনহুও রাসূলের সাথে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, অতএব তাকেও আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ক্ষমা করে দিয়েছেন।

সেনাদের মদিনা ত্যাগ

হিজরি ৮ম বর্ষের রমজান মাসের ১০ তারিখ মুসলিম সেনাদল মক্কার উদ্দেশে মদিনা ত্যাগ করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেতৃত্বে সে বাহিনীতে ছিল দশ হাজার সাহাবা। যাবার আগে রাসূল আবু যর গিফারি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে মদিনাতে নিজের স্থলাভিষিক্ত করে যান। মুসলিম বাহিনীর সকলে রোযা রেখেছিলেন। চলতে চলতে মক্কার অনতিদূরে কুদাইদ বা উসফান এলাকায় গিয়ে তারা ইফতার সেরে, মাগরিবের নামায আদায় করে আবার রওনা করেন। একেবারে মক্কার উপকণ্ঠে 'মাররে যাহরান' নামক স্থানে পৌঁছে রাসূলের নির্দেশে মুসলিম বাহিনী তাঁবু স্থাপন করে।

[১] *বুখারি*: ৪০২৫

মক্কার অদূরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেতৃত্বে সাহাবারা তাঁবু ফেলে বসে আছেন। মক্কায় প্রবেশের আগের রাতে যুদ্ধকৌশলের অংশ হিসেবে রাসূলের নির্দেশে প্রতিজন সেনা তাদের তাঁবুর সামনে এককেটা অগ্নিচুল্লি স্থাপন করে; একই সাথে দূর থেকে প্রায় দশ হাজার অগ্নিশিখা পরিলক্ষিত হয়। এতে পুরো উপত্যকা আলোকিত হয়ে যায়। আবু সুফিয়ান রাসূলের চাচা আব্বাসের সাথে রাতে পায়চারি করতে বের হলেন। তাকে বেশ চিন্তিত দেখাচ্ছে। আব্বাস জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছে, আবু সুফিয়ান? মুহাম্মদকে নিয়ে চিন্তা করছ?' আবু সুফিয়ান বলেন, 'আমাদের বিরাট ভুল হয়েছে এভাবে মুহাম্মদকে উস্কে দেয়া। যে-করেই হোক, এর একটা সমাধা যে করতেই হয়!' এভাবে চলতে চলতে তারা একটি পাহাড়ের টিলায় এসে দাঁড়ালেন। দূরে একসাথে জ্বলে অসংখ্য আগুন। আবু সুফিয়ান অবাক হয়ে গেলেন। জানতে চাইলেন, 'আব্বাস, এরা আবার কারা? আগে তো এত বড় কোনো গোত্র মক্কায় দেখিনি!' আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু ততদিনে গোপনে মুসলমান হয়ে গেছেন। তিনি জানতেন, রাসূল আসবেন। ওখানে মুসলমানরা শিবির ফেলেছে, সে-খবরও তার অজানা নয়। সুযোগ বুঝে তিনি আবু সুফিয়ানকে বললেন, 'ওটা মুসলমানদের শিবির। ঐ আগুনগুলো মুহাম্মদের বাহিনীর তাঁবুগুলোর সামনে জ্বলছে।'

মূলত আবু সুফিয়ানকে ভড়কে দেবার জন্যই রাসূল আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে পরামর্শ করে এই কৌশল করেছিলেন। আবু সুফিয়ান সত্যিই ভয় পেয়ে গেলেন। বললেন, 'এতগুলো আগুন যদি একসাথে জ্বালানো থাকে, তাহলে তার বাহিনী তো অনেক বড় হবার কথা।' আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'আমিও তাই ভাবছি। আমাদের বুঝি মুহাম্মদের হাত থেকে বাঁচার কোন উপায় বাকি নেই। চলো তার সাথে দেখা করে কোন একটা সুরাহায় পৌঁছি; নতুবা সে এই বাহিনী নিয়ে মক্কায় হামলে পড়লে, একসাথে আমাদের সকলের শির কাটা যাবে।' আবু সুফিয়ানের কপালের ভাঁজ ক্রমশ গাঢ় হতে লাগল।

এরপর রাত আরও খানিক গভীর হয়ে আসে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'যুহফা' নামক স্থানে গেলে চাচা আব্বাস ইবনু আবদিল মুত্তালিবের সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়। তিনি তার পরিবারবর্গসহ ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং হিজরতের উদ্দেশ্যে বের হয়েছেন। আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাদা খচ্চরটিতে আরোহণ করেছিলেন। তিনি এমন কাউকে খুঁজছিলেন, যার মাধ্যমে কুরাইশের কাছে মদিনার বাহিনী আগমনের

সংবাদ পৌঁছানো যায়, যাতে তারা এই বাহিনী মক্কা প্রবেশের পূর্বেই অনতিবিলম্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিরাপত্তা তলব করে।

এমন সময় কাকতালীয়ভাবে আবু সুফিয়ানের সাথে পথে তার দেখা হয়ে যায়। আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে সাথে করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে যান। সেখানে রাসূলের সাথে দীর্ঘ আলাপচারিতার পর আবু সুফিয়ান ইসলাম গ্রহণ করে নেন। এরপর আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন: 'আবু সুফিয়ান সবসময় গর্ব করতে পছন্দ করে; এমন আনন্দের মুহূর্তে তাকে এমন কোনো সম্মান দিন, যা নিয়ে সে গর্ব করতে পারে।' এ-কথা শুনেই রাসূল বললেন: 'যে-কেউ আবু সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ। যে অস্ত্র ফেলে দেবে, সে নিরাপদ; আর যে তার ঘরের খিঁল আটকে দিবে, সে-ও নিরাপদ।'[১]

বিজয়ের মাহেন্দ্রক্ষণ

ইসলাম গ্রহণ করে নিলেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু সুফিয়ানকে মুসলমানদের শক্তিমত্তা দেখাতে চাচ্ছিলেন, যাতে সে মনে মনেও মুসলমানদের সাথে যুদ্ধের কথা চিন্তা করতে না পারে। তাই রাসূল তাকে পাহাড়ের সরু পথের কিনারে দাঁড় করালেন এরপর প্রদর্শনীর মতো করে মুসলমানদের প্রত্যেক গোত্রকে তাদের পতাকা হাতে হেঁটে যেতে বললেন। তারা হেঁটে গেলে রাসূল তাঁর বিশেষ সবুজ বাহিনী নিয়ে মার্চ করলেন। এ-সব দেখে আবু সুফিয়ানের মুসলিম বাহিনীর শক্তি ও সামর্থ্য আন্দাজ করতে বেগ পেতে হলো না। তিনি বললেন: 'এদের সাথে মোকাবেলা করার শক্তি-সাহস, আসলেই কারুর নেই।'

এরপর আবু সুফিয়ান দ্রুত মক্কায় ফিরে এলেন। উচ্চকণ্ঠে ডেকে ডেকে বললেন: 'হে কুরাইশ গোত্রবাসী, মুহাম্মদ তোমাদের ঘাড়ের উপর নিঃশ্বাস নিচ্ছে, তার মোকাবেলা করার ক্ষমতা তোমাদের নাই। যে আমার ঘরে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ; যে তার দরোজার খিল আটকে দিবে, সে নিরাপদ; আর যে মসজিদে ঢুকে যাবে, সে-ও নিরাপদ।' আবু সুফিয়ানের এমন এলান শোনামাত্রই লোকেরা হুড়মুড় করে তাদের ঘরে ও মসজিদে আশ্রয় নিতে শুরু করে। দরোজা লাগিয়ে দিয়ে ছিদ্র ও ফাটল দিয়ে কৌতূহলী চোখে চেয়ে থাকে মুসলিম বাহিনীর দিকে।

[১] *মুসলিম:* ১৭৮০, *আবু দাউদ:* ৩০২১, *নাসায়ি:* ১১২৯৮, *মুসনাদে আহমাদ:* ৭৯০৯

মুসলিম বাহিনীর মক্কায় প্রবেশ

মক্কা ইব্রাহিমীয় উপত্যকায় অবস্থিত, যা প্রায় ১০০০ ফিট উঁচু অসমতল পাহাড় দ্বারা পরিবেষ্টিত। পাহাড়গুলোর খাদের মাঝ দিয়ে চলে গেছে ছোট-বড় প্রায় চল্লিশটি প্রবেশপথ। এগুলো উত্তর-পশ্চিম, দক্ষিণ-পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তর-পূর্ব দিক হয়ে শহরে ঢুকে গেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাই মুসলিম সেনাবাহিনীকে চারটি সারিতে বিভক্ত করেন, যেগুলোর প্রত্যেকটি এক এক দিক দিয়ে অগ্রসর হবে। রাসূল নিজে যে সারিতে উপস্থিত ছিলেন, তার নেতৃত্ব দেন আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ। এই দল মদিনার প্রধান প্রবেশপথের মধ্য দিয়ে আজাখিরের নিকটবর্তী উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে মক্কায় প্রবেশ করবে বলে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। দ্বিতীয় সারির নেতৃত্ব দেন যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু; এই সারিটি দক্ষিণ-পশ্চিম দিক হতে কুদা পাহাড়ের পশ্চিমের একটি পথ দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করবে বলে কথা হয়। দক্ষিণ দিক হতে কুদাইরের মধ্য দিয়ে প্রবিষ্ট সারিটি রাসূলের চাচাতো ভাই আলির নেতৃত্বাধীন ছিল। বাহিনীর সর্বশেষ সারিটি ছিল হযরত খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের[১] নেতৃত্বাধীন, যা খান্দামা ও লাইসের মধ্য দিয়ে উত্তর-পূর্ব দিক হয়ে প্রবেশের জন্য এগিয়ে যায়।

রাসূলের রণকৌশলটি ছিল একই সময়ে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য হিসেবে মক্কাকে কেন্দ্র করে চারদিক থেকে অগ্রসর হওয়া। এর ফলে শত্রুপক্ষের শক্তি ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়বে এবং অগ্রসরমাণ কোনো সারির দিকেই তারা আলাদাভাবে বিশেষ মনোযোগ দিতে পারবে না। এই কৌশলের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল, যদি একটি বা দুটি আক্রমণকারী সারি প্রবল বাধার সম্মুখীনও হয় এবং সেই বাধা ভাঙতে অক্ষম হয়ে পড়ে, তবুও অন্য পাশের সারিগুলো থেকে আক্রমণ চালিয়ে নেয়া যাবে। পাশপাশি এই কৌশলে সবগুলো পথ আটকে যাবার ফলে কুরাইশদের পালিয়ে যাওয়াকেও রোধ করা সম্ভব হবে।

কুরাইশরা আক্রমণ না করলে যুদ্ধ হতে বিরত থাকার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। মুসলিম সেনাবাহিনী রবিবার ১১ ডিসেম্বর ৬২৯ সালে মক্কায় প্রবেশ করে (১৮ রমজান ৮ হিজরি)। খালিদের সারি ছাড়া বাকি তিনটি সারির প্রবেশ ছিল শান্তিপূর্ণ ও একেবারেই রক্তপাতবিহীন। ইকরিমা ইবনে আবি জাহল তার মতো আরও কিছু কট্টর মুসলিম-বিরোধী কুরাইশ

[১] হুদাইবিয়ার সন্ধির পর তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।

যোদ্ধাদের একটি দলকে একত্র কর খালিদের সারির মুখোমুখি প্রেরণ করে। তারা মুসলিম সেনাদের তলোয়ার ও বর্শা দ্বারা আক্রমণ করলে মুসলিমরা সে আক্রমণ প্রতিরোধ করেন। একটি স্বল্পকালীন খণ্ডযুদ্ধের পর ১২ জন কুরাইশ সেনা নিহত হলে কুরাইশরা মুসলিমদের প্রবেশের জন্য পথ ছেড়ে দেয়। পাশাপাশি এখানে মুসলিমদের ২ জন সেনাও শাহাদাত বরণ করেন।

এদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শহরের উঁচু ও প্রধান ফটক হয়ে মক্কায় দাখিল হন; তিনি মুখে তখন উচ্চারণ করছিলেন:

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا

> *'নিশ্চয়ই আমি তোমাকে দান করেছি, সুস্পষ্ট বিজয়।'*[১]

রাসূলের শক্তি ও গাম্ভীর্যের সামনে পুরো মক্কা নত হয়ে আসে। সাহাবারা শহরের দিকে দিকে মার্চ করতে থাকেন, উল্লাসে উল্লাসে মুখর করে তোলেন পুরো শহর। তাদের কণ্ঠনিঃসৃত 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি যেন আকাশ ছুঁয়ে যাচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হারামের দিকে এগোলেন, কাবা তাওয়াফ করলেন, চারপাশে সারিবদ্ধ সাজিয়ে রাখা মূর্তিগুলো ভেঙে ফেলার নির্দেশ দিলেন; নির্ভরযোগ্য বর্ণনামতে যার সংখ্যা ছিল ৩৬০টি। রাসূল মূর্তিগুলোকে লাঠি দ্বারা খোঁচা দিতে দিতে বলতে লাগলেন:

جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَٰطِلُ إِنَّ ٱلْبَٰطِلَ كَانَ زَهُوقًا

> *'সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয় মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল।'*[২]

এরপর তিনি উসমান ইবনু তালহাকে ডাকালেন, তার কাছ থেকে কাবাঘরের চাবিটি নিলেন এবং ঘরটি খোলার নির্দেশ দিলেন। খুলে দেয়া হলে তিনি ভেতরে প্রবেশ করে নামায আদায় করলেন। কুরাইশরা তখন সন্ত্রস্ত মনে কাতারবদ্ধ হয়ে বাইরে অপেক্ষমাণ, কী ঘটবে তাদের সাথে—আতঙ্ক সবার মনে। রাসূল নামায শেষ করে বের হয়ে এলেন। সমবেত জনতাকে লক্ষ করে বললেন: 'আল্লাহ ছাড়া

[১] সূরা ফাতহ: ০১

[২] সূরা ইসরা: ৮১

কোনো উপাস্য নেই। তার কোনো সহকারী নেই। তিনি তার অনুগতর কাছে করা অঙ্গীকার পূর্ণ করেছেন, তাকে সাহায্য করেছেন এবং তার সকল প্রতিপক্ষকে পরাজিত করেছেন। মনে রেখো, কাবাঘরের অভিভাবকত্ব ও মক্কায় তীর্থযাত্রীদের পানি সরবরাহকারী ছাড়া সকলের বংশ বা সম্পদ সম্পর্কিত জাত্যাভিমানের দাবি বাতিল করা হল। মনে রেখো, যে হত্যা করবে, তার রক্তপণ হবে ১০০ উট। হে কুরাইশের লোকসকল, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের কাছ থেকে অজ্ঞতাযুগের সকল অহংকার এবং তোমাদের পূর্বপুরুষ-সম্পর্কিত সকল গরিমা রহিত করেছেন, কারণ সকল লোকই আদমের উত্তরসূরি, আর আদম আলাইহিস সালাম ছিলেন মাটির তৈরি।'

এরপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন:

'হে কুরাইশগণ, তোমাদের প্রতি আমার কী রকম আচরণ করা উচিত বলে তোমরা মনে কর?'

তারা বলল, 'করুণা, হে আল্লাহর নবী। আমরা আপনার কাছ থেকে ভালো ছাড়া কিছুই আশা করি না।'

এ-কথা শুনে রাসূল ঘোষণা করলেন:

'আমি তোমাদের ঠিক তা-ই বলব, যা নবী ইউসুফ আলাইহিস সালাম তার ভাইদেরকে বলেছিলেন। আজ তোমাদের প্রতি আমার কোন অভিযোগ নেই; তোমরা যেতে পারো, কারণ তোমরা মুক্ত।'[১]

মক্কাবাসীর আত্মসমর্পণের পর রাসূলের সম্মান বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। আরব অঞ্চল হতে সকল কূটনৈতিক প্রতিনিধিগণ তাকে স্বীকৃতি দিতে মদিনায় আসেন। দলে দলে লোকেরা ইসলামের প্রতি ঝুঁকতে থাকে। মক্কার বহু গোত্র, যারা ইসলামের সত্যতা পূর্বেই বুঝতে পেরেছিল, কিন্তু কুরাইশদের নির্যাতনের ভয়ে মুখ ফুটে কখনো বলেনি—তারা সকলে একে একে ইসলামের প্রতি আনুগত্যের প্রকাশ্য ঘোষণা দিতে শুরু করে।

এতটা শান্তিপূর্ণ প্রবেশ এবং নিঃশর্ত ক্ষমা ঘোষণার পরও বিশেষ কারণে দশজন

---

[১] সুরা ইউসুফ: ৯২; *আস-সুনানুল কুবরা:* বাইহাকি ১৮৭৩৯, *সিরাতে ইবনু হিশাম:* ২/৪১১, *যাদুল মাআদ:* ইবনুল কায়্যিম ৩/৩৫৬, *আর-রাওদুল উনুফ:* সুহাইলি ৪/১৭০, *সিরাতে ইবনু কাসির:* ৩/৫৭০, *ফাতহুল বারি:* ইবনু হাজার ৮/১৮

লোককে মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ দেয়া হল: ইকরিমা ইবনে আবু জেহেল, আবদুল্লাহ ইবনে সাদ ইবনে আবি সারহ, হাবার ইবনে আসওয়াদ, মিক্বাস সুবাবাহ লাইসি, হুয়াইরাস বিন নুকাইদ, আবদুল্লাহ হিলাল ও চারজন মহিলা; যারা হত্যা বা গুরুতর কোনো অপরাধের দায়ে দোষী ছিল, বা কোনোভাবে যুদ্ধ উস্কে দিয়েছিল অথবা মুসলিম বাহিনীর প্রবেশকালে কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছিল।

তবে দণ্ডপ্রাপ্ত সকলকে হত্যা করা হয়নি। ইকরিমা ইসলাম গ্রহণ করে বেঁচে যান এবং ভবিষ্যৎ যুদ্ধে মুসলিম পদবিতে যুদ্ধ করে ধন্য হন। দুইজন গায়িকাকে রাসূল আইন অমান্যের দায়ে অভিযুক্ত করেন। তাদের একজনকে হত্যা করা হয় কিন্তু অপরজন ইসলাম গ্রহণের কারণে মুক্তি পায়। আবদুল্লাহ ইবনে সাদ উসমান ইবনে আফফানের সুপারিশে নিরাপত্তা পায়; কিন্তু প্রাথমিকভাবে সে মুহাম্মদের আনুগত্য মেনে নিতে অস্বীকার করে। তবুও রাসূলের জারিকৃত আদেশকে ভুল বোঝার কারণে প্রত্যক্ষদর্শীরা তাকে হত্যা না করে ছেড়ে দেয়।

বর্ণিত আছে, এ সময় এক ব্যক্তি কাঁপতে কাঁপতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে এসে হাজির হয়। রাসূল তার বিচলিত হাল দেখে বলেন, 'শান্ত এবং নিশ্চিন্ত হও। আমি কোনো রাজা-বাদশাহ নই, বরং আমি এক সাধারণ মহিলার সন্তান।'

এই বলে তিনি কাবার চাবি পুনরায় উসমান ইবনু তালহার হাতে ফিরিয়ে দিলেন। বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, 'কাবার ওপরে উঠে আজান দাও।' ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কী আশ্চর্য ক্ষমার ঘোষণা! দীর্ঘদিনের জমানো প্রতিশোধের বদলে কী সুন্দর মহানুভবতা! বেশি দূরে যাই কেন—স্মরণ করুন, আমাদের এই উত্তরাধুনিক শতাব্দীতে সংঘটিত দুই বিশ্ব যুদ্ধে, বিজয়ী দল পরাজিতদের সাথে কী নির্মম আচরণ করেছিল। যে শতাব্দীকে আমরা সভ্যতা ও মানবতার শতাব্দী বলি(!) তাকান সে সভ্য শতাব্দীর দিকে, তাহলেই ইসলাম আর কুফরের পার্থক্য বিবেকবান সকলের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে।

বিজয়ের পর

মক্কা বিজয়ের দ্বিতীয় দিন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে তাঁর সেই প্রসিদ্ধ খুতবাটি দিলেন। তিনি সেখানে বলেন: 'যেদিন আল্লাহ সমুদয় আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন, সেই দিন থেকেই তিনি মক্কা নগরীতে (রক্তপাত) হারাম করেছেন। তাই কিয়ামাত দিবস পর্যন্ত এখানে (রক্তপাত) হারাম থাকবে,

আল্লাহ্ হারাম করেছেন বিধায়। আমার পূর্বে কারও জন্য তা হালাল করা হয়নি, আমার পরেও কারও জন্যও তা হালাল করা হবে না। আর আমার ক্ষেত্রেও মাত্র সামান্য সময়ের জন্যই তা হালাল করা হয়েছিল। এখানকার শিকারযোগ্য প্রাণীকে বিতাড়িত করা যাবে না, এ-জমিনের ঘাস কাটা যাবে না, কাঁটা তোলা যাবে না; বিজ্ঞপ্তির উদ্দেশ্য ব্যতীত এখানকার রাস্তায় পতিত বস্তু উত্তোলন করা যাবে না।[১]

রাসূলের খুতবা শেষ হলে ছোট-বড়, নারী-পুরুষ দলে দলে সকলে এসে তাঁর হাতে ঈমান ও শাহাদাতের (আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই বলে আন্তরিক সাক্ষ্য প্রদান) বাইয়াত গ্রহণ করে। পুরুষদের বাইয়াত গ্রহণ শেষে তিনি যখন মহিলাদের বাইয়াত গ্রহণ করেন, তখন তিনি সাফা পাহাড়ে ছিলেন। তাঁর নিচেই বসে ছিলেন হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু। এ-সময় মহিলারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বাইয়াতবদ্ধ হয় এই মর্মে যে, তারা আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, তাদের সন্তানদের হত্যা করবে না, কোনো মহিলার ব্যাপারে তাদের হাত ও পায়ের মধ্যকার বিষয় নিয়ে মিথ্যে অপবাদ দেবে না এবং ন্যায় ও পুণ্যকর্মে অবাধ্য হবে না।

এভাবে শিরক ও কুফরে নিমজ্জত মক্কা ও তার আশপাশে ইসলামের পতাকা সমুন্নত হয়; মানুষের বুকে বুকে, ঘরে ঘরে, কর্মে-কথায়—ছড়িয়ে পড়ে আল্লাহর একত্ববাদের স্লোগান!

হুনাইনের যুদ্ধ
BATTLE OF HUNAYN

তারিখ:	৮ম হিজরি / ৬৩০ খ্রি.
স্থান:	তায়েফসংলগ্ন হুনাইন উপত্যকা
ফলাফল:	মুসলমানদের বিজয়

পক্ষ-বিপক্ষ:	মুসলমান	হাওয়াযিন এবং সাকিফ গোত্র
সেনাপ্রধান:	রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)	মালিক ইবনু আওফ
সেনাসংখ্যা:	২০০০০	জানা যায় নি
ক্ষয়ক্ষতি:	মুসলমানদের অনেকেই শাহাদাতবরণ করেন	৭০ জন নিহত

মক্কা ও তায়েফের মাঝামাঝি গুরুত্বপূর্ণ একটি স্থানের নাম হুনাইন। ৮ম হিজরির শাওয়াল মাসে এ-জায়গাটিতেই মুসলমানদের সাথে হাওয়াযিন ও সাকিফ নামক আরবের দুই প্রসিদ্ধ গোত্রের এক ঐতিহাসিক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তাৎপর্যপূর্ণ তায়েফ ও মক্কার বেশকিছু অঞ্চলজুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এ বৃহৎ দুটি কাফির গোত্রের সাথে ঘটা এই যুদ্ধটি মুসলমানদের বিজয়ের মধ্য দিয়ে সমাপ্তিতে গড়ায়।

যুদ্ধের বাতাস বইলো কেন

অষ্টম হিজরির রমজান মাসে মুসলমানদের হাতে আকস্মিক প্রতাপপূর্ণ শক্তিমত্তা প্রদর্শনের মাধ্যমে মক্কা বিজয়ের ঘটনা আরবের সাধারণভাবে 'মুযার' এবং বিশেষভাবে 'কুরাইশ' গোত্রের বিরোধী জোট-গোত্রগুলোতে ব্যাপক ক্ষোভ ও আক্রোশের সঞ্চার করে। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দয়াসুলভ আচরণ দেখে এবং মুসলমানদের সাথে উঠাবসা করে একদিকে মক্কায় দলে দলে লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করতে লাগল; অন্যদিকে তামাম আরব গোত্রের ওপর মক্কা বিজয়ের বিরাট প্রভাব পড়ল। তারা বুঝতে পারল, ইসলামের প্রতি আহ্বানকারী মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা বাস্তবিকই ধন-দৌলত বা রাজত্বের কাঙাল নন; বরং তিনি সত্যিই আল্লাহর প্রেরিত পয়গম্বর। পরন্তু এ সময়ে ইসলাম ও তার বৈশিষ্ট্য কোনো চোরা-গুপ্তা জিনিস ছিল না; বরং ইসলামি আদর্শের স্বরূপ ততদিনে প্রায় গোটা আরবই জেনে ফেলেছে। যাদের হৃদয়ে বুঝবার শক্তি ছিল, তারা বুঝে নিয়েছিল যে, ইসলামই হচ্ছে আসল সত্য। তাই মক্কা বিজিত হবার সঙ্গেসঙ্গেই আরবের দূর-দূরাঞ্চল থেকে বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা এসে দলে দলে ইসলাম কবুল করতে লাগল। এতদসত্ত্বেও যে সব লোকের অন্তরে ইসলামি আন্দোলনের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ বর্তমান ছিল, তারা এ দৃশ্য দেখে যারপরনাই

অস্থির হয়ে উঠল। মক্কা বিজয়ের পূর্ব থেকেই যুদ্ধের পরিকল্পনা করা গোত্রগুলোতে তুষের আগুন জ্বলে উঠল।

এমনিতেও 'কায়স আইলানের' শাখা গোত্রগুলোর সাথে 'মুযারের' শাখা গোত্রগুলোর দ্বন্দ্ব ছিল প্রাচীন ও প্রথাগত। এ-জন্যই মুসলমানদের হাতে মক্কা বিজিত হবার পর হাওয়াযেন, সাকিফ এবং বনু হেলাল গোত্রগুলো একজোট হয়ে ইসলামবিদ্বেষ, বংশ ও গোত্রগত পুরনো রোধের জেরে—মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নেয়।

হাওয়াযেন ও সাকিফ গোত্রের এ সম্মিলিত বাহিনীর প্রধান সেনাপতি মালিক ইবনু আওফ সেনাদলের সাথে নিজেদের সহায়-সম্পদ, পরিবার এবং নারীদেরও নিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়, যেন তারা গোত্রের পুরুষদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত এ যুদ্ধে উৎসাহ দিতে পারে, তাদেরকে ক্ষেপিয়ে তুলতে পারে। ফলে সেনারা যেন মৃত্যু পর্যন্ত অব্যহতভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যায়। এ-যুদ্ধ কেবল বিজয়ের জন্য নয়, এ যুদ্ধ নিজেদের পূর্বপুরুষ ও গোত্রমূলের সম্মান রক্ষার সম্মিলিত চেষ্টা।

বাহিনী বেরিয়ে পড়ে। মক্কা থেকে প্রায় একদিনের দূরত্বে 'আওতাস' নামক উপত্যকায় এসে এরা যাত্রাবিরতি করে। পরিবার-পরিজন, সহায়-সম্বল নিয়ে কেবল গোত্ররক্ষার এমন দ্বেষমূলক যুদ্ধের সিদ্ধান্তে দুরাইদ ইবন আস-সিম্মা নামক বাহিনীর আরেক সচেতন নেতা একদমই সম্মত ছিল না। কিন্তু প্রধান নেতা মালিক ইবনু আওফ জোর করে তার সন্তোষ আদায় করেছে। তার কথা না মানলে আত্মহননেরও হুমকি দিয়েছে। অগত্যা বাহিনীর অনেককেই তার এমন চপলবুদ্ধির সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হয়েছে। যুদ্ধের পর অবশ্য সে তার নির্বুদ্ধিতার প্রতিদানস্বরূপ 'অনুসৃত নির্বোধ' হিসেবে উপাধিও লাভ করেছে।

খবর পৌঁছে গেল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কানে। মক্কার অদূরে অপেক্ষমাণ মুশরিকদের জোটবাহিনীর বিরুদ্ধে তিনি সেনাদল প্রস্তুত করলেন। মুসলমানদের মূল বাহিনীর সাথে তিনি এমন অনেককেই একত্র করলেন, যারা মক্কা বিজয়ের পর কিছুমাত্র পূর্বে ইসলামের ছায়াতলে এসেছে; এখনো যাদের মন-মগজে ইসলাম ততখানি শক্ত হয়ে বসতে পারেনি। এতে বাহিনীর কলেবর এতটাই ব্যাপ্তি পেলো যে, খোদ মুসলমানরাই তা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তাদের ভেতর আশ্বাস ও ভরসা পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করছিল। প্রতিপক্ষ মুশরিকদের ধুলোয় মিশিয়ে দেবার একরকম গর্ব বা অহংবোধ, তাদের ভেতর উদিত হয়ে ওঠে। নিজেদের

উপর বিশ্বাসের আতিশয্যে কেউ তো বলে ওঠে, 'এবার আর আমরা স্বল্পতা হেতু পরাজিত হবো না।' রাসূল তাদের এমন মনোভাবে এবং এরূপ নাকফুলানো কথায় যথেষ্ট বিরক্ত হয়ে যান।

যুদ্ধ শুরু হলো

মালিক ইবনু আওফ তার বাহিনীকে হুনাইন উপত্যকার ঘাঁটি, টিলা এবং সরু ও ছোট জায়গাগুলোতে বিভক্ত করে দিয়ে গোপনে ওঁৎ পেতে রইল। যুদ্ধের জন্য সে বেছে নিল তায়েফ অভিমুখী মক্কার দুর্গম পাহাড়ি পথ। মুসলমানরা পূর্বেও এ প্রান্তর অতিক্রম করেছে, তাই সে চাইল সহসা তাদের উপর বৃষ্টির মতো তির ছুড়ে তাদেরকে আতঙ্কিত করে ফেলবে।

৮ম হিজরির শাওয়াল মাসের দশ তারিখ। তখনও ভোর নামেনি ধরায়। হুনাইনের সুপ্ত গোপন জায়গাগুলোতে তখনও তাঁবু গেড়ে আছে আধো আঁধারের কৃষ্ণতা। মুসলমানরা ঠিক তখনই হুনাইন উপত্যকায় পা ফেলল। শত্রুপক্ষের গোপন ঘাঁটিগুলোর ব্যাপারে তাদের জানা নেই কিছু। হঠাৎ সবদিক থেকে মুহুর্মুহু উড়ে আসতে লাগল তির। একযোগে প্রতিপক্ষের সেনারা তাদের উপর বাজপাখির মতো হামলে পড়ল। অকস্মাৎ এমন প্রাণঘাতী আক্রমণে মুসলমানদের চোখেমুখে নেমে এল হতবুদ্ধ বিদিশা। তারা বিশৃঙ্খল হয়ে পেছনে সরতে বাধ্য হলো। ধাক্কাধাক্কি হুড়োহুড়ি করে তারা একে অপরের উপর চড়ে বসছিল। সবেমাত্র ইসলাম গ্রহণ করা আবু সুফিয়ান ইবনু হারব, কিলদা ইবনুল জুনাইদসহ অনেকেই অবচেতন মনে চিৎকার করে বলে ফেলছিল ইসলাম সম্পর্কে তাদের মনে জমা থাকা পুরনো কথাবার্তা। এ-সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক দুঃসাহসিক কাজ করলেন। তিনি নিজেকে ভীষণ বিপদের সামনে তুলে ধরে ডান দিকে এগোতে থাকলেন। মুসলমানদের দিকে ফিরে আহ্বান করে বললেন:

أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب

> *'আমি মিথ্যাবাদী নবী নই, আমি আবদুল মুত্তালিবের সন্তান।'* [১]

এরপর তিনি আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে আদেশ করলেন মুসলমানদেরকে যুদ্ধের

---

[১] *বুখারি:* ২৭০৯, *মুসলিম:* ১৭৭৬

দিকে আহ্বান করতে। আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু পেছনে ফিরে চলা মুসলমানদের দিকে মুখ করে বললেন: 'হে ইসলামের সহযোগী সেনারা, হে ইসলামের জন্য হিজরতকারী পুরুষেরা, হে বৃক্ষতলের বাইআতকারীরা, ফিরে এসো।' আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর এ আহ্বান মুসলমানদের মন-মানসে বীরত্ব ও ঈমানের অনুভব জাগ্রত করে। তারা সমস্বরে জবাব দিয়ে বলে: 'হে আল্লাহর রাসূল, আমরা উপস্থিত আছি।'

মুসলিম সেনাদল পুনরায় পুনর্গঠিত হয়ে গেল। যুদ্ধ জড়িয়ে গেল পায়ে পায়ে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ময়দানে আগে আগে চললেন। তিনি এক মুষ্টি মাটি হাতে নিয়ে শত্রু বাহিনীর দিকে নিক্ষেপ করলেন। আল্লাহর কুদরতে সেই মাটি প্রতিপক্ষের প্রতিটা সেনার চোখ ছুঁয়ে গেল। এতে তারা হতবিহ্বল হয়ে পিছু হটতে শুরু করল। মুসলমানদের পাল্টা আক্রমণে অল্প সময়ের ব্যবধানে মুশরিকরা পরাজিত হয়ে মুখ ফিরিয়ে পালাতে লাগল। পেছনে ফেলে গেল সাথে নিয়ে আসা অতিরিক্ত সম্পদ, পরিবার, সন্তান এবং নারীদের। ব্যস্ত পায়ে দৌড়ে গিয়ে এরা বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল, প্রাণ বাঁচাতে যে যেখানে পারল আশ্রয় গ্রহণ করল। একদল গেল আওতাসের দিকে, একদল লুকিয়ে পড়ল পাশের খেজুরবাগানে; বাকি অধিকাংশ সেনারা তায়েফের বিভিন্ন দুর্গে লুকিয়ে হাফ ছেড়ে বাঁচল। প্রতিশোধের স্পৃহায় মুসলমানরা শত্রুপক্ষের নারী-শিশুদের দিকে হাত বাড়াতে চাইলে রাসূল তাদের শক্ত ভাষায় নিবৃত্ত করলেন।[১] রাসূল মুসলমানদের ছোট ছোট দল গঠন করে এদের পশ্চাদ্ধাবনে পাঠিয়ে দিলেন, যাতে তারা অন্য কোথাও সমবেত হয়ে দ্বিতীয় বার মুসলমানদের উপর হামলে পড়ার সুযোগ না পায়। মুসলমানরা তাদের পেছন থেকে আক্রমণ করে প্রায় ছয় হাজার মুশরিককে বন্দি করে নিল।

তায়েফ অবরোধ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরো বাহিনী নিয়ে সরাসরি তায়েফের দিকে অগ্রসর হন। সেখানে সাকিফ গোত্রীয় লোকদের বাড়িঘর এবং শক্ত কিছু দুর্গ ছিল; সে-সবে সেনাপতি মালিক ইবনু আওফ এবং অন্য অনেক সেনারা

[১] এর কারণ ছিল অনেকটা এমন যে, এরা মক্কা বিজয়ের পর সদ্য ইসলামে এসেছে। কেউ-বা দ্বীনের প্রতি আনুগত্য থেকে, কেউ আবার মুসলমানদের হাত থেকে প্রাণে বাঁচতে। ফলে তারা তাদের চিরাচরিত লুটের স্বভাব তখনও কাটাতে পারেনি।

লুকিয়ে ছিল। রাসূল তাই সাহাবাদের নিয়ে তায়েফে শক্ত অবরোধ আরোপ করেন। এ-সময় ভেতরে লুকিয়ে থাকা দুর্গরক্ষীদের সাথে মুসলমানদের ছোট ছোট কিছু সংঘাত দেখা যায়। এতে মুসলিম বাহিনীকে বেশকিছু শক্ত আঘাত তাদেরকে যুদ্ধের অবস্থান পরিবর্তনে বাধ্য করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবরুদ্ধ শত্রুদের উপর চাপ প্রয়োগ করতে তাদের আঙুর বাগানগুলো কেটে ফেলতে উদ্যত হন। এতে ভেতর থেকে অনুনয় আসে, আল্লাহর জন্য দয়া করে সেগুলো ছেড়ে দিন। রাসূল তাদের আবেদন রাখেন, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই অনুগ্রহপূর্বক তাদের বাগানগুলো সহালে ছেড়ে দেন এবং সাথে ঘোষণা দেন, সাকিফ গোত্রের গোলামরা ইসলাম গ্রহণ করলে তাদেরকে স্বাধীন করে দেয়া হবে। এ ঘোষণা শুনে পুনরায় তেইশ জন লোক বের হয়ে আসে এবং মুসলমানদের সাথে তুমুল যুদ্ধ বাঁধায়। ভেতরে অবরুদ্ধরা আগামী এক বছরের প্রয়োজনীয় রসদ জোগানোর চেষ্টা করে। এ অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের সাথে জরুরি পরামর্শ করে তায়েফের অবরোধ তুলে মক্কা ফিরে যাবার মনস্থ করেন।

গনিমত বিতরণ

তায়েফ অবরোধ ছেড়ে এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিইররানা নামক স্থানে অবস্থান গ্রহণ করেন। এখানে বসেই হুনাইনে প্রাপ্ত গনিমতের সম্পদ বিতরণ শেষ করেন। পূর্ববর্তী যুদ্ধগুলোর তুলনায় এ-যুদ্ধে লব্ধ গনিমতের সম্পদ ছিল অনেক বেশি। রাসূল প্রথমে মক্কার সম্ভ্রান্ত গোত্রপ্রধান এবং সদ্য ইসলাম গ্রহণকারী সেনাদের মধ্যে গনিমত বণ্টন করেন, যাতে ইসলামের প্রতি তাদের আন্তরিকতা বৃদ্ধি পায়। তাদেরকে তিনি বিপুল পরিমাণ গনিমতের অংশ দেন। সম্পদের নেশায় আরবের বেদুইন সর্বসাধারণ রাসূলের চারপাশে ভিড় করে। ঘটনাক্রমে এ যুদ্ধে প্রাপ্ত গনিমত থেকে আনসার সাহাবিদের রাসূল কিছুই দেননি। ফলে তাদের খানিকটা মনোক্ষুণ্ণ দেখা গেল। দেখা গেল, তারা এ বিষয়ে পরস্পর বিভিন্ন কথাবার্তা বলছে। এমনকি, তাদের ভেতর কানাঘুষা অনেকটা দৃষ্টিকটু পর্যায়ে চলে গেল। রাসূল ব্যাপারটা বুঝতে পেরে তাদেরকে ডেকে একত্র করলেন। তাদেরকে অত্যন্ত প্রভাবপূর্ণ ভাষায় নসিহত করলেন, যার ফলে তাদের ভেতর জমে ওঠা দুঃখ ও কষ্ট নিমিষেই দূর হয়ে গেল। তিনি বললেন: 'হে ইসলামের সহযোগী গোষ্ঠী আনসাররা, তোমাদের ব্যাপারে আমি এ-কী শুনছি? তোমাদের মনের ভেতর কি প্রাচুর্যের নেশা ছড়িয়ে গেল? তোমরা কি পথহারা বিভ্রান্ত পথিক

ছিলে না? যাদেরকে আল্লাহ সঠিক পথের দিশা দিয়েছেন? তোমরা কি ছিলে না সহায়-সম্বলহীন হতদরিদ্র? যাদেরকে আল্লাহ ধনসম্পদ দিয়ে পরবিমুখ করে দিয়েছেন? তোমরা কি পরস্পর একে-অন্যের শত্রুপক্ষ ছিলে না? যাদের হৃদয়ে আল্লাহ সৌহার্দ্য ঢেলে দিয়েছেন?' তারা জবাব দিল: 'হ্যাঁ, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক সবচেয়ে অনুগ্রহশীল, সর্বোচ্চ দয়াবান।'

এরপর কিছুক্ষণ থেমে রাসূল বললেন: 'তোমরা কি আমার প্রশ্নের কোনো উত্তর দেবে না, হে আনসার গোষ্ঠী?' তারা জবাব দিলেন: 'আমরা আর কী উত্তর দেবো, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই সবচেয়ে অনুগ্রহশীল, দয়ার আধার।' রাসূল বললেন: 'হ্যাঁ, তোমরা চাইলে এ-কথা বলতে পারো—বললে তোমরা অবশ্য সত্যই বলবে এবং তোমাদেরকে সে ব্যাপারে সত্যায়নও করা হবে—যে, আপনি তো আমাদের কাছে এসেছিলেন, মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়ে; আমরা আপনাকে সত্যায়ন করেছি, আপনি এসেছিলেন সাহায্যহীন অবস্থায়; আমরা আপনাকে সহায়তা করেছি, আপনি স্বদেশ-বিতাড়িত ছিলেন; আমরা আপনাকে আশ্রয় দিয়েছি, আপনি অসহায় ছিলেন; আমরা আপনার সহায় জুগিয়েছি।

তোমরা কি পার্থিব এই তুচ্ছ বস্তুর জন্য মন খারাপ করছো? যেগুলো আমি কিছু মানুষের মনোরঞ্জনের জন্য বিলিয়ে দিয়েছি, যাতে তারা ইসলামের উপর অবিচল থাকে? আমি তো তোমাদের দায়িত্বে দিয়েছি খোদ ইসলাম। তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, লোকেরা উট-বকরি নিয়ে বাড়ি ফিরবে আর তোমরা ঘরে ফিরবে রাসূলকে সঙ্গে নিয়ে? কসম সেই সত্তার, যাঁর হাতে আমি মুহাম্মদের প্রাণ, যদি হিজরতের ব্যাপার না হতো, আমি তবে একজন আনসার হতাম। যদি পৃথিবীর সকলে এক পাশে থাকে, আর আনসাররা অপর পাশে দাঁড়ায়—আমি তবে আনসারদের দলগত হতাম। হে আল্লাহ, আপনি আনসারদের প্রতি, তাদের সন্তানদের প্রতি এবং তাদের উত্তরপুরুষদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ করুন!'

রাসূলের এমন আবেগঘন বক্তব্য শুনে সকলের চোখ ভিজে উঠল। চোখের পানিতে তাদের দাড়ি ভিজে গেল। তারা সন্তোষ মনে বলে উঠল: 'আমরা বণ্টন ও প্রাপ্তি হিসেবে প্রিয় রাসূলকে নিতে সন্তুষ্ট আছি।'

এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠে গেলেন এবং ধীরে ধীরে উপস্থিত আনসাররাও যার যার মতো চলে গেল।

শিক্ষা ও উপদেশ

হুনাইনের যুদ্ধ ছিল মুসলমানদের জন্য শিক্ষার পাঠশালা। তারা সেদিন শিখেছে—বিজয় কখনো সংখ্যা ও প্রস্তুতির আধিক্যে হয় না এবং এগুলো নিয়ে গর্ব-অহংকার করা মুসলমানদের স্বভাব হতে পারে না।

এ ঘটনার কিছুদিন পর হাওয়াযেন গোত্র থেকে একটি প্রতিনিধিদল এসে রাসূলের কাছে তাদের ইসলাম গ্রহণের সংবাদ দিয়ে যায়। সবাইকে অবাক করে দিয়ে আরেকটি দল আসে সাকিফ থেকে, তারাও জানায় নিজেদের মুসলিম হবার খবর। এভাবে গতকালের রণশক্ররা আজ—আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পরস্পরে ভাই ভাই হয়ে যায়। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কুরআনের সুরা তাওবায় হুনাইনের যুদ্ধ ও মুসলমানদের নিজেদের নিয়ে অতিভরসার বিষয়গুলো নিয়ে কিছু আয়াত অবতীর্ণ করে দেন, যাতে মুসলমানরা সেদিনের ঘটনাকে স্মরণ করে আক্ষেপ করে এবং হুনাইন যুদ্ধের ভুলগুলো থেকে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন:

لَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِى مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْـًٔا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ * ثُمَّ أَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُۥ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَذَٰلِكَ جَزَآءُ ٱلْكَٰفِرِينَ * ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

> *'আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেছেন অনেক ক্ষেত্রে এবং হুনাইনের দিনে, যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদের উৎফুল্ল করেছিল; কিন্তু তা তোমাদের কোনো কাজে আসেনি এবং পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের জন্য সংকুচিত হয়ে পড়েছিল। পরে তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করেছিলে। তারপর আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূল ও মুমিনদের উপর প্রশান্তি বর্ষণ করেন এবং অবতীর্ণ করেন এমন সেনাবাহিনী, যাদের তোমরা দেখতে পাওনি। এবং*

তিনি কাফেরদের শাস্তি প্রদান করেন; এটাই কাফেরদের কর্মফল। এরপরও আল্লাহ যাদের প্রতি ইচ্ছা ক্ষমাপরায়ণ হবেন; আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'[১]

মুতার যুদ্ধ
BATTLE OF MU'TAH

তারিখ:	৮ম হিজরি / ৬২৯ খ্রি.
স্থান:	জর্ডানের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত মুতা প্রান্তরে
ফলাফল:	রোমানদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধন করে মুসলমানদের ময়দান ত্যাগ

পক্ষ-বিপক্ষ:	মুসলমান	রোমান বাহিনী (সহযোগী হিসেবে থাকে আরবের খ্রিস্টানরা)
সেনাপ্রধান:	যাইদ ইবনু হারিসা জাফর ইবনু আবি তালিব আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ	হেরাক্লিয়াস
সেনাসংখ্যা:	৩ হাজার	২ লক্ষ
ক্ষয়ক্ষতি:	১৩ জন শহিদ	নিহতের সংখ্যা হাজার হাজার

৮ম হিজরির জুমাদাল উলা মাসে জর্ডানের পশ্চিম-দক্ষিণ দিকে অবস্থিত মুতা নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দূত হারিস ইবনু উমাইরের হত্যাকে কেন্দ্র করে এ যুদ্ধটি সংঘটিত হয়। বসরা নগরের বাদশাহর কাছে রাসূল তাকে বার্তা দিয়ে প্রেরণ করলে রোমান শাসিত বালকা অঞ্চলের গভর্নর শুরাহবিল ইবনু আমর তাকে হত্যা করে ফেলে। সে প্রথমে তাকে শক্ত করে বেঁধে ফেলে, এরপর তার সামনে দাঁড়িয়ে দেহ থেকে শির আলাদা করে দেয়।

কেন এই যুদ্ধ

রোমানদের সাথে মুসলমানদের কূটনৈতিক সম্পর্ক দিনদিন উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে উঠছিল। রোমান সাম্রাজ্য এবং আরবে থাকা তাদের মিত্র শক্তিগুলো ক্রমশ মুসলমানদেরকে সবদিক থেকে কোণঠাসা করে ফেলতে চাইছিল; সময় অসময়ে তাদেরকে নানাভাবে প্ররোচিত করাকেই তারা তাদের ধ্যান-জ্ঞান বানিয়ে নিয়েছিল। এর অন্যতম ধারাবাহিক প্রকাশ্য চিত্র ছিল, নামে-বেনামে শাম থেকে আসা মুসলমানদের বাণিজ্যিক কাফেলাগুলোর পেছনে লেগে থাকা; তাদের কার্যক্রমে বিভিন্নভাবে হস্তক্ষেপ করা। সে-পথ হয়ে ক্রমাগত আসা-যাওয়া করা ব্যবসায়ীদের উপর আক্রমণ করা, তাদের মাল-সম্পদ লুট করা, তাদেরকে হত্যা করে ফেলা— ইত্যাকার কাজগুলো যেন তাদের নিত্যদিনের অভ্যাসে পরিণত হচ্ছিল। এ-ছাড়া যে-কোনো কারণে তাদের হাতে পড়ে যাওয়া বা ভৌগোলিকভাবে তাদের অধীনে বাস করা মুসলিমদের উপর তারা নানামাত্রিক চাপ প্রয়োগ করত এবং তাদের যাপিত জীবনকে সংকীর্ণ করে তুলত।

তাদের এসব অত্যাচার যখন চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে গেল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন হারিস ইবনু উমাইরকে বসরার শাসককে ইসলামের

দিকে আহ্বান করতে শামে পাঠান। হারিস যখন বালকা নগরীর গভর্নর শুরাহবিল ইবনু আমর আল-গাসসানির কাছে পৌঁছেন, সে রাসূলের দূতকে হত্যা করে ফেলে। এ ঘটনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ করে তোলে। কারণ, দূতকে সম্মান দেখানো এবং তাদের কোনোরূপ ক্ষতি না করার সামাজিক প্রচলনের বিরুদ্ধে গিয়ে এটাই ছিল ইসলামে দূত হত্যার প্রথম ঘটনা। রাসূল তাঁর জীবনের সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী এক যুদ্ধের জন্য তিন হাজার সেনাসমৃদ্ধ একটি বাহিনী তৈরির নির্দেশ দিলেন। ইতিপূর্বে আহযাবের যুদ্ধ ছাড়া এত বিপুল মুসলিম সেনা কোন যুদ্ধেই তিনি একত্র করেননি।

সেনাপতিদের উদ্দেশ্যে রাসূলের নসিহত

এ-যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমির হিসেবে মনোনিত করেন সাহাবি হযরত যাইদ ইবনু হারিসা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে। বলেন: যাইদ শহিদ হয়ে গেলে আমির হবে জাফর, জাফর শাহাদাত বরণ করলে দায়িত্ব নেবে আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা।[১] রাসূল যাইদ ইবনু হারিসার হাতে একটি শুভ্র পতাকা তুলে দিয়ে বলেন, 'সরাসরি সেখানটায় চলে যাবে, যেখানে হারিস ইবনু উমাইরকে হত্যা করা হয়েছে। সেখানে যাদেরকে পাবে, তাদেরকে প্রথমে ইসলামের দাওয়াত দিবে। যদি তারা মেনে নেয়, তাহলে তো ভালো; নতুবা আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা করে তাদের সাথে যুদ্ধ করবে।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই কোনো কাউকে কোনো বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করতেন, তাকে বিশেষভাবে তাকওয়া অবলম্বন এবং সাধারণ সেনাদের সাথে সদাচরণের উপদেশ দিতেন। এরপর বলতেন: 'আল্লাহর নামে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করবে; আল্লাহকে যারা অস্বীকার করে, তাদেরকে হত্যা করবে; যুদ্ধ করবে, কিন্তু গনিমত আত্মসাৎ করবে না, ধোঁকা দেবে না, কারও লাশ বিকৃত করবে না এবং শিশুদেরকে হত্যা করবে না।' [২]

এরপর মুসলিম নারীরা বের হয়ে তাদের স্বামীদেরকে বিদায় জানাল, বলল: 'আল্লাহ আপনাদেরকে ধৈর্যধারণের সাথে আমাদের কাছে ফিরিয়ে দিন।' আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা তাঁর স্ত্রীকে জবাব দিয়ে বললেন: 'তবে আমাকে আল্লাহ ফিরিয়ে আনবেন

[১] *বুখারি*: ৪০১৩, *নাসায়ি*: ৮২৪৯, *মুসনাদে আহমাদ*: ২২৬০৪

[২] *মুসলিম*: ১৭৩১

না, জানি।'

মুসলিম সেনারা তাদের বসতভিটা ছেড়ে বেরিয়ে গেল। 'সানিয়াতুল অদা' পর্যন্ত রাসূল তাদের এগিয়ে দিলেন। শামের 'মাআন' নামক স্থানে পৌঁছলে তাদের কাছে খবর এল রোমসম্রাট হেরাক্লিয়াস এক লক্ষ রোমান সেনা নিয়ে বালকায় অবস্থান করছে। তাদের সাথে যোগ দিয়েছে আরবের রোমান মিত্র গোষ্ঠী লাখাম, জুযাম, বাহরা ইত্যাদি থেকে আরও এক লক্ষ সেনা। সব মিলিয়ে হেরাক্লিয়াসের অধীনে বর্তমানে দুই লক্ষ সেনা সমবেত হয়েছে।

মুসলমানরা দুই রাত সেখানে থেমে থেকে শত্রুদের কার্যক্রম লক্ষ করলেন। তারা ভাবতেও পারেননি, এত বড় বাহিনীর মুখোমুখি হতে হবে। মক্কা থেকে এতটা দূরে এসে এমন অবস্থায় পড়ে তাদের খানিকটা চিন্তিত দেখাল। তাদের সামনে এই প্রশ্ন মূর্ত হয়ে দেখা দিল যে, তারা কি তিন হাজার সেনা নিয়েই দুই লক্ষ সেনার বিরুদ্ধে দাঁড়াবেন, নাকি অন্য কোন চিন্তা করবেন? দুই রাত গত হলে তারা একটি জরুরি সভা ডাকলেন। সকলে চিন্তা করলেন, রাসূলের কাছে এখানকার সর্বশেষ জানিয়ে একটি পত্র পাঠাবেন; হয় রাসূল তাদেরকে সহায়তা দেবেন, অথবা ফিরে যাবার নির্দেশ দেবেন। এ-সময় আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু আনহু দাঁড়িয়ে তাদের সাহস জোগালেন। বললেন: 'আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, তোমরা তো সেই শাহাদাতকেই প্রকারান্তরে অপছন্দ করছ, যেই শাহাদাতের তামান্না বুকে নিয়ে তোমরা বের হয়েছিলে। আমরা কখনোই সংখ্যা বা শক্তি আধিক্য দিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করি না; আমরা তো যুদ্ধ করি এই দ্বীনকে আঁকড়ে ধরে, যে দ্বীনের পরশে আল্লাহ আমাদের সম্মানিত করেছেন। তোমরা সামনে অগ্রসর হও; দুটি উত্তম সমাপ্তির যে-কোনোটা তোমাদের ভাগ্যে জুটবে—হয় বিজয়, নয় শাহাদাত।'

তাঁর এমন প্রত্যয়দীপ্ত স্লোগান শুনে সকলে বলে উঠল, 'খোদার কসম, ইবনু রাওয়াহা সত্য বলেছে।' এই বলে তারা নব উদ্যমে সামনে এগিয়ে চলে। বালকা অঞ্চলের কাছাকাছি এলে রোম থেকে আসা হেরাক্লিয়াসের বাহিনী আর 'মাশারিফ' থেকে আসা আরব সেনাদের সাথে তাদের সাক্ষাত হয়। শত্রুপক্ষ তেড়ে আসলে মুসলমানরা তাদেরকে কৌশলে মুতা অঞ্চলে নিয়ে যায় (যার বর্তমান নাম কির্ক)। সেখানে দুপক্ষের সরাসরি যুদ্ধ বাধে। মুসলমানরা তাদের বাহিনীকে সুসংহত করে সাজিয়ে নেয়। ডান পাশের নেতৃত্বে রাখে বনি উজরার বিখ্যাত যোদ্ধা কুতবা ইবনু কাতাতকে, বাম পাশের দায়িত্ব দেয় উবায়া ইবনু মালিক নামক এক আনসারি সাহাবিকে।

যুদ্ধ তখন তুমুলে

মুসলমানরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে গেল সীসাঢালা প্রাচীরের মতো। কদমে কদমে এগিয়ে আসছে সেই ভয়ানক সময়, সিরাতে নববির ইতিহাসে যা অন্যতম দুঃখজনক অধ্যায় হয়ে আছে। রোমান সেনা এবং আরবের খ্রিস্টানরা উত্তাল ঢেউয়ের ন্যায় ধেয়ে আসছিল মুতার প্রান্তরে। এদিকে মুসলমানরা তৎকালীন বিশ্বের সবচে শক্তিশালী বাহিনীর সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে রইল অবিচল পাহাড়ের মতো। সাহাবাদের পুরো বাহিনীতে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে থাকল আল্লাহু আকবারের আওয়াজ। রাসূলের দেয়া শুভ্র পতাকা হাতে এগিয়ে চললেন হযরত যাইদ ইবনু হারিসা রাদিয়াল্লাহু আনহু। আড়চোখে তিনি সেনাদেরকে যুদ্ধ শুরু করার ইঙ্গিত দিলেন। বিক্ষিপ্ত তিরের মতো ক্ষিপ্র গতিতে তারা রোমান বাহিনীর দিকে ছুটে চললেন। যুদ্ধের রূপ দাঁড়াল এতটা প্রকট, মুসলমানরা যার মতো যুদ্ধ আগে দেখেনি কখনো। কয়েক সেকেন্ডের ভেতর রণক্ষেত্রে ধুলো উঠে গেল। সবার কাছে ভেসে আসছিল হয় তরবারির আঘাতের শব্দ অথবা আহতের ব্যথাতুর আর্তনাদ। এ-দুটি আওয়াজ ভেদ করে উঁচু হয়ে উঠছিল মুসলমানদের তাকবিরধ্বনি—আল্লাহু আকবার; কিংবা এমন কিছু কবিতার উৎসাহব্যঞ্জক পঙ্ক্তি, যা মুসলমানদের রগে রগে ঢেলে দিচ্ছিল শাহাদাতের নেশা; আল্লাহর কালিমা ইসলামকে সমুন্নত করার লক্ষ্যে নিজের জান-মাল উৎসর্গ করার তামান্না।

পুরো মুতার প্রান্তর রক্তে ভেসে গেছে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে নিহত সেনাদের ছিন্নভিন্ন মৃতদেহ। বেঁচে থাকা সেনারাও চোখের সামনে মৃত্যু দেখেছে বারকয়েক। সর্ব বিবেচনায়ই এ যুদ্ধ ছিল 'রক্তক্ষয়ী'। নিহতের সারিতে দেখা গেল মুতার যুদ্ধে মুসলমানদের প্রথম শহিদ সেনাপতি হযরত যাইদ ইবনু হারিসা রাদিয়াল্লাহু আনহুর দেহ। পড়ে থাকা এই বীর মুজাহিদ পেছনফেরা ছিলেন না, মৃত্যুর পরও তার দেহ ছিল অগ্রমুখী। প্রধান সেনাপতির শাহাদাতের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশমতো জিহাদের পতাকা ডান হাতে তুলে নিলেন হযরত জাফর ইবনু আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু। ডান হাতে শুভ্র পতাকা নিয়ে তিনি হারিয়ে গেলেন ভিড়ের ভেতর। যুদ্ধ করতে করতে একপর্যায়ে তার ডান হাত কেটে গেল, পতাকা বাম হাতে নিলেন। বাম হাত কেটে গেল, এরপর দুই বাহুর মাঝে পতাকা জাপটে ধরে রাখলেন। এমন সময় এক রোমান সেনা এসে তাকে আঘাত করলে তিনি মাটিতে পড়ে শাহাদাত বরণ করে নিলেন। এ-ঘটনার কারণে তাকে বলা হতো জাফর তাইয়ার 'জুল-জানাহাইন' বা দুই পাখাওয়ালা; কারণ, আল্লাহ তার কর্তিত

হাত দুটির বদলায় তাকে দুটি পাখা দান করেছেন, যা দিয়ে তিনি জান্নাতে যেখানে খুশি উড়ে বেড়াচ্ছেন।

জাফর ইবনু আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু শহিদ হয়ে গেলে ঝাণ্ডা তুলে নেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু আনহু। এরপর ঘোড়া নিয়ে কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে কী মনে করে তিনি ঘোড়া থেকে নেমে যান। পায়ে হেঁটে সামনে অগ্রসর হতে থাকেন এবং যুদ্ধ করতে করতে শহিদ হয়ে যান। তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়লে তাঁর হাত থেকে ঝাণ্ডা হাতে তুলে নেন হযরত সাবিত ইবনু আরকাম রাদিয়াল্লাহু আনহু। বলেন: 'হে মুসলিম সেনাদল, দ্রুত তোমাদের কারও ব্যাপারে সম্মত হও।' আশপাশের সকলে বললেন, 'আপনিই রাখুন।' তিনি বললেন, 'আমি এর যোগ্য নই।' এরপর সকলে হযরত খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাপারে সম্মতি জ্ঞাপন করে তাঁর হাতে ঝাণ্ডা তুলে দিলেন।

খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের পরিকল্পনা

খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বাহিনীর আমির নিযুক্ত হয়েই শত্রুপক্ষের মোকাবেলায় নতুন পরিকল্পনা প্রস্তাব করেন। সে-সময়ে রাতে যুদ্ধ করা সেনাবাহিনীর অভ্যাস ছিল না, বরং রাত নেমে এলে উভয় পক্ষই যুদ্ধ বন্ধ রাখত। সে-রাতে রোমানরা বিশ্রাম করছিল, কিন্তু মুসলমানদের শিবিরে কোনো বিশ্রাম ছিল না। তারা অক্লান্ত পরিশ্রম এবং নিরলস সাধনা অব্যাহত রেখেছিলেন রাতেও। খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু সে রাতে তাঁর প্রতিভাদীপ্ত পরিকল্পনা প্রস্তুত করলেন, যা ছিল বাহিনীকে মুক্ত করার ও বিজয় নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে অবাক নীতিসমৃদ্ধ। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, রোমানদের এ অনুভব ঘটানো যে, গত রাতে কেন্দ্র থেকে মুসলমানদের বিরাট সৈন্য সাহায্য এসেছে। এ ধারণা রোমান ও তাদের মিত্র আরবীয় খ্রিস্ট সেনাদের মনোবল ভেঙে দেবে এবং তাদের মধ্যে হতাশা ছড়িয়ে দেবে। কিন্তু কথা হলো, তারা তো সেই হাজারের সাথেই লড়বে, যাদের সাথে গতকালও যুদ্ধ করেছে; সেই তাদেরকেই দেখবে বাহিনীতে, যাদেরকে আগেও দেখেছে—তাহলে নতুন সৈন্যসাহায্য আসার অনুভব তারা পাবে কী করে?

এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার জন্য সেনাপতি খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ নিম্নোক্ত পদক্ষেপ হাতে নেন:

- সিদ্ধান্ত নিলেন রাতভর যুদ্ধের ময়দানে সেনাদের ঘোড়াগুলো চালানো হবে, যাতে ময়দানের ধুলো ঘন হয়ে উড়তে থাকে; এতে সকালে রোমানরা এসে ভাববে, মুসলমানদের শিবিরে বুঝি কেন্দ্র থেকে বিরাট সাহায্য এসেছে।

- সেনাদের বিন্যাস বদলে দিলেন; ডানের সেনাদের বামে নিয়ে গেলেন, বামের সেনাদের নিয়ে এলেন বামে। সামনের সেনাদের পেছনে করে দিলেন, পেছনের সেনাদের এগিয়ে দিলেন সামনে। সকালে যখন রোমানরা এই চিত্র দেখল; দেখল পতাকা, চেহারা এবং বেশভূষা আগের মতো নেই—ধরে নিল মুসলমানদের বিরাট মদদ এসেছে এবং এতে তাদের মানসিক অবস্থা একেবারে ধসে পড়ল।

- সেনাদের পেছনে, মূল বাহিনী থেকে বেশ কিছুটা দূরে একটি টিলার উপর তিনি কিছু সেনা রেখে দিলেন। তাদেরকে আদেশ করলেন, যেন লম্বা জায়গাজুড়ে ছড়িয়ে থাকে। তাদের কাজ হলো, কেবল ধুলো উড়ানো, যাতে রোমান বাহিনী মনে করে, মুসলমানরা বুঝি কোনো বড় সেনা সাহায্য পেয়েছে।

- পরদিন সকালে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু মুসলিম বাহিনীকে ধীরে ধীরে পেছনে নিতে নিতে ময়দানের মরুপ্রান্তরের ভেতরে নিয়ে যাবেন। এতে শত্রুরা মনে করবে, খালিদ বুঝি আস্তে আস্তে তাদেরকে প্রান্তরে পেতে রাখা কোনো ফাঁদে আটকে ফেলতে চাইছে। ফলে তারা তাদের অনুসরণ করতে চাইবে না, বরং মুতার প্রান্তে দাঁড়িয়ে স্থির নয়নে খালিদের পশ্চাৎগমন দেখবে; না আক্রমণ করার সাহস পাবে, না তাদের পেছনে যাবার আগ্রহ পাবে।

খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের এ পরিকল্পনা ষোল আনায় বাস্তবতা পেল। পরদিন সকালে সূর্য উঠতেই রোমানরা দেখল, মুসলমানদের সম্মুখভাগের চেহারাগুলো চেনা যায় না। ভাবল, তারা বুঝি কেন্দ্র থেকে কোনো সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছে। এতে তারা ভয় পেয়ে চুপসে গেল, তাদের চেহারায় যা প্রকাশ্য হয়ে উঠছিল। এদিকে খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদেরকে ধোঁকা দিয়ে দিয়ে পুরো ময়দান ঘোরালেন। এভাবে কৌশলে মুসলমানরা কয়েকদিন যুদ্ধ চালিয়ে নিলে একসময় রোমানদের ভেতর ভয় জেঁকে বসল যে, এটা নিশ্চয়ই তাদেরকে মরু অঞ্চলে নিয়ে ফাঁদে জড়ানোর ষড়যন্ত্র এবং যুদ্ধ পুরোপুরি বন্ধ করে দিল।

এভাবে মুসলিম বাহিনীর আপাতপরাজয় বদলে গেল মহান বিজয়ে। দুই লক্ষ যোদ্ধার সামনে তিন হাজার সেনার ইস্পাতকঠিন দৃঢ়তার চেয়ে বড় বিজয় আর কী হতে পারে? সত্তর জন অস্ত্রসজ্জিত সেনাদলের সামনে দাঁড়ানো একজন মুসলিম—এমন বিরল দৃশ্য কেউ কি দেখেছে এর আগে? কিন্তু ঈমানি শক্তিই মুসলমানদেরকে এত বিশাল বড় শত্রুবাহিনীর সামনে শক্ত হয়ে দাঁড় করিয়েছে। এরপর ধীরে ধীরে তাদেরকে নিয়ে গেছে প্রান্তরের গভীরে। ধূলিময় প্রান্তরে রোমানদের পদানত করে মুসলমানরা এবার নিরাপদে মদিনার পথে রওনা করেন।

আহলান সাহলান, হে বীর সেনাদল!

সেনাবাহিনী শহরের কাছাকাছি যেতেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং তাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। পুরো শহরবাসী তাদের অভ্যর্থনায় নেমে আসে। বাচ্চারা প্রফুল্লবদনে দেখা করে বাবাদের সাথে, স্ত্রীরা অশ্রুসিক্ত নয়নে স্বাগত জানায় প্রাণের স্বামীদের। এরপর সকলের সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও বাহনে চড়ে শহরের দিকে এগিয়ে গেলেন। তিনি বললেন: 'বাচ্চাদেরকে তোমাদের বাহনে তুলে নাও, জাফরের ছেলেটাকে আমার কাছে দাও।' রাসূলের আহ্বানে আবদুল্লাহ ইবনু জাফরকে এনে তাঁর কাছে দেয়া হলে তিনি তাকে সামনে বসালেন। লোকেরা সেনাদের উপর মাটি ছুড়ে মেরে মেরে আনন্দমুখর হয়ে বলছিল: 'হে দ্রুত প্রত্যাবর্তনকারী সেনাদল, তোমরা আল্লাহর পথের যুদ্ধ থেকে দ্রুত প্রত্যাবর্তন করেছ।' তাদের কথা শুনে রাসূল বললেন: 'দ্রুত প্রত্যাবর্তনকারী নয়, বরং বারবার গমনকারী, ইনশাআল্লাহ।'[১]

মুতার যুদ্ধের প্রভাব

যে প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে মুতা অভিযান পরিচালিত হয়েছিল, সেটা সম্ভব না হলেও এ যুদ্ধের ফলে মুসলমানদের সুনাম সুখ্যাতি বহু দূর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। সমগ্র আবরজগত বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়। কারণ, রোমকরা ছিল তৎকালীন সময়ের সবচে বড় পরাশক্তি। আরবরা মনে করত, রোমকদের সাথে সংঘাতে লিপ্ত হওয়া মানে নিজেদের আত্মহত্যার আয়োজন করা। কাজেই, উল্লেখযোগ্য ক্ষয়ক্ষতি

---

[১] *সিরাতে ইবনু হিশাম*: ২/৩৮২, *সিরাতে ইবনু কাসির*: ৩/৪৭৯

ছাড়া তিনহাজার সৈন্য নিয়ে দুই লাখ সৈন্যের মোকাবেলায় সাহসিকতাপূর্ণ বিজয় অর্জন, তাদের কাছে কোনো সহজ কথা ছিল না। এ যুদ্ধের ফলে আরবের জনগণ বুঝতে পেরেছিল যে, ইতিপূর্বে পরিচিত সকল শক্তির চেয়ে মুসলমানরা সম্পূর্ণ আলাদা কিছু। সত্যিই আল্লাহর সাহায্য তাদের সাথে রয়েছে। তাদের নেতা মুহাম্মদ যে একজন খোদাপ্রেরিত রাসূল, এতেও কোনো সন্দেহ বাকি নেই। এ কারণেই দেখা যায়, মুসলমানদের চিরশত্রু জেদ ও অহংকারী হিসেবে সর্বমহলে পরিচিত বেশকিছু গোত্র মুতার যুদ্ধের পর ইসলামের ছায়াতলে এসে আশ্রয় গ্রহণ করে। এসব গোত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: বনু ছালিম, আশজা, গাতফান, জিবান ও ফাজারাহ।

মুতার প্রান্তরে মুসলিম সেনাপতিদের শাহাদাত এবং সেনাদের বীরত্বপূর্ণ আত্মত্যাগের ভিত্তিতে পরবর্তীতে ইসলাম বেগবান হয়েছে বহুগুণে। আরবের সীমানা ছাড়িয়ে পৃথিবীর নানাপ্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে রাসূলুল্লাহর নাম। সমসময়ের সকল পরাশক্তির শিরকের মহলে আলোচনায় উঠে এসেছে ঈমানি কাফেলার সাহসের পরিমাপ।

আহরিত শিক্ষা

মুতার যুদ্ধের পুরোটা চুঁইয়ে পড়ে নানারকম শিক্ষা। এ যুদ্ধের ঘটনাগুলো খোলা চোখে পাঠ করলে পাঠকমাত্রেরই আশ্চর্যে ভাষা আটকে আসে। এরা কেমন মানুষ ছিল? দুই লক্ষ প্রশিক্ষিত ভয়ঙ্কর সেনাদলের সমানে সমান পা রেখে বুক চিতিয়ে দাঁড়ানো সেই তিন হাজার সেনা কি আসলেই মানুষ ছিল? দুই পক্ষের বাহিনীর দিকে একটি আবছা নজর দিলেই স্পষ্ট মনে হয়, নিশ্চিত বড় দল প্রতিপক্ষ ছোট দলকে একেবারে পিষে ফেলবে। কিন্তু এরপরও মুসলমানরা এগিয়ে গেছেন, নিজেদের সংখ্যাস্বল্পতার দিকে ভ্রুক্ষেপ করেননি; দেখেন নি তাদের নিজেদের সীমিত প্রস্তুতির হাল, বরং আল্লাহর পথে সর্বতোভাবে নিজেকে বিলিয়ে দিতে, তাঁর দ্বীনের নামে কুরবান হতে—তারা নির্ভয়ে এগিয়ে গেছেন। তাদের চোখে ছিল দিগন্তবিস্তৃত সামনের বিক্ষুব্ধ সেনাদলকে ধুলোয় মিশিয়ে দেবার নেশা। মোকাবেলা করতে আসা রোমান সাম্রাজ্যের বিপুল বাহিনীকে হাস্যরসের পাত্র বানানোর অদম্য তাড়না ছিল তাদের ধমনীতে। তাই বলতেই পারি, সার্বিক বিচারে মুতার যুদ্ধ ছিল প্রিয় রাসূলের অন্যতম মুজিযা; মুসলমানদের চিরভাস্মর কারামত। বিপুল সংখ্যাবৈষম্যের এ-যুদ্ধ মুসলমানদের সামনে শত্রু মোকাবেলার এক বিরাট সামরিক

রীতি রেখে গেছে; তা হলো, আমরা সংখ্যায় বা সম্পদে—যুদ্ধ করি না; আমাদের যুদ্ধের মূল রসদ হলো দ্বীন। আমাদের যুদ্ধ যদি আল্লাহর দ্বীনের সাহায্যের জন্য হয়, যদি আল্লাহর দেয়া সামর্থ্য অবলম্বন করে সাধ্যের সবটুকু ঢেলে আমরা শত্রুর সামনে কাতারবদ্ধ হই—তবে, আল্লাহর ইচ্ছায় বিজয় আমাদের পদচুম্বন করবেই।

একটি ধোঁয়াশা ও তার অপনোদন

মুতার ময়দানের মাত্র তিন হাজার সেনা নিয়ে ২ লক্ষ রোমান সেনার বিপক্ষে মুসলিম বাহিনীর বীরত্বের কাহিনি আমরা পড়লাম। কিন্তু একটি জায়গায় প্রশ্ন কিন্তু থেকে যায়, রোমান বাহিনী তো তখনও ময়দান ছাড়েনি; তাহলে মুসলিম বাহিনীর এমন হঠাৎ ফিরে আসাকে আমরা পরাজয় ধরব, নাকি বিজয়? নাকি বলব যুদ্ধটি কোন মীমাংসায়ই পৌঁছতে পারেনি?

ইসলামি ইতিহাসের প্রাচীন গ্রন্থাদি ওল্টালে পূর্ববর্তী যুগ থেকেই এ বিষয়ে বিস্তর মতানৈক্যের খোঁজ পাওয়া যায়। হযরত মুসা উবনু উকবা তার মাগাযিতে এটাকে সুস্পষ্ট বিজয় বলে উল্লেখ করেছেন। তার সাথে একমত প্রকাশ করেছেন প্রখ্যাত ইমাম ইবনে শিহাব জুহরি, ইমাম ওয়াকেদি, ইমাম বাইহাকি এবং আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়ার লেখক ইমাম ইবনু কাসির। তারা সকলে মনে করেন, মুতা প্রান্তরের এই যুদ্ধ মুসলিম বাহিনীর পক্ষে নিখাদ বিজয় ছিল।

কিন্তু তাবাকাতে ইবনু সাদে ইমাম ইবনু সাদ এ ঘটনাকে মুসলমানদের পরাজয়ের ইতিহাস বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলতে চান, মুসলিম বাহিনী যেহেতু রোমানদের চূড়ান্ত ফায়সালা না করে ময়দান ত্যাগ করেছে, যেহেতু তখনও রোমান সেনারা ময়দানের কাছাকাছিই ছিল—অতএব তৎকালীন যুদ্ধরীতি অনুসারে এটাকে মুসলিম পক্ষের পরাজয় ছাড়া আর কিছুই বলার সুযোগ নেই। অপরদিকে প্রখ্যাত যুদ্ধ-ইতিহাসবিদ ইবনে ইসহাক তার সিরাতে ইবনে ইসহাকে এবং ইমাম ইবনুল কায়্যিম তার প্রসিদ্ধ সিরাতগ্রন্থ যাদুল মাআদে, মুতার ঘটনাকে অমীমাংসিত বা দুপক্ষের সমান কৃতিত্বের যুদ্ধ বলে উল্লেখ করেছেন।

কিন্তু আমরা এই দুই পক্ষের সাথে একমত নই। আমরা প্রথম পক্ষের সাথে সহমত হয়ে বলতে চাই, মুতার ঘটনা মুসলিম বাহিনীর সুস্পষ্ট বিজয়ের ঘটনা। এটা কেবল কথার কথা নয়, বরং এ বক্তব্যের সপক্ষে আমরা দলিল পেশ করব।

বুখারি শরিফে হযরত আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি মুজিযাসাপেক্ষ হাদিস বর্ণিত হয়েছে। যেখানে তিনি বলেন, মুতার যুদ্ধ চলাকালে রাসূল তাদের সামনে ময়দানের অবস্থা স্বচোখে দেখার মতো করে বলেছিলেন: 'ঝাণ্ডা এখন যাইদের হাতে; মাত্র সে শহিদ হয়ে গেল। ঝাণ্ডা তুলে নিয়েছে জাফর, সেও শহিদ হয়ে গেল; ঝাণ্ডা এখন ইবনু রাওয়াহার কাছে, মাত্র সেও শহিদ হয়ে গেল।' রাসূল বলছিলেন আর তাঁর চোখ দুটো থেকে অঝোরে পানি ঝরছিল। এভাবে ধারাবাহিক বলতে বলতে একপর্যায়ে তিনি বলেন: 'এখন পতাকা তুলে নিয়েছে খালিদ.... শেষপর্যন্ত আল্লাহ তাদেরকে বিজয় দান করেছেন।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এমন স্পষ্ট বর্ণনা থাকার পর, মূলত আর কোনো দলিলের প্রয়োজন পড়ে না। তিনি কোন উপমার আশ্রয় না নিয়ে সরাসরি শব্দে বলে দিলেন, 'শেষপর্যন্ত আল্লাহ তাদেরকে বিজয় দান করেছেন।'

মুসনাদে আহমাদে হযরত আবু কাতাদা রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরও একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে। সেখানে তিনি মুতার যুদ্ধের বিবরণ দিতে গিয়ে শেষে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের জন্য দোয়া করে বলেন: 'হে আল্লাহ, সে তোমার তরবারিসমূহের একটি তরবারি, তাকে বিজয় দান করো।'

রাসূলের দুয়ার ব্যাপারে আমাদের বিশ্বাস কী? নিশ্চিত সেটা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কবুল করেছেন। তিনি মুস্তাজাবুদ দাওয়াত ছিলেন। তাঁর দুআর ভিন্ন কিছু ঘটা তার নবুওয়তের জন্য সংশয়কর ছিল। তাই এ-কথা বলতেই হবে যে, মুতার যুদ্ধে রাসূলের এই দোয়ার ফলে মুসলিম বাহিনী বিজয় লাভ করেছিলেন।

এ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর শহিদের সংখ্যা হিসেব করলেই সবকিছু পরিষ্কার হয়ে যায়। দুই লক্ষ সেনার বিরুদ্ধে লড়াই করে খালিদের সেনাদলের মাত্র ১২ জন শাহাদাত বরণ করেন। একটা বাহিনী পরাজয় বরণ করলে তাদের কেবল ১২ জন মারা যায় কী করে? দুই লক্ষ সেনার সামনে, তাদের তো অস্তিত্ব থাকার কথা না। তেমনি এটাকে 'বরাবর' হিসেবেও কীভাবে দেখি?

যেখানে হযরত খালিদই তাঁর দক্ষ হাতে নয়টি তলোয়ার ভেঙেছেন রোমানদের কচুকাটা করে। তাহলে তাদের মৃত্যুসংখ্যা যে মুসলমানদের বহুগুণ বেশি ছিল, তা তো সহজেই অনুমেয়।

- মুসলমান বাহিনী প্রচুর পরিমাণ গনিমত নিয়ে ফিরেছিলেন। আবু দাউদের একটি বর্ণনা মতে, হযরত আওফ ইবনু মালিক আল-আশযায়ি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: 'রোমানরা প্রচুর স্বর্ণ এবং দামি ঘোড়া নিয়ে এসেছিল; মুসলিমরা প্রায় সবই গনিমত হিসেবে সাথে নিয়ে আসেন।' সুবহানাল্লাহ! এটা বিজয় ছাড়া আর কী হতে পারে? যুদ্ধে স্বর্ণ এবং অন্যান্য দামি সম্পদ খুব স্বাভাবিকতই সাধারণ সেনাদের কাছে থাকার কথা নয়; বরং এগুলো সেনাপতিদের কাছেই গচ্ছিত ছিল বলে অনুমিত।

- এটা খুবই স্বাভাবিক কথা যে, বিজয় হাসিলের পর গনিমত হাতে পেয়ে খালিদের মতো একজন বিচক্ষণ সেনাপতি সহসা ময়দান ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিবেন। কারণ, প্রতিপক্ষের সেনা ছিল প্রচুর এবং ধীরে ধীরে তারা রোমান এরিয়ায় ঢুকে পড়ছিল। সেদিকে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করতে গেলে মুসলিম বাহিনী বিপদের মুখে পড়তে পারত। এ জন্য তিনি দ্রুত সবাইকে ফিরতি পথ ধরার আদেশ দিয়েছিলেন।

এ যুদ্ধের পর পুরো আরব ইসলামের রওনক টের পায়। তারা বুঝতে পারে, বিশ্বের এক নম্বরে থাকা রোমান পরাশক্তিকে হারিয়ে দেয়া মুহাম্মদের বাহিনীকে ছোট করে দেখার কোনো সুযোগ নেই। সুতরাং যুদ্ধের পূর্বাপর সকল কিছু বিবেচনা করলে এটা যে মুসলিম বাহিনীর অন্যতম একটি বিজয়ের ইতিহাস ছিল, সে ব্যাপারে কারও বিন্দু পরিমাণ সন্দেহ থাকার কথা নয়।

তাবুকের যুদ্ধ
BATTLE OF TABUK

তারিখ:	৯ম হিজরি / ৬৩০ খ্রি.
স্থান:	তাবুক প্রান্তর
ফলাফল:	মুসলমানদের বিজয়

পক্ষ-বিপক্ষ:	মুসলমান	বাইজেন্টাইন এবং সাসানি সাম্রাজ্য
সেনাপ্রধান:	রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)	হেরাক্লিয়াস
সেনাসংখ্যা:	৩০,০০০	৪০,০০০
ক্ষয়ক্ষতি:		

মক্কা-বিজয় ছিল সত্য ও মিথ্যার মধ্যে এক সিদ্ধান্তমূলক অভিযান। এ অভিযানের পর মক্কাবাসীদের মনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়ত ও রেসালাত সম্পর্কে কোনো প্রকার সন্দেহ আর অবশিষ্ট ছিল না। তাই অল্প দিনের মাথায় পরিস্থিতির বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটেছিল। জনগণ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করছিল। বিভিন্ন জায়গা থেকে গোত্র ও রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে ইসলামের সত্যতা স্বীকার করে নিচ্ছিল। বিদায় হজের সময়ে উপস্থিত মুসলমানদের সংখ্যা থেকেও এ বিষয়ে আন্দাজ করা যায়। মোটকথা অভ্যন্তরীণ সমস্যার সমাধান প্রায় হয়ে গিয়েছিল বিধায়, মুসলামনরা ইসলামি শরীয়তের শিক্ষা সার্বজনীন করা এবং তার প্রচার প্রসারে ঐকান্তিকভাবে মনোযোগী হয়ে পড়েছিল।

যুদ্ধের কারণ

ওই সময়ে এমন একটি শক্তি মদিনার প্রতি দৃষ্টি দিয়েছিল, যারা কোনো প্রকার উস্কানি ছাড়াই মুসলামনদের গায়ে বিবাদ বাধাতে চাচ্ছিল। এরা ছিল রোমক শক্তি। সমকালীন বিশ্বে এরা ছিল সর্ববৃহৎ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি। এ বিবাদের ভূমিকা তৈরি হয়েছিল শুরহাবিল ইবনে আমর গাসসানির হাতে। এই ব্যক্তি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দূত হারেস ইবনে আল-আযদিকে হত্যা করেছিল। বসরা গভর্নরের তাকে পাঠিয়েছিলেন রাসূল। এরপর হযরত যায়েদ ইবনে হারেসার নেতৃত্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি সৈন্যদল প্রেরণ করেন। রোমক ভূমিতে সংঘটিত হয় মুতার যুদ্ধ। সে অভিযান কাছে ও দূরের সকল আরব অধিবাসীদের মনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিল।

কায়সারে রোম এ সকল প্রভাব প্রতিক্রিয়া এবং এর ভয়াবহতা উপেক্ষা করতে

পারেনি। মুসলিম অভিযানের ফলে তার রাজ্যের বহু আরব গোত্রের মধ্যে স্বাধীনতার চেতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। এটা ছিল তার জন্যে একাধারে বিপজ্জনক এবং লজ্জাজনক অবস্থা। ক্রমশ জনগণের স্বাধীনতার এই চেতনা সীমান্তবর্তী এলাকায় রোমকদের জন্যে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। বিশেষ করে সিরিয়ার সীমান্তে উত্তেজনা দিনদিন বেড়েই যাচ্ছিল। এ কারণে কায়সারে রোম ভাবল, মুসলমানদের শক্তি বিপজ্জনক হয়ে ওঠার আগেই এদেরকে শক্তভাবে দমন ও নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে। এতে করে রোমের সাথে সংশ্লিষ্ট আরব এলাকাগুলোতে নতুন করে কোনো ফেতনা ও হাঙ্গামা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার সুযোগ পাবে না। (কায়সারে রোম, শব্দটি উর্দু। এভাবে না লিখে রোমের কায়সার এভাবে লিখে সুন্দর হবে)

ইত্যাকার নানা কারণে মুতার যুদ্ধের পর এক বছর যেতে-না-যেতেই কায়েসারে রোম রোমের অধিবাসী এবং রোমের অধীনস্ত আরব এলাকাসমূহ থেকে বিপুল সৈন্য সমাবেশ শুরু করলেন। এটা ছিল মুসলমানদের সাথে এক ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পূর্বপ্রস্তুতি।

রোম ও গাসসানের প্রস্তুতির খবর

এদিকে বণিকদলের মাধ্যমে মদিনায় পর্যায়ক্রমে খবর আসছিল যে, রোমে মুসলমানদের বিরুদ্ধে এক সিদ্ধান্তমূলক যুদ্ধের ব্যাপক তোড়জোড় চলছে। এ খবরে মুসলমানরা অস্বস্তি এবং উৎকণ্ঠার মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলেন। হঠাৎ কোনো শব্দ শুনলেই তারা চমকে উঠতেন। ভাবতেন, রোমকরা বুঝি মদিনার ভূমিতে এসে পড়েছে। নবম হিজরির একটি ঘটনা থেকেই মুসলমানদের উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার পরিচয় যায়।

মদিনায় প্রচণ্ড গরম চলছে তখন। হযরত উমর বসে আছেন তার আপন কামরায়। গাসসানিরা যে-কোনো সময় মদিনায় আক্রমণ করতে পারে, অন্যদের মতো উমরকেও বেশ চিন্তিত দেখাচ্ছে। আরবরা জানত, রোমানদের চেয়ে শক্তিশালী তখনকার বিশ্বে কেউ নেই। এদের বিপক্ষে যাওয়া মানে নিজেদের আত্মহত্যার ব্যবস্থা করা। উমর তাই কোনোভাবেই নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না।

'উমর, দরজা খুলন! দরজা খুলুন!'—উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর এক আনসারি বন্ধুর আওয়াজ। উমর শঙ্কিত হন। মদিনার পার্শ্ববর্তী এলাকায় থাকেন উমর ও তার

আনসারি বন্ধু। তারা ধারাবাহিকভাবে একে অন্যকে ডেকে নিয়ে রাসূল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে উপস্থিত হন। উমর কোথাও গেলে আনসারি তাকে সকল সংবাদ দেন। আবার আনসারি কোথাও গেলে উমর তাঁকে সকল সংবাদ দেন।

বন্ধুর কাছে ছুটে যান। আনসারি বলেন—একটা ভীষণ সর্বনাশ হয়ে গেছে! উমর বলেন—'কী? গাসসানিরা কি এসে পড়েছে?' আনসারি বলেন—'না। এরচেয়েও ভয়ঙ্কর কিছু। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার স্ত্রীদের তালাক দিয়ে ফেলেছেন!'

উমর ছুটে যান রাসূলের বাসস্থানে। কন্যা হাফসাকে ভীষণ বকাবকি করেন, তারপর জিজ্ঞেস করেন—'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোথায়?' হাফসা বলেন—'পাশেই একটি ঘরে আছেন।' উমর সেদিকে এগিয়ে যান। দরজায় একজন প্রহরী ছিলেন। উমর ভেতরে যাওয়ার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন। তিনবার অনুমতি প্রার্থনা করার পর ভেতরে যাওয়ার অনুমতি মেলে। ভেতরে প্রবেশ করে উমর বলেন—'ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনার অনুমতি দিলে আমি হাফসার মাথা কেটে ফেলব।' রাসূল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাতে ইশারা করে তাকে শান্ত হতে বলেন।

ঘটনা তেমন বড় নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মধু পছন্দ করতেন। এক মহিলা যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহাকে মধু উপহার দিলে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে মধু পেশ করেন। এজন্য তার ঘরে আল্লাহর রাসূল দীর্ঘসময় অবস্থান করেন। আর এ কারণে আয়েশা ও হাফসা পরামর্শ করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফিরে এলে বলেন, 'আপনার মুখ থেকে মাগাফিরের গন্ধ আসছে ('মাগাফির' একপ্রকার গন্ধময় বস্তুর নাম)।' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে দুর্গন্ধ খুবই অপ্রিয়। তিনি স্ত্রীদের খুশি করার জন্য নিজের উপর মধু হারাম করে নেন। অতঃপর তার এক স্ত্রীকে ব্যাপারটা বলে তাকে কথাটা গোপন রাখতে বলেন।

কিন্তু তিনি একজনকে বলে দিলে একজনের কাছ থেকে আরেকজন, এভাবে সবাই ব্যাপারটা জেনে যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই ঘটনা জানার পর তার স্ত্রীদের কাছে না যাওয়ার কসম করেন এবং হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে তালাক প্রদান করেন। কিন্তু জিবরিল আলাইহিস সালাম এসে যখন বলেন—

'হাফসা অধিক রোযা পালনকারিনী, রাতে বেশি বেশি নামায আদায়কারিনী এবং জান্নাতে তিনি আপনার স্ত্রী হবেন', তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে আবার ফিরিয়ে নেন।

এই ঘটনা নিয়ে মুনাফিকরা হাঙ্গামা বাধিয়ে দেয়। তারা বলে, রাসূল তার সকল স্ত্রীকে তালাক দিয়েছেন। তারা ভেবেছিল, আবু বকর ও উমরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে দাঁড় করানো যাবে। কিন্তু তারা শুধু আপন কন্যা কেন, রাসূলের পদতলে নিজেদের জীবন পর্যন্ত বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত ছিলেন। আল্লাহ তাআলা এ ব্যাপারে কুরআনের আয়াত নাযিল করে সতর্ক করে দেন যে—'তারা যদি নবীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে, তবে আল্লাহ ও সৎকর্মশীল মুমিনরাই তার সহায় হবেন।'

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু শান্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি কি তাদেরকে তালাক দিয়েছেন?' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'না।' উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তখনই বের হয়ে মসজিদে দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে ঘোষণা করলেনশ, 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের তালাক দেননি। সকলে শান্ত থাকুন।' এ খবর শুনে মুসলমানরা অত্যন্ত আনন্দিত হন। দুশ্চিন্তার কালো ছায়া মদিনার উপর থেকে সরে যায়।

এ ঘটনা থেকে বোঝা যায়, সে-সময় মুসলমানদের ওপর রোমকদের হামলার হুমকি কতটা মারাত্মক ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওসাল্লাম মদিনায় পৌঁছার পর মুনাফিকরা রোমকদের যুদ্ধপ্রস্তুতির অতিরঞ্জিত খবর মুসলমানদের মধ্যে প্রচার করছিল। কিন্তু মুনাফিকরা লক্ষ করছিল যে, সবক্ষেত্রেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওসাল্লাম সফল হচ্ছেন এবং তিনি বিশ্বের কোনো শক্তিকেই পরোয়া করছেন না। তাঁর সামনে যে কোনো বাধা এলেই, তা যেন ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। এসব সত্ত্বেও মুনাফিকরা মনে মনে জপছিল, মুসলমানরা এবার আর রক্ষা পাবে না, তারা নাকানিচুবানি খাবেই। সেই প্রত্যাশিত তামাশা দেখার দিন বুঝি আর বেশি দূরে নয়। এরূপ চিন্তা-ভাবনার প্রেক্ষিতে তারা একটি মসজিদ তৈরি করলো, যা 'মসজিদে যিরার' নামে পরিচিত।। এই মসজিদে মুনাফিকরা বসে পরস্পরে আড্ডা দিত এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে নানাপ্রকার ষড়যন্ত্র করত। মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি, মুসলিম উম্মার ঐক্যে ফাটল ধরানো এবং শত্রুদের সাহায্য করার ক্ষেত্র প্রস্তুত করার লক্ষ্যেই এটি তৈরি করা হয়েছিল। অসৎ উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত সেই মসজিদে তারা শুধু ইসলামবিরোধী কাজে লিপ্ত থেকেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং

সে মসজিদে নামায আদায়ের জন্যে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও আবেদন জানিয়েছিল। এর মাধ্যমে মুনাফিকরা মূলত সরলপ্রাণ মুসলমানদের ধোঁকা দিতে চাচ্ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দিয়ে যদি একবার নামায আদায় করানো যায়, তাহলে সাধারণ মুসলমানরা মুনাফিকদের প্রতিষ্ঠিত সেই মসজিদের ঘৃণ্য উদ্দেশ্য আর বুঝতে পারবে না। তাঁরা ধারণাও করতে পারবে না যে, মসজিদ নামের এ ঘরে বসে তাদের বিরুদ্ধে কীরূপ ভয়ানক ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত করা হয়ে থাকে। তাছাড়া এ মসজিদে কারা যাতায়াত করছে, মুসলমানরা সেদিকেও বিশেষ লক্ষ রাখবে না।

এ মসজিদ এমনি করে মুনাফিক এবং তাদের বাইরের মিত্রদের ষড়যন্ত্রের অন্যতম আঁখড়ায় পরিণত হবে। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওসাল্লাম সেই মসজিদে সাথেসাথে নামায আদায় করতে রাজি হলেন না। তিনি বললেন, 'ইনশাআল্লাহ যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে আমি এই মসজিদে নামায আদায় করব।' সে-সময়ে তিনি যুদ্ধের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ছিলেন, তাই এদিকে মন দেয়ার সময় তার ছিল না। তবে পরবর্তীতেও মুনাফিকরা তাদের উদ্দেশ্য সফল করতে পারেনি। আল্লাহ তায়াল ওহির মাধ্যমে তাদের ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দেন। ফলে যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে নবীজি সেই মসজিদে নামায আদায়ের পরিবর্তে সেটিকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দেন।

এ সময়ে সিরিয়া থেকে তেল আনতে যাওয়া নাবেতিদের [১] কাছে হঠাৎ জানা যায়, হিরাক্লিয়াস ৪০ হাজার দুর্ধর্ষ সৈন্যের এক বাহিনী তৈরি করেছেন এবং রোমের এক বিখ্যাত যোদ্ধা সেই সেনাদের নেতৃত্ব করছেন। সেই কমান্ডার তার অধীনে খৃষ্টান গোত্র লাখাম জাযাম প্রভৃতিকে সমবেত করেছে এবং তাদের অগ্রবর্তী বাহিনী ইতিমধ্যে বালকা নামক জায়গায় পৌঁছে গেছে। এমনিভাবে সহসা এক গুরুতর পরিস্থিতি আতঙ্কে থাকা মুসলমানদের সামনে এসে দেখা দেয়।

পরিস্থিতির নাযুকতা

গনগনে রোদ মদিনার অলিগলিতে তাতিয়ে আছে। দেশে বিরাজ করছে অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা এবং দারিদ্র্য-দুর্ভিক্ষ। আরবের একমাত্র উর্বর ফল খেজুর পেকে আসছে

[১] এরা নাবেত ইবনে ইসমাইল আলাইহিস সালামের বংশধর। একসময় এরা পাটরা এবং হিজাযের উত্তরাঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করেছিল। কিন্তু কালক্রমে শক্তিহীন হয়ে এদের বংশধরেরা কৃষক ও ব্যবসায়ীতে পরিণত হয়।

গাছে গাছে। প্রায়পরিণত খেজুরের হলদেটে খোসায় দুলছে সাহাবিদের আগামী বছরের স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন। তাই তাৎক্ষণিকভাবে যুদ্ধে যাবার জন্য তারা একদমই প্রস্তুত নন। তদুপরি যুদ্ধের যাত্রা হবে দীর্ঘ, পথ থাকবে চূড়ান্ত বন্ধুর। ভাবতেই সাহাবাদের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ে যাচ্ছে। যেন-বা এবারের যুদ্ধ তাদের বীর বাহুগুলোকে আলগা করে দিচ্ছে খানিক।

সেনাপতির ভাবনা

কিন্তু মুসলিম বাহিনীর সর্বাধিনায়ক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাবছিলেন অন্যকিছু। সেনাপতিদের তো সাধারণদের মতো ভাবলে চলে না। তিনি বরং পরিস্থিতি মূল্যায়ন করে তাৎক্ষণিক দৃঢ় পদক্ষেপ নেয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বুঝতে পারছিলেন যে, এমন সঙ্কটসময়ে যদি রোমকদের সাথে যুদ্ধ করার ক্ষেত্রে শৈথিল্য ও অলসতার পরিচয় দেয়া হয়, তাহলে তারা মুসলিম অধিকৃত ও অধ্যুষিত এলাকাসমূহে প্রবেশ করবে। আমাদের দারিদ্র্য ও দুর্দশার সুযোগ কাজে লাগিয়ে মদিনাকে বিরান করে দেবে। ফলে ইসলামের দাওয়াত, প্রচার এবং প্রসারে মারাত্মক বিপরীত ক্রিয়া সৃষ্টি হবে। মুসলমানরা সামরিক স্বাতন্ত্র্য হারাবে এবং অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। হুনাইনের যুদ্ধে পর্যুদস্ত বাতিল ও কুফুরি শক্তি মুসলমানদের বিরুদ্ধে পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠবে। বাইরের শক্তির সাথে গোপনে যোগাযোগ রক্ষাকারী যে মুনাফিকরা সময় ও সুযোগের অপেক্ষা করছিল, তারাও সুযোগ বুঝে মুসলমানদের পিঠে ছুরিকাঘাত করতে পিছপা হবে না। পিঠের পেছনে থাকবে মুখোশধারী মুনাফিকের দল আর সামনে থাকবে বিধর্মী রোমক সেনারা। এতে ইসলামের প্রচার ও প্রসারে নিয়োজিত এতদিনের শ্রম-সাধনা ব্যর্থতার মুখোমুখি হয়ে পড়বে। নবী এবং সাহাবাদের দীর্ঘদিনের কষ্ট বিফল প্রমাণিত হবে। অনেক কষ্টে, অনেক রক্তে অর্জিত সাফল্য ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। অথচ এই সাফল্যের পেছনে মুসলমানদের ত্যাগ তিতিক্ষার ইতিহাস বড়ই দীর্ঘ এবং দুঃখের।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসব সম্ভাবনা ভালোভাবে অনুধাবন করছিলেন। তাই তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, পরিস্থিতি যত প্রতিকূলই হোক—মুসলিম অধিকৃত এবং অধ্যুষিত এলাকায় বিধর্মীদের প্রবেশের সুযোগ দেয়া তো দূরে থাক, বরং ওদের এলাকায় গিয়েই ওদেরকে মরণআঘাত করতে হবে।

মদিনার ঘরে ঘরে যুদ্ধের ঘোষণা

পারিপার্শ্বিক সবকিছু বিবেচনার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদের মধ্যে যুদ্ধপ্রস্তুতির নির্দেশ দিলেন। মক্কা ও মদিনাবাসীর পাশাপাশি আরবের বিভিন্ন গোত্রেও রাসূলের যুদ্ধের বার্তা পৌঁছে দেয়া হলো। অন্য সময়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধের ক্ষেত্রে যে কৌশল অবলম্বন করতেন, গন্তব্যের কথা গোপন রাখতেন, এবার তা করলেন না। প্রকাশ্যে এলান দিলেন, রোমানদের সাথে যুদ্ধ হবে আমাদের; অতএব সকলে উত্তমরূপে প্রস্তুতি নিতে থাকো।

আর্থিক ও পারিপার্শ্বিক দৈন্যে কাটানো মুসলমানরা যাতে যুদ্ধের জন্য মানসিকভাবে তৈরি হতে পারে, সে জন্য প্রকাশ্যে রাসূলের এই ঘোষণার প্রয়োজন ছিল। এদিকে যুদ্ধের জন্যে মুসলমানদের প্রস্তুতিতে উদ্বুদ্ধ করতে আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হলো ওহি, সুরা তাওবার কিয়দংশ। যুদ্ধের খরচের দিক চিন্তা করে রাসূল সকলের মাঝে আল্লাহর রাহে দান-সদকার ফজিলত তুলে ধরেন। এমন দুর্যোগ ও দুর্ভিক্ষের সময় দান করাতে আলাদা কী সম্মান ও পুরস্কার নিহিত, রাসূল তা সাহাবিদের সামনে সুস্পষ্ট করে দেন।

এরা যে ঈমানদার!

সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ পাওয়ার পরই যুদ্ধের জন্যে পুরোদমে প্রস্তুত হতে শুরু করেন। মদিনার চারিদিক থেকে আগ্রহী মুসলমানরা দলে দলে আসতে থাকে। কেবল যাদের মনে নিফাক তথা কপটতার অসুখ বিদ্যমান, তারা ছাড়া কেউ এ যুদ্ধ থেকে দূরে থাকার কথা ভাবতেই পারেননি। তবে তিন শ্রেণির মুসলামন ছিলেন পৃথক। তাদের ঈমান ও আমলে কোনো প্রকার ত্রুটি ছিল না। গরীব ক্ষুধাতুর মুসলামনরা জিহাদের চেতনায় আসছিলেন এবং যানবাহনের ব্যবস্থা করার আবেদন জানাচ্ছিলেন। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে অক্ষমতা প্রকাশ করছিলেন। ফলে তারা নিরুপায় হয়ে যুদ্ধ থেকে সরে পড়ছিলেন। এদের ব্যাপারে ক্ষমার ঘোষণা দিয়ে সূরা তাওবায় আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'ওদের কোন অপরাধ নেই, যারা তোমার কাছে বহনের জন্যে এলে তুমি বলেছিলে, 'তোমাদের জন্যে কোন বাহন

আমি পাচ্ছি না। ওরা অর্থব্যয়ে অসামর্থতাজনিত দুঃখে অশ্রু বিগলিত চোখে ফিরে গেল।'

সাহাবিদের মধ্যে যুদ্ধের জন্য অর্থ ব্যয়ে প্রতিযোগিতা শুরু হয়। পরস্পর ঈর্ষান্বিত হয়ে একে অন্যকে ছাড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছিলেন তারা। বিখ্যাত সাহাবি ও রাসূলের জামাতা হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু সিরিয়ায় ব্যবসার জন্যে প্রেরণের উদ্দেশ্যে একটি কাফেলা তৈরি করেছিলেন। এতে সুসজ্জিত দুইশত উট এবং দুশো উকিয়া (প্রায় সাড়ে উনত্রিশ কিলো রৌপ্য) ছিল, তিনি এগুলো সবই যুদ্ধে ব্যয়ের জন্য রাসূলের সামনে রেখে দেন। এরপর বাড়ি গিয়ে আরও একশত উট এনে সেখানে যোগ করে দেন। দাম করেন আরও এক হাজার দিনার (প্রায় ৫ কিলো স্বর্ণ)। রাসূলের সামনে এসব রাখা হলে তিনি সেগুলো উল্টেপাল্টে দেখছিলেন আর বলছিলেন, 'আজকের পর থেকে উসমান যা কিছুই করুক না কেন, তার আর কোনো নেই।' সব মিলিয়ে দেখা গেল, উসমানি রাদিয়াল্লাহু আনহুর সদকার পরিমাণ নগদ অর্থ ছাড়াও প্রায় নয়শত উট এবং একশত ঘোড়া।

এদিকে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ রাদিয়াল্লাহু আনহু দুশো উকিয়া অর্থাৎ প্রায় সাড়ে উনত্রিশ কিলো চাঁদি নিয়ে আসেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর ঘরের সবকিছু নিয়ে আসেন। রাসূল তাকে 'ঘরে কী রেখে এসেছ' জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে রেখে এসেছি।' তাঁর সদকার পরিমাণ ছিল প্রায় চার হাজার দিরহাম। তিনিই প্রথমে তার সদকা নিয়ে রাসূলের দরবারে হাজির হয়েছিলেন। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তার অর্ধেক সম্পদ নিয়ে উপস্থিত হন। হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু নিয়ে আসেন বহু কিছু। হযরত তালহা, হযরত সাদ ইবনে ওবাদা এবং মুহাম্মদ ইবনু মাসলামা রাদিয়াল্লাহু আনহুমও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সম্পদ হাজির করেন। হযরত আসেম ইবনে আদি নব্বই ওয়াসক অর্থাৎ সাড়ে ১৩ হাজার কিলো বা সোয়া তের টন খেজুর নিয়ে আসেন। অন্যান্য সাহাবারাও তাদের সাধ্যমতো সদকা নিয়ে রাসূলের সামনে উপস্থিত হতে থাকেন। এক মুঠো দুই মুঠো করেও অনেকে দেন, তাদের এর বেশি দেয়ার সামর্থ্যও ছিল না।

মহিলারা তাদের হার, বাজুবন্দ, ঝুমকা, পা-জেব, বালি, আংটি ইত্যাদি অলংকার এবং সাধ্যমাফিক দিনার দিরহাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে প্রেরণ করেন। কেউ বিরত থাকেননি, কেউ পিছিয়েও যাননি। কৃপনতার চিন্তা কারও মনে আসেনি। তবে একদল ছিল হাত গোটানোর দলে, ইসলামের লেবাসধারী

মুনাফিকের গোষ্ঠী। এদের কেউ তো কিছুই দিচ্ছিল না, কেউ-বা লোকদেখানো গরজে দান করে গরিব সাহাবারা সাধ্যমতো যা অল্পস্বল্প দান করছিলেন, তাদেরকে খোঁটা দিচ্ছিল যে, ওরা একটি দুটি খেজুর দিয়ে কায়সারের দেশ জয় করতে চলেছে। সূরা তাওবায় এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তায়ালা বলে দেন, 'মুমিনদের মধ্যে যারা স্বতস্ফূর্তভাবে সদকা দেয় এবং যারা নিজ শ্রম ব্যতীত কিছুই পায় না, তাদেরকে যারা দোষারোপ ও বিদ্রূপ করে, আল্লাহ্ তায়ালা স্বয়ং তাদের বিদ্রূপ করেন; বস্তুত ওদের জন্যে আছে মর্মন্তুদ শাস্তি।'

তাবুকের পথে

জিহাদের প্রেম ও শাহাদাতের তামান্নায় বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে মুসলিম বাহিনী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাম্মদ ইবনু মাসলামা (মতান্তরে সাবা ইবনু আরফাতা)-কে নিজের অনুপস্থিতিতে মদিনার গভর্নর নিযুক্ত করেন এবং পরিবার পরিজনের তত্ত্বাবধানের জন্যে হযরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে মদিনায় অবস্থানের নির্দেশ দেন। কিন্তু রাসূল রওনা হতেই মুনাফিকরা আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর সমালোচনা শুরু করে; তাকে কটাক্ষ করে ভীরু কাপুরুষ বলে নানা উক্তি করতে থাকে। এতে আত্মমর্যাদাশীল হয়ে ওঠেন হযরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু। সহ্য করতে না পেরে তিনি মদিনা থেকে বেরিয়ে পড়েন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মিলিত হন। রাসূল তাঁকে পুনরায় মদিনায় ফেরত পাঠিয়ে দেন। বলেন, 'তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তোমার সাথে আমার সম্পর্ক মুসা এবং হারুনের মতো হোক? অবশ্য, আমার পরে আর কোন নবী আসবে না।' মুনাফিক এরপর রাব্বুল আলামিনের উপর ভরসা করে তিনি উত্তর দিকে রওনা হন। দিনটি ছিল শনিবার। প্রচণ্ড রোদে গা পুড়ে যাচ্ছে সবার। তিরিশ হাজার আলোর দেবদূতের গন্তব্য তাবুক। ইতিপূর্বে রাসূলের তত্ত্বাবধানে এতো বড় সেনাদল কখনো তৈরি হয়নি। মুসলমানদের স্বতঃস্ফূর্ত অবারিত দান সত্ত্বেও বাহিনীর বিশালতা যেন হার মানার নয়। এতকিছুর পরও যানবাহন এবং পাথেয় ছিল অপ্রতুল। প্রতি আঠারো জন সৈন্যের জন্যে বরাদ্দ ছিল একটি উট, পর্যায়ক্রমে আঠারো জন তাদের সকলকেই সেই উটে সওয়ার হতে হতো। খাদ্যসামগ্রীর অপর্যাপ্ততার কারণে অনেক সময় গাছের পাতা খেতে হচ্ছিল তাদের। এই সামান্য সংখ্যক উটগুলো থেকেও ক্ষুধার প্রয়োজনে জবাই করতে হচ্ছিল দু-চারটে করে। এত কষ্ট ও প্রতিকূলতা

সত্ত্বেও আল্লাহর দ্বীনের জন্য তাদের যাত্রা ছিল সনিষ্ঠ। ঘরে দারিদ্র্য ফেলে, পেটে ক্ষুধার পাথর বেঁধে, তারা এগিয়ে যাচ্ছিলেন পৃথিবীর সবচে শক্তিশালী বাহিনীর মোকাবেলায়।

যাত্রাপথে মুসলিম বাহিনী সামুদ জাতির অবস্থান এলাকা দিয়ে যাচ্ছিলেন। 'হিজর' নামক প্রাচীন সে এলাকায় তারা 'ওয়াদিউল কুরার' ভেতরে পাথর খুঁড়ে বাড়ি তৈরি করেছিল। সাহাবায়ে কেরাম সেখানকার একটি কূপ থেকে পানি উত্তোলন করেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের বলেন, 'তোমরা এ জায়গায় পানি পান কোরো না এবং সে পানি ওযুর জন্যেও ব্যবহার কোরো না। বরং তোমরা সেই কূপ থেকে পানি নাও, যে কূপে হযরত সালেহ আলাইহিস সালামের উটনী পান পান করত।'

হযরত আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজর অর্থাৎ দিয়ারে সামুদ অতিক্রমের সময় বললেন, 'জালিমদের এই অবস্থানস্থলে প্রবেশ কোরো না। তাদের ওপর যে বিপদ এসেছিল, সে বিপদ তোমাদের ওপর যেন না আসে। তবে হ্যাঁ, কাঁদতে কাঁদতে প্রবেশ করতে পারো।' এরপর তিনি নিজের মাথা আবৃত করে দ্রুত সেই স্থান অতিক্রম করে গেলেন।'

পথে পানির ভীষণ সংকট দেখা দিল। এদিকে তৃষ্ণায় সাহাবিদের গলা-বুক মরু খাক হয়ে যায়। উপায় না পেয়ে সাহাবারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে সমস্যার উত্তরণ চেয়ে আবেদন জানান। রাসূল তাদের জন্য হাত তুলে দোয়া করলেন। সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তায়ালা সে এলাকায় মেঘ তাড়িয়ে দিলেন। মুষলধারে বৃষ্টি হলো। সাহাবারা তৃপ্তির সাথে পানি পান করলেন এবং প্রয়োজনীয় পানি সংরক্ষণ করে রাখলেন।

তাবুকের কাছাকাছি পৌঁছার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'ইনশাআল্লাহ আগামীকাল তোমরা তবুকের জলাশয় দেখতে পাবে। তবে চাশতের আগে পৌঁছুতে পারবে বলে মনে হয় না। যারা আগে পৌঁছুবে, তারা যেন আমি না যাওয়া পর্যন্ত ওখানের পানিতে হাত না দেয়।'

হযরত মুয়ায রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'আমরা তাবুকে পৌঁছে দেখি আমাদের দুজন সঙ্গী আগেই সেখানে উপস্থিত আছেন। ঝরনা থেকে অল্প অল্প করে পানি উথলে আসছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের জিজ্ঞেস

করলেন, 'তোমরা কি এখানের পানিতে হাত লাগিয়েছো?' তারা বলল, 'হ্যাঁ।' রাসূল এতে নাখোশ হয়ে গেলেন। এরপর হাতে আজলা পাকিয়ে ঝরনার নিচে ধরলেন। ধীরগতিতে আসা পানি রাসূলের হাতের তালুতে জমা হতে থাকল। তিনি সেই পানি দিয়ে হাতমুখ ধুয়ে নিলেন। তারপর হাতের পানিটুকু আবার ঝরনায় ফেলে দিলেন। মুহূর্তেই ঝরনা নেচে উঠল। খলখলিয়ে পানি উঠতে থাকল তার বুকের পাটাতন চিরে। সাহাবারা তৃপ্তির সাথে পানি পান করলেন। এরপর রাসূল আমাকে ডেকে বললেন, 'হে মুয়ায, যদি তুমি দীর্ঘজীবী হও, তবে দেখতে পাবে যে, এখানকার বাগানগুলো সজীব হয়ে উঠেছে।'

তাবুকে পৌঁছার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'আজ রাতে প্রচণ্ড ঝড় হবে, তোমরা কেউ উঠে দাঁড়াবে না। যাদের কাছে উট থাকবে তার উটের রশি শক্ত করে ধরে রাখবে।' রাসূলের কথামতো রাতে প্রচণ্ড ঝড় হলো। একজন সাহাবি অসাবধানতাবশত উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, ঝড়ের তাণ্ডব তাকে উড়িয়ে নিয়ে দুই পাহাড়ের মাঝখানে ফেলে রেখেছিল।

এই সফরে রাসূল জোহর ও আসরের নামায একত্রে এবং মাগরিব ও ইশার নামায একত্রে আদায় করেছেন। জাময়ে তাকদিম এবং জাময়ে তাখির দুটোই করেছিলেন। জাময়ে তাকদিম অর্থাৎ কখনো জোহর ও আসরের নামায জোহরের সময়েই আদায় করতেন; তেমনি মাগরিব ও ইশার নামায মাগরিবের সময়েই আদায় করতেন। জাময়ে তাখির মানে, কখনো জোহর ও আসরের নামায আসরের সময় আদায় করতেন; তেমনি মাগরিব ও ইশার নামায ইশার সময়ে আদায় করতেন।

মুসলিম বাহিনীর অবস্থান

দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে এসে সাহাবারা তাবুকে তাঁবু স্থাপন করলেন। তারা রোমক সৈন্যদের সাথে লড়াই করতে প্রস্তুত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তেজস্বিনী ভাষায় মুসলমানদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। সে ভাষণে তিনি দুনিয়া ও আখরাতের কল্যাণের জন্যে সাহাবাদের অনুপ্রাণিত করালেন, প্রকৃত বিজয়ের সুসংবাদ দিলেন। রাসূলের এমন উদ্দীপিত ভাষণে সৈন্যদের মনোবল বেড়ে গেল । কোনো কিছুর অভাবই তাদের মুখ্য মনে হলো না। অন্যদিকে রোম এবং তাদের সেনারা বিশাল মুসলিম বাহিনীর আগমনের খবর পেয়ে ভীত হয়ে পড়ল; সামনে এগিয়ে মোকাবেলা করার সাহস করতে পারল না। নিজেদের

শহরেই তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। যার যার মতো ফিরে গেল পূর্বের আবাসভূমিতে। বিধর্মীদের এ পিছুটান মুসলমানদের জন্যে কল্যাণকর প্রমাণিত হলো। আরব এবং আরবের বাইরে মুসলানদের সামরিক শক্তির শ্রেষ্ঠত্বের আলোচনা হতে লাগল। এ অভিযানে মুসলমানরা যে রাজনৈতিক সাফল্য লাভ করে রোমকদের সাথে যুদ্ধ করলেও সেই সাফল্য অর্জন সম্ভব হতো না।

রোমানদের পলায়নের খবর চলে যায় আশপাশের শাসকদের দরবারে। আয়েলার শাসনকর্তা রাসূলের কাছে এসে জিযিয়া আদায়ের শর্ত মেনে নিয়ে সন্ধি চুক্তি করে নেন। জাররা এবং আজরুহের অধিবাসীরাও হাজির হয়ে নিজে থেকে জিযিয়া প্রদানের শর্ত মেনে নেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সকলকে একটি করে চুক্তিপত্র লিখে দিলেন। তারা সেগুলো সাথে করে নিয়ে গেল। আয়েলোর শাসনকর্তাকে লিখে দেয়া একটি চুক্তি বা সন্ধিপত্রের ভাষা ছিল এমন, 'পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। এ শান্তি পরওয়ানা আল্লাহ এবং নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে ইউহান্না ইবনে রওবা এবং আয়েলার অধিবাসীদের জন্যে লেখা হচ্ছে। জলে-স্থলে তাদের কিশতি এবং কাফেলার রক্ষার দায়িত্ব আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর বর্তাবে এবং একই দায়িত্ব সেইসব সিরীয় ও উপকূলীয় অঞ্চলের বাসিন্দাদের জন্যেও, যারা আয়েলার সাথে থাকবে। তবে হ্যাঁ, এদের মধ্যে যদি কেউ গোলমাল পাকায়, তবে তার অর্থ-সম্পদ তার জীবনের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা নবী মুহাম্মদ দিবে না। এ ধরনের চুক্তিহীন ব্যক্তির ধন-সম্পদ যে কারও জন্যই গ্রহণ করা বৈধতা পাবে। ওদের কোনো কূপে অবতরণ এবং জলে-স্থলে কোনো পথে চলাচলের ক্ষেত্রে তখন কোনো নিষেধাজ্ঞা থাকবে না।'

এ-ছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত খালিদ ইবনুল ওয়ালিদকে প্রায় পাঁচশো সৈন্যের একটি দল দিয়ে দাওমাতুল জান্দালের শাসনকর্তা উকাইদিরের কাছে পাঠালেন। খালিদকে বলে দিলেন, 'তুমি দেখবে, সে চন্দ্রালোকিত রাতে নীল গাভী শিকার করতে বের হয়েছে।' হযরত খালিদ সেখানে গেলেন। শাসনকর্তার দুর্গ যখন দেখা যাচ্ছিল চোখে, হঠাৎ একটি নীল গাভী কোথা থেকে বের হলো এবং দুর্গের দরজায় শিং দিয়া গুঁতো মারতে থাকল। উকাইদির অমনি সেই গাভী শিকারের উদ্দেশ্যে বের হয়ে গেল। খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে গ্রেফতার করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে উপস্থিত করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উকাইদিরের প্রাণভিক্ষা

দিলেন এবং জিযিয়া কর দেওয়ার শর্তে তাকে মুক্ত করে দিলেন।

মদিনায় প্রত্যাবর্তন

এরপর মুসলিম বাহিনী তাবুক থেকে সফল ও বিজয়ী বেশে মদিনায় ফিরে এলেন। কোনো সংঘর্ষ হয়নি। যুদ্ধের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা ছিলেন মুমিনদের জন্যে যথেষ্ট। পথে একটি ঘাঁটিতে বারো জন মুনাফিক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যার চেষ্টা করে, কিন্তু ব্যর্থ হয়। এ সময় রাসূলের সাথে ছিলেন হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি উটের রশি ধরে রাসূলকে নিয়ে এগোচ্ছিলেন। পেছনে হযরত হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু তিনি উট হাঁকিয়ে দিচ্ছেন। অন্য সাহাবারা তখন মোটামুটি দূরে। মুনাফিক কুচক্রীরা এ সময়কে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে নাপাক ইচ্ছা চরিতার্থ করতে সামনে অগ্রসর হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সফরসঙ্গী দুই সাহাবি মুনাফিকদের পায়ের আওয়াজ শুনতে পেলেন। বারো জন মুনাফিক নিজেদের চেহারা ঢেকে তাদের দিকে এগিয়ে আসছিল। নবীজিও ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন। তিনি হযরত হুযাইফাকে সেদিকে পাঠালেন। হযরত হুযাইফা পেছনের দিকে গিয়ে মুনাফিকদের উটগুলোকে দেখতে পেলেন। তিনি সেগুলো এলোপাতাড়ি আঘাত করে এলোমেলো করে দিলেন। আর এতেই আল্লাহ তায়ালা মুনাফিকদের প্রভাবিত করলেন। তারা দ্রুত পেছনের দিকে গিয়ে সাহাবায়ে কেরামের গোপনে কাফেলার সাথে মিশে গেল। এদিকে রাসূল হুযাইফার কাছে তাদের নাম পরিচয় প্রকাশ করে চক্রান্ত ফাঁস করে দিলেন। এ কারণে হযরত হুযাইফাকে বলা হয় 'রাযদান' অর্থাৎ গোপনীয়তা রক্ষাকারী।

মদিনার কাছাকাছি পৌছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দূর থেকে মদিনাকে দেখে বলে ওঠেন—'ওই তো তাইবা! ওই তো উহুদ! এটি সেই পাহাড়, যে আমাদের ভালাবাসে এবং আমরাও যাকে ভালোবাসি।' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনার কাছাকাছি পৌঁছে বললেন—'মদিনায় এমন কিছু লোক রয়েছে, তোমরা যে পথই অতিক্রম করেছে, যে উপত্যকাই তোমরা পাড়ি দিয়েছে, তারা সব সময় তোমাদের সঙ্গে ছিল। অপারগতা তাদেরকে ওখানে ধরে রেখেছে!' সাহাবিরা বললেন—'ইয়া রাসূলুল্লাহ, তারা মদিনায় থেকেও?' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—'হ্যাঁ, মদিনায় থেকেও।'

মুসলিম বাহিনীর আগমনসংবাদ মদিনায় ছড়িয়ে পড়লে নারী, শিশু, বৃদ্ধরা

বেরিয়ে এসে মুসলিম বাহিনীকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানায়। মদিনায় প্রবেশ করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অভ্যাস মোতাবেক প্রথমে মসজিদে নববীতে গিয়ে দুই রাকাত নামায আদায় করলেন। এরপর তিনি সেখানে বসলে মুনাফিকরা মসজিদে নববীতে এসে যুদ্ধে যেতে না পারার ওজর বর্ণনা করে কসমের পর কসম করতে লাগল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের বাইরের অভিব্যক্তি গ্রহণ করে তাদের ওজর গ্রহণ করলেন, তাদের জন্য মাগফিরাতের দুআ করলেন এবং তাদের অন্তরের অবস্থা আল্লাহর হাতে ছেড়ে দিলেন।

কিন্তু তিনজন সাহাবি উল্লেখযোগ্য কোনো ওজর ছাড়াই এ যুদ্ধে অংশ নেননি। এরা হচ্ছেন: কাব বিন মালিক, মুরারা বিন রবি ও হেলাল বিন উমাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুম। তারা সত্যতার সাথে স্বীকার করলেন, তাঁদের যুদ্ধে না যাওয়ার বিশেষ কোনো কারণ ছিল না। এ কথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকল সাহাবিকে তাদের সাথে কথা বলতে নিষেধ করে দিলেন। আল্লাহর রাসূলের নিষেধের সাথে সাথে সকলে তাদের সাথে কথাবার্তা বন্ধ করে দিলেন। চেনা লোকেরা তাদের চোখের সামনে অচেনা হয়ে গেল; জমিন প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গেল। ধীরে ধীরে ব্যাপারটা মারাত্মক রূপ ধারণ করল। চল্লিশ দিন অতিবাহিত হতেই তাদের স্ত্রীদের আলাদা করে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হলো। এতে বিরহে-একাকীত্বে এই তিনজন সাহাবির মরে যাওয়ার দশা হলো। অতঃপর পঞ্চাশ দিন পূর্ণ হলে আসমান থেকে তাদের তাওবা কবুলের বারতা নেমে এল। সূরা তাওবার একশ সতেরো থেকে একশ উনিশতম আল্লাহ তাআলা তাদের ব্যাপারে ক্ষমার ঘোষণা দিয়ে নাযিল করলেন। তাদের চোখে-মুখে আনন্দের ঢেউ খেলে গেল। নতুন করে যেন প্রাণ ফিরে পেলেন তারা। সাহাবিরা ছুটোছুটি করে পরস্পরকে এ খবর দিতে লাগলেন। দান-খয়রাত করতে লাগলেন।

খুশিতে হযরত কাব বিন মালিক তার সমস্ত সম্পদ দান করে দিতে চাইলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তোমার জন্য কিছু রেখে দাও।' তিনি খায়বারে প্রাপ্ত সম্পত্তি ছাড়া তার অন্য সমস্ত সম্পদ মুক্তির খুশিতে দান করে দিলেন। এই আয়াত নাযিলের দিন ছিল তাদের জীবনের সবচেয়ে আনন্দ ও সৌভাগ্যের দিন।

যেসব লোক সত্যিকারেই অক্ষমতা ও অপারগতাহেতু যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'যারা দুর্বল, যারা পীড়িত তাদের অবিমিশ্র আনুগত্য থাকে। যারা সৎ কর্মপরায়ণ, তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের

কোনো কারণ নেই। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'

এ যুদ্ধের প্রভাব

জাযিরাতুল আরবে মুসলমানদের প্রভাব বিস্তার এবং শক্তি বৃদ্ধিতে তাবুক যুদ্ধ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জাযিরাতুল আরবে ইসলামি শক্তির বিরুদ্ধে মুনাফিকদের আশা-আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্র ছিল রোমান শক্তি। কিন্তু এ যুদ্ধের ফলে সে আশাও ধূলিসাৎ হয়ে যায়। এ অবস্থায় মুনাফিকদের সাথে নমনীয়তা দেখানোর সামান্য কোনো প্রয়োজন মুসলমানদের ছিল না। তাই তাদের সাথে কঠোর ব্যবহার করার বার্তা দিয়ে আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলের প্রতি নির্দেশনা জারি করেন।

তাবুক থেকে ফিরে আসার কিছুদিন পরই মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জন্য মাগফিরাতের দুআ করেন এবং উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিষেধ সত্ত্বেও তার জানাযার নামায আদায় করেন। এরপর কুরআনে কারীমের আয়াত নাযিল হয় এবং তাতে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বক্তব্যের সমর্থনে মুনাফিকদের জানাযা পড়াতে নিষেধ করা হয়। এমনকি তাদের দেওয়া দান-খয়রাত গ্রহণ, তাদের জন্য মাগফিরাতের দুআ এবং কবর যিয়ারত করতেও নিষেধ করে দেওয়া হয়। মসজিদে যিরার নামে ষড়যন্ত্রের যে আখড়া মুনাফিকরা তৈরি করেছিল, সেটি ধ্বংস করে দেওয়ার নির্দেশ হয়। মুনাফিকদের সম্পর্কে এমন আয়াত নাযিল হয় যে, তাদের চিনতে সাধারণ সাহাবিদের জন্যও আর কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকে না।

এ হিজরি সনেই ইন্তেকাল করেন হাবাশার সম্রাট নাজাশি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় সাহাবিদের নিয়ে বিশেষভাবে তাঁর গায়েবানা জানাযা আদায় করেন। [১]

---

[১] গায়েবানা জানাযা নিয়ে বর্তমানে কিছু ভাইয়ের মধ্যে অতি আবেগ দেখা দেখা যায়। এজন্য বিষয়টি পরিষ্কার হতে হবে। এ বিষয়ে মাসিক আল কাউসারে প্রকাশিত একটি ফতোয়া দেখা যাক—

জানাযা নামায সহীহ হওয়ার জন্য লাশ সামনে উপস্থিত থাকা আবশ্যক। অনুপস্থিত লাশের গায়েবানা জানাযা নামায আদায়ের বিধান নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় অসংখ্য সাহাবি মদিনার বাইরে দূর-দূরান্তে শহীদ হয়েছেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তাদের গায়েবানা জানাযা পড়ার কোনো ঘটনা বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত নেই। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের জানাযা নামায পড়ার ব্যাপারে খুবই আগ্রহী ছিলেন। এজন্য তিনি বলে দিয়েছিলেন যে—

مَا مَاتَ مِنكُمْ مَيِّتٌ مَا كُنتُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ إِلَّا آذَنْتُمُونِي بِهِ فَإِنَّ صَلَاتِي عَلَيْهِ رَحْمَةٌ.

তোমাদের কেউ মারা গেলে আমাকে জানাবে। কেননা আমার জানাযা নামায মৃতের জন্য রহমত। (*সহীহ ইবনে হিব্বান*, হাদীস ৩০৮৩)

তদ্রূপ খোলাফায়ে রাশেদীন থেকেও গায়েবানা জানাযা নামায পড়ার প্রমাণ নেই। অথচ তাদের খেলাফতকালে বিভিন্ন মুজাহিদ শহীদ হয়েছেন। গায়েবানা জানাযা নামায যদি সুন্নাহসম্মত হত তাহলে সাহাবিগণ অবশ্যই উক্ত সুন্নাহর অনুসরণ করতেন। কখনো পরিত্যাগ করতেন না।

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম রাহ. *যাদুল মাআদ* গ্রন্থে লেখেন, অনুপস্থিত লাশের গায়েবানা জানাযা নামায রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ ও আদর্শ ছিল না। কেননা অসংখ্য মুসলমান দূর-দূরান্তে ইন্তেকাল করেছেন। কিন্তু তিনি তাদের গায়েবানা জানাযা পড়েননি। (*যাদুল মাআদ* ১/১৪৮)

সুতরাং বর্তমানে যেসব অনুপস্থিত লাশের গায়েবানা জানাযা পড়া হয় তা সুন্নাহসম্মত নয় এবং সালাফের আমলের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। তাই এ প্রথা অবশ্যই বর্জনীয়।

উল্লেখ্য যে, কেউ কেউ গায়েবানা জানাযা প্রমাণ করার জন্য রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক নাজাশী রা.-এর জানাযা পড়াকে দলীল হিসেবে পেশ করতে চান। কিন্তু পুরো বিষয়টা সামনে রাখলে এ কথা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, নাজাশীর জানাযা পড়ার ঘটনাটি বর্তমানে প্রচলিত গায়েবানা জানাযার জন্য দলীল হতে পারে না। কারণ সেটি ছিল বিশেষ একটি ঘটনা, যা ব্যাপকভাবে গায়েবানা জানাযা জায়েয হওয়াকে প্রমাণ করে না। এছাড়া মুসনাদে আহমদ ও সহীহ ইবনে হিব্বানে নাজাশীর জানাযা সম্পর্কিত একটি হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, নাজাশীর লাশ কুদরতিভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনেই উপস্থিত ছিল।

ইমরান ইবনে হুসাইন রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তিনি বলেন,

إِنَّ أَخَاكُمُ النَّجَاشِيَّ تُوُفِّيَ فَصَلُّوا عَلَيْهِ. قَالَ: فَصَفَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَصَفَفْنَا خَلْفَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ ، وَمَا نَحْسِبُ الْجِنَازَةَ إِلَّا مَوْضُوعَةً بَيْنَ يَدَيْهِ.

তোমাদের ভাই নাজাশী ইন্তেকাল করেছে। সুতরাং তোমরা তার জানাযা আদায় করো। ইমরান রা. বলেন, অতপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়ালেন। আর আমরা তাঁর পেছনে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালাম। অতপর তিনি তার জানাযা পড়ালেন। আমাদের মনে হচ্ছিল যে, নাজাশীর লাশ তাঁর সামনেই রাখা ছিল। -*মুসনাদে আহমদ*, হাদীস ২০০০৫; *সহীহ ইবনে হিব্বান*, হাদীস ৩০৯৮

আর অনেক মুহাদ্দিস নাজাশীর জানাযা সংক্রান্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এ ঘটনাটি বিশেষ এক প্রয়োজনের কারণে সংঘটিত হয়েছিল। তা হল, নাজাশীর মৃত্যু হয়েছিল এমন এক ভূখণ্ডে যেখানে তার জানাযা পড়ার মতো কোনো (মুসলিম) ব্যক্তি ছিল না। তাই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণ নিয়মের বাইরে তার জানাযা পড়িয়েছেন।

উলামায়ে কেরাম এ ঘটনার আরও অন্যান্য ব্যাখ্যাও প্রদান করেছেন। যা হোক, এটা ছিল নববী জীবনের স্বাভাবিক রীতিবহির্ভূত মাত্র একটি ঘটনা। এর উপর ভিত্তি করে ব্যাপকভাবে প্রচলিত গায়েবানা জানাযাকে বৈধ বলার সুযোগ নেই। কেননা অনুসৃত সুন্নাহর সাথে এটির কোনো মিল নেই।

এছাড়া যে লাশের কোথাও জানাযার ব্যবস্থা আছে এবং তার জানাযা হয়েছে বা হচ্ছে তার গায়েবানা জানাযা পড়ার একটি ঘটনাও হাদীসের কিতাবে পাওয়া যায় না। তাই এটি অবশ্যই পরিত্যাজ্য। -*সহীহ*

আরবের কিছু কবিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে মক্কা বিজিত হবার অপেক্ষায় ছিল। তারা ভেবে রেখেছিল, যদি মক্কা রাসূলের হাতে চলে আসে, তবে বুঝব, তিনি সত্য নবী। আর যদি না আসে, তাহলে প্রমাণ হয়ে যাবে, তিনি আসলে আল্লাহপ্রেরিত কোনো নবী নন। অষ্টম হিজরিতে মক্কা বিজিত হলে এ সকল লোকেরা নির্দ্বিধায় রাসূলের হাতে এসে ইসলামের আনুগত্য স্বীকার করে নেয়।

কিন্তু তখনও মক্কার বাহিরে কিছুটা অস্বস্তি বিরাজ করছিল মানুষের মনে। কিন্তু প্রবল পরাশক্তি রোমানদের এমন ভয়ার্ত পলায়ন দেখার পর তারা আর কোনো অপেক্ষা প্রয়োজনীয় মনে করল না। রাসূল যে সত্য নবী, সেটার দ্বিতীয় কোনো প্রমাণ তাদের কাছে জরুরি মনে হলো না। তাই এ বিজয়ের পর লোকেরা দলে দলে মদিনায় এসে ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করল।

জাযিরাতুল আরবের বাইরে ইসলামের ব্যাপ্তি ছড়িয়ে পড়লে কতেক সাহাবারা বুঝে নিলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দায়িত্ব অনেকাংশে শেষ হয়ে এসেছে। ঠিক তাই। নবম হিজরিই ছিল রাসূলের সশস্ত্র অংশগ্রহণের শেষ বছর। পৃথিবীবাসীর হৃদয়ে সফলভাবে ইসলামের আহ্বান ছড়িয়ে দিয়ে, শত্রুদের ভেতরে আসমানি শক্তির ভয় ঢুকিয়ে দিয়ে—রাসূল এবার যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ ক্ষান্ত করে দিলেন।

পরবর্তী প্রায় দুটি বছর, বিজিত এলাকাগুলোকে ঘিরে মদিনায় একটি সফল রাষ্ট্র কায়েম করলেন তিনি। কীভাবে রাষ্ট্র চালাতে হবে, কীভাবে বিজয়ের পর ভূমিগুলোকে ধরে রাখতে হবে, কীভাবে সমাজের প্রতিটা পর্যায়ে আল্লাহর দ্বীনকে প্রথম ও প্রধান বিধান হিসেবে কার্যকর করতে হবে—সবকিছু হাতে-কলমে বুঝিয়ে দিয়ে আল্লাহর রাসূল বিদায় হজের ভাষণে সাহাবাদের সামনে প্রশ্ন করলেন, 'আমি কি আমার দায়িত্ব পালন করতে পেরেছি?' সাহাবারা একবাক্যে একসাথে রাসূলের প্রশ্নে হ্যাঁ-সূচক জবাব দিলেন।

বুদ্ধিমান সাহাবিরা সেদিন থেকেই থমকে গেছেন। তাবুকের যুদ্ধ আর বিদায়ের হজ, এ দুটোই তাদেরকে নাড়িয়ে দিয়েছে। রাসূলের বিয়োগবিধানের শোক তাদেরকে

বুখারী, হাদীস ৪০৯০; *নাসবুর রায়া* ২/২৮৩; *যাদুল মাআদ* ১/৫০২; *উমদাতুল কারী* ৮/১১৯; *ফয়যুল বারী* ২/৪৭০; *ফাতহুল কাদীর* ২/৮০, ৮১; *আল-মাবসূত*, সারাখসী ২/৬৮; *বাদায়েউস সানায়ে* ২/৪৮; *রদ্দুল মুহতার* ২/২০৯; *ইলাউস সুনান* ৮/২৮৩)

তখন থেকেই তাড়িয়ে ফিরেছে। এরপর তো তিনি চলে গেলেন, তাঁর পরম বন্ধুর কাছে। আরবের জাহিলি মানুষগুলোকে আলোর তরীতে তুলে দিয়ে, ঘরহারা লোকগুলোকে সংহত একটি রাষ্ট্র উপহার দিয়ে, 'জীবন্ত কন্যা সন্তান দাফন' করা সেই বর্বর লোকগুলোকে সোনালি মানুষে পরিণত করে তিনি পরপারের পথে পাড়ি জমালেন।

সাহাবারা রাসূলের শোককে বুকে দাফন করে নিলেন। তারা জানতেন, রাসূল বেঁচে থাকবেন তাঁর সুন্নাহর ভেতর, তাঁর আদর্শ ও বিধানের ভেতর। তাঁর বিয়োগে নিথর হওয়ার চেয়ে জরুরি হলো, তাঁর আদর্শের বাস্তবায়নে তৎপর হওয়া। আবু বকর প্রিয় বন্ধুর স্থলাভিষিক্ত হয়ে তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের হেফাজত শুরু করলেন। সাহাবারা ছড়িয়ে পড়লেন দিগ্বিদিক। সমগ্র পৃথিবী থেকে কুফরকে বিদায় করে ইসলামকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে তলোয়ার হাতে ছুটে গেলেন সেই খালিদ, যিনি উহুদে রাসূলের বিরুদ্ধে গর্জেছিলেন। নেতৃত্ব দেন সেই উমর, যিনি নাঙ্গা তলোয়ার হাতে রাসূলের শির নিতে ছুটেছিলেন। বের হয়ে আসেন সেই আবু সুফিয়ান, যিনি রাসূলের বিরুদ্ধে কতগুলো যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছেন।

কী এক জাদুর পরশে রাসূল তাদের ধন্য করে গেলেন। কী এক অদৃষ্ট আবেশে তারা মোহময় হয়ে পড়লেন। কী এক প্রেম তাদের চোখের পর্দা সরিয়ে আলোকিত ভুবন দেখাল! হ্যাঁ, এই লোকগুলোকে নূরের পথে আনতে আলোর ফেরি করেছেন রাসূল। রক্ত ঝরিয়েছেন তায়েফে, রক্ত ঝরিয়েছেন উহুদে। আরও বুকের খুন বিলিয়েছেন হেরা গুহায় সেই নির্জনতায়, উম্মাহর হিদায়াতের জন্য কেঁদে কেঁদে। পরম হিতৈষী সেই মহান রাসূলের প্রতি, শত শত কোটি বার জানাই সালাম, পাঠাই দুরুদ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল্লাম!

খিলাফতে রাশিদা

১১-৪০ হি.

৬৩২-৬৬১ খ্রি.

যাতুস সালাসিল

BATTLE OF CHAINS

তারিখ:	১২তম হিজরি / ৬৩৩ খ্রি.
স্থান:	কুয়েত
ফলাফল:	মুসলিম বাহিনীর বিজয়

পক্ষ-বিপক্ষ:	খিলাফতে রাশিদা	পারস্যের সাসানি সাম্রাজ্য
সেনাপ্রধান:	খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ	হরমুজ
সেনাসংখ্যা:	১৮ হাজার	৮০ হাজার
ক্ষয়ক্ষতি:	১ হাজার শহিদ	৩০ হাজার নিহত

ইতিহাসের অপরাজেয় সেনাপতি খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের নেতৃত্বে ১২তম হিজরি মোতাবেক ৬৩৬ খ্রিস্টাব্দে পারস্যের বাহিনী ও মুসলিম সেনাদের মধ্যকার সংঘটিত যুদ্ধকেই 'যাতুস সালাসিল' বা Battle of Chains বলা হয়। এ যুদ্ধে পারস্যবাহিনীর সঞ্চালনায় ছিল হিংস্র সেনাপতি হরমুজ। মুসলমানদের অবিস্মরণীয় বিজয়ের মধ্য দিয়ে যুদ্ধটি সমাপ্ত হয়।

যুদ্ধের প্রাকালাপ

ইরাক বিজয়ের সূচনা হিসেবে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর দৃষ্টি ছিল 'আল-আবেলাহ' (Al Abelah) শহরটি দখল করার প্রতি। সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে এ শহরের ভৌগলিক এবং সামরিক গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। কেননা, এ-শহরটিই ছিল আরবের সাথে পারস্যের নৌ যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম। শহরটির সাগর উপকূল ব্যবহার করেই ইরাকে ছড়িয়ে থাকা পারস্যের ঘাঁটিগুলোতে সবধরনের সাহায্য পৌঁছানো হতো। সে-সময় এ শহরের দায়িত্বভার ছিল উচ্চপদস্থ পারসিক আমির, প্রসিদ্ধ সেনাপতি হরমুজের হাতে। বর্তমানেও আরব উপদ্বীপের উপকূলীয় একটি শহরের নাম রয়েছে এই হরমুজের নামে। হরমুজ ছিল প্রচণ্ড অহংকারী এবং হিংস্র প্রকৃতির লোক। ইসলাম এবং মুসলমানদের প্রতি—এমনকি পুরো আরব জাতীয়তার প্রতি—তার ছিল সীমাহীন ক্ষোভ। তেমনি আরবরাও সে-সময় ইরাকবাসীদের প্রতি নানা কারণে হয়ে উঠেছিল বীতশ্রদ্ধ; তারা সমাজে এদের উপমা দিয়ে বলতো:'এরা তো দেখি হরমুজের চেয়েও বড় কাফের, হরমুজের চেয়েও নিকৃষ্ট।'

খলিফার কাছে সেনা সাহায্য তলবের পর সর্বমোট ১৮ হাজার সদস্যের মুসলিম বাহিনী নিয়ে সেনাপতি খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ সেখানে পৌঁছে প্রতিপক্ষ দলের

নেতা হরমুজের বরাবর একটি চিঠি লিখলেন। যেখানে তিনি ইসলামে জিহাদের বাস্তবতা কী, তার স্পষ্ট বিবরণ দিলেন। উত্তম ভাষা ও উপস্থাপনায় বর্ণনা করলেন মুসলিম সেনাবাহিনীর বিশেষ গুণাগুণ। তিনি বললেন:

'ইসলাম গ্রহণ করে নিন, নিরাপদ হয়ে যাবেন; অথবা নিজের ও স্বজাতির জন্য জিম্মি চুক্তি মেনে নিন এবং মুসলমানদেরকে জিযিয়া কর প্রদানে সম্মত হয়ে যান—নতুবা সবকিছুর জন্য নিজেকেই তিরস্কার করতে হবে আপনার। কারণ, আমি এমন এক জাতি নিয়ে এসেছি, যারা মৃত্যুতে ততটা ভালোবাসে, যতটা আপনারা জীবনকে ভালোবাসেন।'

মুসলিম বাহিনীর চরিত্র-স্বভাবের এরচেয়ে সত্য চিত্রায়ন আর কী হতে পারে? এই স্বভাব ও মানসিকতার কারণেই তো ইসলামের শত্রুরা মুসলমানদেরকে এতটা ভয় করত। এটাই মুসলমানদের হৃদয়োত্থিত উর্ধ্বগামী সুবাস, সুরভি। সেই মুসলিম বাহিনীর মৃত্যুপ্রেম আজ বদলে গেছে ভীরুতায়, দুর্বলতায় আর দুনিয়ার প্রতি লালসায়; অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে গেছেন, এই দুনিয়াসক্তির কারণেই পৃথিবীর তাবৎ কুফুরি শক্তি একযোগে আমাদের উপর হামলে পড়ছে। সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত এক হাদিসে তিনি স্পষ্ট ইরশাদ করেছেন: 'খাদ্য গ্রহণকারীরা যেভাবে খাবারের পাত্রের চতুর্দিকে একত্র হয়, অচিরেই কাফেররা তোমাদের বিরুদ্ধে সেভাবেই একত্রিত হবে। এক ব্যক্তি বলল, 'সেদিন আমাদের সংখ্যা কম হওয়ার কারণে কি এরূপ হবে?' তিনি বললেন: 'তোমরা বরং সেদিন সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে; কিন্তু তোমরা হবে প্লাবনের স্রোতে ভেসে যাওয়া আবর্জনার মতো। আর আল্লাহ তোমাদের শত্রুদের অন্তর থেকে তোমাদের প্রভাব দূর করে দিবেন, তিনি তোমাদের অন্তরে 'ওয়াহন' ভরে দেবেন। এক ব্যক্তি বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল, 'ওয়াহন' কী?' তিনি বললেন: 'দুনিয়ার প্রতি মোহ এবং মৃত্যুর প্রতি বিতৃষ্ণা।'[১]

[১] *আবু দাউদ*: ৪২৯৭, *মুসনাদে আহমাদ*: ২২৪৫০, শাইখ শুয়াইব আরনাউত বলেন: হাদিসটির সনদ হাসান পর্যায়ের। ইমাম হাইসামি বলেন: এ-হাদিসের *মুসনাদে আহমাদের* সনদটি উত্তম। দেখুন: *মাজমাউয যাওয়ায়েদ*, হাদিস নং—১২২৪৪। এছাড়া শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানি হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন; দেখুন: *আস-সিলসিলাতুস সাহিহা*, হাদিস নং—৯৫৮

শেকড়ছেঁড়া যুদ্ধ

মুসলিম সেনাপতির প্রেরিত পত্রের 'ইসলাম বা জিযিয়া প্রদানের দাওয়াত' গ্রহণ না করে ছুড়ে মারল হরমুজ। নিজের হাতে ডেকে আনল স্বজাতির সর্বনাশ। পারস্য সম্রাট কিসরার কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়ে দূত রওনা করল সে। ঘটনা শোনামাত্রই কিসরা বিরাট রণসাহায্য পাঠিয়ে দিল হরমুজ বরাবর। অল্প সময়ের মধ্যেই হরমুজের অধীনে জড়ো হলো বিপুল অস্ত্রবাহী বিশাল সেনাদল। হরমুজ তার পুরো যুদ্ধপরিকল্পনা করল 'কাজমা' (Kazma) শহরকে কেন্দ্র করে; কারণ, সে ভেবেছিল মুসলমানরা এখানটাতেই সেনা জমায়েত করবে। কিন্তু সে মুসলিম সেনাপতি হযরত খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের চৌকস সামরিক বুদ্ধিমত্তার কাছে হোঁচট খেয়ে গেল। তিনি আধুনিক যুদ্ধবিদ্যামতে 'লয় ও ক্ষয়ের যুদ্ধ' বা War of Attrition-এর পথ বেছে নিলেন। পারস্য বাহিনীকে নিয়ে তিনি কঠোর পরিকল্পনা করলেন। সে-মতে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ তাঁর বাহিনী নিয়ে চলে গেলেন 'হাফির' অঞ্চলে। এদিকে হরমুজ তার সেনাদল নিয়ে কাজমা শহরে এসে দেখে, সেখানে কেউ নেই। গুপ্তচররা তাকে জানাল, মুসলমানরা হাফিরের দিকে গেছে। এ-খবর শুনে বিকল্প পথে সে দ্রুত হাফিরের পথ ধরল, যাতে মুসলমানদের আগে পৌঁছানো যায়। ঘটলও তাই, মুসলমানদের আগে সে হাফিরে পৌঁছে গেল। সেখানে গিয়েই সে যুদ্ধের জন্য চূড়ান্ত প্রস্তুতি শুরু করল; চারপাশে গভীর পরিখা খনন করতে করতে তার সেনারা ক্লান্ত হয়ে পড়ল। কিন্তু বীর সেনাপতি খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ ততক্ষণে শত্রুদের অবস্থান জানতে পেরে মুসলিম বাহিনীর মোড় ঘুরিয়ে নিলেন। তাদেরকে নিয়ে পুনরায় চলে গেলেন কাজমা শহরে। সেখানে সেনাতাঁবু স্থাপন করলেন এবং এ-সুযোগে যুদ্ধের পূর্বে সেনারা খানিক বিশ্রাম করারও সুযোগ পেয়ে গেল।

মুসলিম বাহিনীর কাজমা ফিরে যাওয়ার সংবাদ এল হরমুজের কাছে। ক্রোধে তার কান লাল হয়ে গেল, তার ললাটের ভাঁজে ভাঁজে জমে গেল দুঃশ্চিন্তা। অগত্যা সে তার ক্লান্ত শ্রান্ত বিশাল বাহিনী নিয়ে যুদ্ধের জন্য পুনরায় কাজমার পথ ধরল। তবে সে এলাকার ভূমি-প্রকৃতি এবং ভৌগোলিক অবস্থা সম্পর্কে মুসলমানদের চেয়ে স্থানীয় পারসিকদের জানাশোনা ছিল বেশি। ফলে পরবর্তীতে এলেও হরমুজ ময়দানের পার্শ্ববর্তী পানির উৎসগুলো দখল করে নিল; ফোরাত নদীকে পেছনে রেখে সে ময়দানে এসে হাজির হলো, যাতে মুসলমানরা পানির প্রয়োজনে ফোরাতে যেতে না পারে। কিন্তু মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাঁর পবিত্র গ্রন্থে সত্য

বলেছেন:

وَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًٔا

> *'কখনো তোমাদের কাছে কোনো কিছু অপছন্দ লাগে, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর।'*[১]

শত্রুপক্ষকর্তৃক ময়দানের সুবিধা দখল মুসলমানদের ভেতর আত্মমর্যাদার আগুন জ্বেলে দেয়; তারা কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য আরও উৎসাহী এবং উদ্যমী হয়ে ওঠে। এ-সময় সেনাদের উদ্বুদ্ধ করতে সেনাপতি খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: 'তোমরা কি ময়দানে তোমাদের ঘোড়াগুলো নামিয়ে দেবে না? আল্লাহর অস্তিত্বের শপথ, পানির ঝরনাগুলো তাদেরই অধিকারে আসবে, দুপক্ষের যারা হবে সবচে ধৈর্যশীল এবং সবচে সম্মানিত।'

পারসিক বাহিনীপ্রধান হরমুজ মুসলিম সেনাদের সাথে ময়দানি মোকাবেলায় নামার আগে পরিস্থিতির বিবরণ জানিয়ে সম্রাট কিসরার কাছে আরেকটি চিঠি লিখে পাঠাল। সে তৎক্ষণাৎ কারিন ইবনু কিরবাসের নেতৃত্ব আরেকটি বিশাল বাহিনী পাঠিয়ে দিল, যাতে ঘটনাক্রমে হরমুজ মুসলমানদের কাছে পরাজিত হলেও এই বিকল্প বাহিনী যেন আবলেহ শহরটি তাদের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে। কারণ, আমরা পূর্বেও বলেছি—শহরটি এতদাঞ্চলে পারস্য প্রভাব জিইয়ে রাখতে সার্বিক বিচারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

মৃত্যুর শেকল

পারস্য বাহিনীর সেনাপতি হরমুজ ছিল প্রচণ্ড অহংকারী এবং কাণ্ডজ্ঞানহীন হঠকারী একজন মানুষ। সে কেবল নিজের কথা ভাবত, নিজের স্বার্থের চিন্তা করত। এমনকি, নিজের মোকাবেলায় সে বাহিনীর বৃহৎ স্বার্থ বিসর্জন দিতেও দ্বিধাবোধ করত না। এবারও সে তা-ই করল, সে পারস্য বাহিনীর প্রত্যেক সেনাকে জোর করে শেকলাবদ্ধ করে ফেলল, যাতে যুদ্ধ যত ভয়াবহই হোক—মৃত্যু পর্যন্ত যেন কেউ যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করতে না পারে। তার এমন অপরিণামদর্শী কাজের দিকে সম্বন্ধ করে, ইতিহাসে এ-যুদ্ধকে 'যাতুস সালাসিল' ব্যাটল অফ চেইন বা শেকলের যুদ্ধ নামে অভিহিত করা হয়।

---

[১] সুরা বাকারা: ২০১

সে-সময়ের যুদ্ধের স্বাভাবিক রীতিমতো প্রথমে দুই সেনাপতির মাঝে প্রতিদ্বন্দ্বিতা দিয়ে যুদ্ধ শুরু হলো। মহান মুসলিম সেনাপতি খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের মোকাবেলার জন্য পারস্যদলের প্রধান হরমুজ ময়দানে নেমে এল। কিন্তু হরমুজ ছিল প্রচণ্ড ধূর্ত এবং বিশ্বাসঘাতক। সে একদল অশ্বারোহীকে বলে এল, দুই সেনাপতির প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলাকালে অতর্কিত যেন তারা খালিদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আর এরপরই যাতে মুসলমানদের সাথে কাফেরদের এলোপাতাড়ি যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়।

দুই সেনাপতি তখন রণাঙ্গনে। খালিদ তো সেই সেনাপতি, ইসলাম গ্রহণের পূর্বাপর কোনো যুদ্ধেই—একটি বারের জন্যও জীবনে যে কোনো মুখোমুখি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাজিত হয়নি। পেছনে ফাঁদ পাতা হরমুজের অশ্বারোহীরা খালিদের উপর হামলে পড়ার আগেই মুসলিম শিবিরের অন্যতম আরেক বীর মুজাহিদ কাকা ইবনু আমর আত-তামিমি—বীরত্ব ও সাহসিকতায় তিনি খালিদের সমকক্ষ ছিলেন—ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন। দ্রুত তিনি সেনাদের সারি থেকে বের হয়ে হিংস্র সিংহের মতো গাদ্দার সে-সব অশ্বারোহীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এদিকে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ ততক্ষণে হরমুজের ইহকাল সাঙ্গ করে দিলেন, চূড়ান্ত আঘাত হেনে ভেড়া জবেহ করার মতো তার গলার উপর তরবারি চালিয়ে দিলেন। এ অবস্থা দেখে পারস্য বাহিনীর চোখ কপালে উঠে গেল, তাদের ঐক্য ভেঙে গেল এবং সেনাপতির মৃত্যুতে বাহিনী চরম বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ল। আক্রমণের চিন্তা বাদ দিয়ে তারা দিগ্বিদিকশূন্য হয়ে পালাতে শুরু করল। মুসলমানরা ঘোড়া হাঁকিয়ে তাদের পেছনে ছুটলেন। সেখানেই তারা তিরিশ হাজারোর্ধ্ব অগ্নিপূজারিকে জাহান্নামে পৌঁছে দিলেন। অনেকে ডুবে গেল ফোরাতের পানিতে, শেকল ছিঁড়ে যারা পালাতে পারে নি—সেনাপতির নির্বুদ্ধিতার কৈফিয়ত হিসেবে তাদেরকে সেখানেই চূড়ান্ত বলি হতে হলো। বাকি সেনারা কোনোমতে প্রাণ বাঁচিয়ে ময়দানের ভরাডুবি সয়ে সব ছেড়েছুড়ে পালিয়ে গেল। শোচনীয় এ পরাজয়ের জোয়ার কুফুরি শক্তি এবং অগ্নিপূজারি শিবিরের কোনায় কোনায় মুসলমানদের ভীতি পৌঁছে দিল।

ভয়াবহ ভীতির প্রসার

এ যুদ্ধের প্রাসঙ্গিকতা তখনও শেষ হয়নি; আবলেহ শহরটি তখনও মুসলমানদের হাতে আসেনি। তাছাড়া সেখানেও এক শক্তিশালী রক্ষীবাহিনী অপেক্ষমাণ, হরমুজের পরাজয়ের ভিত্তিতে যাদেরকে শহর বাঁচানোর দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। হরমুজের তো ভরাডুবি হয়েছে, পরাজয়ের গ্লানি ও প্রভাব গায়ে মেখে পালিয়ে আসা

বাহিনীর বাকিরা তখনও ভয়াবহ এ পরাজয়ের শোকে শোকার্ত হয়ে আছে। তাদের মনস্তত্ত্বে চেপে রয়েছে প্রচণ্ড ভয় ও সংশয়। এই ভয় ও গ্লানি নিয়েই তারা যোগ হয়েছে কারিন ইবনু কিরবাসের দায়িত্বে থাকা আবলেহ শহরের রক্ষীবাহিনীতে। পালিয়ে আসা সেনারা কারিনের কানেও পরিস্থিতির নাজুকতার খবর জানিয়েছে, ফলে এ সেনাপতির মনেও জমে উঠেছে মুসলমানদের সম্মুখ-মোকাবেলার প্রচণ্ড ভয় ও দুশ্চিন্তা।

কিন্তু তারপরও, পারস্য সম্রাটের হুকুম মানার তাগিদে একরকম বাধ্য হয়েই তাকে মুসলিম বাহিনীর সাথে যুদ্ধের জন্য শহরের বাইরে 'মিযার' নামক স্থানে নেমে আসতে হয়। সে যুদ্ধের জন্য এ অঞ্চল বেছে নিয়েছিল, যাতে ফোরাত নদীর প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। তদুপরি সে বিরাট এক নৌবহর তৈরি রেখেছিল, পরিস্থিতি প্রতিকূল হয়ে উঠলে যেন নদীপথে পালিয়ে যাওয়া যায়—সে জন্য। এদিকে হরমুজের অবশিষ্ট বাহিনী নিজেদের জন্য শহরের ভেতরে থেকে আত্মরক্ষাকেই উত্তম বলে ভেবে নিয়েছে। কারণ, তারা ময়দানে মুসলমানদের মোকাবেলা করা কতটা কঠিন, তা স্বচক্ষে দেখে এসেছে।

মুসলমানদের বীর সেনাপতি হযরত খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ সবসময় প্রতিপক্ষের প্রতিটা কাজের তদন্ত ও অনুসন্ধানকেই যুদ্ধের প্রধান অস্ত্র বলে হিসেব করতেন। মুসলিম পক্ষের গুপ্তচরদের মাধ্যমে তিনি জানতে পারলেন, পারস্যের আরেক বাহিনী মিযার নামক স্থানে একত্র হচ্ছে। এ-সংবাদ পাওয়ামাত্রই খালিদ মুসলিম বিশ্বের খলিফা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে পত্র পাঠান এ মর্মে যে, তারা অচিরেই মিযারে সেখানকার পারস্য বাহিনীর মোকাবেলার জন্যে আরেকটি যুদ্ধের উদ্দেশ্যে যাত্রা করছে, যাতে এর মাধ্যমে আবলেহ দখলের পথ সুগম হয়। এরপর তিনি দ্রুত প্রতিপক্ষের সাক্ষাতের জন্য যাত্রা করেন। ইরাকের সিংহ হযরত মুসান্না ইবনু হারিসা রাদিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে একদল দক্ষ অশ্বারোহীকে তিনি অগ্রে প্রেরণ করেন এবং এত দ্রুত মুসলিম বাহিনী নিয়ে সেখানে পৌঁছে যান, যা শত্রুপক্ষ একদমই চিন্তা করতে পারেনি। মুসলমানদের ক্ষিপ্রতা দেখে তারা দিশেহারা হয়ে গেল।

সামরিক বুদ্ধিমত্তা

মিযার অঞ্চলে পৌঁছেই দিগ্বিজয়ী মুসলিম সেনাপতি খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ প্রতিপক্ষের সেনাবাহিনীতে অনুসন্ধানী দৃষ্টি দেন। দীর্ঘ সামরিক অভিজ্ঞতা এবং সুক্ষ্ম বুদ্ধিমত্তা খাটিয়ে তিনি অনুধাবন করে নেন, শত্রুপক্ষের সেনাদের হৃদয় ভরে আছে মুসলিম বাহিনীর ভয়। কারণ, ঘাড় কাত করেই তিনি দেখতে পান ফোরাতের পাড়ে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়ে নোঙর করে আছে বড় বড় নৌ জাহাজ। এটা দেখে তিনি মুসলিম বাহিনীর দিকে ঘুরে তাদেরকে যুদ্ধে ধৈর্য ধারণ করার এবং অবিচল থাকার নির্দেশ দেন। বলেন, পেছনে ফেরা ছাড়াই যেন সবাই সামনে অগ্রসর হয়! পারসিকদের সেনাসংখ্যা ছিল প্রায় ৮০ হাজার। এদিকে মুসলমানদের সেনা ছিল মাত্র ১৮ হাজার। তবে দুপক্ষের শক্তির মূল পরিমাপক ছিল দক্ষ ঘোড়সওয়ারের আনুপাতিক হার।

প্রথমেই ময়দানে বেরিয়ে এল পারস্যের সেনাপতি কারিন। সে ছিল দক্ষ ও সাহসী যোদ্ধা। ময়দানে পা রেখেই মুখোমুখি মোকাবেলার জন্য কোনো মুসলমানকে বের হয়ে আসতে আহ্বান করল কারিন। তার ডাকে সাড়া দিয়ে একসাথে ময়দানে নেমে এলেন দুজন, সেনাপতি খালিদ এবং অখ্যাত এক আরব বেদুইন। ইতিহাসে যার নাম লেখা হয় মাকিল ইবনু আল-আশা, যার উপাধি ছিল 'শুভ্র অশ্বারোহী'। বেদুইন এই সাহসী সেনা খালিদ ইবনুল ওয়ালিদকে পেছনে ফেলে ময়দানে বেরিয়ে যায় আগে। বাজপাখির মতো সে কারিনের উপর হামলে পড়ে এবং চোখের পলকেই তাকে হত্যা করে ফেলে। এরপর পারস্যের বাহিনী থেকে একসাথে কয়েকজন সাহসী যোদ্ধা এবং নেতাগোছের সেনারা বেরিয়ে আসে ময়দানে। মুসলমানদের মধ্য থেকে আসেম ইবনু আমর মোকাবেলা করেন পারস্য সেনাপতি আনোশজানের, মুহূর্তেই তিনি তাকে ওপারে পৌঁছে দেন। এরপর সাহাবি আদি ইবনু হাতিম রাদিয়াল্লাহু আনহু বের হন প্রতিপক্ষের সেনাপতি কাভাডের বিরুদ্ধে, কয়েক মিনিটে তাকেও তিনি পরপারের টিকেট ধরিয়ে দেন। এভাবে পারস্য সেনারা নেতা ও নেতৃত্বহীন হয়ে পড়ে।

এটা খুবই স্বাভাবিক ছিল যে, নেতাদের কল্লা পড়ে যাবার পর পারস্যের সাধারণ সেনারা দ্রত ময়দান ত্যাগ করবে; তাদের সামরিক বন্ধন শিথিল হয়ে যাবে। কিন্তু তাদের ভেতরে মুসলমানদের জন্য জমে ছিল প্রচণ্ড ক্ষোভ ও ক্রোধ। পুষে রাখা সেই ঘৃণা ও ক্রোধের বশবর্তী হয়ে তারা মরণপণ যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো। নিজেদের

সর্বোচ্চ দিয়ে তারা মুসলিম বাহিনীকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করল, কিন্তু শেষপর্যন্ত মুসলমানদের ধ্বংসাত্মক আক্রমণে তারা পদপিষ্ট হয়ে গেল। মুসলিম বাহিনীর পদ চুম্বন করল স্পষ্ট বিজয়। তারা গুরুত্বপূর্ণ শহর আবলেহ দখল করে নিল। যার ফলে ইরাকের দক্ষিণাঞ্চলের ক্ষমতা চলে এল মুসলমানদের হাতে। তেমনি সাগর উপকূলের অধিকাংশ জরুরি বন্দর এলাকার নিয়ন্ত্রণ চলে এল খিলাফতের নিয়ন্ত্রণে। তবে এ বিজয় ইরাকের মাটিতে পারস্যের সাথে মুসলমানদের ভয়ঙ্কর কিছু যুদ্ধের দ্বার খুলে দিল। যে যুদ্ধগুলোর সবকটিতেই বিজয় সঙ্গী হয়েছে মুসলমানদের এবং এতদাঞ্চলে অগ্নিপূজারি শয়তানদের রাজত্বের যবনিকাপাত ঘটেছে।

ওয়ালাজার যুদ্ধ
BATTLE OF WALAJA

তারিখ:	১২তম হিজরি / ৬৩৩ খ্রি.
স্থান:	ইরাক (ফুরাত নদীর তীরে)
ফলাফল:	মুসলিম বাহিনীর গৌরবান্বিত বিজয়

পক্ষ-বিপক্ষ:	খিলাফতে রাশিদা (মুসলমানরা)	পারস্যের সাসানি সাম্রাজ্য এবং আরব খ্রিস্টান
সেনাপ্রধান:	খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ	আন্দুযগার
সেনাসংখ্যা:	১৫ হাজার	২৫/৩০ হাজার
ক্ষয়ক্ষতি:	প্রায় ২ হাজার শহিদ	২০ হাজারের বেশি নিহত

ঐতিহাসিক মেসোপটেমিয়ায় ১২ হিজরি (৬৩৩ খ্রি.) সনে সংঘটিত হয় ওয়ালাজার যুদ্ধ। সেনাপতি খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের নেতৃত্বে খুলাফায়ে রাশিদিনের বাহিনীর বিপক্ষে এ যুদ্ধে মোকাবেলা করে পারস্য (ইরান) সম্রাট এবং তার আরবীয় খ্রিস্টান মিত্ররা। মুসলমানদের দ্বিগুণ সেনাসমৃদ্ধ এ জোটবাহিনীর বিরুদ্ধে চৌকস সেনাপতি খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ মর্যাদার বিজয় তুলে আনেন। সংখ্যাধিক্যে শত্রুদল এগিয়ে থাকলেও পূর্ববর্তী যুদ্ধগুলোর মতো এ যুদ্ধেও খালিদ 'লয় ও ক্ষয়ের যুদ্ধ' বা War of Attrition-এর সাঁড়াশি নীতি অবলম্বন করেন।

পারস্য বাহিনী

উল্লাইসের যুদ্ধে (Battle of Ullais) থাকতেই পারস্যের তৎকালীন সম্রাট তৃতীয় আরদাশির (Ardashir III) আরও দুটি নতুন বাহিনী গঠনের নির্দেশ পাঠায়। তার নির্দেশ পেয়ে সম্রাটের শহরে শুরু হয় নতুন সেনাবাহিনী তৈরির কাজ। রোমান সাম্রাজ্যের পূর্ব সীমাঘেঁষা পারস্য বা ইরানের পশ্চিম দিকের সীমান্ত পাহারায় থাকা সেনারা ব্যতীত সে অঞ্চলের সবগুলো শহর ও দুর্গ থেকে সেনারা দলে দলে কেন্দ্রীয় শহরের দিকে আসতে থাকে। অল্প কয়েকদিনের ব্যবধানে প্রথম বাহিনী সংগঠিত হয়ে যায়। এবার সাম্রাজ্যের দক্ষ সমরবিদেরা পরামর্শ করে স্থির করে, মুসলিম বাহিনী অচিরেই ফোরাতের পাড় ঘেঁষে ইরাকের উত্তর-পশ্চিম দিকে এগিয়ে আসবে। কারণ, তারা জানত, নিকট ইতিহাসে আরব সেনাদেরকে মরু এলাকা থেকে দূরে সরে আসতে দেখা যায়নি; কেননা তারা যুদ্ধে পরাজয়ের শঙ্কা টের পেলে মরু অঞ্চলকে পেছনে ফিরে যাবার জন্য ব্যবহার করে থাকে।

পশ্চিম দিকটাকে মুসলমানদের আগমনের সম্ভাব্য দিক নির্বাচন করে সম্রাট তৃতীয়

আরদাশির 'ওয়ালাজা' নামক জায়গাটিকে ধরে নেন যে, এখানেই খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের বাহিনীর গতিরোধ করে তাদেরকে চিরতরে কবরস্থ করা সম্ভব।

পারসিকদের প্রথম বাহিনী ততক্ষণে টেসিফুন (Ctesiphon) নামক স্থানে চলে এসেছে। খোরাসানের গভর্নরের নেতৃত্বে এ বাহিনী ধীরেধীরে ওয়ালাজার দিকে এগোতে থাকে, যেখানে কিছুক্ষণের মধ্যেই দ্বিতীয় বাহিনী তাদের সাথে মিলিত হবে। সে-মতে প্রথম বাহিনী টেসিফুন থেকে বের হয়ে দজলার পূর্ব পাড় ঘেঁষে কাসকার এলাকা দিয়ে নদী পার হয়ে যায়। এরপর পশ্চিম-দক্ষিণ দিক হয়ে তারা ফোরাতের দিকে এগিয়ে যায়। ওয়ালাজার কাছাকাছি এসে গেলে তারা ফোরাত পার হয়ে ওয়ালাজায় সেনা তাঁবু স্থাপন করে যাত্রা ক্ষান্ত দেয়।

মুসলিম বাহিনী

উল্লাইসের যুদ্ধে বিজয় মুসলমানদের জন্য ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সামান্য ক্ষয়ক্ষতি সয়ে সে-যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী পারস্যের বিশাল সেনাদলকে পরাজিত করে। সাথে হাসিল করে নেয় বিপুল পরিমাণ গনিমতের সম্পদ। এতে সেদিন থেকে পারসিকদের বহু সম্পদের উৎস মুসলমানদের হস্তগত হয়ে যায়। অথচ ততদিনে তারা কেবল ভিন্ন দুটি যুদ্ধে দুটি আলাদা বাহিনীর মোকাবেলা করেছে। এমনকি সে যুদ্ধগুলোর ভূমিও নির্ধারণ করেছে মুসলমানরা। তবে পারস্যের ছোট ছোট সহায়ক বাহিনী (Backup Force) তাদের সে ধারা নষ্ট করেছে। আমরা পূর্বেও বলেছি, পারসিকরা একই সময়ে একাধিক সেনাবাহিনী প্রস্তুত করতে পারত। ইতিপূর্বে কাজমা এবং উল্লাইসের যুদ্ধেও আমরা এর নজির দেখে এসেছি।

খালিদ তাঁর তদন্ত টিমকে নির্দিষ্ট কাজে নিয়োজিত রেখেছিলেন, যারা তাকে ক্ষণে ক্ষণে পারস্য বাহিনীর অবস্থান ও গতি-প্রকৃতি তাকে জানিয়ে দিচ্ছিল। খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর এ বিশেষ টিম ছিল আরবের এমন সব অঞ্চলের লোকজন, যা ছিল পারসিকদের আঁতুড়ঘর। তাই এরা পারস্যের নতুন বাহিনী গঠন, ওয়ালাজায় তাদের অবস্থান গ্রহণ এবং তাদের বিপুল যুদ্ধপ্রস্তুতির কথা সহজেই খালিদের কাছে পৌঁছে দেয়।

খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু 'আল-হিরা' (Al-Hirah) অঞ্চল অধিকার করতে পূর্ব থেকেই ছিলেন বদ্ধপরিকর। ওয়ালাজা এলাকাটি 'আল-

হিরা'র পথেই ছিল; তাই সাথে থাকা পনেরো হাজার সেনার বাহিনী নিয়ে খালিদ মূলত রওনা করেন আল-হিরা শহরকে টার্গেট করে। জলাভূমি পার হয়ে তিনি দ্রুত তাঁর বাহিনী এগিয়ে নিচ্ছিলেন। বাহামানের কল্পনার কয়েক দিন আগেই পূর্ব দিকে মুসলিম বাহিনীর উদয় ঘটল; ওয়ালাজার সামান্য দূরত্বে এসে তারা সেনাদের জন্য তাঁবু খাটাল।

খালিদের সুদক্ষ রণকৌশল

ওয়ালাজায় পারস্য বাহিনীর বিরাট সংখ্যক সাসানি সেনা ছিল পূর্বের যুদ্ধ থেকে পালিয়ে আসা। এরা এখানে এসে পুনরায় অস্ত্র হাতে তুলেছে। যাতুস সালাসিল যুদ্ধ থেকে বেঁচে আসা সেনারা যুক্ত হয়েছিল কারিনের সাথে, এরপর তারা উল্লাইসের যুদ্ধে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়েছে। আবার সেখানে যারা পরাজিত হয়ে পলায়ন করেছিল, তাদেরকে এখন দেখা যাচ্ছে খোরাসানের শাসকের সাথে একজোট হয়ে ওয়ালাজায় এসে জড়ো হয়েছে।

অবস্থাদৃষ্টে মুসলমানরা দুটি কৌশলগত পরিকল্পনা করে। একটি সামগ্রিক, আরেকটি তুলনামূলক আংশিক এবং আনুষঙ্গিক।

এক: সামগ্রিক পরিকল্পনা

পারস্যের দুই বাহিনী অচিরেই একত্র হয়ে মুসলমানদের প্রতিরোধ করার সম্ভাবনা ছিল। এ আশংকার সমাধানে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ চিন্তা করেন, উপস্থিত প্রতিপক্ষের উপর দ্রুত হামলে পড়বেন এবং বাহামানের নেতৃত্বে দ্বিতীয় বাহিনী ময়দানে এসে পৌঁছার আগেই খোরাসানের শাসকের অধীনে ময়দানে হাজির প্রথম এ বাহিনীর ফায়সালা চূড়ান্ত করবেন। এরপর দ্বিতীয় বাহিনী এলে আলাদা করে তাদের মোকাবেলা করা যাবে।

দুই: আনুষঙ্গিক পরিকল্পনা

যুদ্ধের ময়দান থেকে শত্রুপক্ষের একজন সেনাকেও পালাতে দেয়া হবে না, যাতে তারা নতুন করে কাতারবদ্ধ হয়ে পুনরায় যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে না পারে, যেমন এ-যাবৎ তারা করে এসেছে। এ-জন্য সেনাপতি খালিদ ভাবলেন, পারস্য সেনাদে সবদিক থেকে ঘিরে ফেলবেন, পেছন দিক থেকে আক্রমণ করবেন এবং সেখা

তাদেরকে নিঃশেষ করে ফেলবেন। বস্তুত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর এবারের পরিকল্পনাও ছিল অনেকটা সাঁড়াশি চিন্তা-উদ্ভূত।

এদিকে তিনি সুওয়াইদ ইবনু মুকরিনকে আদেশ করলেন, কিছু দায়িত্বশীল লোক নিয়ে বিজিত অঞ্চলগুলোর প্রশাসনের দিকে নজর রাখতে। আরেকদল সাহসী জানবাজদের ছড়িয়ে দিলেন দজলা নদীর আশপাশে, যাতে তারা শত্রুপক্ষের দ্বিতীয় প্লাটুনকে নদী পার হয়ে উত্তর-পূর্ব দিক থেকে মুসলিম বাহিনীর উপর হামলে পড়া থেকে বাধা দেয়। পাশাপাশি সেদিক থেকে শত্রুসেনাদের ব্যাপারে যে-কোনো ধরনের সতর্ক বার্তা যেন সরাসরি মূল বাহিনীতে পৌঁছে দেয়।

যুদ্ধের ভূমি

পারস্য বাহিনীর সাথে মুসলমানদের এবারের যুদ্ধের ভূমি ছিল প্রায় দুই মাইল দীর্ঘ দিগন্তবিস্তৃত সমতল জমিন। যার দুপাশ স্বাভাবিক ভূমি থেকে প্রায় তিরিশ কদম উঁচু। এ সমতল ভূমির উত্তর-পূর্ব পাশ ঢুকে গেছে উত্তপ্ত মরু অঞ্চলে; এই উত্তর-পূর্ব দিকের অনতিদূরেই বয়ে গেছে 'খাসেফ' নামে ফোরাতের একটি উপনদী।

যুদ্ধের ক্ষণ

প্রথম বাহিনীর সেনাপতি খোরাসানের শাসক সাহায্যের ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত ছিল। তাই সে তার বাহিনীকে নদীর পাড় থেকে মাইল খানেক ভেতরে নিয়ে যাওয়ায় কোনো অসুবিধা বোধ করেনি; তার ধারণা ছিল, বাহিনী বৃহৎ ও বিশাল হলে সহজেই প্রয়োজনের সময় নদী ব্যবহার করা যাবে।

তখন হিজরি ১২তম বর্ষ (মে, ৬৩৩ খ্রি.)। চূড়ান্ত যুদ্ধের জন্য উভয় বাহিনী তাদের বিন্যাস সেরে নিয়েছে। প্রত্যেক বাহিনীর রয়েছে একটি কেন্দ্রীয় ভাগ ও কিছু শাখা অংশ। মুসলমানদের শাখা অংশগুলোর নেতৃত্বে ছিলেন আসেম ইবনু আমর আর আসি ইবনু হাতিম। ওদিকে পারস্যের বাহিনী সমতল ভূমির মাঝামাঝি এসে গেছে। তারা ছিল পূর্ব এবং পূর্ব-দক্ষিণমুখী। তাদের ঠিক পশ্চিম-দক্ষিণ দিকে ছিল কিছু উঁচু টিলা। খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু উনার বাহিনীকে দাঁড় করিয়েছেন পারস্য সেনাদের মুখোমুখি করে পূর্ব-উত্তরের টিলাগুলোর সামনে এবং অনেকটা ময়দানের ঠিক মাঝামাঝি অংশে। দুই বাহিনীর মধ্যকার এ বৃত্ত 'মুহারি' ঝরনা থেকে

পূর্ব-দক্ষিণে দুই মাইল 'নাজাফ' এলাকার পূর্ব-দক্ষিণে প্রায় ৩৫ মাইল এবং 'খাশ আস-সানাফিয়া' এলাকা থেকে প্রায় ৬ মাইল দূরত্বে অবস্থান করছিল। এ-যুদ্ধে মুসলিম সেনাদের অধিকাংশই ছিলেন মেষপালক, অশ্বারোহণে অভিজ্ঞ ছিলেন হাতেগোনা মাত্র কয়েকজন।

পারস্যের অপেক্ষারত বাহিনী ভেবেছিল, খালিদের বাহিনী না-জানি কত বড় ও বিশাল হবে। ওয়ালাজার যুদ্ধের আগের রাতে সেনাপতি খালিদ বিশর ইবনু আবি রাহাম এবং সাঈদ ইবনু মারাকে দুই হাজার সেনার দুটি ছোট বাহিনীর নেতা বানিয়ে প্রেরণ করেন। তাদেরকে তিনি নিম্নোক্ত নির্দেশনা দেন:

- প্রত্যেকে মধ্যরাতের দিকে সকলে ঘুমিয়ে গেলে তার অশ্বারোহী সেনাদের নিয়ে পারস্যের অশ্বারোহী শিবিরের দক্ষিণ দিকে দ্রুত বের হয়ে যাবে।

- শত্রুদের অশ্বারোহী শিবিরের পেছনের সারিবদ্ধ টিলাগুলোর অপরপাশে পৌঁছে গেলে তোমরা তোমাদের সেনাদের লুকিয়ে ফেলবে। কিন্তু লুকিয়ে থাকার এ সময়টায় কিছুক্ষণ বাদে আরেকটি টহল দেবার জন্য প্রস্তুত হবে।

- ভোরবেলা যখন যুদ্ধ শুরু হবে, তোমাদের এ দুটি দলের সেনারা তখন টিলার পেছনে লুকিয়ে থাকবে। কয়েকজন ময়দানে আমার ইঙ্গিতের দিকে সতর্ক দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখবে।

- আমি ইশারা দিতেই পেছন থেকে পারস্যের বাহিনীর উপর তোমরা হামলে পড়বে। তোমাদের প্রত্যেক টিম, তাদের একেক পাশে আক্রমণ করবে।

সেনাপতি খালিদ এ-নির্দেশনা ও দায়িত্ব তাদেরই দিয়েছিলেন, যারা তাঁর পরিকল্পনা সুষ্ঠুরূপে বুঝতে ও আঞ্জাম দিতে পারবে, যাতে ব্যবস্থাপনা এবং প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সেনাদের উপস্থাপন উন্নত ও দৃঢ় হয়; তাতে কোনো বিঘ্ন বা অপূর্ণতা না থাকে। এজন্য অন্যান্য সাধারণ সেনাদেরকে—যাদের থেকে সামান্য হলেও সীমালঙ্ঘনের শঙ্কা ছিল—সেনাপতি খালিদ মূল সাঁড়াশি পরিকল্পনার কিছুই জানতে দেননি।

খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ তাঁর অবশিষ্ট ১৪ হাজার সেনাকে পারসিক সাসানি বাহিনীর সামনে দাঁড় করালেন। ওদিকে প্রতিপক্ষ সেনাদের নিয়ে তাদের সেনাপতির পরিকল্পনা ছিল প্রতিরোধমূলক। তারা মুসলমানদেরকে প্রথমে আক্রমণ করার সুযোগ দিচ্ছিল এবং নিজেরা পণ করেছিল তাদেরকে ঠেকিয়ে দেয়ার, যাতে

মুসলমানদের যেচে করা আক্রমণ নিষ্ফল হয়ে যায়। এরপর পাল্টা আক্রমণ করে তারা মুসলমানদের পরাজয় নিশ্চিত করবে বলে ভেবে রেখেছিল।

ময়দানে যুদ্ধের প্রথম সূচনাটা প্রতিপক্ষের সেনাপতির পরিকল্পনা মতোই হলো। খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তার বাহিনীকে ব্যাপকভাবে শত্রুদের উপর হামলা করার নির্দেশ দিলেন। পারস্য সেনাদের কিছু সতর্কতামূলক ব্যবস্থা ছিল, সেনাদলের সাহসী পুরুষেরা সেগুলো পরিকল্পনামতো বাস্তবায়নের চেষ্টা করল, যা মুসলিম বাহিনীর সামনে তাদের টিকে থাকা এবং তাদেরকে ধ্বংস করার মূল পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহায়তা করবে। এরই মধ্যে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ পারস্যের প্রসিদ্ধ বীর যোদ্ধার সাথে—যাকে হাজারমর্দ নামে ডাকা হতো—মুখোমুখি যুদ্ধ করলেন এবং তাকে মেরে ফেললেন। এতে মুসলমানদের ভেতর প্রাথমিক মনস্তাত্ত্বিক বিজয় খেলে গেল।

প্রথম ভাগের যুদ্ধ ততক্ষণে শেষ। দ্বিতীয় ভাগের যুদ্ধ শুরু হলো পারস্য বাহিনীর পাল্টা আক্রমণ দিয়ে। প্রতিপক্ষের সেনাপতি এ-সময় মুসলিম বাহিনীতে কিছুটা ক্লান্তির ছাপ দেখতে পেল। তাই সে ভাবল, এটাই মুসলিম বাহিনীকে সমূলে উৎখাতের জন্য পারসিক সেনাদের চূড়ান্ত আক্রমণের উপযুক্ত সময়। এই ভেবে সে ভারী অস্ত্রধারী মূল অশ্বারোহীদের বাহিনীর সামনের দিকে নিয়ে আসল মুসলমানদের মেরে ফেলার জন্য।

মুসলমানরা কিছু সময় তাদের মোকাবেলা করল, কিন্তু প্রতিপক্ষের অশ্বারোহীরা যথেষ্ট চাপ সৃষ্টি করছিল, তাই মুসলমানরা অস্পষ্টভাবে খানিকটা পিছু হটতে লাগল, যাতে আক্রমণ কিছুটা স্তিমিত হয় এবং সেনাপতি খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের থেকে পরিস্থিতির উপযোগী কিছু পরামর্শ পাওয়া যায়।

পরিশেষে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর মূল পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে টিলার পেছনে লুকিয়ে থাকা সেনাদের বেরিয়ে আসার ইঙ্গিত দিলেন। পারস্য বাহিনীর তাঁবুর পেছন থেকে তারা বের হয়ে এলে তাদের যোদ্ধারা দুভাগ হয়ে গেল। একদল পেছনের ডান দিক সামাল দিতে চলে গেল, আরেকদল বাম দিক মোকাবেলা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কিন্তু এরপরও পারস্য অশ্বারোহীদের ভারী অস্ত্রগুলো মুসলমান অশ্বারোহীদের হালকা ও সামান্য অস্ত্রের মোকাবেলায় পেরে উঠছিল না। তারা এতটা দ্রুত ঢুকে পড়ছিল, যা ভাবা যায় না। এত জলদি আগ বেড়ে আক্রমণ করে, পিছ হটে আবার পুনরায় হামলে পড়ছিল—যা বলা

বাহুল্য। এভাবে পারসিক অশ্বারোহীরা হেরে গেলে ছোট ছোট দলবদ্ধ হামলা করে তাদেরকে সংকুচিত করে চারপাশ থেকে ঘিরে ধরা হলো। এরপর খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের নেতৃত্বে থাকা মুসলিম বাহিনীর মূল অংশ পারসিক বাহিনীর সম্মুখভাগে আক্রমণ করল। এরই মধ্যে পরিকল্পনামতো অশ্বারোহীদের দুই টিম তাদেরকে পুরোপুরি অবরুদ্ধ করে ফেলেছে। ফলে পারস্য বাহিনী এমন জালে আটকে গেল, যা থেকে পালাবার আর কোনো উপায় রইল না।

চারদিক থেকে ধারাবাহিক আক্রমণ হওয়ায় পারস্যের সেনারা এমন এক বৃত্তে আটকে গেল, যেখান থেকে তারা স্বাধীনভাবে না হাতিয়ার উঠাতে পারছিল—না পারছিল আক্রমণকারীদের প্রতিরোধ করতে। এমন ভিড়বাট্টার ভেতরও যারা যুদ্ধের জন্য দাঁড়াচ্ছিল, তারা বুঝতে পারছিল না কার সাথে যুদ্ধ করছে; নিজেদের লোকের সাথে, না মুসলমানদের সাথে। আর যারা পালানোর চিন্তা করছিল, তারা খুঁজে পাচ্ছিল না—কোন দিকে পালাবে।

যুদ্ধ তখন শেষ। পারস্যের বাহিনীর লজ্জাজনক পরাজয় হয়েছে। সাকুল্যে মাত্র কয়েক হাজার সেনা পালাতে পেরেছে, তাদের মধ্যে আছে খোদ সেনাপতিও। কিন্তু ফোরাতের দিকে কোনো পথ না পেয়ে তারা দৌড়ে গেছে মরুভূমির উত্তপ্ত বালুর দিকে। পরে সেখানে বাহিনীর সেনাপতিসহ অনেকে পিপাসায় কাতর হয়ে ক্লান্তি ও কষ্টে মৃত্যুর কোলে ঢলে গেছে।

যুদ্ধের পরকথা

যুদ্ধ থেমে গেলে মুসলিম সেনাপতি খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সেনাদের একত্র করলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, আজকের যুদ্ধ পারস্য শক্তির জন্য প্রচণ্ড ভীতি ও চাপ সৃষ্টি করবে। যদিও মুসলমানরা পারসিক বাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করতে পেরেছে, কিন্তু তারপরও—ওয়ালাজার এ-যুদ্ধ ইরাকের মাটিতে মুসলমানদের জন্য সবচে দীর্ঘ এবং ঘোরতর যুদ্ধ ছিল; আর এ-জন্য যুদ্ধকালের পুরোটা সময়জুড়ে সেনাপতি খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ যে-কোনো মূল্যে মুসলমানদের মনস্তত্ত্ব উঁচু রাখতে নানাভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন।

আইন আত-তামর যুদ্ধ

BATTLE OF AYN AL-TAMR

তারিখ:	১২তম হিজরি / ৬৩৩ খ্রি.
স্থান:	আইন আত-তামর, ইরাক
ফলাফল:	মুসলিম বাহিনীর বিজয়

পক্ষ-বিপক্ষ:	খিলাফতে রাশিদা (মুসলিম)	ইরাকের সাসানি গোষ্ঠী এবং তাদের আরব সহযোগীরা
সেনাপ্রধান:	খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ	আক্কা ইবনু আবি আক্কা
সেনাসংখ্যা:	৫/৬ শত	১০ হাজার
ক্ষয়ক্ষতি:	সামান্য, যা উল্লেখযোগ্য নয়	প্রচুর

আইন আত-তামর নামে প্রসিদ্ধ এ-যুদ্ধটি সংঘটিত হয় সেনাপতি খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী এবং সাসানীয় জোট শক্তিগুলোর মাঝে। এ-যুদ্ধে আরবের বেশকিছু খ্রিস্টান গোত্র সাসানীয়দের সঙ্গে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অংশ নেয়। 'আনবার' অঞ্চলের পশ্চিমে অবস্থিত আইন আল-তামর এলাকাটি পারসিকরা তাদের সীমান্ত রক্ষার জন্য স্থাপন করেছিল। মুসলিম সেনাপতি খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের হাতে দ্বাদশ হিজরিতে (৬৩৩ খ্রিস্টাব্দে) 'আল-হিরা' শহর পতনের পর মুসলমান সেনাবাহিনী এই আইন আল-তামরে অবস্থিত পারস্যের সবচে বড় দুর্গের দিকে যাত্রা করে। 'দাওমাতুল জান্দাল'-এর পথে অবস্থিত এ-দুর্গে তখন পারস্যের মিত্র গোষ্ঠী বেশকিছু আরবীয় খ্রিস্টান গোত্র বসবাস করত। দুর্গটি তখন মোটাদাগে দুই ভাগে বিভক্ত ছিল: প্রথমাংশ ছিল পারসিকদের, যার নেতৃত্বে ছিল পারস্য সেনাপতি মেহরান ইবনু বাহরাম। দ্বিতীয়াংশ ছিল আরবীয়দের, যেখানে আক্কা ইবনু আবি আক্কার নেতৃত্বে বসবাস করত তাগলিব, নামর এবং ইয়াদ গোত্রের লোকেরা।

এ যুদ্ধটি ইতিহাসে অন্যতম 'দ্রুতসমাপ্ত' যুদ্ধ হিশেবে পরিচিত; যেখানে আরবের খ্রিস্টানরা ময়দানে কার্যত কোনো যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার আগেই তল্পিতল্পা তুলে পালিয়ে গিয়েছিল।

যুদ্ধের আগে

আইন আত-তামর দুর্গে আরবদের নেতৃত্বে থাকা আক্কা ইবনু আবি আক্কা হঠাৎই অহংকারী এবং উদ্ধত হয়ে ওঠে। সকলের কাছে প্রকাশ হয়ে যায়, সে মূলত মুসলমানদের সাথে বিজয়ের গর্ব, গৌরব এবং মর্যাদা—একা লুফে নিতে চায়। সে পারস্য নেতা মেহরানকে বলে, ময়দান খালি করে দিতে, যাতে সে পারসিকদের

কোনো সহায়তা ছাড়া একাই মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারে। সে বলে: 'আরবদের যুদ্ধরীতি সম্পর্কে আরবরাই অধিক প্রাজ্ঞ; অতএব, খালিদ-বধে আমাকে একা ছেড়ে দাও', সে এমন কথা বলে ওঠে—অথচ খালিদের ইতিপূর্বের বিজয়েতিহাস সম্বন্ধে তার জানাশোনা কম নয়।

মেহরান আক্কার এমন বাসনা দেখে বলল: 'তুমি ঠিকই বলেছ; সত্যিই তোমরা আরবদের যুদ্ধরীতির ব্যাপারে বেশি জানো, তেমনি অনারবদের যুদ্ধ সম্পর্কে তোমাদের চেয়ে আমরা অধিক প্রাজ্ঞ ও অভিজ্ঞ। ঠিকাছে, তাদেরকে তোমাদের হাতে ছেড়ে দিলাম; তবে কখনো আমাদেরকে তোমাদের প্রয়োজন হলে সহযোগিতার জন্য আমরা প্রস্তুত আছি।' মেহরান মূলত মুসলমানদের সাথে সম্মুখযুদ্ধ এড়াতে চাচ্ছিল; কারণ সে জানত, ইরাকে লাগাতার বিজয়ের কেতন উড়িয়ে আসা অদম্য এ বাহিনী পরাভূত হবার নয়। আক্কার সাথে বলা মেহরানের এমন আলাপনে পারস্যনেতারা অসন্তুষ্ট হয়ে সমালোচনা শুরু করলে মেহরান তাদেরকে বলে: 'ছাড়ো আমাকে, আমি তোমাদের কল্যাণ আর এই আরবদের অকল্যাণই ভেবেছি! ময়দানে ওপ্রান্তে হাজির হয়েছে এমন সেনাদল, যারা তোমাদের বাদশাদের নাকানি-চুবানি খাইয়েছে; তোমাদের তলোয়ারের খাঁজ ভেঙে দিয়েই যারা এখানে তাঁবু গেড়েছে। তাই আমি ভেবেচিন্তেই এই আরবদের তার (খালিদের) থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছি। এই আরবরা খালিদকে পরাজিত করলে, সেটা তোমাদের জন্যই কল্যাণের; আর তারা হেরে গেলে, খালিদের ফায়সালার জন্য মাঠে নামব আমরা। আর তোমরা তো দেখছই, সেনাসদস্যে তারা দুর্বল, আর আমরা শক্তিশালী।' মেহরানের এমন ব্যাখ্যা ও কারণ শুনে সকলে তার সিদ্ধান্তের যথার্থতা বিনা-বাক্য-ব্যয়ে মেনে নিল।

যুদ্ধ

আক্কা তার খ্রিস্টান আরব সেনাদের নিয়ে মুসলিম বাহিনীর মোকাবেলার উদ্দেশ্যে সদম্ভে 'আইন আল-তামর' দুর্গ থেকে বের হলো। মরুভূমির বালুকাময় ধূলিপ্রান্তর উদ্ধত পায়ে দ্রুত চিরে মুসলমানদের উপর প্রাণপণ আক্রমণের জন্য এগিয়ে যাচ্ছে সে। চলতে চলতে 'কারখ' নামক স্থানে পৌঁছে সে যাত্রাবিরতি করল এবং সেনাদের প্রস্তুত করে নিল। ওদিকে মুসলমানরাও যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত। সেনাপতি খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ দ্রুত তাঁর সেনাদের গুছিয়ে নিলেন এবং যুদ্ধের প্রস্তুতি সেরে নিলেন।

মুসলিম সেনাপতি খালিদ শত্রুপক্ষের সেনাপতি আক্কাকে এর আগে কখনো দেখেননি। তাই যোদ্ধার চোখে সচেতন মনে তিনি তার দিকে অনুসন্ধানী দৃষ্টি দিলেন। তাঁর মনে হলো, লোকটা খুবই অহংকারী এবং একগুঁয়ে। তাই তিনি দুঃসাহসিক এক অভিনব কৌশল করার চিন্তা করলেন। ভাবলেন, প্রতিপক্ষের সেনাপতি আক্কার উপর বজ্রাঘাতের মতো এক প্রাণোৎসর্গকারী হামলা চালাবেন এবং তাকে অপহরণ করে নিয়ে আসবেন। সে-মতে তিনি মুসলমানদের মধ্য থেকে একদল বীর বাহাদুর সেনা নির্বাচন করলেন এবং তাদের সাথে এই দুঃসাহসিক চিন্তার বিনিময় করলেন।

যুদ্ধ-পরিকল্পনার দাবি ছিল, মুসলমানরাই আগে ছোট ছোট দলবদ্ধ আক্রমণ শুরু করবে। একেবারে হামলে পড়ে প্রতিপক্ষ আরব খ্রিস্টানদের বাহিনীর উভয় পার্শ্বকে ব্যস্ত করে তুলবে না। ঘটলও তাই। মুসলিম বাহিনীর দুই পাশকে হালকা আক্রমণে লাগিয়ে প্রতিপক্ষের মনোযোগ সেদিকে নিবদ্ধ রাখলেন; মাঝের মূল অংশকে নীরব রেখে সেনাপতি খালিদ চূড়ান্ত হামলার জন্য তাঁর ইঙ্গিতের অপেক্ষা করতে বললেন। বাহিনীর মূল কেন্দ্রীয় অংশের হামলা থেকে বিরত থাকার এই চিত্র আক্কার কাছে একেবারে নতুন লাগল। মুসলিম সেনাপতির এমন সিদ্ধান্তে সে যথেষ্ট অবাক হলো। সেনাপতি খালিদ এবং তার সঙ্গীরা বাহিনীর সম্মুখভাগে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

কিন্তু এর অল্প কিছুক্ষণ পরে যা ঘটল, তাতে এই সামান্য বাহিনীর আক্রমণের তোপে পড়ে খ্রিস্টানদের দশ হাজার সেনা হতবুদ্ধি হয়ে গেল। তখনও আঘাতের ঘোর কাটেনি, আক্কা নিজেকে আবিষ্কার করল খালিদের দু হাতের মধ্যে—বন্দি অবস্থায়। সেনাপতি খালিদ তাকে বাচ্চাদের মতো দুই হাতে তুলে নিয়ে মুসলমানদের সারিতে এনে ফেললেন। এ চিত্র দেখে আরবীয় খ্রিস্ট সেনাদের শিরাগুলোয় রক্ত জমে গেল। তাদের উপর সওয়ার হলো অসম্ভব পর্যায়ের ভয়। নতুন আর কোনো তলোয়ার কোষহীন করার সাহস হারিয়ে তারা ময়দান ছেড়ে পালাতে শুরু করল।

জয়ের প্রাপ্তি ও পরাজয়ের পূর্ণতা

যুদ্ধের পরিস্থিতি জানতে মেহরান ময়দানে লোক পাঠিয়ে রেখেছিল। সে যখন জানতে পারল, আক্কা ও তার বাহিনী পরাজিত হয়েছে, কেল্লা থেকে নেমে দ্রুত সে তার দুর্গবাসীদের নিয়ে টেসিফুন বা মাদায়েনের দিকে পালিয়ে গেল। দুর্গ পড়ে রইল ন্যূনতম প্রহরাহীন অবস্থায়।

ময়দান ছেড়ে পালিয়ে আসা আরব সেনারা দুর্গে দৌড়ে এসে দেখে, দুর্গের দরোজা খোলা। তারা দ্রুত ভেতরে প্রবেশ করে নিজেদেরকে নিরাপদ জ্ঞান করে। কিন্তু খালিদ তাদের পশ্চাদ্ধাবনে দুর্গের বাইরে চলে এসেছেন ততক্ষণে। চারপাশ থেকে ঘিরে নিয়ে তিনি শক্ত অবরোধ করেন তাদের। দুর্গ থেকে সেনারা এ-পরিস্থিতি দেখে সন্ধির আবেদন পাঠায়। কিন্তু খালিদ বলেন, তাঁর বশ্যতা মেনে না নেয়া পর্যন্ত কোনো সন্ধি হবে না। তারা নেমে এলে শেকলে জড়ানো হয় সকলের পা, দুর্গ হস্তান্তর হয় মুসলিম সেনাপতির হাতে। এরপর তাঁর আদেশের শিরবিচ্ছিন্ন করা হয় আক্কা ও ময়দানে যুদ্ধ অবস্থায় বন্দি হওয়া অন্যান্যদের এবং যারা তাঁর বশ্যতা মেনে নেমে এল মাত্র—তাদেরও এবং দুর্গে জমা সমস্ত সম্পদ ও সহায়, মুসলমানদের গনিমত বলে স্বীকৃত হলো।

খালিদের যে বন্দিরা মহৎ বড়

দুর্গ জয়ের পর সেনাপতি খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ সেটার ভেতরে প্রবেশ করলেন। সেখানে গির্জার ভেতর এক কারাপ্রকোষ্ঠে দেখতে পেলেন চল্লিশটি স্বল্পবয়সী বালক, যারা ইনজিলের জ্ঞান আহরণে মত্ত ছিল। সেনাপতি তালা ভেঙে তাদের জীবন বাঁচালেন; এরপর মুসলিম ভূমি, রাজ্য ও দেশ-বিদেশে তাদেরকে ছড়িয়ে দিলেন।

আইন আল-তামর দুর্গে সেনাপতি খালিদের হাতে আসা সে-সব বালকদের একজন ছিলেন সিরিন, যাকে আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু ক্রয় করে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। এই সিরিনই প্রসিদ্ধ ফকিহ ইমাম মুহাম্মদ ইবনু সিরিনের পিতা। তেমনি এই বন্দিদলের আরেকজন ছিলেন নুসাইর, যার ঔরসে পরবর্তীতে জন্ম গ্রহণ করেন দিগ্বিজয়ী মুসলিম সেনাপতি মুসা বিন নুসাইর।

দাওমাতুল জান্দাল যুদ্ধ

BATTLE OF DAWMAT AL-JANDAL

তারিখ:	১২তম হিজরি / ৬৩৩ খ্রি.
স্থান:	দাওমাতুল জান্দাল
ফলাফল:	মুসলিম বাহিনীর বিজয়

পক্ষ-বিপক্ষ:	খিলাফতে রাশিদা (মুসলিম)	কালব নামক আরবের খ্রিস্টান গোত্র
সেনাপ্রধান:	খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ	জুদি ইবনু রাবিআ
সেনাসংখ্যা:	১০ হাজার	১২/১৫ হাজার
ক্ষয়ক্ষতি:	জানা যায় নি	অধিকাংশ সেনা নিহত, মহিলা শিশুসহ বহু যুবক আটক

দাওমাতুল জান্দাল। দ্বাদশ হিজরি সময়ের আরব উপদ্বীপাঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক কেন্দ্র। জায়গাটি প্রসিদ্ধ হয় এখানে অবস্থিত জনপ্রিয় বাজারটির কারণে; বাজারটিতে প্রচুর দোকানপাট আর ব্যবসায়ীদের আনাগোনা থাকায় প্রতিদিনই ধনাঢ্য ক্রেতা আর সাধারণ জনগণের প্রচণ্ড ভিড় পড়ে যেত এখানে। তাছাড়া ভৌগোলিকভাবে ইরাক, সিরিয়া এবং আরবের মধ্যকার বাণিজ্যিক রুটগুলোর অন্যতম জংশন হয়ে ওঠে—বাজারকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এই দাওমাতুল জান্দাল এলাকাটি।

যুদ্ধকালীন এতদাঞ্চলের ধর্মীয় বিশ্বাস

দাওমাতুল জান্দালের লোকেরা ঐতিহাসিকভাবে বিভিন্ন মূর্তির পূজা করে বেড়াত। কিন্তু ইসলাম আগমনের কিছুদিন পূর্বে এ অঞ্চলে ইহুদি এবং খ্রিস্টান ধর্মের প্রচলন ঘটে। তবে এ দুই ধর্মের পাশাপাশি তখনও কিছু লোক প্রাচীন সংস্কৃতির অনুসরণে ইসলাম প্রকাশের আগপর্যন্ত নানা নামের মূর্তিদের পূজায় লিপ্ত ছিল। ইতিহাসের বিভিন্ন সূত্রমতে এই এলাকার লোকেরাই প্রসিদ্ধ 'ওয়াদ' (وَدّ) মূর্তির পূজা করত। তাবুক যুদ্ধের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে হযরত খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এ অঞ্চলে আসেন এবং এই প্রাচীন মূর্তিটি গুঁড়িয়ে দেন।

দাওমাতুল জান্দালে মুসলমানদের বারংবার অভিযান

দাওমাতুল জান্দালে মুসলমানদের মোট চারটি অভিযান পরিচালিত হয়। প্রথমবার ৫ম হিজরিতে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাওমাতুল জান্দালে একটি বাহিনী নিয়ে হাজির হন, কিন্তু এসে তিনি সেখানে কোনো বসবাসকারী

খুঁজে পাননি।

এরপর ৬ষ্ঠ হিজরিতে (৬২৬ খ্রিস্টাব্দে) তিনি সাহাবি আবদুর রহমান ইবনু আওফ রাদিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে এখানে আরেকটি বাহিনী পাঠান। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সংবাদ আসে, এখানকার অধিবাসীরা ব্যবসায়ী কাফেলাগুলোতে ডাকাতি করে এবং তাদের মালামাল লুট করে। তিনি বাহিনীর প্রধান আবদুর রহমান ইবনু আওফকে বলে দেন, প্রথমে তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করতে এবং সেখানকার বাদশার কন্যার সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে। পরবর্তীতে দাওমাতুল জান্দাল অভিযান শেষ করে মদিনায় ফিরে এসে সেখানকার বাদশা আসবাগ ইবনু আমরের ইসলাম গ্রহণের পর সাহাবি আবদুর রহমান ইবনু আওফ তার কন্যা 'তুমাজির'-কে বিয়ে করেন।

এরপর নবম হিজরিতে (৬৩০ খ্রিস্টাব্দে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৃতীয়বারের মতো হযরত খালিদ ইবনুল ওয়ালিদকে ৪২০ জন অশ্বারোহীর বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে দাওমাতুল জান্দালে প্রেরণ করেন সেখানকার শাসক আকিদার ইবনু আবদিল মালিক আল-কিন্দিকে ধরে আনার জন্যে। সে পরবর্তীতে রাসূলের সামনে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে এবং রাসূল দাওমাতুল জান্দালের ব্যাপারে একটি অঙ্গীকারনামা লিখে দেন।

যুদ্ধকালীন মুসলমানদের খলিফা

দ্বাদশ হিজরি চলছে। মুসলিম জাহানের খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ইয়ামামা থেকে ইরাকের যুদ্ধে রওনা হবার নির্দেশ পাঠালেন। এদিকে ইয়াজ ইবনু গানামকে পাঠালেন দাওমাতুল জান্দাল অধিকার করে উত্তরের গোত্রগুলোতে ইসলাম প্রসার করার ফরমান দিয়ে।

ইয়াজ যখন দাওমাতুল জান্দালে পৌঁছলেন, শহরের দুর্গটি তখন সিরিয়ার পূর্বাঞ্চলে বসবাসকারী খ্রিস্টানঅধ্যুষিত 'কালব' গোত্রের লোকেদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। ইয়াজ দুর্গের দক্ষিণ দিকে তাঁর বাহিনীর শিবির স্থাপন করলেন। ফলে দুর্গাশ্রয়ীদের সামরিক কর্মযজ্ঞের চিন্তা একেবারে অনর্থক হয়ে উঠল। ভেতরের আরব খ্রিস্টানরা নিজেদেরকে পুরোপুরি অবরুদ্ধ মনে করতে লাগল, অথচ দুর্গের উত্তর পাশ তখনও খোলা; সেখানে কোনো অবরোধ নেই। এদিকে দুর্গ ঘেঁষে থাকা মুসলিম সেনারা

সেখানে বেশিক্ষণ টিকতে পারছিল না, উপর থেকে তির বর্শা নেমে আসছিল বরাবর। তবে কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে, দুর্গের উত্তর-দক্ষিণ উভয় পাশেই মুসলিম সেনারা অবরোধ গড়েছিল।

কয়েক সপ্তাহ এভাবে কেটে গেল। দুর্গের ভেতর থেকে কিছু তির-বর্শা উড়ে আসা ছাড়া কার্যকর কোনো যুদ্ধই হলো না। এরকম বসে থেকে অপেক্ষা করতে করতেই দুপক্ষের সেনারা ক্লান্ত হয়ে গেল। নিজেদের রসদসামগ্রী ফুরিয়ে আসায় নিজেরাই ক্ষতির দিকে ঝুঁকে যেতে লাগল। অগত্যা সেনাপতি ইয়াজ বাহিনীর এক সেনাকে বললেন, ইরাকে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের কাছে সাহায্য চেয়ে একটি পত্র পাঠাতে। সে দ্রুত একটি চিঠিতে দাওমাতুল জান্দালের বর্তমান অবস্থা বিস্তারিত লিখে ইরাকে রওনা করিয়ে দিল।

মহান সেনাপতি খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের কাছে এই চিঠি যখন পৌঁছল, তিনি তখন আইন আল-তামরের হিসেব চুকিয়ে 'আল-হিরা' শহরের দিকে যাবার মনস্থ করেছেন। ইয়াজের পত্র পেয়ে পরদিন সকালে তিনি ছয় হাজার সৈন্য নিয়ে আইন আল-তামর থেকে সরাসরি দাওমাতুল জান্দাল অভিমুখে যাত্রা করলেন।

পরিস্থিতির নতুন মোড়

দুর্গের ইটে ইটে খবর রটে গেল, খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ এসেছেন দাওমাতুল জান্দাল অবরোধে। দুর্গরুদ্ধ সেনাদের মূল নেতৃত্বে ছিল দুইজন, সদ্য ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে আসা আকিদর ইবনে আবদুল মালিক আল-কিন্দি এবং জুদি ইবনে রাবিআ। হঠাৎ এ দুই আরবনেতার মধ্যে বিরোধ দেখা দিল এবং আকিদর নেতৃত্ব থেকে সরে পড়ল। ইমাম তাবারি তার ইতিহাসগ্রন্থে লেখেন, 'দাওমাতুল জান্দালে যখন খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ আসার সংবাদ পৌঁছল, আকিদর এবং জুদির অধীনে থাকা সেনাদের মধ্যে তখন বিরোধ উস্কে উঠল। আকিদর বলল: 'খালিদের ব্যাপারে আমার চেয়ে ভালো কেউ জানে না, যুদ্ধের ময়দানে তার চেয়ে ভাগ্যবান এবং সাহসী নেতা হতে পারে না। ক্ষুদ্র হোক বা বৃহৎ—যে সম্প্রদায়ই খালিদের মুখ দেখেছে, তারা পরাজিত হয়েছে। তাই হে গোষ্ঠী নিষ্ঠ পুরুষেরা, নিজেদের কল্যাণ চাইলে আমার কথা মেনে নাও।' কিন্তু অধীনস্থ লোকেরা তার কথা শুনল না। এই দেখে সে বলল: 'খালিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমি তোমাদের নেতৃত্ব দিতে পারব না; এখন তোমাদের মর্জি।' এরপর সে দুর্গ থেকে বেরিয়ে গেল। কিন্তু তার দুর্গ ছাড়ার

কথা পৌঁছে গেল খালিদের কাছে। তিনি আসিম ইবনু আমরকে পাঠালেন তাকে খুঁজে বের করতে। আসিম খুঁজে তাকে ধরে নিয়ে আসলে খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তার গর্দান উড়িয়ে দিলেন।

পরিস্থিতি বেগতিক বুঝতে পেরে দুর্গে পলায়নের ঘোষণা জানানো হলো। যারা এই কিছুক্ষণ আগে ইয়াজ ইবনু গানামের সামনে শক্ত প্রতিরোধ করার চিন্তা করেছিল, খালিদকে অবরোধে অংশ নিতে দেখেই তাদের প্রাণের পানি শুকিয়ে গেল। তারা দেরি না করে সাহায্যের আবেদন সমেত পার্শ্ববর্তী আরব গোত্রগুলোতে দূত পাঠাল। আশেপাশের খ্রিস্টান আরব গোষ্ঠীগুলোও সানন্দে তাদের সহযোগিতায় ইতিবাচক সাড়া দিল। কালব এবং গাসসান গোত্রের সেনারা দুর্গ বাঁচাতে তাদের সাথে অংশ নিল। ফলে সর্বমোট সেনাসংখ্যা এত বেড়ে গেল যে, দুর্গে জায়গা সংকুলান না হওয়ায় অনেকে দুর্গের দেয়ালের নিচে অবস্থান গ্রহণ করল।

যুদ্ধের গতি

সেনাপতি খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ এসে ইয়াজ ইবনু গানামকে তাঁর নেতৃত্বে নিয়ে নিলেন। এখন দুই বাহিনী মিলে মুসলমানদের সেনাসংখ্যা দাঁড়াল প্রায় ১০ হাজারে; যেখানে প্রতিপক্ষের সেনা সদস্য প্রায় ১২/১৫ হাজার।

খালিদ ইয়াজের বাহিনীকে দায়িত্ব দিলেন দুর্গের দক্ষিণ দিকের গমনপথ আটকে দিতে এবং নিজের বাহিনী নিয়ে তিনি তাঁবু ফেললেন দুর্গের উত্তর, পশ্চিম এবং পূর্ব দিকে। রুদ্ধ করে দিলেন ইরাক এবং জর্ডান গমনের পথ। সতর্কতাস্বরূপ কিছু শক্তিশালী সেনাকে তিনি দুর্গের বেশ দূরে দাঁড় করালেন, যাতে দুর্গের পরিস্থিতি দুর্বল করে তাদের উপর চূড়ান্ত হামলা করার আগেই সম্ভাবনার সর্বোচ্চ ক্ষয়ক্ষতি সাধন করে তাদেরকে ব্যাপক চাপে ফেলে দেয়া যায়। সেনাপতি খালিদ নিজেও তাঁর বিশেষ টিম নিয়ে দুর্গ থেকে খানিক দূরে গিয়ে তাঁবু স্থাপন করলেন।

এদিকে আরব খ্রিস্টান বাহিনীর নেতা জুদি ইবন রাবিআ অপেক্ষায় ছিল, কখন মুসলমানরা প্রথম হামলাটা করে; কিন্তু দেখা গেল, মুসলমানরা শান্ত সময় পার করছে, তারা যেন দুর্গে আক্রমণের কোনো চিন্তাই করেনি। বেশকিছু সময় অপেক্ষা করে জুদি নিশ্চিত হয়ে গেল, মুসলমানরা আগ বেড়ে হামলা করবে না; তাই সে নিজেই মুসলমানদের উভয় পক্ষের উপর একযোগে হামলা করার চিন্তা

করল। প্রথম বাহিনী হলো, আরবের পথ আটকে দাঁড়ানো ইয়াজের বাহিনী; আর দ্বিতীয় বাহিনী হলো, খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের উত্তরে অবস্থান করা মূল বাহিনী, যাদের হাতেই তার গোত্রবাসীর জীবন অধিক সংকটাপন্ন। জুদি ভাবল, সগোত্র 'ওয়াদিআ'র লোকদের সহবাহিনীর সবচে বড় অংশ নিয়ে নিজেই খালিদের এই মূল সোনাদলের দিকে অগ্রসর হবে।

পরিকল্পনা অনুসারে জুদি বাহিনীর অধিকাংশ সেনা নিয়ে খালিদের বিপরীতে বের হয়ে গেলে অবশিষ্ট সেনাদের খুব সহজেই প্রতিরোধ করতে সক্ষম হলো ইয়াজ ইবনু গানাম। দুর্গের অপরপাশে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের বাহিনী। জুদি বের হয়ে দেখে, এ-কি—মুসলমানরা তো শান্ত বসে নেই, তারা তো যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নিয়ে সেজন্য সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে রেখেছে। সে তার গোত্রকে বিন্যস্ত করে এগিয়ে গেল খালিদের মোকাবেলায়। যখন উভয় বাহিনীর সামনে খুব বেশি আর দূরত্ব নেই, খালিদ তখন তাঁর বাহিনীকে অতর্কিত হামলে পড়ার নির্দেশ দিলেন। অল্প সময়ের ভেতর কঠোর হাতে দমন করা হলো জুদির বাহিনীকে; কয়েক মিনিটের ব্যবধানে জুদির সেনারা ধুলোয় মিশে গেল।

গোত্রের আরও শতজনের সাথে বন্দি হলো গোত্রপতি জুদি, বাকিরা এলোপাতাড়ি পালিয়ে গেল দুর্গের দিকে লক্ষ করে। আর যে-সকল আরব সেনারা তখনও দুর্গ ত্যাগ করেনি, তারা দেখল, একদল মানুষ এলোমেলো ঘিঞ্জি হয়ে তাদের দিকে ছুটে আসছে—যাদের অর্ধেক মুসলিম সেনা। তারা এসে আটকে দিল দুর্গের ফটক; ওয়াদিআ গোত্রের যারা জুদির সাথে যুদ্ধে নেমেছিল, তাদেরকে দুর্গে ঢোকার সুযোগ দিল না। ময়দান থেকে পালিয়ে আসা এসব সেনাদের সাথে দুর্গের ফটকের সামনে যুদ্ধ হলো ফের। শতজনের মতো বন্দি হলো আরও, রক্তক্ষয়ী কঠিন যুদ্ধের মধ্য দিয়ে এই ফটকের সামনেই প্রাণ গেল বাকিদের।

সেনাপতি খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ জুদি এ তার সাথে বন্দি হওয়া বাকিদের ধরে দুর্গের সামনে নিয়ে এলেন, যাতে সকলেই এদের শিরশ্ছেদের চিত্র দেখতে পায়। এরপরও আরও কিছুদিন দুর্গের অবরোধ বহাল রইল, এরপর চূড়ান্ত হামলা চালালেন সেনাপতি খালিদ। ভেতরের সেনারা যতটা সম্ভব তাদের প্রতিরোধের চেষ্টা করল, কিন্তু খালিদের প্রশিক্ষিত সেনাদলের সামনে এদের কোনো মূল্য ছিল না। ফলে এবার রুখে দাঁড়ানো অধিকাংশের গর্দান কাটা গেল; নারী, শিশুসহ অনেক যুবক মুসলিম বাহিনীর হাতে বন্দি হলো। এ ঘটনা দ্বাদশ হিজরির (৬৩৩ খ্রিস্টাব্দ) আগস্ট মাসের শেষ সপ্তাহের।

যুদ্ধ যখন শেষ

যুদ্ধের পরও বেশ কিছুদিন সেনাপতি খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ দাওমাতুল জান্দালে অবস্থান করলেন। এরপর ইয়াজ ইবনু গানামকে সাথে নিয়ে তিনি 'আল-হিরা' নগরীর পথ ধরলেন। তিনি যখন 'আল-হিরা'য় পৌঁছেন, ততক্ষণে ইরাকের পরিস্থিতি নতুন করে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে; পুনরায় বিনষ্ট হতে শুরু করেছে সামাজিক শৃঙ্খলা।

আজনাদাইন যুদ্ধ
BATTLE OF AJNADAYN

তারিখ:	১৩তম হিজরি / ৬৩৪ খ্রি.
স্থান:	আজনাদাইন, রামাল্লা, ফিলিস্তিন
ফলাফল:	মুসলিম বাহিনীর বিজয়

পক্ষ-বিপক্ষ:	খিলাফতে রাশিদা	বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য
সেনাপ্রধান:	খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ	কুবুকলার
সেনাসংখ্যা:	৪০ হাজার	৯০ হাজার
ক্ষয়ক্ষতি:	৪৫০ জন শহিদ	কয়েক হাজার নিহত

ফিলিস্তিনের রামাল্লার অদূরে ত্রয়োদশ হিজরি (৬৩৪ খ্রিস্টাব্দ) সালে বাইজান্টাইন বাহিনীর সাথে মুসলমানদের সংঘটিত আরেকটি ঐতিহাসিক যুদ্ধের নাম 'আজনাদাইন'। রোমান বাইজেন্টাইনের সাথে খেলাফতে রাশেদার সেনাদের ইতিপূর্বে প্রথম সাক্ষাত হয় শামের ভূমিতে এবং আজনাদাইনের ঠিক দুই বছর পর পনেরো হিজরিতে (৬৩৬ খ্রিস্টাব্দে) ইয়ারমুকের যুদ্ধে এ দুই বাহিনীর চূড়ান্ত এবং গুরুতর মোলাকাত হয়।

মরুভূমির তপ্ত বালু মাড়িয়ে গেলেন যিনি

সেনাপতি খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ তখন ইরাকে। খলিফা আবু বকর সিদ্দিকের পত্র এল, অর্ধেক বাহিনী নিয়ে যেতে হবে শামে। সেখানে দেখা হবে আরেক সেনাপ্রধান সাহাবি হযরত আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে। এরপর দুজনের সম্মিলিত বাহিনীর নেতৃত্ব বুঝে নিতে হবে তাঁর কাছ থেকে।

একই সময় খিলাফতের পক্ষ থেকে আরেকটি পত্র গেল আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ বরাবর, খলিফা সেখানে তাকে জানিয়েছেন—খালিদ আসছে। বলেছেন: '... আমি খালিদকে শামে পাঠাচ্ছি রোমানদের সাথে যুদ্ধের জন্য। আপনি তার কোনো অমতে যাবেন না, তার কথা শুনবেন, তার নেতৃত্ব মানবেন; আমি তাকে আপনার জিম্মাদার হিসেবে নির্ধারণ করেছি। আমি জানি, আপনি তার চেয়ে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ; কিন্তু আমার মনে হয়েছে, যুদ্ধের ময়দানে তার এমন কিছু বুদ্ধি, বিচক্ষণতা এবং অভিজ্ঞতা আছে—যা আপনার নেই। আল্লাহ আপনাকে এবং আমাদেরকে সত্য পথের দিশা দিন! আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।'

খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ খলিফার নির্দেশনা মেনে ইরাকের আল-হিরা থেকে বের

হয়ে গেলেন। ত্রয়োদশ হিজরির সফর মাসের আট তারিখ (১৪ই এপ্রিল, ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দ), সেনাপতি খালিদ নয় হাজার সেনা নিয়ে উত্তরের দিকে রওনা হলেন। যেতে যেতে পার হয়ে গেলেন ইতিহাসের অন্যতম দুঃসাহসিক সমর এলাকা 'সামাওয়া মরুভূমি'। ভয়ঙ্কর এ মরু অঞ্চলে মাত্র আঠারো দিনে প্রায় একশত কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে হাজির হলেন দামেশকের উত্তর ফটকের সামনে। এরপর আরও কিছুদূর গিয়ে 'জাবিয়া'-তে দেখা হলো হযরত আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর বাহিনীর সাথে। অতঃপর উভয় বাহিনী একত্রে রওনা করলেন বসরা নগরীর দিকে।

পুরো বাহিনী তখন খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের নেতৃত্বে সমবেত। সমস্ত সেনাদের নিয়ে তিনি বসরায় শক্ত অবরোধ বসালেন। একপর্যায়ে শহরবাসী সন্ধি করে জিযিয়া প্রদানের শর্ত মেনে নিতে বাধ্য হয়ে পড়ল। সেনাপতি খালিদ তাদের সন্ধিপ্রস্তাব মেনে নিলেন এবং ত্রয়োদশ হিজরির ২৫শে রবিউল আউয়াল মোতাবেক ৩০শে মে ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দে আল্লাহর হুকুমে বসরা নগরী মুসলমানদের করতলগত হয়। এটাই ছিল শামের প্রথম শহর, যা শহরবাসীর জান-মালের নিরাপত্তা-প্রদান-মূলক অঙ্গীকারের মাধ্যমে জিযিয়া কর প্রদানের শর্তে সন্ধিভুক্ত হয়ে খিলাফতের অধীনস্থ হয়ে যায়।

আজনাদাইনের প্রস্তুতি

মুসলমানদের হাতে বসরা নগরীর পতনের পর হেরাক্লিয়াস তার বাহিনী নিয়ে পলায়নের চিন্তা করল। এতক্ষণে তার মনে হলো, বিষয়টা খুবই গুরুতর; একে স্বাভাবিক বা সাধারণ কিছু ভাববার সুযোগ নেই। মুসলমানদের শক্ত হাতে দমন করতে না পারলে শামের সম্পদ ও জনপদের ভবিষ্যৎ-খতরায় পড়ে যাবে। পুরো শামের নিরাপত্তা এবং কর্তৃত্ব তার হাতে আসা পর্যন্ত যুদ্ধের বিকল্প নাই। এই ভেবে বিপুল সেনা সমাগমের চিন্তা করল সে। বাহিনী গঠন করে তাদেরকে বসরায় শুরাহবিল ইবনে হাসানার কাছে পাঠিয়ে দিল, যে মুসলমানদের শহর দখলের পর প্রচণ্ড সেনা সংকটে ভুগছিল। হেরাক্লিয়াসের সেনাসাহায্য পেয়ে তার অধীনে জমা হয়ে গেল বিশাল সমাবেশ। এরপর সেই বাহিনীকে রওনা করালো দক্ষিণ ফিলিস্তিনের আজনাদাইন এলাকায়। পথিমধ্যে এদের সাথে জড়ো হলো আরব ও সিরিয়ার বিভিন্ন খ্রিস্টান গোত্র।

মুসলমানদের সুসংহত সেনাদল 'বাইত জিবরিন' (Bayt Jibrin) থেকে এগারো কিলোমিটার এবং রামাল্লা থেকে ৩৯ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত আজনাদাইনের নিকটবর্তী একটি স্থানে পুনরায় সংগঠিত হলো। জায়গাটি ছিল কাছাকাছি সবগুলো রুটের গুরুত্বপূর্ণ সমাবেশস্থল। প্রায় ৪০ হাজার মুসলিম বীর যোদ্ধাদের বাহিনীকে সেনাপতি খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ ঢেলে সাজালেন। নতুন করে তাদের গঠন ও বিন্যাস শক্ত ও শক্তিশালী করলেন। শামের ভূমিতে রোমানদের সাথে এটাই ছিল মুসলমানদের প্রথম কোনো বৃহৎ যুদ্ধ মোকাবেলা, যেখানে প্রতিপক্ষের সেনাসংখ্যা ছিল প্রায় ৯০ হাজার।

সেনাপতি খালিদ তাঁর বাহিনীকে সীসাঢালা প্রাচীরের মতো সংহত করে দাঁড় করালেন। মূল বাহিনীর ডানে, বামে এবং পেছনে শৃঙ্খলার সাথে বাহিনীর অন্যতম বীর বাহাদুরদের সুষম বিন্যাস ঘটালেন। ডান অংশের নেতৃত্বে রাখলেন সাহাবি মুয়ায ইবনু জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে, বামপাশের দায়িত্ব দিলেন সাঈদ ইবনু আমেরকে। কেন্দ্রীয় পদাতিক সেনাদের সেনানায়কের আসনে রাখলেন হযরত আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে। অশ্বারোহীদের সেনাপতি নির্ধারণ করলেন সাঈদ ইবনু যাইদকে আর মূল সেনাপতি খালিদ বাহিনীর সকল কাতারগুলোতে সতর্ক দৃষ্টিতে টহল দিতে থাকলেন, নির্দিষ্ট কোনো অংশের নেতৃত্বে জমে থাকলেন না। তিনি ক্রমাগত সেনাদেরকে যুদ্ধের জন্য উৎসাহ দিচ্ছিলেন; ধৈর্য, অবিচলতা এবং কষ্টসহিষ্ণু মনোভাবের দীক্ষা দিচ্ছিলেন, বিভিন্ন কথায়-উপমায়—তাদের মনোবল শক্ত করছিলেন। বাহিনীর পেছনে মহিলারা দাঁড়িয়ে আল্লাহর কাছে কাকুতি-মিনতির সাথে দুআ করছিল; আল্লাহর সাহায্য এবং বিজয় কামনা করছিল। পাশাপাশি সেনাদেরকে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করে যাচ্ছিল।

রোমান সেনারাও ততক্ষণে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছে। তাদের সাহসী নেতাদেরকে যুদ্ধের প্রথম সারিতে রেখে পেছনে দাঁড় করিয়েছে অশ্বারোহীদের মূল অংশ; এরপর বাকি সেনাদেরকে কয়েক ব্যাটেলিয়নে ভাগ করে প্রতি লাইনে একশত সেনা কাতারবদ্ধ করে দিয়েছে।

যুদ্ধের বারুদ

সেদিন ত্রয়োদশ হিজরির ২৭শে জুমাদাল উলা মোতাবেক ৩০শে জুলাই ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দ। ফজরের সালাতের পর খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ তাঁর বাহিনীকে সামনে এগিয়ে রোমান সেনাদের কাছাকাছি হবার নির্দেশ দিলেন। প্রতিটা ব্যাটেলিয়নের সামনে গিয়ে গিয়ে তাদেরকে বললেন: 'হে আল্লাহর বান্দারা, আল্লাহকে ভয় করো, আল্লাহর পথে আল্লাহর অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো; কিছুতেই কখনো পিছু হটে যেয়ো না, শত্রুদের হাতে লাঞ্ছিত হোয়ো না—বরং সিংহের মতো সামনে অগ্রসর হও, তোমরা তো স্বাধীন এবং সম্মানী জাতি; তোমরা পার্থিব জীবনকে পশ্চাতে ছুড়ে মেরে আল্লাহর ডাকে পরকালের প্রতিদানের আশায় সাড়া দিয়েছ, অতএব শত্রুদের সংখাধিক্য যেন তোমাদেরকে ভীত না করে। ইনশাআল্লাহ, আল্লাহ তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন; যথাযথ শাস্তি প্রদান করবেন।' এরপর বলেন: 'হে লোকসকল, আমি অস্ত্র হাতে নিলে তোমরাও তরবারি তুলবে।'

মুসলিম সেনাপতি খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ চাচ্ছিলেন যুদ্ধটা যোহরের সালাত এবং সূর্য সহনীয় হয়ে বাতাসের মৃদুমন্দ প্রবাহ পর্যন্ত বিলম্বিত হোক। এ সময়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধ করতে পছন্দ করতেন। আর যদি এর আগেই শত্রুপক্ষ হামলে পড়ে, তাহলে মুসলমানরা এ সময়টা আসা পর্যন্ত তাদের প্রতিরোধ করবে।

রোমানদের সেনাসংখ্যা নিয়ে অহংকারে মত্ত ছিল। নিজেদের সদস্য, সামগ্রী এবং যুদ্ধসরঞ্জামে অতিনির্ভর হয়ে তারা মুসলমানদের ডান অংশে আগে হামলা করে বসল। যে দিকটায় নেতৃত্বে ছিলেন হযরত মুয়ায ইবনু জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু। রোমানদের আক্রমণে মুসলমানরা অনড় দাঁড়িয়ে রইলেন, সামান্য পিছু হটলেন না। এরপর শত্রুরা বাম দিকে হামলে পড়ল, কিন্তু ডানপাশের মতো এদিকটায়ও মুসলিম সেনারা তাদের শক্ত আঘাত সহ্য করে দাঁড়িয়ে রইলেন এবং প্রতিহত করলেন। এবার তারা একযোগে মুসলিম বাহিনীর উপর তির বর্ষণ শুরু করল। এতে মুসলিম সেনাপতিরা সেনাপ্রধান খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের কাছে আক্রমণের নির্দেশ চেয়ে আবেদন করলেন, যাতে রোমানরা মুসলমানদের দুর্বল এবং ভীরু না ভাবে এবং সেই সাহসে বারংবার আক্রমণ করে না বসে।

খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ অশ্বারোহীদের দিকে এগিয়ে গিয়ে তাদেরকে বললেন: 'আল্লাহর নামে অস্ত্র হাতে তুলে নাও, তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করুন!'

সেনাপতির নির্দেশে তারা প্রভুর নামে অস্ত্র তুলে নিতেই শত্রুদের পায়ের তলার মাটি কেঁপে উঠল। মুসলমানদের পদাতিক এবং অশ্বারোহী বাহিনী শত্রুদের কাতারে ঢুকে গিয়ে তাদেরকে কচুকাটা করতে লাগল। এতে তাদের ঐক্য নড়ে উঠল এবং শক্তি দুর্বল হয়ে গেল।

রোমান সেনাপতি কুবুকলার যখন দেখল, পরিস্থিতি আর নিয়ন্ত্রণে নেই এবং তার সেনাদলের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী—তখন তার আশেপাশের সেনাদের বলল: 'আমার মাথা কাপড়ে ঢেকে নাও, জলদি।' সেনারা সেনাপতির এমন কথায় অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। সে আবার বলল: 'হতভাগ্য দিন আজ, আমি একে দেখতে চাই না। এমন ঘোরতর দিন আমি এর আগে কখনো দেখিনি।' এই বলে সে তার মাথা কাপড়ে ঢেকে নিল, কিন্তু মুসলমানরা সব কেটেকুটে কুবুকলারের কাছে এসে তার মাথায় ক্রমাগত আঘাতে ছেদ করতে থাকল। কিছুক্ষণের মধ্যেই রোমানদের শক্তিবূহ্য ভেঙে খানখান হয়ে গেল এবং তারা পরাজয় বরণ করে নিল। এই লজ্জাজনক খবর হেরাক্লিয়াসের কানে গেলে তার ভেতরজগতে মুসলমানদের ভয় জেঁকে বসল।

বীরত্ব ও আত্মত্যাগ

এ যুদ্ধে মুসলিম সেনারা ঘোরতর বিপদের মোকাবেলা করেছে। শাহাদাতের তামান্নায় উপস্থাপন করেছে বীরত্বের সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত। শত্রুদলের মোকাবেলায় জিহাদ ও ধৈর্যের উত্তম পরাকাষ্ঠা তুলে ধরেছে। আত্মত্যাগের এমন মহান দিনে মুসলমানদের শিবির থেকে বের হয়ে আসে যিরার ইবনুল আযওয়ারের লাশ। দিনটি ছিল তার শাহাদাতের দিন। শাহাদাতের পূর্বে তিনি তিরিশ জন রোমান সেনাকে জাহান্নামে পাঠিয়েছেন। ওদিকে মুসলিম নারীদের শিবিরে শত্রুপক্ষের কুকুরেরা হামলে পড়লে প্রখ্যাত সাহাবিয়া উম্মে হাকিম রাদিয়াল্লাহু আনহু চারজন রোমান সেনাকে তাঁবুর লাঠি দ্বারা পিটিয়ে হত্যা করে ফেলেন।

এ যুদ্ধে রোমানদের নিহতের সংখ্যা কয়েক হাজার ছাড়িয়ে যায়। এদিকে মুসলমানদের মধ্য থেকে প্রায় ৪৫০ যোদ্ধা শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করে ধন্য হন।

যুদ্ধের ময়দান শান্ত হয়ে গেছে। শূন্যে এলোমেলো উড়তে থাকা ধুলোরা স্থির হয়ে বসেছে মাটির 'পরে। রক্তক্ষয়ী মোকাবেলার পর বিজয় নিশ্চিত হয়েছে

মুসলমানদের। এ সময় খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ একটি চিঠি লিখলেন; দ্রুতগামী ঘোড়ায় করে একজন দূত পারফত সেটা পাঠিয়ে দিলেন মুসলিম জাহানের খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বরাবর। সে চিঠিতে তিনি বিজয়ের সুসংবাদ দিলেন; জানালেন, আল্লাহ তাদেরকে কতখানি সাফল্য এবং কত বিপুল গনিমত দান করেছেন। সেখানে তিনি আরও বলেন:

'.... হামদ ও সালাতের পর,

হে মহান খলিফা সিদ্দিক, আপনাকে অবগত করছি যে, আমরা মুশরিকদের মোকাবেলায় অবতীর্ণ হয়েছিলাম। আজনাদাইনে আমাদের বিপুল সেনা সমাগম হয়েছে। তারা এ ভূমি থেকে ক্রুশের পতাকা তুলে ফেলেছে, ছড়িয়ে দিয়েছে তাদের কিতাব। তারা শপথ করেছে, তাদেরকে মেরে ফেলা বা এ ভূমি থেকে বের করে দেয়া ছাড়া কোনো পরিস্থিতিতেই পিছু হটবে না। এরপর আমরা আল্লাহর উপর ভরসা ও বিশ্বাস রেখে বের হয়েছি। তাদেরকে আঘাত করেছি আমাদের বর্শা দিয়ে; এরপর হাতে তুলেছি তলোয়ার, ময়দানের প্রতিটি কোনায় কোনায় খুঁজে খুঁজে তাদেরকে আহত করেছি। সবশেষে আল্লাহর প্রশংসা করছি যে, তিনি তাঁর ধর্মে মর্যাদা রক্ষা করেছেন এবং শত্রুদের করেছেন চূড়ান্ত লাঞ্ছিত; পাশাপাশি তাঁর বন্ধুদের সাথে দেখিয়েছেন উত্তম আচরণ।'

আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু আজনাদাইন থেকে আসা খালিদের চিঠিটা পড়েই আনন্দিত হয়ে উঠলেন। বললেন: 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ পাকের, যিনি মুসলমানদের বিজয় দান করেছেন এবং তদ্দ্বারা আমার চক্ষু শীতল করেছেন।'

সেতুর যুদ্ধ

BATTLE OF THE BRIDGE

তারিখ:	১৩তম হিজরি / ৬৩৪ খ্রি.
স্থান:	কুস আন-নাতেফ, ইরাক
ফলাফল:	মুসলিম বাহিনীর পরাজয়

পক্ষ-বিপক্ষ:	খিলাফতে রাশিদা	পারস্যের সাসানি সাম্রাজ্য
সেনাপ্রধান:	আবু উবাইদ আস-সাকাফি	বাহমান জাযুয়া
সেনাসংখ্যা:	৮ হাজার	৭০ হাজার সেনা ১০টি রণহস্তি
ক্ষয়ক্ষতি:	৪ হাজার শহিদ	৫ হাজার নিহত

ইসলামের সামরিক ইতিহাস আমাদের জন্য বহুমুখী শিক্ষার আধার। ইতিহাসের এই শিক্ষাগুলো অর্জন ও অনুধাবন উম্মতের সকলের জন্য অত্যাবশ্যক। কিয়ামত অবধি যে-কোনো যুগে, যে-কোনো সময় এই শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সমান। এমনকি, যে সব যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয় ঘটেছে, আমাদেরকে ইতিহাসের সে সব পৃষ্ঠাগুলোর সামনেও দাঁড়াতে হবে সতর্ক হয়ে; সূক্ষ্ম নজরে সে সব কারণগুলো তুলে আনতে হবে, যেগুলো আমাদের পরাজয় নিশ্চিত করেছিল। হয়তো পরাজয়ের সেই তিক্ত দাস্তানের অন্যতম প্রসিদ্ধ যুদ্ধ ত্রয়োদশ হিজরির শাবান মাসের ২৩ তারিখ ঘটে যাওয়া—ব্যাটল অফ দ্য ব্রিজ বা সেতুর যুদ্ধ।

যুদ্ধের আভাস

হঠাৎ করে ইসলামের বিরুদ্ধে রোমানদের নানামাত্রিক উত্থান ঘটে, মুসলিম সেনাবাহিনীর একটা বড় অংশ রোমানদের ক্রমবিকাশ ঠেকাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সেই সুযোগে ইরাকে ইসলামের অস্তিত্ব বিনাশ করতে নিজেদের সামরিক কেন্দ্র গড়ে তোলে পারসিকরা। তাদের আক্রোশ থেকে এতদাঞ্চলে ইসলামের আলো জ্বেলে রাখতে মহান সেনাপতি মুসান্না ইবনু হারিসা ইরাক সীমান্তে মুসলিম সেনাদের জমায়েত শুরু করেন। দ্রুত ছুটে যান সে সময়ের মুসলিম খলিফা আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে। কিন্তু দুঃখজনকভাবে তখন তিনি মৃত্যুশয্যায় শায়িত। খুব সামান্য সময়ের ব্যবধানে তাঁর তিরোধান এবং হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর্ব সম্পন্ন হয়। মুসান্না ইবনু হারিসা দেরি না করে তাঁর কাছে ইরাকের সামরিক পরিস্থিতি তুলে ধরেন। মাত্র খেলাফতের দায়িত্ব নেয়া হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সামনে তখন বহু গুরুত্বপূর্ণ কাজ পড়ে

আছে। এরপরও ইরাকে পারস্যশক্তির নব উত্থান ঠেকাতে জিহাদ ফি-সাবিলিল্লাহর প্রয়োজনীয়তাকে তিনি গুরুত্বের সাথে নিলেন। মুসলমানদেরকে তিনি ইরাকের পারস্যবিরোধী জিহাদের জন্য আহ্বান করলেন। কিন্তু কেবলই সাবেক খলিফার মৃত্যু ঘটায় পরিস্থিতি মুসলমানদের কাছে পুরোপুরি পরিষ্কার ছিল না। ফলে লোকেরা উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর এমন আহ্বানে কতটা কী সাড়া দিবে, বুঝতে পারছিল না। বারবার অব্যাহত প্রচেষ্টার পর হাজার খানেক লোকের সাড়া পাওয়া গেল। খলিফা উমর তাদেরকে একত্র করে আবু উবাইদ আস-সাকাফির[১] নেতৃত্বে দিয়ে ইরাক অভিমুখে পাঠিয়ে দিলেন। তবে সকল ঐতিহাসিক এ ব্যাপারে একমত যে, হযরত আবু উবাইদ আস-সাকাফি নেতৃত্বের জন্য অতটা যোগ্য ছিলেন না। কিন্তু তিনি বীরত্বে, নিষ্ঠায় এবং তাকওয়ায় ছিলেন পরিচিত এবং প্রসিদ্ধ। এমনকি, তৎকালীন আরব সমাজে বিভিন্ন উপলক্ষে তার বীরত্বের উপমা টানা হতো এবং খোদ উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুও সেটা সম্যক জানতেন। কিন্তু খিলাফতের এমন দুর্বল স্নায়বিক সময়ে আবু উবাইদকে নেতা হিসেবে নির্ধারণ করা ছাড়া তার সামনে অন্য কাউকে নির্বাচনের সুযোগ ছিল না।

আবু উবাইদ আস-সাকাফি তার বাহিনী নিয়ে তখনই ইরাকে ছুটে যান। সেখানে প্রবেশ করেই তিনি মুসলমানদের কাতারবদ্ধ করতে সক্ষম হন। আল্লাহ তাআলার দয়া এবং নিজের বীরত্বকে পুঁজি করে তিনি সামনে অগ্রসর হন এবং সে অঞ্চলে মুসলমানদের হস্তচ্যুত এলাকাগুলো পুনরুদ্ধারে সক্ষম হন। মাত্র দশ হাজার সেনা নিয়ে তিনি নামারাক, সাকাতিয়া এবং বাকসিয়াসার মতো গুরুত্বপূর্ণ তিনটি যুদ্ধে নিজের পক্ষে বিজয় তুলে নেন। খলিফা উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু পুরোটা সময় গুরুত্বের সাথে আবু উবাইদের সার্বিক খবরাখবর রাখছিলেন। তার বিজয়ের গল্পগুলো জেনে তিনি তার সেনা-নেতৃত্বের প্রতি অনেকটা আশ্বস্ত হতে পারেন।

---

[১] আবু উবাইদ ইবনু মাসউদ ইবনু আমর ইবনু উমাইর ইবনু আওফ আস-সাকাফি (মৃত্যু: ২২শে অক্টোবর, ৬৩৪ খ্রি.)। তিনি তায়েফে জন্মগ্রহণ করেন। ছিলেন অন্যতম সাহসী একজন সেনাপতি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশাতেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে ধন্য হন। খলিফা হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর নির্দেশে তিনি পারস্যের বেশকিছু এলাকা খিলাফতের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে সক্ষম হন। নামারিক, সাকাতিয়া এবং বাকসিয়াসায় পারসিক বাহিনীকে দক্ষতা এবং বীরত্বের সাথে তিনি পরাজিত করেন। তিনি ছিলেন বিখ্যাত মুখতার আস-সাকাফির পিতা এবং হযরত উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর ছেলে আবদুল্লাহ ইবনু উমারের শ্বশুর। জিসরের যুদ্ধে তিনি শাহাদাতবরণ করেন। বর্তমানে তাঁর নামে ইরাকে একটি সেতুর নামকরণ করা হয়েছে। রাদিয়াল্লাহু আনহু! *মারিফাতুর রিজাল*: ১/৩৪১, *আল-লুহুফ ফি কাতলা আত-তুফুফ*: ১৯৬ পৃ.

পারস্য শিবিরের পরিবেশ

আবু উবাইদের নেতৃত্বে ইরাকের মাটিতে মুসলমানদের বৃহৎ তিন বিজয় পারস্য বাহিনীতে বেশ প্রভাব ফেলে; মনস্তাত্ত্বিকভাবে তাদেরকে গোড়া থেকে নাড়িয়ে তোলে। এমনকি রুস্তমের প্রতিদ্বন্দ্বীরা তার উপর হিংস্র সিংহের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ভীরু, অমনোযোগী এবং ব্যর্থ বলে অভিহিত করতে থাকে। এসব আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে পারস্যের সেনাদল ভেতর থেকে একেবারে ভেঙে পড়ে। পারসিক সেনাদের মনস্তাত্ত্বিক দৃঢ়তা ফিরিয়ে আনতে রুস্তমের[১] তখন অত্যাবশ্যক দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোনো বড় অভিযান পরিচালনা করা এবং ন্যূনতম যে-কোনো বিজয় অর্জন করা। এই চিন্তা থেকেই সে উচ্চপদস্থ সেনাদের একটি সভা ডাকল। সেখানে তলব করল সেই সেনাপতি জালিনুসকেও, যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করেছিল। রুস্তম তার প্রতি রাগান্বিত হয়ে কিছুটা সময় প্রদানপূর্বক তাকে হত্যা করার হুকুম জারি করল। প্রধান সেনাপতির পদ থেকে তাকে নামিয়ে দিল সহকারী সেনাপতির পদে। এরপর মুসলমানদের বিপক্ষে যুদ্ধ জয়ের জন্য কী পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে, সে-সব বিষয়ে অন্যান্য নেতৃস্থানীয় সমরনেতাদের সাথে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ করল। অন্তত একটাবারও যদি মুসলমানদের বিপক্ষে জয় ছিনিয়ে আনা যায়, তাহলেও সেসব পারস্য সেনাদের মানসিক উন্মেষ ঘটানো সম্ভব হবে—যারা মুসলিম বাহিনীর সাথে বেশ কটি সাক্ষাতে প্রত্যেকবারই পরাজিত হয়ে ফিরেছে। রুস্তম ছিল প্রচণ্ড ধূর্ত প্রকৃতির লোক; সে সভা থেকে খানিক আড়াল হয়ে সাবেক সেনাপতি জালিনুসের সাথে পরামর্শ করল এবং মুসলিম বাহিনীর শক্তি মূল জায়গাগুলো চিহ্নিত করতে চেষ্টা করল। পাশাপাশি মুসলমানদের দুর্বল পয়েন্টগুলো কী কী—সেটাও নোট করল। জালিনুস তাকে জানাল, কেবল অধিক সংখ্যক সৈন্য মুসলমানদের বিপক্ষে যুদ্ধের জন্য যথেষ্ট নয়; কারণ, তাদের যুদ্ধরীতি

[১] রুস্তম ফররুখজাদ। সপ্তম শতাব্দীর পারস্যের সাসানি সম্রাট তৃতীয় ইয়াযদাজারদের অন্যতম সেনাপতি ছিলেন। ছিলেন প্রচণ্ড বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ এবং সাম্রাজ্যের প্রতি বিশেষ অনুগত। মুসলমানদের সাথে তার মোলাকাত হয়েছে বেশ কিছু যুদ্ধে। তোমায় সরাসরি, কোনটায় বা তার পরামর্শে ময়দানে আসার বাহিনীর তলোয়ারের ঝিলিকে। তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, 'সেনাপতি, আরবরা তাদের পোশাকে এতটা অমনোযোগী কেন?' সে বলেছিল: 'আরবরা বাহ্যিক সৌন্দর্যে বিশ্বাসী না, তারা বংশে, সম্মানে, বীরত্বে এবং গৌরবে বিশ্বাসী।' ৬৩৬ সালে কাদেসিয়ার প্রান্তরে সাম্রাজ্যের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ এই সেনাপতি সেই আরবদের হাতেই নিহত হয়ে কর্মের হিসেব দিতে পরকালে চলে যায়।

অনেকটা 'আক্রমণ ও পলায়ন' [১] কৌশল মেনে হয়ে থাকে। এবং তারা যুদ্ধের জন্য এমন কোনো বিস্তৃত সমতল ভূমি খুঁজে বের করে, যা তাদের মরুজীবনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়। এ জাতীয় আরও বেশকিছু পয়েন্ট রুস্তম তার নোটে তুলে রাখে এবং সৈন্যগঠনকালে সেগুলো থেকে উপকার হাসিল করে।

প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে রুস্তম বাহিনীর একজন যোগ্য সেনাপতি নির্বাচন করে। অনেক ভেবেচিন্তে সে পারস্যের সবচে দক্ষ এবং হিংস্র সেনাপতি বাহমান জাদুইয়াকে (Bahman Jaduya) বেছে নেয়। তার আরেকটি বিশেষ দিক হলো, সে মুসলমান এবং আরবদের প্রতি প্রচণ্ড ক্ষোভ এবং ক্রোধ পুষত। তাকে 'জুল-হাজিব' বা ভ্রুধারী বলে ডাকা হতো; কারণ, অতি অহংকারবশত সে তার ভ্রু জোড়াকে চোখের উপর পাক দিয়ে রাখত। সার্বিক বিবেচনার পর রুস্তম এবারের সত্তর হাজার পারসিক সেনার বিশাল বাহিনীর নেতৃত্বের জন্য এই লোককেই যোগ্য মনে করে। তেমনি বাহিনীর অন্যান্য সেক্টরের নেতৃত্বের জন্যও রুস্তম নিজেই লোক নির্ধারন করে দেয়। মুসলমানদের 'আক্রমণ ও পলায়ন' কৌশলে লাগাম পরাতে সে বাহিনীর ব্যাপ্তি বিশাল করে এবং প্রথমবারের মতো তারা পারস্যের সাঁজোয়া অস্ত্র হিসেবে 'হাতির বহর' মাঠে নামানোর চিন্তা করে এবং এই বিশেষ বাহিনীর গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি করার জন্য সে তাদের হাতে দ্রাফুন কাবিয়াঁ নামক পারস্যের সবচে সম্মানের পতাকা তুলে দেয়। পতাকাটি ছিল চিতার চামড়ায় তৈরি, চূড়ান্ত কোনো ঘোরতর লড়াইয়ে কেবল বাদশাদের সাথে এই পতাকা ওড়ানো হতো।

এদিকে এতদাঞ্চলে মুসলিম সেনাদের দায়িত্বে থাকা আবু উবাইদ নিয়মিত পারস্য সেনাদের সামরিক কর্মকাণ্ডের যাবতীয় খোঁজখবর রাখছিলেন। সেই সূত্রে তিনি জানতে পারলেন, মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য রুস্তম এক বিশাল

---

[১] আরবিতে এটাকে الكر و الفر বলা হয়। এটি আরবদের আবহমান কাল থেকে চলে আসা একটি যুদ্ধকৌশল। যুদ্ধ মানেই ধোঁকা, যুদ্ধ মানেই কৌশল। বুদ্ধির খেলায় যে জিততে পারে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ময়দান তার। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পরবর্তী দিগ্বিজয়ী সেনাপতিদের ক্ষেত্রেও দেখেছি, তারা ময়দানের যুদ্ধের আগে যুদ্ধ চালাতেন প্রতিপক্ষের সেনাপতির মাথায়। তাদের পরিকল্পনা ও অন্যান্যের সূক্ষ্ম অনুধাবন অনেকসময় যুদ্ধের মোড় পাল্টে দিতে পারে। বড় বড় বাহিনীকে আমরা মুসলমানদের ক্ষুদ্র দলের সামনে কুপোকাত হতে দেখেছি, আমাদের সেনাপতিদের এই মনস্তাত্ত্বিক বিচক্ষণতার কারণে। তেমনি খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের অন্যান্য শতরকমের কৌশলের সাথে তৎকালিন মুসলিম বাহিনী এই 'আক্রমণ ও পলায়ন'-এর কৌশল মেনে যুদ্ধ করতেন। এর অর্থ অনেকটা 'চিলের মতো হঠাৎ ছোঁ মেরে প্রতিপক্ষকে বিব্রত এবং পর্যুদস্ত করে যাওয়ার মতো'। বিভিন্ন উদ্দেশ্যে সাহসী সেনাদলের মাধ্যমে ময়দানে এই প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হতো।

বাহিনী গড়ে তুলছে। এ সংবাদ জানতে পেরেই তিনি তার বাহিনী নিয়ে 'আল-হিরা' শহরের উত্তরে 'কুস আন-নাতেফ' নামক এলাকার দিকে এগিয়ে যান। এখানে মুসলিম বাহিনীতে সমবেত করে তিনি পারস্য সেনাবাহিনীর অপেক্ষায় বসে থাকেন। পারসিকরাও তাদের অনুসরণে এসে ফোরাত নদীর অপর প্রান্তে এসে জড়ো হয়। মুসলমানদের অবস্থান ছিল ফোরাতের পশ্চিম পাশে, এদিকে বাহমান জাদুইয়ার নেতৃত্বে আসা পারস্য বাহিনীর অবস্থান ছিল নদীর পূর্ব পাশে। উভয় পাড়ের মাঝখানে ছিল একটি সেতু, কেবল যুদ্ধের জন্য ঐ সময়টাতেই পারসিকরা সেটা তৈরি করেছিল। ইতিহাস বলে, তারা এরকম উপস্থিত সেতু নির্মাণে বেশ পারদর্শী ছিল। পারস্য সেনাপতি বাহমান এবার মুসলিম বাহিনীর কাছে একটি পত্র পাঠায়। সেখানে সে বলে: 'হয় নদী পার হয়ে আমরা তোমাদের কাছে আসি, নতুবা একই পথে তোমরা আমাদের মোকাবেলায় আসো।'

আবু উবাইদ মানলেন না উমরের নসিহত

যুদ্ধে বের হবার আগে খলিফাতুল মুসলিমিন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আবু উবাইদ আস-সাকাফিকে কিছু নসিহত করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন: 'নিজের কোনো গোপন খবর কারও কাছে ফাঁস করবে না; তোমার সামনে দিয়ে তোমার গোপনীয়তা খোদ ফাঁস হওয়া পর্যন্ত তুমিই তার একমাত্র মালিক এবং নতুন কোনো সিদ্ধান্ত নেবার আগে অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো সাহাবির সাথে পরামর্শ করে নেবে।' তিনি তাকে বিশেষভাবে সাহাবি হযরত সাদ ইবনু উবাইদ আল-আনসারি এবং সালিত ইবনু কাইস রাদিয়াল্লাহু আনহুমার নাম বলে দিয়েছিলেন।

আবু উবাইদ প্রথম যে ভুলটা করেছিলেন, তা হলো, পারস্যের দূতের সামনেই তিনি তার সঙ্গীদের সাথে পরবর্তী করণীয় বিষয়ে বাদানুবাদে লিপ্ত হয়ে পড়েন। এটা স্পষ্ট রহস্যচ্ছেদ এবং শত্রুর সামনে যুদ্ধপরিকল্পনা ফাঁসের শামিল। এবং পারস্য সেনাপতির পত্র পড়েই তিনি উত্তেজিত হয়ে বলে ওঠেন: 'কসম আল্লাহর, আমি তাদেরকে সেতু পার হয়ে এপারে আসতে সুযোগ দেব না; আমরা কি তাদের মোকাবেলা করতে ভীতু হয়ে পড়লাম?' অথচ সাহাবায়ে কেরাম সকলে নদী পার হয়ে ওপারে যাবার বিপক্ষে ছিলেন। তারা তাকে বলেছিলেনও যে, 'আমরা কীভাবে ওপারে যেতে পারি? ওপারে গেলে আমাদের পেছনে সরে আসার পথ বন্ধ হয়ে

যাবে, আপনার পেছনে থাকবে ফোরাত নদী?'

আরব উপদ্বীপের মুসলমানরা সাধারণত মরু অঞ্চলে যুদ্ধ করে অভ্যস্ত; তাছাড়া সবসময় মুসলমানরা তাদের পেছনে খোলা ভূমি রেখে লড়তে নামে, যাতে সামনে চাপ পড়লে প্রয়োজন পরিমাণ পেছনে সরে আসা যায় এবং ঘটনাক্রমে মুসলিম বাহিনী পরাজয়ের শিকার হলে যাতে মরুপথ পাড়ি দিয়ে ফিরে চলে যাওয়া যায়, পুরো বাহিনী যেন একই ময়দানে একই সাথে ধ্বংস না হয়ে যায়। কিন্তু সাহাবাদের কথায় কান না দিয়ে আবু উবাইদ নদী পেরোনোর সিদ্ধান্তে অটল থাকলেন। সাহাবারা এমন অবস্থা দেখে বারবার তাকে খলিফা উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর নসিহত স্মরণ করিয়ে দিলেন। বললেন: 'খলিফা আপনাকে বলেছিলেন, 'রাসূলের সাহাবাদের সাথে পরামর্শ করতে।' কিন্তু আবু উবাইদ জবাব দিলেন, 'শপথ আল্লাহর, আমরা তাদের সামনে ভীত কাপুরুষ হতে পারব না।' এবং সবচে আশ্চর্যের কথা, তাদের মধ্যকার এ বিবাদ বিতণ্ডা পুরোটাই হয় পারস্য সেনাপতির পাঠানো দূতের সামনে। পরিস্থিতি বুঝতে পেরে সে আবু উবাইদের উত্তেজনা বাড়িয়ে দিতে বলে উঠল: 'আমাদের সেনারা বারবার বলে, আপনারা নাকি ভীরু কাপুরুষ; আপনারা নাকি কখনোই নদী পার হয়ে তাদের কাছে যেতে পারবেন না।' দূতের মুখে এমন কথা শুনে আবু উবাইদ বলেন: 'আমরা অবশ্যই ওপারে যাব।' সেনারা তার কথা শুনে মেনে নিলেন এবং মুসলিম বাহিনী পারস্য সেনাদের মুখোমুখি হতে সংকীর্ণ সেই সেতু পার হয়ে ওপারে যেতে শুরু করে।

এখানে যে বিষয়টা লক্ষণীয়, তা হলো, মুসলিম বাহিনী এমন একটি জায়গায় প্রবেশ করছিল, দুপাশে দুটি নদী যাকে ঘিরে নিয়েছে। একপাশে ছিল ফোরাতের শাখা নীল নদী এবং অপর পাশে খোদ ফোরাত। উভয় নদী তখন জলে থইথই। এদিকে পারস্য সেনারা বাকি দিকগুলো বন্ধ করে দিয়েছে আগেই। অতএব মুসলিম বাহিনী এ জায়গাটিতে ঢুকে পড়া মানে—শত্রুপক্ষের সাথে যুদ্ধ করা ছাড়া তাদের আর কোনো উপায় নেই। পারসিকরা এ অবস্থা ও অবস্থানের গুরুত্ব খুব ভালো করেই জানত। সেজন্যই তারা মুসলিম বাহিনীর জন্য ওপারে একটি সংকীর্ণ ছোট জায়গা বরাদ্দ করে রেখেছিল, যাতে তারা নদী পার হয়ে এসে ক্ষুদ্র পরিসরের এ জায়গাটি আটকে যায় এবং পারস্য সেনাপতির ফাঁদে আটকে যায়। হযরত মুসান্না ইবনু হারিসা ব্যাপারটি উপলব্ধি করতে পেরে সেনাপতি আবু উবাইদকে জানালেন। তাকে আবারও নসিহত করে বললেন: 'আমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছি'; কিন্তু আবু উবাইদ তার সিদ্ধান্তে গোঁ ধরে থাকেন। এরই মধ্যে

মুসলিম বাহিনী সেতু পার হয়ে সেই সংকীর্ণ জায়গাটিতে গিয়ে জড়ো হয়। পারস্যের বাহিনীতে মোট দশটি হাতি ছিল, যার মধ্যে একটি হাতি ছিল সাদা। এটি যুদ্ধে ব্যবহৃত পারসিকদের অন্যতম বড় এবং প্রসিদ্ধ হাতি। অন্য হাতিগুলোও ছিল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত; সাদা হাতিটি এগোলে তারা এগোত, সেটি দাঁড়িয়ে পড়লে বাকিরাও দাঁড়িয়ে পড়ত।

যুদ্ধের ক্ষণ

যুদ্ধ শুরু হলো। প্রথমেই পারসিকরা ফোরাত ও নীলের মাঝে আটকে থাকা মুসলিম বাহিনীর দিকে হস্তি বাহিনী এগিয়ে দেয়। মুসলমানরাও ধীরে ধীরে হাতিগুলোর দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। কিন্তু পেছনে দুপাশে দুটি নদী থাকায় অনন্যোপায় হয়ে তাদেরকে হাতিগুলোর আক্রমণ এবং তা প্রতিরোধের অপেক্ষা করতে হয়। তবে মুসলিম বাহিনীর বীরত্ব ও সাহসিকতা ছিল প্রশংসনীয়, তারা হাতির সারি ভেদ করে যুদ্ধে ঢুকে যায়। কিন্তু দুঃখজনকভাবে তাদের ঘোড়াগুলো হাতি দেখেই ভয়ে মুখ ফিরিয়ে পালাতে শুরু করে, এতে মুসলমানদের অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত হয়। ঘোড়াগুলো পেছনে ছুটতে শুরু করলে পদাতিক মুসলিম সেনাদের উপর আপতিত হয় মহা বিপদ। নানাভাবে চেষ্টা করেও তারা ঘোড়াগুলোকে সামনে এগিয়ে দিতে পারে না। কারণ, হাতির দলের সামনে যুদ্ধ করে সেগুলোর পূর্বঅভ্যাস ছিল না।

এরপরও, যুদ্ধ যখন এমন ঘোরতর, যখন পারস্য সেনাপতির দূতের সামনে মুসলিম সেনাপতি আবু উবাইদ তার গোপনীয়তা ফাঁস করেছেন, যখন তিনি রাসূলের সাহাবিদের পরামর্শ না করে ভুল করেছেন, যখন তিনি যুদ্ধের জন্য বেছে নিয়েছেন এমন প্রতিকূল অবস্থান—এতগুলো ভুলের পরও, তার করণীয় হতে পারত দ্রুত সেনাদের নিয়ে যুদ্ধের ময়দান পরিত্যাগ করা, যেমনটা ইতিপূর্বে 'মাযার' যুদ্ধে করেছিলেন হযরত খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ। তিনি যখন বুঝতে পেরেছিলেন শত্রুপক্ষের দ্বারা চারপাশ থেকে মুসলিমরা অবরুদ্ধ হয়ে গেছে, সাথেসাথে তিনি তার বাহিনী নিয়ে সটকে পড়েছিলেন; এগিয়ে গিয়েছিলেন ওয়ালাজায় অপেক্ষমাণ শত্রুদের মোকাবেলার জন্যে।

কিন্তু আবু উবাইদ এমন প্রতিকূল পরিস্থিতির দাবি বুঝতে পারলেন না। তিনি যুদ্ধ অব্যাহত রাখলেন। বললেন: 'আমরা শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করেই যাব।' যদিও এটা ছিল তার বীরত্ব ও সাহসিকতার উজ্জ্বল প্রমাণ এবং যুদ্ধের স্থিতি-প্রকৃতি নির্ভরও করে

সাহসিকতার উপর—কিন্তু ঘটনার পালাবদলে সেখানে কিছু কর্মগত কৌশলেরও প্রয়োজন আছে। এদিকে পারস্য বাহিনীর হাতিগুলো মুসলমানদের দিকে উদগ্র হয়ে ধেয়ে আসছে। এমন সময় আবু উবাইদ নির্দেশ দিলেন, মুসলিম বাহিনীর সকলে ঘোড়া থেকে নেমে পায়ে হেঁটে যেন হাতিগুলোর মোকাবেলা করে। এতে মুসলমানরা যুদ্ধের অতি প্রয়োজনীয় অস্ত্র ঘোড়াও হাতছাড়া করে ফেলল এবং পারস্যের ঘোড়া-হাতি নিয়ে এগিয়ে আসা অস্ত্রসজ্জিত বাহিনীর সামনে পড়ে গেল পায়ে হাঁটা একদল সৈনিক। ক্রমশ যুদ্ধ পরিণত হলো অগ্নিকুণ্ডে। মুসলমানরা তখনও অবসন্ন হয়ে যায়নি। সেনাপতি আবু উবাইদ ইবনু মাসউদ আস-সাকাফি সামনে এগিয়ে গেলেন। বললেন: 'আমাকে হাতিগুলোর সামনে নিয়ে যাও।' এর আগে একই কথা বলেছিলেন মুসান্না ইবনু হারিসা। লোকেরা বলেছিল: 'আপনি হাতির শুঁড়ে মারা পড়বেন।' কিন্তু তিনি একাই এগিয়ে গেছেন সাদা হাতি নামে হস্তি বাহিনীর প্রধান হাতিটির দিকে।

আবু উবাইদ একই রকম কথা বললে সেনারা বলল: 'হে আবু উবাইদ, আপনি একজন সেনাপতি হয়ে নিজেকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন।' তিনি বলেন: 'শপথ আল্লাহর, আমি তাকে ছাড়ব না; হয় সে মরবে, নয় মরব আমি।' এই বলে তিনি হাতিটির দিকে এগিয়ে গেলেন। হাতির উপরে চালক যেখানে বসেছিল, তিনি সেটার রশি কেটে দেন। চালক নিচে পড়ে গেলে আবু উবাইদ তাকে হত্যা করে ফেলেন। কিন্তু হাতি তখনও জীবিত, সে যুদ্ধ বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। আবু উবাইদের দিকে তেড়ে আসতে থাকলে তিনিও বিশালকায় হাতিটির সাথে যুদ্ধ শুরু করেন। হাতিটি তার পেছনের দু পায়ে ভর করে সামনের পা দুটি আবু উবাইদের মুখের উপর উঠিয়ে দেয়। আবু উবাইদ তখনও দমে যাননি; নানা কৌশলে তিনি হাতিটিকে পরাস্ত ও পরাজিত করতে চেষ্টা করে যাচ্ছেন। কিন্তু অবস্থা গুরুতর বুঝতে পেরেই তিনি চারপাশের সেনাদের লক্ষ করে বলেন: 'আমি যদি মারা যাই, তাহলে বাহিনীর আমির হবে অমুক; তারপর অমুক, তারপর অমুক।' এভাবে তার পরবর্তীতে কার পরে কারা দায়িত্ব পাবে, তিনি তাদের নামগুলো বলতে থাকেন। এটাও আবু উবাইদের অন্যতম একটি কৌশলগত ভুল ছিল; কারণ, একজন সেনাপতির প্রথম দায়িত্ব হলো, নিজেকে রক্ষা করা। এজন্য না যে, তিনি মৃত্যুকে ভয় পান, বরং যুদ্ধের এমন ঘোরতর পরিস্থিতিতে তার সেনাদের দিকে তাকিয়েই তাকে বেঁচে থাকতে হবে। বিষয়টা কেবল বীরত্বের নয়, বরং ব্যাপারটা আরও অনেক কিছুর সাথেই সম্পৃক্ত। একজন সেনাপতির মৃত্যুতে সেনাবাহিনীর মানসিক

অবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে, অনেক কিছুই তার অবস্থান থেকে নড়ে যায়। আবু উবাইদের আরও বড় একটি ভুল ছিল, তিনি পরবর্তী সেনাপতি হিসেবে সাকিফ গোত্রের সাতজনের নাম বলে যান; যাদের সকলে তার ছেলে, তার ভাই এবং অন্যান্য। আট নম্বরে তিনি বলেন হযরত মুসান্না ইবনুল হারিসার নাম। অথচ তার দায়িত্ব ছিল, প্রথমেই আমির হিসেবে হযরত মুসান্না বা সালিত ইবনু কাইসের নাম বলা, যেমনটা তাকে উপদেশ দিয়েছিলেন খলিফা হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু।

সেনাপতি আবু উবাইদের শাহাদাত

আবু উবাইদ হাতিটির সাথে নিরলস যুদ্ধ চালিয়ে যান। তিনি তার শুঁড়টি কেটে ফেলার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু হাতি তাকে সজোরে এক আঘাত করে মাটিতে ফেলে দেয়; এরপর তার উপর হামলে পড়ে এবং সামনের দু পা দ্বারা তাকে পিষে ফেলে। ফলে তিনি ভেতর থেকে থেতলে একেবারে অসাড় অবশ হয়ে যান। সেনাপতিকে এতটা নির্মম মৃত্যু বরণ করতে দেখা নিঃসন্দেহে মুসলিম বাহিনীর জন্য খুবই করুণ পরিস্থিতি তৈরি করে। তার মৃত্যুর সাথেসাথেই তার কথামতো পরবর্তী সাতজনের প্রথম জন সেনাদলের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আবু উবাইদের মতো তিনিও পারস্যের বাহিনীতে ঢুকে পড়েন এবং যুদ্ধ করতে করতে শহিদ হয়ে যান। এভাবে দ্বিতীয় তৃতীয়জন হয়ে ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকে। একে একে এ যুদ্ধে আবু উবাইদের তিনজন পুত্র শাহাদাত বরণ করেন, যাদের প্রথম জন ছিলেন বাবার বলে যাওয়া পরবর্তী সেনাপতি। তেমনি মারা যান তার ভাই হাকাম ইবনু মাসউদ আস-সাকাফি; তিনিও আবু উবাইদের মৃত্যুপরবর্তী মুসলিম বাহিনীর সেনাপতির দায়িত্বে ছিলেন। এভাবে একসময় সেনাদের দায়িত্ব আসে হযরত মুসান্না ইবনু হারিসার কাঁধে। পরিস্থিতি চূড়ান্ত শোচনীয় হয়ে ওঠে, পারস্য বাহিনী তাদের সর্বশক্তি নিয়ে তখন মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

অবস্থার ভয়াবহতা উপলব্ধি করে অনেক মুসলিম সেতু পার হয়ে ফোরাতের ওপারে চলে যাবার চেষ্টা করে। এটা ইতিহাসে প্রথমবার ঘটছিল, যেখানে পারস্যের বাহিনীর সামনে থেকে কোনো মুসলমান যুদ্ধ ছেড়ে পলায়ন করছিল। অবশ্য এমন ঘোরতর পরিস্থিতিতে পলায়ন করার শরয়ি ভিত্তি আছে, এটা 'যুদ্ধ ছেড়ে পলায়ন'-এর অন্তর্ভুক্ত হবে না। আরেকজন মুসলিম এখানে বিরাট এক ভুল করে বসেন।

আবদুল্লাহ ইবনু মারসিদ আস-সাকাফি নামের এক সেনা তার তরবারি দ্বারা নদীর উপর দাঁড় করানো অস্থায়ী সেতুটি কেটে দেয় এবং বলে: 'আল্লাহর কসম, মুসলমান কখনো যুদ্ধ থেকে পলায়ন করতে পারে না; তারা যুদ্ধ করতে থাকবে, যতক্ষণ না তাদের সেনাপতির মতো মৃত্যু তাদেরও আলিঙ্গন করে।' এতে পারস্য বাহিনী মুসলমানদের উপর নতুন করে হামলে পড়ে। পরিস্থিতি আরও প্রতিকূল হয়ে ওঠে। এ-সময় সেতু কেটে ফেলা সেই সেনাকে সেনাপতি হযরত মুসান্না ইবনু হারিসার কাছে নিয়ে আসা হলে তিনি তাকে শাস্তি দেন এবং বলেন: 'তুমি মুসলমানদের কেন এমন বিপদে ফেললে?' সে বলে: 'আমি চেয়েছিলাম, যাতে মুসলমানরা যুদ্ধ থেকে পলায়ন না করে।' সেনাপতি বলেন: 'এটা কিছুতেই যুদ্ধ ছেড়ে পলায়নের অন্তর্ভুক্ত নয়।'

শৃঙ্খলিত সেতু পারাপার

সেনাপতি হযরত মুসান্না ইবনু হারিসা এবার একটি কৌশল করলেন। তিনি শান্তভাবে সেনাদের নিয়ে বসলেন; দূর থেকে মনে হচ্ছিল, পারস্য যোদ্ধাদের এমন শক্ত আক্রমণের পরও তিনি মুসলিম বাহিনীর অবশিষ্ট সেনাদের নেতৃত্ব দিয়ে সংঘবদ্ধ করছেন। গলা উঁচু করে তিনি বললেন: 'হে আল্লাহর বান্দারা, হয় বিজয় তোমাদের পদচুম্বন করবে, নতুবা তোমরা আজ শাহাদাত বরণ করবে।' কিন্তু অপরপাশে তিনি কিছু মুসলিম সেনাকে আদেশ করলেন, যথাসম্ভব দ্রুত সেতুটি মেরামত করার জন্য। মুসলমানদের মধ্যেও কিছু পারস্য সেনা ছিল, যারা পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তারা সেতু মেরামতে পারদর্শী ছিল। সেনাপতির আদেশমতো তারা সেতুটির মেরামতকাজে আত্মনিয়োগ করল। এদিকে সেনাপতি মুসান্না আরেকটি কঠিন কাজের নেতৃত্ব দিলেন। তিনি চিন্তা করলেন, শক্তিশালী এই পারস্য বাহিনীর সামনে থেকে অবশিষ্ট মুসলমানদের যে-কোনো মূল্যে সরিয়ে নিতে হবে। তাই তিনি বাহিনীর সাহসী সেনাদের খবর দিলেন। তাদেরকে বললেন: 'আমাদের সাহসীদেরকে সেতুটির হেফাজতের জন্য দাঁড়াতে হবে।' সে মতে সেতু সংরক্ষণের জন্য সামনে দাঁড়ালেন আসিম ইবনু আমর আত-তামিমি, যাইদ আল-খাইল, সাহাবি সালিত ইবনু কাইস এবং তাদের আমির হিসেবে থাকেন সেনাপতি মুসান্না ইবনু হারিসা। তারা সেখানে সেতুর হেফাজতে দাঁড়ান, যাতে নদী পার হবার সময় পারস্যের সেনারা সেতু কেটে দিতে না পারে। সেনাপতি মুসান্না ইবনু হারিসা শান্ত স্বরে মুসলিম সেনাদের বলেন: 'তোমরা ধীরেসুস্থে পার হও, ভয় পেয়ো না—

আমরা তোমাদের পেছনে আছি; তোমাদের সর্বশেষ জন পার হয়ে যাওয়া পর্যন্ত আমরা এখান থেকে নড়ব না।' মুসলিম সেনারা যুদ্ধ করতে করতে একের পর এক সুযোগ করে সেতু পার হয়ে যেতে লাগলেন। ময়দানের মাটি থেকে সেতুর কাঠ—সবখানে মুসলমানদের রক্ত লেপ্টে যায়; বালু-মাটিতে পড়ে থাকে মুসলিম সেনার খণ্ড দেহ, ফোরাত ও নীলের শান্ত পানিতে পড়ে যায় কারও নিথর শরীর। সেতুর 'পরে সর্বশেষ শাহাদাত বরণ করেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবি হযরত সুআইদ ইবনু কাইস রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং সর্বশেষ পার হয়ে যান সেনাপতি করত মুসান্না ইবনু হারিসা। তিনি শেষ সময় পর্যন্ত পারসিকরদের সাথে যুদ্ধ করে তাদের দিকে মুখ করেই সেতু পার হয়ে চলে আসেন। তিনি পার হতেই পারসিকদের মুখের উপর সেতুটি কেটে দেন, ফলে তারা আর এপারে আসতে পারেনি।

সূর্যের তেজ কমে এসেছে। নারকেল পাতার গা ছুঁয়ে সে নেমে যাচ্ছে অজানায়। মুসলিম সেনাদের গায়ে-মুখে ক্লান্তির ছাপ, চোখের সামনে শত মৃত্যুর নজরানা দেখে এসেছে তারা। পারসিকরা রাতের আঁধারে যুদ্ধ করে না, তাই সূর্যাস্তের আভাস ফোরাতের পূর্ব পাড়ে পড়ে থাকা মুসলমানদের আহত দেহে খানিক স্বস্তির বাতাস দিয়ে যায়। মুসলিম সেনাবাহিনীর জন্য পেছনের মরু এলাকা পার হয়ে চলে যাবার সুযোগ আছে, যাতে সকাল হতেই পারস্য বাহিনী নদী পার হয়ে এপারে এসে অবশিষ্ট সেনাদেরও কতল করে না দেয়।

যুদ্ধের সমাপ্তি

শেষপর্যন্ত দুই হাজার মুসলিম সেনা সেতু পার হয়ে বেঁচে ফিরতে পারে। আবার দুই হাজারের মতো পালিয়ে যায়, কেউ কেউ এ-যাত্রায় সরাসরি মদিনায় গিয়ে বিরতি নেয়। এ-যুদ্ধে মুসলমানদের মোট শহীদের সংখ্যা ছিল চার হাজার। যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে মোট আট হাজার সেনা, চার হাজার মারা যান ময়দানে যুদ্ধ করতে করতে বা সেতু পার হতে গিয়ে নদীতে ডুবে। এই চার হাজারের অধিকাংশই ছিলেন সাকিফ গোত্রের, কেউ কেউ ছিলেন বদর, উহুদ এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে অন্যান্য যুদ্ধের সঙ্গী সাহাবি। পরিস্থিতি ছিল খুবই ভয়াবহ, আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ না হলে একজনও বেঁচে ফিরতে পারতেন না। সবশেষে মুসান্না ইবনু হারিসার নেতৃত্বই মুসলমানদের বেঁচে ফেরা সেনাদের মুক্তির কারণ

হয়। কেননা, মুসান্না ইবনু হারিসা সামরিক ব্যাপারে অতুলনীয় বুদ্ধিমত্তা রাখতেন। বাকি চার হাজার সেনার শাহাদাত মূলত একজন বীর সেনাপতির নেতৃত্বের ফসল। নিহত সেনাপতি আবু উবাইদ ইবনু মাসউদ সত্যিকারেই একজন সাহসী মুমিন ছিলেন; যুদ্ধের ময়দানে শত্রুর মোকাবেলায় তিনি ছিলেন ইস্পাতকঠিন মানসিকতার অধিকারী। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন মুসলমানদেরকে যুদ্ধে যাবার আহ্বান করেছিলেন, সেখানে বহু সাহাবা ছিলেন, যারা ইতিপূর্বে যুদ্ধে গিয়েছেন, সেনাদলের নেতৃত্ব দিয়েছেন—কিন্তু প্রথম যিনি হযরত উমরের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন, তিনি এই আবু উবাইদ আস-সাকাফি। তিনি শেষ পর্যন্ত সাহসের সাথে যুদ্ধের ময়দানে ঢুকে গেছেন, কোনো তিরস্কার বা পিছুটানের পরোয়া করেননি। প্রকাণ্ড হাতির সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে গেছেন, নিশ্চিত জানতেন এতে তার মৃত্যু ঘটতে পারে—তাই সেখানে দাঁড়িয়ে পরবর্তী আমিরদের নাম বলে গেছেন; কিন্তু এরপরও যুদ্ধ তাকে কাবু করতে পারেনি। তবে এরপরও বলতে হয়, যুদ্ধ কেবল বীরত্ব আর ঈমানের নাম নয়, বরং এখানে তুখোড় মেধা, তীক্ষ্ণ কৌশল আর প্রচণ্ড যুদ্ধবিদ্যার দরকার হয়। কোনো ফকির বলেছিলেন: 'যখন একইসাথে দুজন সেনাপতি মিলে, যাদের একজন ঈমানে টইটম্বুর, কিন্তু সে নেতৃত্ব ও ইমারতের মূল্য বোঝে না; আরেকজন মুসলিম, তবে অনেকটা ফাসিক পর্যায়ের, কিন্তু যুদ্ধ বিষয়ে তার দক্ষতার জুড়ি নেই, তাহলে এই ফাসিক ব্যক্তিকে সেনাপতির দায়িত্ব দেয়াতে কোনো সমস্যা নাই। কারণ, এখানে সে-ই পুরো মুসলিম বাহিনীকে মুক্ত করে আনতে পারে; আর অপরজন—হয়তো তার উঁচু ঈমান ও বীরমানস সত্ত্বেও সেনাদলের ভরাডুবির কারণ হবে।'

ঐতিহাসিক এ যুদ্ধটি সংঘটিত হয় ত্রয়োদশ হিজরির ২৩শে রমাদান। আর আবু উবাইদ ইরাকে এসেছিলেন শাবানের ৩ তারিখে। ৮ শাবান তিনি প্রথম নামারিকের যুদ্ধে অংশ নেন, এরপর ১২ তারিখে সাকাতিয়া, ১৭ তারিখে বাকসিয়াসা এবং ২৩ তারিখে অংশ নেন এই জিসর বা সেতুর যুদ্ধে। আবু উবাইদের তার বাহিনী নিয়ে ইরাক আগমনের মাত্র বিশ দিনের ভেতর মুসলমানরা তিনটি বৃহৎ বিজয় লাভ করেছে; সর্বশেষ অর্ধেক সেনার জলাঞ্জলিতে পরাজিত হয়েছে একটি যুদ্ধে, বাকিরা পালিয়ে গেছে এবং মুসান্না ইবনু হারিসার সাথে রয়ে গেছে মাত্র দুই হাজার সেনা। মুসান্না আবদুল্লাহ ইবনু যাইদের মাধ্যমে এ সংবাদ পৌঁছে দেন মদিনায়। তিনি যখন সেখানে পৌঁছেন খলিফা উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনু যাইদের কাছে সবকিছু জেনেও

মুসলমানদের উপর বিষয়টা ভারি হয়ে উঠতে পারে ভেবে পরাজয়ের খবর তিনি পুরোপুরি গোপন রাখলেন। কিন্তু মিম্বরে দাঁড়িয়ে তিনি কান্না ধরে রাখতে পারলেন না। এদিকে মুসলমানদের ব্যাপারটা জানা দরকার, যাতে ইরাকে থাকা অবশিষ্ট সেনাদের সহযোগিতায় নতুন করে সেনা সংগ্রহ করা যায়। তাই কান্না থামিয়ে তিনি বললেন: 'আল্লাহ আবু উবাইদের উপর রহম করুন! সে যুদ্ধ না করে যদি পেছনে ফিরে আসত, তাহলে হয়তো পরিস্থিতি ভিন্ন হতে পারত। কিন্তু আল্লাহর নির্ধারিত ফায়সালা ছিল ভিন্ন, তিনি যা চেয়েছেন তা-ইই ঘটেছে।' এরপর একে একে মদিনায় ফিরে আসেন যুদ্ধ থেকে পলাতক সেনারা। শহরে ঢুকেই তারা প্রচণ্ড কান্নায় পরিবেশ ভারি করে তোলেন; বলেন: 'আমরা কী করে ময়দান ছেড়ে পালাতে পারলাম? কীভাবে যুদ্ধ ছেড়ে ভেগে আসলাম?'

এ ঘটনা মুসলমানদের জন্য লজ্জা ও গ্লানির ব্যাপার ছিল। ইতিপূর্বে কখনোই তারা শত্রুর সামনে থেকে পলায়নের অভ্যস্ত ছিল না। কিন্তু খলিফা হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদেরকে শান্ত করে বলেন: 'আমি বুঝতে পারছি, তোমরা এমন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে পড়ে গিয়েছিলে, যেখান থেকে বেঁচে ফেরাকে যুদ্ধ ছেড়ে পলায়ন বলা যায় না।' তিনি তাদেরকে উৎসাহ দিলেন, উদ্বুদ্ধ করলেন। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন কারি মুয়ায, যিনি মুসলমানদের তারাবিহর সালাতের ইমামতি করতেন। এরপর থেকে যতবার তিনি ময়দান ছেড়ে পলায়নের আয়াত পড়তেন, নামাযেই কান্নায় ভেঙে পড়তেন। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলতেন, 'শান্ত হও! তুমি এ আয়াতের উদ্দিষ্টদের অন্তর্ভুক্ত নও।'

ছোট উল্লাইস এবং ফিরে আসা মনোবল

জিসর বা সেতুর যুদ্ধ থেকে বেঁচে ফেরা সেনাদের নিয়ে মুসান্না ইবনু হারিসা এক আজব কাণ্ড করলেন। তিনি এদেরকে নিয়ে হাফির অঞ্চলে চলে যান। পরবর্তী দিন ২৪শে শাবান মুসলমানদের মোকাবেলার জন্য একদল পারস্য সেনা মুসান্না ইবনুল হারিসার অবশিষ্টাংশ বাহিনীর পিছু নেয়। তাদের বিশ্বাস ছিল, এ দিকে আর কোনো মুসলিম সেনাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু সেনাপতি মুসান্না ইবনু হারিসা তার স্বল্প সেনার এ দল নিয়ে পারস্য বাহিনীতে হামলা করার পরিকল্পনা করলেন, যাতে বিজয়ের আনন্দ মাটি করে দেয়া যায়। তিনি ভাবলেন, সরাসরি সম্মুখ যুদ্ধে না গিয়ে অতর্কিত হামলে পড়তে হবে। সে মতে তিনি উল্লাইসের দিকে অগ্রসর

হলেন, যেখানে ইতিপূর্বে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের নেতৃত্বে মুসলমানদের বিরাট বিজয় অর্জন হয়েছিল। সে যুদ্ধে এই জায়গায় পারস্য বাহিনীর বিপুল সেনার মৃত্যু ঘটেছিল। তিনি সেখানে গিয়ে একদল পারস্য সেনাকে ফোরাত পার হতে দেখলেন। দ্রুত সেনাদের নিয়ে তিনি তাদের চারদিক থেকে ঘিরে ফেললেন এবং সেখানে আটকে পড়া সকলকে হত্যা করলেন। এদের মধ্যে 'জাবান' নামের এক লোক ছিল, যে উল্লাইসের বড় যুদ্ধ থেকে পালিয়েছিল, তেমনি পালিয়েছিল নামারিকের ময়দান থেকেও; এমনকি জিসর বা সেতুর যুদ্ধে পারস্য সেনাপতি বাহমানের পক্ষ থেকে মুসলিম সেনাপতি আবু উবাইদের কাছে পাঠানো সেই দূত ছিল এই 'জাবান'। এ ঘটনা ছোট ও সামান্য হলেও মুসলিমদের হাতে এদের মৃত্যুর খবর পারস্য বাহিনীর ভেতর কম্পন তৈরি করে। তারা একদমই ভাবতে পারেনি যে, সেতুর যুদ্ধের এমন ভয়াবহতার পরও মুসলমানরা ইরাকের ভূমিতে তাদের বিরুদ্ধে কোনো যুদ্ধে আর দাঁড়াতে পারবে। পাশাপাশি উল্লাইসের মাটিতে সংঘটিত এ ছোট যুদ্ধ মুসলমানদের আহত হৃদয়ের ব্যথা উপশমের কাজ করে, তাদের মনোবল এবং মনস্তাত্ত্বিক শক্তির প্রবৃদ্ধি ঘটায়।

বুওয়াইবের যুদ্ধ

BATTLE OF BUWAIB

তারিখ:	১৩তম হিজরি / ৬৩৫ খ্রি.
স্থান:	আল-বুয়াইব, ইরাক
ফলাফল:	মুসলিম বাহিনীর বিজয়

পক্ষ-বিপক্ষ:	খিলাফতে রাশিদা	পারস্যের সাসানি সাম্রাজ্য
সেনাপ্রধান:	মুসান্না ইবনু হারিসা আশ-শাইবানি	মেহরান আল-হামদানি
সেনাসংখ্যা:	১২ হাজার	পদাতিক, অশ্বারোহী এবং হস্তিবাহিনী মিলিয়ে মোট দেড় লাখের মতো
ক্ষয়ক্ষতি:	৪ হাজার শহিদ	নিহত এক লাখেরও বেশি

বুওয়াইবের যুদ্ধ মুসলমানদের ইতিহাসে এক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ এবং ইয়ারমুকের যুদ্ধের প্রধান অনুঘটক। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে ত্রয়োদশ হিজরি ১২ই রমজান সংঘটিত এ যুদ্ধ মুসলমানদের সামনে পারস্য বিজয়ের রাস্তা খুলে দেয়।

যুদ্ধপূর্ব রাজনৈতিক এবং সামরিক পরিস্থিতি

তৎকালীন রাজনীতিতে পারস্য একটি শক্তিশালী বৃহৎ রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত ছিল। নিত্য নতুন যুদ্ধাস্ত্র আবিষ্কারে তাদের তুলনা ছিল কেবলই তারা। এ যাবত মুসলমানদের সাথে তাদের বেশ কয়েকটি মোকাবেলা হয়েছে, যার সর্বশেষ ছিল জিসর বা সেতুর যুদ্ধ। এ যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজিত করতে পেরে তাদের উৎসাহ তখন তুঙ্গে। এ বিজয় তাদের মনস্তাত্ত্বিক শক্তি যেমন বাড়িয়ে তুলেছে, তেমনি ফিরিয়ে দিয়েছে ময়দানের স্থিতি ও ভরসা। পারস্য সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি রুস্তম খুব ভালো করেই জানত, যুদ্ধের ময়দানের এ বিজয় রাজনীতির মাটিতে খুব একটা উন্নতি ঘটাতে পারবে না। কারণ, মুসলমানরা তখন চোখ সেঁটে রেখেছে পারস্য ভূমির ইঞ্চি ইঞ্চি মাটিতে। এতদাঞ্চলে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা এবং দ্বীন কায়েমের স্বপ্ন তাদের অব্যাহত সাধনার ধারাবাহিকতা ধরে রাখবে। তাই সে এমন এক হিংস্র বাহিনী গঠনের চিন্তা করল, যারা মুসলমানদের শক্তিকে পারস্যের মাটিতে একেবারে নিঃশেষ করে দিতে পারবে এবং এ ভাবনা থেকে সে অধীনস্থ সেনাপতিদেরকে এক বিশাল সেনা সংগ্রহের নির্দেশ দিল।

বিপরীতে জিসরের (পুলের যুদ্ধ। আগের পর্বে যেটা গেছে) যুদ্ধে পরাজয় ইরাকে মুসলিম উত্থানকে বাধাগ্রস্ত করে দিয়েছে। তাদের মানসিক এবং আত্মিক অবনতি ঘটিয়েছে চরমভাবে; ফলে তারা বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়েছে।

এদিকে খলিফা উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুও সর্বশেষ পরাজয়ের ঘটনার পর পারস্য বাহিনীর মোকাবেলায় নতুন করে সেনা সাহায্য পাঠাতে আগ্রহ দেখাচ্ছেন না। কিন্তু সেনাপতি মুসান্না ইবনু হারিসা আশ-শাইবানি এবং সেতুর যুদ্ধ থেকে বেঁচে ফেরা অবশিষ্ট মুসলিম সেনাদের সাথে পারস্যের কয়েক সেনাপতির বিক্ষিপ্ত কিছু সংঘাতের ঘটনা—মুসলমানদের মধ্যে আশার আলো জ্বেলে দিল; এতদাঞ্চলে জিহাদের পতাকা উত্তোলনে তারা নতুন করে আগ্রহী হয়ে উঠল।

বাহিনীর সদস্য পূরণ

যারা বিভিন্ন উপলক্ষে ইসলাম ত্যাগ করেছিল, এমন কিছু মুরতাদ তওবা করে পুনরায় মুসলিম সেনাদলে যোগ দেবার আগ্রহ প্রকাশ করল। খলিফা হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের আবেদন গ্রহণ করলেন। এরপর তাদেরকে মুসান্না ইবনু হারিসার পতাকাতলে সমবেত হবার নির্দেশনা দিয়ে রওনা করিয়ে দিলেন। মদিনা থেকে ইরাকের উদ্দেশে বের হওয়া নতুন এ বাহিনীতে ছিলেন সাহাবি জারির ইবনু আবদুল্লাহ আল-বাজালি রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তার গোত্র।

রুস্তম এবার সমাবেশ ঘটাল দেড় লক্ষ সেনার। এক লক্ষ ঘোড়সওয়ার এবং পঞ্চাশ হাজার পদাতিক ও হস্তি বাহিনী। আবার কেউ বলেন: তাদের সংখ্যা ছিল সত্তর হাজার। সে যাহোক, মোটকথা প্রতিপক্ষের শক্তির তুলনায় এবার তাদের সেনা ও সরঞ্জাম ছিল অনেক বেশি। রুস্তম বিশাল এ সেনা বহরের প্রধান সেনাপতি করলেন মেহরান ইবনু বাজানকে। সে আরবি জানত এবং তার বাবা একজন মুসলিম ছিলেন, মুরতাদদের বিরুদ্ধে যিনি যুদ্ধেও অংশ নিয়েছিলেন। সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে পারস্যের এ বাহিনী মুসলিম বাহিনীর মোলাকাতের উদ্দেশ্যে মাদায়েন থেকে আল-হিরার দিকে এগিয়ে যায়।

মুসলিম সেনাপতি হযরত মুসান্না ইবনু হারিসা পূর্বের কিছু টুকরো আক্রমণ এবং মুসলিম শিবিরের কিছু ছোট ছোট বিজয় অর্জন করে নিজেকে ঝালিয়ে নিয়েছিলেন। তেমনি পারস্য বাহিনীর কাছাকাছি থেকে তাদের সাথে বিভিন্ন যুদ্ধ ও সংঘাতে জড়িয়ে তিনি পারসিকদের চিন্তার মানচিত্র ধরতে পেরেছিলেন, তাদের শক্তি ও দুর্বলতার জায়গাগুলো চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন। এজন্য তিনি যুদ্ধের ক্ষেত্র পাল্টে বুওয়াইবে নিয়ে যাবার মনস্থ করলেন এবং তার বাহিনী নিয়ে ফোরাতের পশ্চিম পাড়ে তাঁবু স্থাপন করলেন। তাছাড়া সেনাদের সাথে তার মেলামেশা,

ওঠাবসা এবং বিভিন্ন সময় তাদেরকে উৎসাহমূলক বক্তব্য প্রদান—মুসলমানদের সামনে একটি বিজয়ের আলো জ্বেলে তোলে; তারা দ্বীনের জন্য লড়াই এবং আত্মত্যাগের প্রেরণা খুঁজে পায়।

যুদ্ধের সূচনা

পারস্যের বাহিনী যখন মুসলমানদের সামনে এল, নদী তখন তাদের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াল। মুসান্না তখন সেতুর যুদ্ধের শোধ তুলতে চাইলেন, তাদেরকে বললেন নদী পার হয়ে এপারে আসতে। পারস্যের সেনারা পার হয়ে এলে নিজেদের আবিষ্কার করল মুসলিম সেনাপতির পাতা ফাঁদে; তাদের একপাশে থাকল নদীর থইথই জলরাশি, অপরপাশে সেনাপতি মুসান্নার মেধায় সাজানো বেশ কটি পতাকাবাহী মুসলিম সেনাদল—যাদের সম্মুখে শাহাদাতের জন্য বুক খুলে দেয়া বীর সেনাপতি মুসান্না ইবনু হারিসা রাদিয়াল্লাহু আনহু।

পারস্যের বাহিনী এগিয়ে এল। তাদের কণ্ঠে চিৎকার ও স্লোগানের আগুন জ্বলছে যেন। মুসলিম বাহিনীর ডানপাশের শাহাদাতের তামান্নাধারীদের কাতার চিরে ফেলা তাদের মাকসাদ। হস্তি বাহিনী সমেত এগিয়ে আসা উপচেপড়া এ বাহিনীর সামনে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুললেন মুসলিম সেনারা। যুদ্ধ তুমুল রূপ নিল, দীর্ঘসময় ধরে চলল ক্ষুরধার গতিতে। পেছনে বসে রইল একদল জরুরি ফোর্স, সেনাপতি মুসান্না যাদেরকে যুদ্ধের গতিবিধি লক্ষ রেখে বাহিনীর শেষভাগের নিরাপত্তা জোরদার রাখার দায়িত্ব সঁপেছিলেন।

সেনাপতি মুসান্না ইবনু হারিসা যুদ্ধের ময়দানে চক্কর দিচ্ছিলেন আর প্রয়োজনমতো আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তার বাহিনীকে ধৈর্যধারণের উপদেশ দিচ্ছিলেন; বলছিলেন, যুদ্ধের কোথায় কোন ফাঁকফোকর রয়ে যাচ্ছে—সেগুলো দেখে দেখে বন্ধ করে দাও। তিনি মুসলিম বাহিনীকে উৎসাহিত করে বলছিলেন: 'তোমরা আজ মুসলমানদের লাঞ্ছিত কোরো না; তোমরা আল্লাহর দ্বীনের সাহায্য করো, তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন।' তিনি জানতেন, যুদ্ধের এ দীর্ঘসূত্রিতা সংখ্যাধিক্যকে বীরত্বের উপর ভারী করে তুলবে। তাই তিনি বাজিলা গোত্র, তাদের নেতা জারির ইবনু আবদুল্লাহ এবং কয়েকজন বীর মুসলিম সেনাকে সাথে নিয়ে শত্রুপক্ষের মূল সেনাপতি মেহরানকে লক্ষ করে এগোলেন এবং এই অগ্নিপূজকের শির ছিঁড়ে আনতে সফল হলেন হযরত জারির ইবনু আবদুল্লাহ আল-বাজালি রাদিয়াল্লাহু

আনহু (তবে কেউ কেউ বলেন: পারস্য সেনাপতি মেহরানের হত্যাকারী ছিলেন হযরত মুনযির ইবনু হাসসান ইবনু যিরার রাদিয়াল্লাহু আনহু)। এতে পারস্য সেনাদের ভেতর হতাশা এবং বিক্ষিপ্ত ভাব পরিলক্ষিত হয়। তাদের চেহারায় পতপত করে উড়ে ওঠে পরাজয়ের পতাকা। মুসলিম বাহিনী এবার তাদের সেনশিবিরের মধ্যিখানের মূল অংশে হামলে পড়েন এবং ডান অংশকে বাম অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেন। এরপর সেনাপতি মুসান্না ইবনু হারিসা নদী পার হয়ে যাবার পুলটি ভেঙে দেন, যাতে সে-সব পলায়নপর সেনাদের মাথা কেটে নিতে পারেন, যারা এর আগে তার ও তার সঙ্গীদের রক্ত ঝরাতে চেয়েছিল।

যুদ্ধের পরকথা

পারস্যের বাহিনী ভেঙে কয়েক দলে ভাগ হয়ে গেলে সেনাপতি মুসান্না ইবনু হারিসা মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেন, পলাতক বাহিনীর উপর চড়াও হতে এবং পারস্যের আরও অধিক পরিমাণ জমিনে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে; যে ভূমিগুলো মুসলমানদের চুক্তিতে এসে আবার হাতছাড়া হয়ে গেছে। এ যুদ্ধে পারস্য বাহিনীর মৃতের সংখ্যা ছিল বাহিনীর এক তৃতীয়াংশ, অর্থাৎ প্রায় এক লক্ষ; যাদের কেউ যুদ্ধে মরেছে, কেউবা ডুবেছে নদীর পানিতে। আর মুসলমানদের মধ্য হতে শাহাদাত বরণ করেছেন মাত্র চার জন।

কাদিসিয়ার যুদ্ধ
BATTLE OF AL-QADISIYYAH

তারিখ:	১৫তম হিজরি / ৬৩৫ খ্রি.
স্থান:	কাদেসিয়া, ইরাক
ফলাফল:	মুসলিম বাহিনীর বিজয়

পক্ষ-বিপক্ষ:	খিলাফতে রাশিদা	পারস্যের সাসানি সাম্রাজ্য
সেনাপ্রধান:	সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস	রুস্তম ফররুখজাদ
সেনাসংখ্যা:	৩৬ হাজার	১ লক্ষ ২০ হাজার সেনা, ৭০টি রণহস্তি
ক্ষয়ক্ষতি:	৬ হাজার শহিদ	৬০ হাজার নিহত

কারও মতে ১৪ হিজরির মহররম মাসে, কারও মতে ১৫ হিজরির ১৩ই শাবান আবার কারও মতে ১৬ হিজরি মোতাবেক ৬৩৬ খ্রিস্টাব্দ সনে ইরাকের কাদিসিয়াতে এ যুদ্ধটি সংঘটিত হয়। সাহাবি হযরত সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাসের নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে এ যুদ্ধে ময়দানে আসে পারস্যের বিশাল বাহিনী, যাদের নেতৃত্ব দেয় খোদ রুস্তম ফররুখজাদ। প্রধান সেনাপ্রধান রুস্তমের মৃত্যু এবং মুসলমানদের বিজয়ের মধ্য দিয়ে ঐতিহাসিক এ যুদ্ধ সমাপ্ত হয়।

কেন যুদ্ধের পথে পা বাড়ানো

১৪ হিজরির শেষ ভাগে সেনাপতি মুসান্না ইবনু হারিসার কাছে সংবাদ আসে, পারস্য সম্রাট ইয়াজদাজারদ (Yazdegerd) মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য তার সমস্ত শক্তিকে একত্র করছে। খবর পাওয়ামাত্রই তিনি খলিফা উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে পত্র পাঠান। তিনি সাথেসাথে ইরাকের পথে যুদ্ধে যাবার জন্য মুসলমানদের মধ্যে সাধারণ ঘোষণা দেন। লোকেরা মদিনায় জমায়েত হতে শুরু করে। খলিফা উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে মদিনা থেকে ইরাকের পথে তিন মাইল দূরে একটি জায়গায় নিয়ে জড়ো করেন। লোকেরা জানে না, উমর কী করতে চাচ্ছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদের সাথে নিজে এ যুদ্ধে নেতৃত্ব দেবার ব্যাপারে পরামর্শ চান। কিন্তু সাহাবারা বলেন, ‘রাসূলের অন্য কোন সাহাবিকে এ যুদ্ধের সেনাপতি নিযুক্ত করে আপনি বরং এখানেই থেকে যান।’ এরপর পরামর্শে ওঠে, কাকে তাহলে সেনাপতি বানানো যায়; সকলে হযরত সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর দিকে ইঙ্গিত করেন।

কাদিসিয়ার পথে

সাহাবাদের পরামর্শ মোতাবেক হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ডেকে পাঠান। তিনি তখন হাওয়াযেন গোত্রের যাকাতের মাল গ্রহণের দায়িত্ব পালন করছিলেন। তিনি দারুল খিলাফায় হাজির হলে খলিফা উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে চার হাজার সেনার সেনাপতি নিযুক্ত করে ইরাকের পথে রওনা হবার নির্দেশ দেন। এরপর আরও দু হাজার ইয়েমেনি এবং দু হাজার নাজদি সেনা সংগ্রহ করে দেন। ওদিকে হযরত মুসান্না ইবনু হারিসা রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে আট হাজার সেনা পূর্ব থেকেই ইরাকে অবস্থান করছে। কিন্তু সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু ইরাকে পৌঁছার আগেই হযরত মুসান্না ইবনু হারিসার ইন্তেকাল হয়ে যায়, রাদিয়াল্লাহু আনহু। ধারাবাহিক সাহায্য ও অংশগ্রহণ বাড়তে থাকলে শেষপর্যন্ত হযরত সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে ৩৬ হাজার সেনা একত্র হয়ে যায়।

সমবেত এই সেনাদের ভেতর ৯৯ জন ছিলেন বদরি সাহাবি। ৩১০ জনের অধিক ছিলেন এমন সাহাবি, যারা বাইয়াতুর রিদওয়ান বা তারও আগ থেকে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন; ৩০০ সাহাবি ছিলেন, যারা মক্কা বিজয়ের দিন ইসলামের বাহিনীতে ছিলেন আর ৭০০ সেনা ছিলেন, যারা সাহাবাদের সন্তান। সেনাপতি সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু সেনাদের বিন্যাসের কাজ সেরে ফেললেন। বাহিনীর ডান অংশের নেতৃত্বে রাখলেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনুল মুতাম রাদিয়াল্লাহু আনহুকে, বাম পাশের দায়িত্ব দিলেন হযরত শুরাহবিল ইবনুস সামত আল-আনসারিকে এবং তিনি শহিদ হয়ে গেলে দায়িত্ব নেবে খালিদ ইবনু আরফাতা—এটাও তিনি বলে দিলেন। বাহিনীর সম্মুখ ভাগের দায়িত্বে রাখলেন আসিম ইবনু আমর আত-তামিমি এবং সাওয়াদ ইবনু মালিক আল-আসাদিকে। অশ্বারোহী দলের সেনাপতি করলেন আবদুল্লাহ ইবনু জিস-সাহমিকে; তাদের আহ্বানকারী হিসেবে নিযুক্ত করলেন হযরত সালমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে এবং লিপিকরণের দায়িত্ব দিলেন যিয়াদ ইবনু আবিহ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে এবং সেনাদের বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত করলেন হযরত আবদুর রহমান ইবনু রাবিআ আল-বাহিলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাতে।

এদিকে পারস্য সম্রাট ইয়াজদাজারদ এবার খোদ রুস্তমকে বাহিনীর সেনাপ্রধানের দায়িত্ব নিতে বাধ্য করে। রুস্তম তার বাহিনী নিয়ে যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হয়। তার

সেনাবাহিনীর সম্মুখভাগের দায়িত্ব দেয়া হয় জালিনুসকে, ডানে রাখা হয় সেনাপতি হুরমুজানকে আর বাম পাশের দায়িত্ব দেয়া হয় মেহরান ইবনু বাহরামকে। এভাবে বিন্যাস করে সে তার বাহিনী নিয়ে প্রথমে আল-হিরা ও পরে নাজাফের দিকে অগ্রসর হয়। শেষপর্যন্ত যখন কাদিসিয়া গিয়ে পৌঁছে, তখন তার বাহিনীতে দেখা যায় সত্তরটি হাতির উপস্থিতি।

পত্র বিনিময়

যুদ্ধের পূর্বে সেনাপতি হযরত সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস এবং খলিফা হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুমার মাঝে বেশ কিছু পত্র বিনিময়ের ঘটনা ঘটে। তার মধ্যে একটি চিঠি ছিল এমন:

'হে সাদ ইবনু উহাইব, এ-কথা যেন আপনাকে ধোঁকায় না ফেলে যে, রাসূলুল্লাহ এবং তাঁর বন্ধু সিদ্দিক বিদায় নিয়েছে; অতএব কারও সাথে আল্লাহ তাআলার নিছক বন্দেগি ছাড়া আর কোনো সম্পর্ক নেই। ...মনে রাখবেন, মানুষের মধ্যে যে অভিজাত আর যে নিকৃষ্ট, আল্লাহর কাছে তারা সবাই সমান, তিনি তাদের সকলের রব, আর তারা সকলে তার গোলাম। তাদের সম্মানের তারতম্য ঘটে কেবল ক্ষমায়, বন্দেগি আল্লাহর কাছে তাদের স্তর নির্ধারণ করে। আপনি কেবল সে-বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখুন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে প্রেরিত হয়ে আমাদের ছেড়ে যাওয়া পর্যন্ত যার উপর অটল অবিচল ছিলেন—আপনি সেটাই আঁকড়ে ধরুন, সেটাই একমাত্র বিষয়।'

তিনি আরও বলেন: 'আমাকে আপনাদের সকল অবস্থার সংবাদ জানান। কোথায় যাত্রাবিরতি করেছেন, আপনাদের শত্রুরা আপনাদের কতটা দূরত্বে অবস্থান করছে—সব। আমাকে এত বেশি পত্র লিখুন, যেন আমি আপনাদের সবকিছু দেখতে পাই।'

সেনাপতি হযরত সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু আমিরুল মুমিনিনের কাছে পত্র পাঠালেন। সেখানে তাঁকে পরিস্থিতির সবকিছু খুলে খুলে বর্ণনা করলেন। এমনকি তিনি প্রতিজন সেনার অবস্থানও সেখানে তুলে ধরলেন। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সেনাপতি সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাসকে প্রথমে পারস্য বাহিনীর প্রতি ইসলামের দাওয়াত দিতে ওসিয়ত করেন। সেনাপতি সাদ তা পুঙ্খানুপুঙ্খ পালন

করেন। তিনি সাহাবিদের একটি দল পারস্যের সেনাপতি রুস্তমের কাছে পাঠান তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাতে।

রুস্তমের সাথে কথোপকথন

সেনাপতি সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু একদল নেতৃস্থানীয় সাহাবিদের পারস্য বাহিনীর কাছে পাঠান। তাদের মধ্যে ছিলেন: হযরত নুমান ইবনু মুকরিন, ফুরাত ইবনু হিব্বান, হানযালা ইবনুর রাবিঈ, আতারিদ ইবনু হাজিব, আশআস ইবনু কাইস, মুগিরা ইবনু শুবা এবং আমর ইবনু মাদিকারিবসহ আরও অনেকে। তারা সেনাপতি রুস্তমের তাঁবুতে প্রবেশ করে দেখেন, তার কক্ষে মখমলের কার্পেটের উপর স্বর্ণখচিত গদি রাখা; দামি মণি-মুক্তা দিয়ে সাজানো হয়েছে পুরো তাঁবু, বিভিন্ন বিলাসী বস্তুসামগ্রী ছড়িয়ে আছে চারপাশে। মাঝখানে সেনাপতি রুস্তম বসে আছে একটি সোনার চেয়ারে।

হযরত রিবয়ি ইবনু হিরাশ রহিমাহুল্লাহ একটি ছোট ঘোড়ায় করে মোটা কাপড় পরিহিত অবস্থায় একটি ঢাল ও তলোয়ার নিয়ে সেখানে প্রবেশ করলেন। চলতে চলতে গালিচার একপাশ তাঁর ঘোড়া মাড়িয়ে গেল। এরপর তিনি নামলেন, ঘোড়ার রশিটাকে বাঁধলেন সাজিয়ে রাখা একটি গদির সাথে। হাতে অস্ত্র, গায়ে বর্ম আর মাথায় শিরস্ত্রাণ পরেই তিনি সামনে এগোতে লাগলেন। পারস্যের সেনারা বলল: 'অস্ত্র রেখে দিন।' তিনি বললেন: 'আমি তোমাদের এখানে আসিনি; তোমরা আমাকে ডেকে এনেছ। আমাকে আমার অবস্থায় যেতে না দিলে আমি ফিরে যাব।' দূর থেকে রুস্তম বলল: 'তাকে আসতে দাও।' তিনি তার হাতের বর্শা দ্বারা গালিচায় ভর দিয়ে দিয়ে সামনে এগোলেন, এতে বিছানো গালিচার বেশিরভাগ অংশই ছিঁড়ে গেল। সেনারা বলল: 'তোমরা কেন এসেছ?' তিনি জবাব দিলেন: 'আল্লাহ আমাদের পাঠিয়েছেন, যেন আমরা তাঁর ইচ্ছে অনুযায়ী মানুষকে মানুষের গোলামি থেকে আল্লাহর গোলামির দিকে বের করে নিয়ে আসি। বের করে নিয়ে আসি দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে প্রশস্ততার দিকে, অন্যান্য ধর্মের (!) নিপীড়ন থেকে ইসলামের ন্যায়ের দিকে। তিনি আমাদেরকে তাঁর ধর্ম দিয়ে তাঁর সৃষ্টির কাছে পাঠিয়েছেন, যেন আমরা তাদেরকে সেই ধর্মের দিকে আহ্বান করি। যে সে ধর্ম গ্রহণ করবে, আমরাও তাকে গ্রহণ করব এবং তাকে নিরাপদ রেখে চল যাব; আর যে তা অস্বীকার করবে, আমরা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকব—যতক্ষণ

না আল্লাহর প্রতিশ্রুতি পর্যন্ত পৌঁছি।' পারস্য সেনারা জানতে চাইল: 'কী সেই প্রতিশ্রুতি?' তিনি বললেন: 'জান্নাত—যে আল্লাহর অস্বীকারকারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে মারা যাবে, তার জন্য। আর যারা বেঁচে থাকবে, তাদের জন্য সফলতা এবং বিজয়।' এ কথা শুনে রুস্তম বলল: 'আচ্ছা, তোমাদের সব কথাই শুনলাম। তোমরা কি বিজয়ের ব্যাপারটা আরেকটু পরে নিশ্চিত করবে, যাতে আমরা সকলেই আরেকটু দেখে নেই, কী ঘটে—কে ঘটায়?' তিনি বললেন: 'হ্যাঁ, কেন নয়? কতক্ষণ সময় দরকার আপনাদের? একদিন, দুইদিন?' সে বলল: 'না, আমাদের চিন্তাশীল নেতারা যতক্ষণ না সিদ্ধান্ত দেন।' তিনি বললেন: 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে শত্রুর সাথে সাক্ষাতের পর তাদেরকে তিন দিনের বেশি সুযোগ দিতে শিখিয়ে যাননি; অতএব আপনি আপনার দলের নেতাদের নিয়ে ভেবে দেখুন, এরপর তিনের ভেতর যে-কোনো একটা সংখ্যা বেছে নিন।' রুস্তম বলল: 'আপনিই কি মুসলমানদের নেতা?' তিনি বললেন: 'না, কিন্তু সমস্ত মুসলিম পরস্পর ভাই-ভাই; সর্বনিম্ন জনের দেয়া প্রতিশ্রুতিও সর্বোচ্চ জন রক্ষা করে চলেন।'

মুসলমানদের দূত হযরত রিবয়ি ইবনু হিরাশের কথাবার্তা শুনে রুস্তম তার দলের নেতাদের ডেকে একত্র করল। বলল: 'তোমরা কি কখনো এ-লোকের চেয়ে উত্তম ও মর্যাদাপূর্ণ কথা কাউকে বলতে শুনেছ?' তারা তাকে বলল: 'প্রভুর পানাহ, আপনি কি এর কোনো কথার প্রতি প্রভাবান্বিত হয়ে পড়ছেন? এমন কুকুরের কথায় আপনি নিজের ধর্ম ছেড়ে দিবেন? আপনি তার গায়ের পোশাক দেখেছেন?' রুস্তম বলল: 'তোমাদের ধ্বংস হোক! পোশাক না দেখে তার চিন্তা দেখো; তার কথাবার্তা এবং আচার-আচরণ দেখো। আরবরা আহারে-পোশাকে হালকা ও সাধারণ হলেও তারা বংশের মর্যাদা বজায় রেখে চলে।'

দিগন্তে ভোর নেমে এল। পারস্যের বাহিনী নদী পার হয়ে এসে তাদের সেনাদের বিন্যস্ত করে নিল। মুসলিম সেনাপতি হযরত সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন তাঁর বাহিনীর সামনে খুতবা দিতে দাঁড়ালেন। প্রথমেই তিনি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পবিত্র গ্রন্থের সুরা আম্বিয়ার এ আয়াতটি পাঠ করলেন:

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِى ٱلزَّبُورِ مِنۢ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَنَّ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِىَ ٱلصَّٰلِحُونَ

> *'আমি উপদেশের পর যবুরে লিখে দিয়েছি যে, আমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাগণই অবশেষে পৃথিবীর অধিকারী হবে।'* [১]

এরপর সেনাদেরকে তাঁর প্রতিনিধি খালিদ ইবনু আরফাতার আদেশ-নিষেধ শুনতে ও মানতে উৎসাহিত করেন। কারণ, হযরত সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাসের দুই রানে ও নিম্নদেশে ফোঁড়া হয়েছিল; ফলে তিনি চেহারায় ভর করে বুকের উপর বালিশ রেখে ঘুমুতেন, এমনকি তিনি ঠিকমতো বসতেও পারতেন না। খুতবা শেষ করে তিনি সেনাদের নিয়ে যোহরের সালাত আদায় করলেন। এরপর বাহিনী সামনে এগিয়ে যেতে শুরু করল। সেনাপতি হযরত সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস প্রথমে তাকবিরধ্বনি দিলেন, এতে সেনারা প্রস্তুত হয়ে গেল; তিনি দ্বিতীয়বার তাকবির দিলে সেনারা যুদ্ধের জন্য হাতিয়ার হাতে তুলে নিল, তৃতীয় তাকবির দিলে সেনারা উদ্যমী হলো এবং তিনি চতুর্থ তাকবির দিতেই তারা একযোগে সকলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। শুরু হয়ে গেল তুমুল যুদ্ধ!

কিতাল

মুসলমানদের ঘোড়াগুলো হাতির বহর দেখে আগের মতোই থমকে দাঁড়াল, কোনোটা উল্টো ঘুরে পালাতে লাগল। পারস্যের সেনারা সতেরোটা হাতি নিয়ে বাজিলা গোত্রকে ঘিরে ফেলল। হাতিগুলো তাদেরকে একেবারে পিষে ফেলবে এমন সময় সেনাপতি সাদ সেদিকে তাকালেন। বনু আসাদ গোত্রে খবর পাঠালেন, বাজিলা গোত্রকে বাঁচাও জলদি। তারা বিভিন্ন কৌশল করে সে যাত্রায় হাতির হাত থেকে বাজিলা গোত্রকে বাঁচিয়ে ফিরল। কিন্তু হাতি হঠাৎ বনু আসাদের দিকে তেড়ে আসল। সেনাপতি সাদ সেটা দেখে আসেম ইবনু আমর আত-তামিমিকে ডেকে বললেন, হাতিগুলোর ব্যাপারে কিছু যেন করে। তিনি তার গোত্রের কিছু লোককে সাথে নিয়ে হাতির উপরে রাখা বাক্সগুলোর রশি কেটে দিলেন, এতে হাতিগুলো চিৎকার করে এদিক ওদিক ছুটে গেল; বাকি রইল কেবল একটি অন্ধ হাতি।

আসেম ইবনু আমরের সঙ্গীরা নিজেদের জীবন দিয়ে বনু আসাদ গোত্রকে রক্ষা করল। এরপর পারস্য ও মুসলিম সেনাদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ চলতে থাকল সূর্যাস্ত পর্যন্ত। সেদিন সন্ধ্যায় মুসলিম সেনাদের বাঁচাতে গিয়ে বনু আসাদ গোত্রের পাঁচশত

---

[১] সুরা আম্বিয়া: আয়াত—১০৫

লোক গুরুতর আহত হয়ে পড়ে। যুদ্ধের এই ছিল প্রথম দিন, মহররম মাসের ২৪ তারিখের এ দিনটাকে ইতিহাসে 'আরমাস' বলে অভিহিত করা হয়।

পরদিন সকাল। সেনাপতি সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস নিহতদের দাফনের জন্য পাঠালেন আর আহতদের শুশ্রূষার জন্য পাঠিয়ে দিলেন মহিলা তাঁবুতে। এরই মধ্যে শাম থেকে একদল অশ্বারোহী এসে পৌঁছল, যাদের সম্মুখে দেখা গেল হিশাম ইবনু উতবা ইবনু আবি ওয়াক্কাস এবং কাকা ইবনু আমর আত-তামিমিকে। কাকা ইবনু আমর তার এক হাজার সেনার বাহিনীকে দশ ভাগে বণ্টন করে দিলেন; এরপর প্রথম দশজনকে নিয়ে হযরত কাকা ইবনু আমর নিজে যুদ্ধের ময়দানে রওনা করলেন। এরপর গেল দ্বিতীয় দল, এরপর তৃতীয়; এভাবে সন্ধ্যা পর্যন্ত নতুন দলের পালাবদল হতে থাকল। এতে পারস্য সেনাদের মনোবল ভেঙে গেল। তারা মনে করল, শাম থেকে বুঝি লাখখানেক সেনা সাহায্য এসে পৌঁছেছে মুসলিম শিবিরে। কাকা ইবনু আমর ময়দানে গিয়েই বাহমানের উপর হামলে পড়লেন এবং তাকে হত্যা করে ফেললেন। যুদ্ধের এই দ্বিতীয় দিনে পারস্য বাহিনী এমন কিছুই দেখেনি চোখে, যা তাদের মনে দোলা দিতে পারে। মুসলমানরা কেবল তাদের লাশ ফেলতে থাকল। এদিন তারা ময়দানে হাতি নামায়নি; কারণ, সেগুলোর উপরে রাখার বক্সগুলো আগের দিনই মুসলমানরা কেটে ফেলেছিল; তাই আজকে সেগুলো মেরামতের কাজ চলছে। বরং এ দিন মুসলমানরা তাদের উটগুলোকে কাপড় পরিয়ে ময়দানে নামিয়ে দিল। বিশালদেহী এ প্রাণীগুলো অবগুণ্ঠিত ভয়াবহ কিছু মনে হচ্ছিল। কাকা ইবনু আমর বললেন, এই উটগুলোকে হাতির সদৃশ করে শত্রুদের ঘোড়াগুলোর সামনে নিয়ে যাও। সেনারা যুদ্ধের এই 'আগওয়াসের' দিনে তা-ই করল, যেটা করেছিল পারসিকরা 'আরমাসের' দিনে। এতে পারস্যের ঘোড়াগুলো কিম্ভুতকিমাকার উটের সারি দেখে ময়দান থেকে উল্টো পালাতে শুরু করে। দুপুর পর্যন্ত পারস্যের বাহিনী যুদ্ধের ময়দানে টিকে রইল। এরপর পুনরায় বিকেল গড়ানো থেকে যুদ্ধ চলল একেবারে মধ্য রাত পর্যন্ত। আরমাস তথা প্রথম দিনের রাত ছিল শান্ত, কিন্তু আগওয়াস তথা দ্বিতীয় দিনের রাত ক্রমশ ছেয়ে যাচ্ছিল যুদ্ধের আঁধারে।

তৃতীয় দিনের সকাল। উভয় বাহিনীর মাঝখানে রাখা মুসলমানদের দুই হাজার শহিদের লাশ। পড়ে আছে পারস্য বাহিনীর আহত ও মৃত মোট দশ হাজার সেনা। মুসলমানরা নিয়মমতো তাদের নিহতদের কবর দিয়ে আহতদের সেবার জন্য পাঠাল নারীদের তাঁবুতে। কিন্তু পারসিকদের মৃতদেহগুলো সেভাবেই সৎকারহীন পড়ে

থাকল ময়দানে।

হযরত কাকা ইবনু আমর সারারাত ঘুমুতে পারলেন না। গোপনে চলে গেলেন সেখানে, যেখানে তিনি গতকাল তার সঙ্গীদের রেখে এসেছিলেন। তাদেরকে বললেন: 'সূর্যোদয়ের পর একশো একশো করে ময়দানে আসবে।' ঠিক সময়ে তারা কাকার নির্দেশমতো ময়দানে আবির্ভূত হলে পারস্য বাহিনীর মনোবল একেবারে কম্পমান হয়ে গেল।

তৃতীয় সকালে তখন যুদ্ধ হয়ে গেছে। এই দিনটিকে ইতিহাস চেনে 'আমওয়াসের দিন' হিসেবে। পারসিকরা তাদের ঘোড়ার (সম্ভবত হাতি হবে) সিন্দুকগুলো মেরামত করে আবারও ময়দানে তাদের নামিয়ে দিয়েছে; ফলে মুসলমানদের ঘোড়াগুলো পেছনে দৌড়াতে শুরু করেছে। হাতিগুলো দেখে সেনাপতি সাদ প্রথম দিনের মতো হযরত আসেম ইবনু আমর এবং কাকা ইবনু আমরকে ডেকে বললেন: 'সাদা হাতিটিকে থামাও'; অন্য হাম্মাল এবং রবিলকে ডেকে বললেন: 'পাঁচড়াযুক্ত হাতিটিকে থামাও।' প্রথম দুজন তাদের বর্শা হাতে নিয়ে সাদা হাতিটির দিকে এগিয়ে গেলেন এবং বর্শাদুটি হাতিটির চোখে গেঁথে দিলেন। এতে হাতিটি মাথা ঝাড়া মেরে উপর থেকে মাহুতকে ফেলে দিল এবং ঠোঁটের সম্মুখভাগ ঝুলিয়ে দিল। এরপর হযরত কাকা সামনে গিয়ে হাতিটিকে সজোরে আঘাত করলে সেটা একপাশ হয়ে পড়ে যায়।

এদিকে অপর দুজন পাঁচড়াযুক্ত হাতিটির দিকে গেল এবং হাম্মাল তার চোখে আঘাত করল, এতে হাতিটি জায়গায় বসে পড়ল এবং ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে উঠল। রবিল আরেকটা আঘাত করামাত্রই হাতিটি ঠোঁট বের করে দিয়ে আহত অবস্থায় দৌড়ে চোখের আড়াল হয়ে গেল এবং নদীতে লাফিয়ে পড়ল। তার দেখাদেখি অন্য হাতিগুলোও একই কাজের পুনরাবৃত্তি করল। নদী পার হয়ে এরা সবগুলো একেবারে মাদায়েনে এসে থামল। ময়দান থেকে বিরাটকায় হাতিগুলো বিদেয় নিলে দুই বাহিনীকে শুরু হয় ঘোরতর লড়াই। তৃতীয় দিনের রাতকে বলা হয় লাইলাতুল হারির বা বেড়াল ডাকের রাত। এ রাতে ইশার সালাতের পর হযরত কাকা এবং তাঁর ভাই আমর সেনাদের নিয়ে পারস্য বাহিনীর উপর হামলে পড়েন। সকাল পর্যন্ত এ যুদ্ধ সমানতালে চলতে থাকে। মুসলিমদের সেনাপতি সাদ এবং পারস্যের সেনাপতি রুস্তম বাহিনী সম্পর্কে একেবারে বে-খবর হয়ে পড়েন। ফলে উভয় শিবিরের কেউই সে রাতে সামান্য ঘুমাতে পারেনি। এদিকে মুসলমানদের পক্ষে সেনাদের নেতৃত্ব দিয়ে গেছেন হযরত কাকা একাই।

বিজয়

দুপুর নেমে এলে সর্বপ্রথম ময়দান থেকে সরে যায় পারস্য দলের কেন্দ্রীয় পক্ষের সেনাপতি ফিরজান এবং হুরমুজান; এতে বাহিনীর মধ্যখানের মূল জায়গাটি খালি হয়ে পড়ে। এদিকে আল্লাহর আদেশে শুরু হয় প্রমত্তা বাতাস, যা রুস্তমের সিংহাসন উল্টে নিয়ে সেখানে ফেলে যায় মরুর ধুলো। হযরত কাকা ইবনু আমর রুস্তমের খোঁজে তার তাঁবুর দিকে এগিয়ে গেলে সেখানে তাকে খুঁজে পাননি। সে পালিয়েছে আগেই। আশ্রয় নিয়েছে একটি খচ্চরের পিঠে, যে একটি বোঝা বহন করছিল। হিলাল ইবনু উলফা রুস্তমের উপস্থিতি না জেনেই সেই বোঝাটিতে আঘাত করেন, এতে রুস্তম সেখান থেকে বের হয়ে নদীর দিকে ছুটে যায় এবং নদীতে ঝাঁপ দেয়। হেলাল তাকে দেখতে পেয়ে পেছনে পেছনে যান এবং তাকে হন্যে হয়ে খুঁজতে থাকেন। নদীতে তাকে দেখতে পেয়ে টেনে তুলে এনে হত্যা করে ফেলেন। এরপর তাকে হেঁচড়ে তার সিংহাসনের কাছে এনে ফেলেন এবং বলেন: 'কাবার রবের কসম, আমি রুস্তমকে হত্যা করেছি; তোমরা আমার দিকে ছুটে আসো, দেখো।'

এ দৃশ্য দেখে পারস্য সেনাদলের মনোবল চূড়ান্তভাবে ভেঙে যায় এবং তারা পালিয়ে নদী পার হয়ে যায়। মুসলমানরা তাদের বর্শা ছুড়ে মারতে মারতে এদের পিছু নেয়, ফলে পালাতে গিয়েও কয়েক হাজার পারস্য সেনা নদীতে পড়ে যায়।

কাদিসিয়ার দিনে ও লাইলাতুল হারিরে মুসলমানদের মোট শহিদের সংখ্যা দাঁড়ায় আড়াই হাজার। আর পারসিকদের এক রাতেই নিহত হয় দশ হাজার সেনা। হযরত যাহরা ইবনুল হাওয়িয়্যা আত-তামিমির সাথে সাক্ষাত হয় জালিনুসের, তিনি হাতের কাছে পেয়েই তাকে হত্যা করে ফেলেন। সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর বাহিনী কাদিসিয়ার মাটিতে পারস্য সেনাদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত করার পর মাদায়েনের পথে অগ্রসর হয়।

দামেশক বিজয়

SIEGE OF DAMASCUS

আমিরুল মুমিনিন হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলামি খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর সামরিক বিভাগে শৃঙ্খলা ফিরে আসে। শামের সেনাবাহিনীতে হযরত খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের পরিবর্তে সেনাপ্রধানের দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয় হযরত আবু উবাইদা ইবনু জাররাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাতে। এ দুই জগদ্বিখ্যাত সেনাপতি একত্রে একযোগে ইয়ারমুকের যুদ্ধে মুসলমানদের নেতৃত্ব দেন। ১৫ হিজরির রজব মাসে (আগস্ট, ৬৩৫ খ্রিস্টাব্দে) সংঘটিত গুরুত্বপূর্ণ সে যুদ্ধে শেষপর্যন্ত মুসলমানদের বিজয় নিশ্চিত হয়।

ইয়ারমুকের ময়দানে মুসলমানদের বিজয়ের খবর শুনেই হেরাক্লিয়াস বাইতুল মাকদিস ছেড়ে হিমসের দিকে চলে যায়। সেখানে নিজের যুদ্ধ-বিষয়ক কর্মতৎপরতার সদর দফতর গঠন করে। এদিকে ময়দান থেকে পালিয়ে আসা পরাজিত সেনারা ফিহলের দিকে যাত্রা করে। সেনাপতি হযরত আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ ছোট একদল বাহিনী তাদের পেছনে পাঠিয়ে আমিরুল মুমিনীন হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর নির্দেশনা মোতাবেক মূল বাহিনী নিয়ে দামেশকের দিকে রওনা করেন। খলিফাতুল মুসলিমিন তাকে বলেছিলেন: 'দামেশকের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করো এবং এর জন্য যুদ্ধ করো; কারণ, এটা শামের দুর্গ এবং এতদাঞ্চলের সাম্রাজ্যের মূল কেন্দ্রবিন্দু। ফিহলবাসীদের পেছনে ঘোড়া দৌড়ে তাদেরকে তোমাদের থেকে নির্লিপ্ত করো; তেমনি ফিলিস্তিন এবং হিমবাসীদেরকেও অন্য কিছুতে মনোযোগী করো।'

অবরোধের সূচনা

খলিফার নির্দেশে মুসলিম সেনাদল দামেশকে পৌঁছলে সেনাপতি আবু উবাইদা অবরোধ আরোপের উদ্দেশ্যে তাদেরকে শহরের ফটকগুলোতে বণ্টন করে দেন। শুরাহবিল ইবনু হাসানাকে রাখেন তাওমা দরোজায়, আমর ইবনুল আসকে রাখেন

ফারাদিস ফটকে, ইয়াযিদ ইবনু কাইসানকে বসান কাইসান দরোজায় এবং খালিদ ইবনুল ওয়ালিদকে দাঁড় করান পূর্ব পাশের জাবিয়া দরোজার সামনে। এভাবে মুসলমানরা দীর্ঘ সত্তর দিন দামেশক অবরোধ করে রাখে। মিনজানিক ও অন্যান্য প্রতিরক্ষার অস্ত্র ব্যবহার করেও শহরবাসীর কোনো কার্যকরী উপকার হলো না। বাহিরের সব রকম সাহায্য আসার পথ মুসলমানরা বন্ধ করে দিলেন। সেনাপতি আবু উবাইদা অনুমান করলেন, মুসলিম বাহিনীকে দামেশকের রক্ষীবাহিনী এবং রোমান সেনাদের মাঝামাঝি দাঁড় করিয়ে দিতে হেরাক্লিয়াস যে-কোনো সময় বড়ধরনের সেনা সাহায্য পাঠাতে পারে, তাই তিনি একদল মুসলিম সেনাকে দামেশকের পথে তাঁবু গেড়ে বসে থাকতে পাঠিয়ে দিলেন।

হেরাক্লিয়াসের সেনা সাহায্য এবং মুসলমানদের জয়

সেনাপতি আবু উবাইদার অন্তর্দৃষ্টির সত্যতা মিলল। হেরাক্লিয়াস দামেশকে অবরুদ্ধ রোমানদের বাঁচাতে বিরাট এক বাহিনী পাঠাল। কিন্তু হঠাৎ সে বাহিনী যাত্রাপথে অপেক্ষায় থাকা মুসলমান সেনাদের মুখোমুখি হয়ে যায় এবং দুপক্ষের ভেতর সহিংস যুদ্ধ বেঁধে যায়। দীর্ঘক্ষণ তুমুল যুদ্ধের পর রোমান বাহিনী লজ্জাজনক পরাজয় বরণ করে নেয় এবং পালিয়ে হিমসের দিকে চলে যায়। ক্ষুদ্র সেনাদের এ বিজয় অবরোধে ব্যস্ত থাকা মুসলমানদের প্রচণ্ড মানসিক শক্তি জোগায়। এতে তাদের যুদ্ধে দৃঢ়তা বৃদ্ধি পায় এবং শীত এসে যাওয়ায় মরুবাসে অভ্যস্ত মুসলমানদের যে অসহ্য কষ্টের মুখোমুখি হতে হচ্ছিল—এ বিজয় সেই প্রতিকূল আবওহাওয়াকে অনেকটাই সহনীয় করে তোলে।

অবরুদ্ধ রোমানদের সাহায্যপ্রাপ্তির অপেক্ষা দীর্ঘ হতে থাকে। নিজেদের শক্তি ও টিকে থেকে প্রতিরোধের দৃঢ়তা ফুরিয়ে যাবার পূর্বেই সাহায্য কামনা করে তারা বারবার হেরাক্লিয়াসের কাছে পত্র পাঠায়। কিন্তু হেরাক্লিয়াস সে-সব চিঠির জবাবে কেবল সান্ত্বনা ও অবিচল থাকার উৎসাহ পাঠায়; কার্যকর কোনো সাহায্য পাঠাতে অক্ষম হয়। কিন্তু হেরাক্লিয়াসের আশ্বাসে দুর্গবাসীর প্রতিরোধের মানসিকতা শক্ত ও দৃঢ় হয়; তাদের হৃদয়ে আশা ফিরে আসে এবং তারা পরস্পরে নিজেদেরকে মুসলমানদের আক্রমণ প্রতিরোধে সাহস জোগাতে থাকে।

মুসলমানদের উপর থমাসের আক্রমণ

সময় বয়ে যায় আর দুর্গবাসী সাধারণ রোমান জনতার মনে হতাশা জেঁকে বসতে থাকে। নেতাদের মনে উদ্বেগ জাগে, জনগণ যে-কোনো সময় তাদের উপর আক্রমণ করে বসতে পারে। দেরি না করে তাদের একদল দামেশকের প্রধান রোমান সেনাপতি হেরাক্লিয়াসের মেয়ের জামাই থমাসের কাছে যায়। তাকে তাদের আশঙ্কার কথা জানায়; পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় নিচ্ছে—তা বোঝাতে চেষ্টা করে এবং মুসলিম সেনাপতির সাথে সন্ধি করে নেবার আবদার করে। কিন্তু থমাস তাদের আশঙ্কা উড়িয়ে দেয় এবং তাদের প্রস্তাবনা ফিরিয়ে দেয়। তাদেরকে জোর দিয়ে বলে, শহর রক্ষার পর্যাপ্ত শক্তি আমার আছে এবং অচিরেই আমি দামেশকের চারপাশ থেকে মুসলমানদের হটিয়ে দেব।

সে-মতে থমাস মুসলমানদের উপর শক্ত আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেয়। তাওমা ফটকের সামনে এক বিরাট সেনা জমায়েত করে সে। এরপর সে তিরন্দাজদের নির্দেশ দেয়ামাত্র তারা শুরাহবিল এবং তার বাহিনীকে দুর্গের পাশ থেকে সরাতে উপর থেকে উপর্যুপরি তির ও পাথর ছুড়তে থাকে। পাশাপাশি প্রায় পাঁচশো অশ্বারোহীকে দুর্গের বাইরে নামিয়ে দেয় মুসলমানদের উপর হামলে পড়ার জন্য।

থমাসের এই তিরন্দাজ বাহিনী মুসলমানদের বেশ ক্ষয়ক্ষতি সাধন করতে সক্ষম হয়। বেশ বড় সংখ্যক অশ্বারোহী সেনা শহিদ হয়ে যায়। ফলে বাধ্য হয়ে মুসলমানরা তাদের তিরের লক্ষ্যস্থান থেকে দূরে সরে যায় এবং খুব দ্রুতই শুরাহবিলের বাহিনীর সাথে থমাসের বাহিনীর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু হয়। রোমানদের সেনাসংখ্যা অনেক বেশি হওয়া সত্ত্বেও মুসলমানদের দৃঢ়তা তাদেরকে দুর্গে ঢুকে যেতে বাধ্য করে। এদিকে খণ্ডকালীন এ মোকাবেলায় তাদের সেনাপতি চোখে তিরবিদ্ধ হয়ে কাতরাতে থাকে।

থমাসের দ্বিতীয়বার

কিন্তু থমাস তখনও নিরাশ নয়; রাতে সে মুসলমানদের উপর আরেকবার চড়ে বসতে চাইল। তবে এবারের আক্রমণ আরও চওড়া, একইসাথে প্রায় সবগুলো দরোজায় একযোগে হামলা শুরু হলো। তবে পূর্ব দিকের দরোজায় সবচে বেশি সংখ্যক সেনা মোতায়েন হলো, যাতে খালিদ নিজেকে বাঁচিয়ে শুরাহবিলের সাহায্যে

ছুটে না আসতে পারে।

তখন মধ্যরাত। দুর্গের বাইরে মুসলমানরা শান্ত শুয়ে আছে; জেগে আছে কেবল দায়িত্বশীল সেনাদের চোখ। হঠাৎ কাঁসার ঘন্টা বাজার আওয়াজ ভেসে এল সবার কানে। হড়মড়িয়ে উঠলেন শুয়ে থাকা সেনারা। এটা ছিল সেনাদের প্রতি থমাসের ইঙ্গিত, যেন শহরের ফটকগুলো খুলে দেয়া হয়। কিছু বুঝে ওঠার আগেই রোমান সেনারা মুসলমানদের দিকে ধেয়ে আসল। মুসলমানরা বীরত্ব ও দুঃসাহসিকতার সাথে থামিয়ে দিল সে আক্রমণ; বেশকিছু রোমান সেনাকে নিথর পড়ে থাকতে দেখা গেল। পরবর্তী ভোর পর্যন্ত বেশ কয়েক ঘন্টা ধরে অব্যাহতভাবে যুদ্ধ জারি থাকল। মুসলমানদের নেতৃস্থানীয় বীর সেনা এবং অশ্বারোহীদের তলোয়ারের ছলকে উঠছে সাহস ও উদ্যম; সারারাত কোনো প্রশ্রয় বা ছাড় না দিয়েই—অব্যাহতভাবে তারা যুদ্ধ চালিয়ে নিয়েছেন। হঠাৎ রোমানদের মনে হলো, এভাবে ধারাবাহিক যুদ্ধ করে যাবার কোনো উল্লেখযোগ্য ফায়দা নেই; তাই থমাস দ্রুত সকলকে দুর্গে ফিরে যাবার নির্দেশ দিল। কিন্তু একটু হলেই সে শুরাহবিল ইবনু হাসানার হাতে নিজের ইহকাল সাঙ্গ করে নিত; অল্পের জন্য বেঁচে যায় থমাস। রোমান সেনারা দ্রুত শহরের সুরক্ষাপ্রাচীরের ভেতর ঢুকে যায় এবং মুসলমানরাও তাদের পিছু নেবার কোনো চেষ্টা করে না। আপাতত যেচে এসে যে লজ্জার পরাজয় মাথায় করে নিয়ে গেছে দুর্গবাসী, সেটুকুই তাদের কাছে যথেষ্ট মনে হয়।

খালিদ : না ঘুমায়, না ঘুমোতে দেয়

থমাসের পরিকল্পনা নিষ্ফল হলে মুসলমানরা নতুন করে শহর অবরোধে মনোযোগ দিল। খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ পূর্বফটকে দাঁড়িয়ে আছেন অতন্দ্র প্রহরী হয়ে; তাঁর সতর্ক দৃষ্টি সবসময় নিবদ্ধ আছে শহরের দিকে, সদাপ্রস্তুত মনে তিনি কেবল শত্রুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার সুবর্ণ কোনো সুযোগের তালাশে আছেন। ফলে তাঁর চোখে ঘুম নেই; তিনি ঘুমান না, ঘুমোতে দেন না শত্রুকেও। কোনো কিছু তার চোখের আড়াল হয় না, গোচরের বাইরে তিনি যেতে দেন না সামান্য ব্যাপারও। পূর্ব দিকের প্রাচীর ও ফটকের প্রতিটা নড়াচড়ার প্রতি, তিনি ও তার সেনারা সূক্ষ্ম নজর জমিয়ে রেখেছেন।

খালিদ খবর পেলেন, ভেতরে কোনো অনুষ্ঠান চলছে। দামেশকের গির্জার প্রধান বিশপের একটি সন্তান জন্ম গ্রহণ করেছে। শহররক্ষী সকলে সে উপলক্ষ্যে বিশপের

দাওয়াতে আনন্দ করছে। সেখানে সবাই শরাব পান করে হুঁশ হারিয়ে পড়ে আছে; প্রহরীরা অনেকেই তাদের আপন জায়গায় নেই। খালিদ তো পূর্ব থেকেই এমন একটি সময়ের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিলেন; এবার তিনি দড়ি দিয়ে উপস্থিত কয়েকটি সিঁড়ি বানিয়ে নিলেন।

রাত্রি নিশীথ। সবখানে ঝুলে আছে তার আঁধারের আবরণ। খালিদ ও তাঁর সেনারা অস্থায়ী সাঁকোতে পার হয়ে এলেন দুর্গঘেঁষা পরিখা। এরপর প্রাচীরের শরীরে তুলে দিলেন বানিয়ে আনা দড়ির সিঁড়িগুলো। ধীরে ধীরে একেক করে উঠতে থাকলেন উপরের দিকে। ভেতরে ঢুকেই পা টিপে টিপে চলে গেলেন ফটকের কাছে। তরবারির ক্রমাগত আঘাতে ভেঙে ফেললেন দরোজার খিল। এরপর গায়ের জোরে 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনিতে আকাশ প্রকম্পিত করে তুললেন। মুসলিম বাহিনী খালিদের ইঙ্গিত বুঝতে পেরে দ্রুত পায়ে চলে এল শহরের কাছে। তাকবিরধ্বনি তুলে সকলে ভেতরে প্রবেশ করতে লাগল। তাদের সমস্বর 'আল্লাহু আকবারে'র গগনবিদারী শব্দে দুর্গের পরিবেশ কেঁপে কেঁপে উঠল। রাতের নীরবতা ভেঙে সবকিছু জ্যান্ত-জীবন্ত হয়ে গেল। এবার হুঁশ ফিরল বেতাল রোমানদের; দ্রুত দৌড়ে এসে দেখে, দুর্গের সবখানে মুসলিম সেনারা ছড়িয়ে গেছে।

রোমানরা পরিস্থিতি টের পেয়ে দ্রুত শহরের বাকি ফটকগুলো খুলে গিয়ে মুসলিম সেনাপতি আবু উবাইদার কাছে সন্ধির আবেদন করল। খালিদ ওদিকে কী করে ফেলেছেন, সেটা না জেনেই তিনি তাদেরকে নিরাপত্তা প্রদানের ঘোষণা দিয়ে দিলেন এবং সকলকে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকতে বললেন। যেহেতু তিনি তাদের সাথে সন্ধি করেছেন, তাদেরকে নিরাপত্তা দিয়েছেন এবং যেহেতু সেনাপতির নির্দেশ মেনে নেয়া ছাড়া খালিদের কিছু করারও নেই, তাই তার হাতে বলপূর্বক বিজিত এরিয়াটুকুতেও সন্ধির বিধান কার্যকর করা হলো।

১৫ হিজরির রজবের ১৬ তারিখ (৫ সেপ্টেম্বর, ৬৩৫ খ্রিস্টাব্দ)। রাত পোহানোর আগেই দামেশক মুসলমানদের সামনে আনত হয়ে আসলো। উদীয়মান ইসলামি সাম্রাজ্যের গলার মালায় সে হয়ে গেল নতুন মুক্তাদানা; মুসলিম খিলাফতের প্রতিশ্রুত স্বর্গরাজ্যের নতুন সংযোজন।

ইয়ারমুকের যুদ্ধ
BATTLE OF YARMOUK

তারিখ:	১৫ হিজরি / ৬৩৬ খ্রি.
স্থান:	জর্ডানের উত্তরে, ইয়ারমুক নদীর অববাহিকায়
ফলাফল:	মুসলিম বাহিনীর বিজয়

পক্ষ-বিপক্ষ:	খিলাফতে রাশিদা	বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য
সেনাপ্রধান:	খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ ইয়াযিদ ইবনু আবি সুফিয়ান শুরাহবিল ইবনু হাসানাহ আমর আবনুল আস কাইস ইবনু হুবাইরা	গ্রেগরি মাহান জাবালাহ ইবনুল আওহাম কানাতির কন্সটান্টিন দারিজান থিওডর
সেনাসংখ্যা:	৩৬ হাজার	২ লক্ষ ৫০ হাজার
ক্ষয়ক্ষতি:	৪ হাজার শহিদ	৭০ হাজার থেকে ১ লক্ষ নিহত

আরব মুসলমান এবং বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের মাঝে হিজরি ১৫ সালের ৫ই রজব মোতাবেক ১২ই আগস্ট ৬৩৬ খ্রিস্টাব্দে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। অনেক ঐতিহাসিকের মতে, এটি কেবল ইসলাম নয়, বরং সমগ্র বিশ্ব ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ। কারণ, এ যুদ্ধের মাধ্যমে জাযিরাতুল আরবের বাইরে মুসলমানদের বিজয়তরঙ্গের সূচনা হয় এবং শামের শহরগুলোতে ইসলামের শুভপ্রবেশ ত্বরান্বিত হয়।

পূর্বকথা

খলিফা উমর মদিনা থেকে পত্র পাঠিয়ে জানালেন, 'বিশেষ কারণে খালিদ বিন ওয়ালিদকে মুসলমান সেনাবাহিনীর কমান্ড থেকে সরিয়ে, আবু উবাইদাকে নতুন সেনাপ্রধান নিয়োগ দেয়া হচ্ছে।' বার্তা পেয়ে আবু উবাইদা চমকে উঠলেন। তিনি নিঃসন্দেহে সেনাপ্রধান হওয়ার যোগ্যই ছিলেন, দীর্ঘদিন ধরে তিনি সিরিয়ার ভূমিতে বেশ কিছু যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছেনও, কিন্তু তিনি নিজেও খুব ভালো করেই জানতেন যে, অন্তত যুদ্ধক্ষেত্রের সেনাপতিত্বে মুসলিম বাহিনীতে খালিদের সমকক্ষ এই মুহূর্তে আর কেউই নেই। তাই দামেশক অবরোধের পুরোটা সময় খলিফা উমরের এই পয়গাম তিনি গোপন রাখলেন। নানা কায়দায় সেটাকে নিজের সাথে খালিদের যৌথ কমান্ড দেখিয়ে শেষ করলেন। ১৮ সেপ্টেম্বর ৬৩৪ তারিখে দামেশকের পতন হবার পর আবু উবায়দা খলিফা উমরের ইচ্ছার কথা খালিদকে জানান। এরপর নিজে কমান্ড গ্রহণের পরপরই সেনাপ্রধানের ক্ষমতাবলে খালিদকে উপ-কমান্ডার ঘোষণা করেন। পাশাপাশি মুসলমান কভ্যলরি রিজার্ভ সেনাদের[১] মেইন কমান্ডার

[১] যে সব যোদ্ধা ঘোড়ার পিঠে চড়ে যুদ্ধ করে তাদের বাহিনীকে ক্যাভুলরি বলে। ক্যাভুলরি যোদ্ধাদের ক্যাভুলরিমেন, হর্সমেন, ড্রাগুন, ট্রুপার, সাঁজোয়া, অশ্বারোহী অথবা ঘোড়সওয়ার বলেও

হিসেবে খালিদকেই দায়িত্ব প্রদান করেন।

হযরত আবু সুলায়মান খালিদ ইবনে আল ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ততদিনে ছোট-বড় প্রায় শ খানেক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। আজীবন অপরাজিত থাকার এক আশ্চর্য গৌরবও তার ঝুলিতে আছে। সময়ের সকলে তাকে সমরইতিহাসের অন্যতম সেরা সেনাপতি বলে মেনেও নিয়েছেন। মুতার যুদ্ধে বাইজান্টাইন রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে পরপর নয়টা তরবারি ভাঙা খালিদ ছিলেন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেওয়া উপাধি 'সাইফুল্লাহ' বা 'আল্লাহর তরবারি' নামের সার্থক প্রতিভূ। কোনো যুদ্ধেই হার না মানার এ সেনাপতির যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিতি মানেই যেন আসন্ন বিজয়ের গ্যারান্টি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাই উমরের এমন সিদ্ধান্ত স্বভাবতই খালিদকে হতভম্ব করে দিল। কিন্তু তিনি তা সামলে নিয়ে বললেন, 'যদি আবু বকর ইন্তেকাল করে থাকেন আর উমর নতুন খলিফা নির্বাচিত হয়ে থাকেন, তো আমাদের সবারই উচিত খলিফা উমরের প্রতি অনুগত থাকা এবং সর্বক্ষেত্রে তার নির্দেশ মেনে চলা।'

যুদ্ধক্ষেত্রের কমান্ডার হিসেবে আবু উবায়দা ছিলেন অনেক বেশি সাবধানি, তাই খালিদ পাশে থাকার পরও স্বভাবতই মুসলমান সেনাবাহিনীর অগ্রাভিযানের গতি অনেকটাই কমে গেল বলে মনে হচ্ছিল। আমর ইবনু শুরাহবিলকে অর্ধেক সেনাবাহিনীসহ ফিলিস্তিন দখলের মিশনে পাঠিয়ে দিয়ে উবায়দা খালিদকে সঙ্গে নিয়ে সিরিয়ার আরও উত্তরে তার অগ্রাভিযান অব্যাহত রাখলেন এবং মার্চ ৬৩৬ নাগাদ এমেসা নগরী পর্যন্ত দখল করে ফেললেন।

উপায়ান্তর না পেয়ে বাইজান্টাইন সম্রাট হেরাক্লিয়াস অগত্যা তার রাজধানী এন্টিওকে দুই লাখ সৈন্যের এক বিশাল সেনাবাহিনী একত্র করলেন। তার পরিকল্পনা ছিল এই বিশাল বাইজান্টাইন বাহিনী দিয়ে ফিলিস্তিন, মধ্য সিরিয়া আর উত্তর সিরিয়াজুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে অভিযানরত মুসলমান সেনাদলগুলোকে একের পর এক ধ্বংস করে ফেলা।

ডাকা হয়। তবে উট কিংবা হাতির পিঠে চড়ে যুদ্ধ করা যোদ্ধাদের সাধারণত ক্যাভুলরি বলা হয় না। ঘোড়ার পিঠে চড়া ক্যাভুলরি যোদ্ধারা পদাতিক যোদ্ধাদের তুলনায় উঁচুতে থাকায় পদাতিকদের চেয়ে বেশি দূর পর্যন্ত দেখতে পেত এবং ঘোড়ার গতিকে কাজে লাগিয়ে ওপর থেকে আঘাতের সুবিধাও পেত। তা ছাড়া ঘোড়ার গতির সুবিধা নিয়ে দ্রুত হামলা করে আবার দ্রুত সরে যেতেও পারত। ফলে দ্রুত স্থান পরিবর্তিন করে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ক্যাভুলরি বাহিনী আক্রমণ করে পদাতিক শত্রুদের চমকে দিয়ে যুদ্ধে হারিয়ে দিত। আধুনিক যুদ্ধক্ষেত্রে ঘোড়ার পরিবর্তে ট্যাংক একই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়।

৬৩৬ সালে জুন মাসের মাঝামাঝি একযোগে পাঁচ-পাঁচটা বাইজান্টাইন সেনাবাহিনী যখন তিন দিক দিয়ে এমেসার দিকে অগ্রসর হতে শুরু করল, বিভ্রান্ত আবু উবায়দা তখন ফের খালিদের শরণাপন্ন হলেন। শাহি ফরমানের তোয়াক্কা না করেই তিনি খালিদের হাতে কমান্ড তুলে দিয়ে বাহিনীর প্রশাসনিক কার্যক্রম দেখতে বললেন। অবশ্য আবু উবাইদা বলার আগে বাইজান্টাইন সেনাবাহিনীর এগিয়ে আসার খবর পাওয়ার পর থেকেই খালিদ মনে মনে এই কঠিন অবস্থা থেকে পরিত্রাণের উপায় নিয়ে ভাবছিলেন এবং হঠাৎই তার মাথায় একটি আইডিয়া খেলে গেল। আইডিয়াটা এতটাই যুগান্তকারী ছিল যে, স্রেফ এই একটা আইডিয়ার কারণেই এ যুদ্ধে ইতিহাসের মোড় ঘুরে গিয়েছিল আর বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের পতনের মধ্য দিয়ে ইসলামের ইউরোপযাত্রার পথ খুলে গিয়েছিল। তাই কমান্ড ফিরে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খালিদ একটা কনফারেন্স ডাকলেন। সব কমান্ডার আর অফিসারদের সেই কনফারেন্সে হাজির থাকার নির্দেশ দিলেন।

বাইজান্টাইন প্রস্তুতি

কনফারেন্স রুমজুড়ে পিনপতন নিস্তব্ধতা। আবু উবায়দা সেই নিস্তব্ধতা ভেঙে খালিদের পরামর্শ চাইলেন, কী করা যায়। প্রথমেই খালিদ গোয়ান্দাপ্রধানদের কাছ থেকে বাইজেন্টাইনের সর্বশেষ অবস্থা জানতে চাইলেন। বাইজান্টাইন যুদ্ধবন্দি আর এমেসায় সদ্য নিয়োজিত গুপ্তচরদের মাধ্যমে পাওয়া ইন্টেলিজেন্সের ভিত্তিতে খালিদের টেবিলজুড়ে সম্রাট হেরাক্লিয়াসের রণ-পরিকল্পনার যে চিত্র ক্রমশ স্পষ্টতর হয়ে উঠছিল, তা নিঃসন্দেহে ভয়াবহ।

৬২৯ সালে সম্রাট হেরাক্লিয়াস গ্রিক টাইটেল 'ব্যসিলিও' গ্রহণের পর থেকেই তার আশপাশের লোকেরা যেকোনো বাইজান্টাইন অভিযানকেই যিশুর নামে চালিয়ে দিচ্ছিল। যুদ্ধক্ষেত্রেও নিয়মিত যিশুর ক্রুশের কাঠ বহন করা হতো সৈন্যদের মনোবল চাঙ্গা রাখতে। এবারও এর কোনো ব্যতিক্রম হলো না। সিরিয়ান ফ্রন্টে তখন মুসলমানদের বিরুদ্ধে বাইজান্টাইনের কোনো প্রতিরোধই কাজে আসছিল না। এদিকে কদিন আগেই মুসলমানদের হাতে চলে গেছে বাইজান্টাইনদের এমেসা নগরীও। অগত্যা ৬৩৫ সালের শেষ দিকে সম্রাট হেরাক্লিয়াস ইসলামের এই প্রায় অপ্রতিরোধ্য অগ্রাভিযানকে ঠেকাতে এক আদি ক্রুসেডের ডাক দিতে বাধ্য হলেন। মে ৬৩৬ নাগাদ এমেসাবাসী যখন জিজিয়া কর দিয়ে মুসলমান সেনাবাহিনীর

বশ্যতা মেনে নিতে রাজি হয়েছে, তখন উত্তর সিরিয়ার আরও উত্তরে এন্টিয়কজুড়ে রাশান, স্লাভ, ফ্রাঙ্ক, গ্রিক, রোমান, জর্জিয়ান, আর্মেনিয়ান আর খ্রিস্টান আরবদের নিয়ে গড়ে ওঠা বাইজান্টাইন বহুজাতিক বাহিনী নতুন রণপ্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে। সম্রাট হেরাক্লিয়াসের নতুন ধর্মযুদ্ধের ডাকে ৩০ হাজার সৈন্য নিয়ে একেকটা বাইজান্টাইন সেনাবাহিনী গড়ে উঠতে লাগল। রোমান সেনাবাহিনীতে আর্মেনিয়ানরা দুঃসাহসী যোদ্ধা হিসেবে সুপরিচিত ছিল। সকল আর্মেনীয় সেনাকে তাই জরুরি ভিত্তিতে এ যুদ্ধে হাজির হতে বলা হলো। উপস্থিত হলেন খ্রিস্টানদের প্রশাসক প্রিন্স জাবালাহও; তিনি নিজের হাতের তালুর মতোই ভালো করে চিনতেন সিরিয়ান ভূমিকগুলোর আনাচকানাচ। এদিকে কষ্টসহিষ্ণু যোদ্ধা বলে খ্যাত রাশান আর স্লাভরাও দলে দলে সম্রাটের ডাকে এসে ময়দানে জড়ো হতে থাকল। বাইজেন্টাইনের মূল বাহিনী ছিল মোট পাঁচটি বিচ্ছিন্ন বাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত। আর্মেনীয় সম্রাট মাহান (কারও মতে ফাহান বা ভাহান) ছিল আর্মেনীয় বাহিনীর প্রধান, স্লাভ (Slavs) উপজাতিদের সম্মিলিত বাহিনীর নেতৃত্বে ছিল কানাতির স্লাভি এবং আরবের গাসসান গোত্রের খ্রিস্ট বাহিনীর প্রধান ছিল তাদেরই গোত্রপতি জাবালাহ ইবনুল আইহাম। এরা সকলেই উট ও ঘোড়ায় আরোহণ করে অভ্যস্ত ছিল। এদিকে জর্ডানের জোট বাহিনীর পুরোটাই ছিল গ্রেগরি এবং দারিজানের অধীনে; তবে পুরো বাহিনীর লিড দিত দারিজান নিজেই। তেমনি বাইজান্টাইনের এ সেনাবাহিনীতে অংশগ্রহণ করেছিল হেরাক্লিয়াসের সহোদর ভাই থিওডোরাস। আরবি উৎসগুলোতে তাকে تذارق (তাযারুক) বা Theodore (থিওডোর) নামে অভিহিত করা হয়; তেমনি ইতিহাসের কিছু গ্রন্থে তাকে 'দ্রাগোস' বা 'সাকলাব' নামেও উল্লেখ করতে দেখা যায়। স্বভাববিচারে সে একেবারে হেরাক্লিয়াসের মতোই ছিল; তেমনি রোমানদের শত-হাজার-লাখ সেনাদের নেতৃত্বেও সে ছিল সমানভাবে যোগ্য।

গ্রেগরির বাহিনী ছিল রোমান বাহিনীর ডানপাশে। সে তার সেনাদের পায়ে শেকল বেঁধে দিয়েছিল, পরিস্থিতি যেদিকেই মোড় নিক—সেনারা যেন প্রতিরোধে বীরত্বের সাথে অটল থাকে, সে জন্য। তেমনি গ্রেগরির বাহিনী বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়লে মুসলমান অশ্বারোহীদের পরাভূত করতে এই শেকলগুলো বেশ কাজে দেবে। পাশাপাশি এমন বাঁধনযুক্ত থাকলে সেনাদের নড়াচড়া এবং প্রতিপক্ষের আঘাতের প্রতিক্রিয়া খুব ধীর গতিতে ঘটবে বলেও মনে করে গ্রেগরি। সম্রাট হেরাক্লিয়াস জেনারেল মাহানের হাতে যুদ্ধক্ষেত্রের সেনাপতির দায়িত্ব

তুলে দিয়ে থিওডোর টিথোরিয়াসকে বাইজান্টাইন বহুজাতিক বাহিনীর প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে নিয়োগ দিলেন। টিথোরিয়াস আদতে ছিলেন বাইজান্টাইন কোষাধ্যক্ষ। সিরিয়ান ফ্রন্টে তাকে পাঠানোর কারণ ছিল দ্বিবিধ। প্রথমত: আর্মেনীয় জেনারেল মাহানের সঙ্গে ইউরোপীয় কমান্ডার আর জেনারেলদের ব্যক্তিত্বের সংঘাত এড়িয়ে পারস্পরিক বোঝাপড়াটা সহজ করা। দ্বিতীয়ত: বিশাল এই বহুজাতিক বাহিনীর সৈন্যদের মধ্যে বেতন ইত্যাদি ভাতাপ্রাপ্তি নিয়ে কোনো ধরনের গুজব যেন ছড়িয়ে না পড়ে, সেটা লক্ষ করা। এদিকে খেলাফতের মুসলমান সেনাবাহিনী তখন চার ভাগে বিভক্ত হয়ে তিন ফ্রন্টজুড়ে অভিযান পরিচালনায় ব্যস্ত। আমর বিন আল আস ফিলিস্তিনে, আমর ইবনু শুরাহবিল জর্ডানে, কাসেরিতে ইয়াজিদ আর আবু উবায়দা ও খালিদ আছেন এমেসার উত্তরে। হেরাক্লিয়াস মুসলমান সেনাবাহিনীর এই বিভক্ত অবস্থার ফায়দা লোটার ফন্দি আঁটলেন। তিনি চাইলেন তার বিশাল এই বহুজাতিক বাহিনী দিয়ে একের পর এক মুসলমান সেনাবাহিনীকে আলাদা-আলাদা করে গুঁড়িয়ে দিতে।

সেসময় লোকে ভাবতে শুরু করেছিল, খালিদ যুদ্ধক্ষেত্রে পা রাখা মানেই সুনিশ্চিত বিজয়! তাই খলিফাতুল মুসলিমিন উমরের মনে হচ্ছিল, জীবন্ত কিংবদন্তি খালিদের ব্যাপারে মুসলমানদের মনে ক্রমেই দৃঢ় হতে থাকা এই কুসংস্কার থেকে ইসলামকে বাঁচাতে হবে। মুসলমানরা যাতে আল্লাহর উপর নির্ভরতা কমিয়ে খালিদের প্রতি নির্ভর করে না বসে, সবখানে তার অপেক্ষায় না থাকে, যেখানে সে আছে—সেখানে আল্লাহর নুসরতের চিন্তা না করে বিজয় সুনিশ্চিত বলে মনে না করে, সেজন্যই তিনি খালিদকে কমান্ড থেকে অপসারণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তাছাড়া আসন্ন ইয়ারমুকের যুদ্ধে দুজনই স্ট্র্যাটেজিক আর টেকনিক্যাল দৃষ্টিকোণ থেকে দারুণভাবে লড়াই করে এবং নেতৃত্ব দিয়ে হেরাক্লিয়াস-মাহানদের বহুজাতিক বাইজান্টাইন বাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরাস্ত করেছিলেন; যা প্রমাণ করে, ব্যক্তিগতভাবে এ-দুজন সাহাবির মধ্যে সামান্যতম বিরোধ ছিল না।

যুদ্ধের ময়দান ও মুসলিম বাহিনী

সেনাপ্রধানের দায়িত্ব পেয়েই খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ মুসলিম বাহিনীকে নিজের মতো গুছিয়ে নেন। কিন্তু হেরাক্লিয়াসের হঠাৎ এক কৌশলী সিদ্ধান্ত খালিদকে চিন্তিত করে ফেলে। সম্রাট তার মেয়ে (কারও মতে নাতনি) ম্যানিয়াহকে

রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সামনে রেখে পারস্যের ইয়াযদাজারদের সাথে বিবাহ দিয়ে দেন। তার চিন্তা ছিল, মুসলমান বাহিনীকে বিক্ষিপ্ত করে ফেলতে ইয়াযদাজারদ ও তার বাহিনীকে কাজে লাগানো। কিন্তু গোয়েন্দা মারফত সেনাপতি খালিদ সেটা জেনে ফেললেন। এ-সময়ে হঠাৎ এই বিয়ে অন্যান্য মুসলিম বাহিনীর ব্যাপারে তাকে ভাবিয়ে তুলল। দূরবর্তী দুর্গম পথ পাড়ি দেয়ার অদম্য এক সাহস খালিদের ছিল। তিনি হেরাক্লিয়াসকে অবাক করে দিয়ে দ্রুত এমেসা থেকে সকল সেনা নিয়ে দামেশক পেরিয়ে আরও দক্ষিণে গোলাম হাইটের কাছাকাছি জাবিয়াতে পুনর্জমায়েতের নির্দেশ দিলেন। এতে প্রায় একই সময়ে ছড়িয়ে থাকা আরও তিন বাহিনীর সাথে একইসময়ে একত্র হওয়া সহজ হবে এবং খলিফা উমরের জন্যও যে-কোনোরকম সাহায্য পাঠানো সহজ হবে। তাছাড়া জাবিয়ার এই ভূমি খালিদের বিশেষ ক্ষুদ্র অশ্বারোহী দলের জন্য আদর্শ ক্ষেত্র হতে পারবে।

এদিকে খলিফা উমর কৌশলে দারুণ এক কাজ করে ফেললেন। পারস্যের ইয়াযদাজারদকে ঠাণ্ডা রাখতে তিনি অনতিবিলম্বে তার দরবারে যুদ্ধবিরতির চুক্তি নিয়ে দূত পাঠালেন। মুসলিম বাহিনীর এই আমূল পটবদলে হেরাক্লিয়াস হতবিহ্বল হয়ে পড়ল। ইয়ারমুকের যুদ্ধে খলিফা উমর ও খালিদের এমন দুটি সিদ্ধান্তের কারণেই যুগ যুগ তাদেরকে অন্যতম রাষ্ট্রনায়ক এবং সেনাপতি হিসেবে স্মরণ করা যায়। সবকিছু এমেসাকে ঘিরে চিন্তা করে রাখা হেরাক্লিয়াসের জন্য এবার জাবিয়াতে মার্চ করা মানে প্রায় দ্বিগুণ পথ তাকে বাহিনীসমেত পাড়ি দিতে হবে। এতে যুদ্ধ যেমন সময়সাপেক্ষ হয়ে উঠবে, তেমনি হবে চূড়ান্ত ব্যয়বহুল। তাই সে চারপাশে ছড়িয়ে থাকা খ্রিস্টান ক্যাম্পগুলোতে সংবাদ পাঠিয়ে দিল, যে-কোনোভাবে যেন মুসলমানদের অন্যান্য বাহিনী খালিদের সাথে এক হতে না পারে, সেটা খেয়াল করতে। তার নির্দেশমতে মুসলমানদের বিচ্ছিন্ন তিন বাহিনীতে হঠাৎ খ্রিস্টানরা ধাওয়া দিতে শুরু করে। হযরত আবু উবাইদা এই খবর পেয়ে মূল বাহিনী নিয়ে ইয়ারমুকের দিকে খানিক এগিয়ে যাবার পরামর্শ দেন খালিদকে। খালিদ তার বিশেষ বাহিনী[১] ছাড়া বাকিদের নিয়ে সেদিকে যাবার অনুমতি দেন আবু উবাইদাকে। তিনি চলে গেলে খালিদ পার্শ্ববর্তী এক খ্রিস্টান ক্যাম্পে হানা দিয়ে তাদেরকে চোখের

[১] মুসলমানদের সিরিয়া অভিযানে খালিদের নেতৃত্বে থাকা হালকা ক্যাভুলরি রেজিমেন্টের রিজার্ভ বাহিনী গড়ে ওঠে। অগ্রাভিযানের সময় এরা মূল সেনাবাহিনীর সামনে অ্যাডভান্স গার্ড আর পিছু হটার সময় এরা রিয়ার গার্ড হিসেবে দায়িত্ব পালন করত। যুদ্ধ চলাকালে খালিদের এই বিশেষ দল অপ্রত্যাশিত দিক থেকে ছুটে এসে শত্রুবাহিনীকে আক্রমণ করে তছনছ করে দিত। একে ক্যাভুলরি রিজার্ভও বলা হয়, আরবিতে বলে তুলাইয়া মুতাহারিক্কাহ।

দূরত্বে সরিয়ে ফেলে, আবু উবাইদার বাহিনীতে ইয়ারমুকে[১] এসে যোগ দেন।

খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ তার এবারের সেনাবাহিনীতে এক তৃতীয়াংশ রাখেন ঘোড়সওয়ার, যাদের সংখ্যা ছিল প্রায় দশ হাজার। বাহিনীকে তিনি ৩৬টি পদাতিক ব্যাটেলিয়নে বিভক্ত করে নেন। দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে থাকা সেনাদেরকে জরুরি আহ্বানে এমেসায় নিয়ে আসেন। পুরো সেনাদলে ছড়িয়ে দেন চারটি মূল পতাকা; মাঝে দুটি এবং ডানে ও বামে একটি করে। মাঝের কেন্দ্রীয় অংশের দায়িত্বে রাখেন হযরত আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ এবং শুরাহবিল ইবনু হাসানাহকে; ডানে আমর ইবনুল আস এবং বামে সেনাপতি হিসেবে রাখেন ইয়াযিদ ইবনু আবি সুফিয়ানকে। প্রতিটি পতাকাতলে সমবেত করেন নয়টি ক্ষুদ্র বাহিনী, যা গোত্র বা বংশবিচারে বিভক্ত ছিল। অশ্বারোহী দলের সেনাপতি ছিলেন একাধারে হযরত কাকা ইবনু আমর, মাজউর ইবনু আদি, ইয়াজ ইবনু গানাম, হাশিম ইবনু উতবা ইবনু আবি ওয়াক্কাস, সুহাইল ইবনু আমর, ইকরামা ইবনু আবি জাহল, আবদুর রহমান ইবনু খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ, হাবিব ইবনু মাসলামা, সফওয়ান ইবনু উমাইয়া, সাদ ইবনু খালিদ ইবনুল আস, খালিদ ইবনু সাঈদ ইবনুল আস, আবদুল্লাহ ইবনু কাইস, যুবাইর ইবনুল আওয়াম এবং মুআবিয়া ইবনু হুদাইয—রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইন।

প্রতিটি পতাকার নিচে তিনি কয়েকজন করে সংবাদদাতা বসিয়ে দিলেন, যাতে একইসাথে যুদ্ধের পুরো ময়দানের খবর সেনাপ্রধানের গোচরে থাকে। যুদ্ধের পরিকল্পনার ভেতর ছিল আশপাশের এগারো মাইল এলাকা। মুসলিম বাহিনী রোমানদের মোকাবেলার জন্য পশ্চিম দিক ধরে এগোতে লাগল। এদিকে রোমান

[১] ঐতিহাসিক এ যুদ্ধক্ষেত্রটি বর্তমানে গোলান মালভূমির দক্ষিণপূর্বে সিরিয়ার হাওরান অঞ্চলে অবস্থিত। এই উচ্চভূমি অঞ্চলটি গ্যালিলি সাগরের পূর্ব দিকে সিরিয়া, জর্ডান ও ইসরায়েলের সীমান্তে রয়েছে। ইয়ারমুক নদীর উত্তরদিকে সমতল ভূমিতে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এর পশ্চিম অংশ ওয়াদি-উর-রুক্কাদ নামক গভীর গিরিসংকট দেয়া ঘেরা। এই জলধারার তীর খাড়া পাড়বেষ্টিত, যার উচ্চতা ৩০ মি (৯৮ ফু)–২০০ মি (৬৬০ ফু)। উত্তরে জাবিয়া সড়ক এবং পূর্বে আজরা পাহাড় অবস্থিত। তবে এই পাহাড়গুলো মূল যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরে রয়েছে। কৌশলগতভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে ১০০ মি (৩৩০ ফু) উঁচু তেল আল জুমা একমাত্র লক্ষণীয় স্থান। মুসলিমরা এখানে জড়ো হয়। এখান থেকে ইয়ারমুক সমভূমির দৃশ্য ভালভাবে দেখা যেত। ৬৩৬ খ্রিস্টাব্দে যুদ্ধক্ষেত্রের পশ্চিমের গিরিখাত মাত্র কয়েকটি স্থান দিয়ে প্রবেশযোগ্য ছিল। এখানে পারাপারের জন্য আইন দাকারের কাছে রোমান সেতু (জিসর-উর-রুক্কাদ) ছিল। ইয়ারমুকের সমতল ভূমিতে দুই বাহিনীর টিকে থাকার মতো পানির সরবরাহ যথেষ্ট ছিল।

সেনাদের ডান অংশ দক্ষিণে ইয়ারমুক নদীর (বর্তমানে এই নদী সিরিয়া, জর্ডান ও ইসরায়েলের মধ্য দিয়ে বয়ে গেছে এবং তা গ্যালিলি সাগরের পূর্বে অবস্থিত) পাড় ঘেঁষে এগোচ্ছিল। উত্তরে কয়েক মাইল দূরে দক্ষিণ-পশ্চিম দিক বেয়ে এগোলে দেখা যাবে 'রুক্কাদ' উপত্যকা।

স্পেশাল অশ্বারোহী টিমের বিশেষ নেতৃত্বের দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয় কাইস ইবনু হুবাইরা, আমির ইবনু তুফাইল এবং মাইসারা ইবনু মারজুকের হাতে। যাদের দায়িত্ব ছিল, মুসলিম বাহিনী পর্যুদস্ত হয়ে পশ্চাদপসরণের পরিস্থিতি তৈরি হলে পেছন থেকে রিজার্ভ ফোর্সের দায়িত্বে অবতীর্ণ হওয়া।

সাহাবি যিরার ইবনুল আসওয়ারের দায়িত্ব ছিল, সেনাপ্রধান হযরত খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ ময়দানে যুদ্ধের জন্য ঢুকে গেলে সমগ্র বাহিনীতে তাঁর প্রতিনিধিত্ব করা।

যুদ্ধ শুরুর পূর্বমুহূর্তে রোমান সেনাপতি 'মাহান' দূত মারফত জানালো যে, সে সেনাপতি খালিদের সাথে কথা বলতে চায়। খালিদ রাজি হলেন। দুই বাহিনীর মধ্যবর্তী ময়দানে দুই সেনাপতি মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ালেন। রোমান সেনাপতি মাহান খালিদকে বলল: 'আমরা জেনেছি, কঠোর শ্রম ও ক্ষুধা তোমাদেরকে স্বদেশ থেকে তাড়িয়ে এখানে নিয়ে এসেছে। তোমরা চাইলে তোমাদের প্রত্যেককে আমরা দশটি দিনার, এক প্রস্থ পোশাক আর কিছু খাদ্য দিতে পারি। বিনিময়ে তোমরা দেশে ফিরে যাবে। সাথে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আগামী বছরও আমরা অনুরূপ জিনিস তোমাদের কাছে পাঠাব।' রোমান সেনাপতির এ কথায় যে অপমান প্রচ্ছন্ন ছিল, খালিদ তা অনুধাবন করলেন। তিনি রাগে দাত কিড়মিড় করতে করতে বললেন: 'ক্ষুধা আমাদেরকে দেশ থেকে তাড়িয়ে এখানে আনেনি। তবে আমরা একটি রক্তপায়ী জাতি। পুরো পৃথিবী আমাদেরকে খুব ভালো করে চেনে। আমরা জেনেছি, রোমানদের রক্ত অপেক্ষা অধিক লোভনীয় ও পবিত্র রক্ত নাকি দুনিয়াতে আর নাই। তাই সেই রক্তের লোভে আমরা এখানে এসেছি।' কথাগুলো বলেই সেনাপতি খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ ঘোড়ার লাগাম ঘুরিয়ে সোজা নিজ বাহিনীর কাছে ফিরে এলেন এবং আল্লাহু আকবর, হাইয়্যা আলাল-জিহাদ ধ্বনি দিয়ে যুদ্ধের ঘোষণা করলেন।

কয়েক লাইনে যুদ্ধের ফিরিস্তি

ছয় দিন ধরে লাগাতার যুদ্ধ চলতে থাকে। মুসলিম বাহিনী এ সময় প্রতিদিন বারকয়েক রোমানদের উপর আক্রমণ করেছে। সেনাপ্রধান খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ তাঁর নিজের নেতৃত্বে থাকা 'দ্রুতগামী অশ্বারোহী বাহিনী'কে এ-সময়টাতে চোখের পলকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে প্রয়োজনীয় অবস্থান পরিবর্তনে বেশ কাজে লাগান। বিশেষ করে শত্রুপক্ষের চাপে মুসলমানরা যখনই পেছনে সরতে শুরু করেছে, তখনই তিনি ছোট্ট এ বিশেষ ফোর্স নিয়ে তাদের উপর আরোপিত পরিস্থিতির জট সরিয়ে দিয়েছেন। যুদ্ধ চলাকালীন প্রতিদিনকার যুদ্ধ শেষ করে সন্ধ্যা হয়ে গেলে উভয় বাহিনী সেনাসারিতে তাদের পূর্ব অবস্থানে ফিরে যেত।

প্রথম চারদিনের ঘটনা অনেকটা এমনই। এ চারদিনে রোমানদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ মুসলমানদের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি ছিল। পঞ্চম দিনের যুদ্ধ শুরু হবার আগে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রোমানদের দূতের সামনে বলেন, 'আমরা খুব দ্রুতই আমাদের কর্ম খতম করব।' তাঁর এ কথা শুনতে পেয়ে রোমান বাহিনী তিন দিনের জন্য যুদ্ধবিরতির আবেদন করলে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ সে আবেদন নাকচ করে দেন। ফলে পঞ্চম দিন শেষে নতুন করে তেমন কোনো ক্ষয়ক্ষতির হিসেব কোনো পক্ষেই উঠে আসেনি।

ষষ্ঠ দিনে প্রতিরোধ থেকে খালিদের কৌশল পরিবর্তন হয় আক্রমণাত্মক মনোভাবে। তিনি তার বীর বাহিনী নিয়ে রোমানদের উপর শক্ত হামলা করেন এবং নিজের অনন্যসাধারণ সামরিক রীতির প্রয়োগ ঘটান। সেটা হলো, মুসলমানদের সম্ভাব্য পরাজয়কে শক্তিশালী বিজয়ে পরিণত করতে তিনি তার বিশেষ 'দ্রতগামী অশ্ববাহিনী'র সুষ্ঠু ব্যবহার করেন।

এ যুদ্ধে মুসলমানদের পেছন দিকে অনেক বীরাঙ্গনা মহিলারাও অবস্থান করছিল; যুদ্ধের খুব বেশি প্রকট হতে দেখলে তারাও পুরুষদের পেছনে থেকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এবং বেশ বড় সংখ্যার রোমান সেনাদের জাহান্নামে পাঠাতে সক্ষম হয়। তাছাড়া মুসলিম বাহিনীর কেউ যদি পরাজিত হয়ে পেছনে চলে আসত, মহিলারা তাকে পাথর মেরে মেরে সামনে তাড়াত। তিরস্কার করে বলত: 'আমাদেরকে শত্রুর সামনে এগিয়ে দিয়ে কোথায় পালাচ্ছ, শুনি!' এতে সাহস হারানো সেনারাও মহিলাদের ধাওয়া খেয়ে আবার সামনে চলে যেতে বাধ্য হতো। যুদ্ধের পুরোটা সময়ে প্রায় প্রতিদিন বেশ কয়েকবার এমন ঘটনা ঘটতে থাকে। এমনকি শেষপর্যন্ত

পরিস্থিতি এই হয়, কোনো যোদ্ধা যুদ্ধ ঘোরতর দেখে একটু পেছনে সরে আসতে চাইলে মহিলাদের কথা মনে হতেই বলে উঠত—'থাক, আমাদের নারীদের চেয়ে রোমানদের মোকাবেলা করাই সহজ।'

প্রথম দিনের ঘটনাবলি

সে সময়ের স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী ইয়ারমুক যুদ্ধের প্রথম দিন শুরু হয় দু পক্ষের সাহসী দুই যোদ্ধার মুখোমুখি মোকাবেলার মাধ্যমে। সে-মতে কেউ সেনা সারি থেকে স্বেচ্ছায় বের হয়ে আসে, কেউ-বা বের হয় সেনাপতির নির্দেশ পেয়ে। যুদ্ধের প্রথম দিন দুপুর পর্যন্ত উভয় পক্ষের বীরদের এই মুখোমুখি যুদ্ধ চলতে থাকে। এ যুদ্ধে মুসলমান সেনাদের ক্রমাগত বিজয় ঘটে। সাহাবি আবদুর রহমান ইবনু আবি বকর পাঁচজন বাইজান্টাইন সেনাকে মেরে ফেলেন। এরপর বাইজান্টাইন সেনাদের মানসিক শক্তি পুনর্বৃদ্ধির জন্য প্রধান সেনাপতি মাহান যুদ্ধ শুরু করার নির্দেশ দিয়ে দেয়। এতে তারা মুসলিম বাহিনীকে লক্ষ করে তীব্র তিরবৃষ্টি ছুড়তে শুরু করে, ফলে মুসলমানদের বেশ ক্ষয়ক্ষতি হয় এবং উভয় বাহিনী চূড়ান্ত যুদ্ধের জন্য ফুঁসে ওঠে।

ইতিহাসের গ্রন্থগুলোতে পাওয়া যায়, জর্জ ইবনু বুজিহা নামের এক উচ্চপদস্থ রোমান আমির যুদ্ধের প্রথম দিনে ময়দানে নেমে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদকে মুবারাজার জন্য আহ্বান করতে থাকে। এ কথা শুনে হযরত খালিদ মোকাবেলার প্রস্তুতি নিয়ে তার সামনে নেমে আসেন এবং বৃত্তাকার ভঙ্গিতে ঘুরতে থাকেন দুজন। নীরবতা ভেঙে জির্জা প্রথমে বলে: 'খালিদ, আমি তোমাকে বেশকিছু প্রশ্ন করতে চাই, স্পষ্ট করে সেগুলোর উত্তর আশা করছি; স্বাধীন ব্যক্তি মিথ্যে বলে না বলেই জানি আমি।' এরপর সে লাগাতার কিছু প্রশ্ন করতে থাকে। যেমন: 'কেন খালিদ বিন ওয়ালিদকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাইফুল্লাহ আল-মাসলুল বা মুশরিকদের জন্য আল্লাহর খোলা তলোয়ার উপাধি দিয়েছেন? আল্লাহ কি তাঁর নবীর উপর কোনো তরবারি অবতীর্ণ করেছেন, যা তিনি খালিদের গলায় পরিয়ে দিয়ে গেছেন?' হযরত খালিদ তার এ-প্রশ্নের এবং অন্যান্য আরও কিছু প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। সে আরও প্রশ্ন করে: 'আজ যদি কেউ মুসলমান হয়, তাহলে মুসলিম সমাজে তার অবস্থান কেমন হবে?' খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ বলেন: 'মুসলিম সমাজে প্রতিটি মুসলমান সমান মর্যাদার অধিকারী, তাদের মধ্যে

নতুন মুসলিম বা পুরাতন মুসলিম বলে আলাদা কোন শ্রেণিবৈষম্য নেই; বরং তারা সকলে পরস্পর ভাই ভাই।' এমন উত্তর শুনে সাথেসাথেই জর্জ সকলকে অবাক করে দিয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে নেয় এবং ময়দান ছেড়ে তাঁর তাঁবুতে এসে একসাথে দু রাকাত নামায আদায় করে। এরপর মুসলমানদের পক্ষে শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করে সেদিনের যুদ্ধেই শহিদ হয়ে যায়।

দ্বিতীয় দিনের সংক্ষিপ্ত বয়ান

ফজর উদয় হতেই মুসলমানদের উপর অতর্কিত হামলা করার সিদ্ধান্ত নেয় বাইজান্টাইন সেনাপতি মাহান। সে ভাবে, এই সময়টায় হয়তো মুসলমানরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে বসে থাকবে না। কিন্তু মুসলিম সেনাপ্রধান খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ তাঁর তীক্ষ্ণ যুদ্ধবিদ্যা থেকে অনুমান করতে পারেন, প্রতিপক্ষের সেনাপতি পরদিনের যুদ্ধের জন্য কী পরিকল্পনা করতে পারে। তাই রাতে তিনি গোপনে শক্তিশালী প্রতিরোধব্যবস্থা গ্রহণ করে রেখেছিলেন, যা বাইজেন্টাইনের অতর্কিত হামলার পরিকল্পনা শূন্যের কোঠায় রেখে দেয় এবং একপাক্ষিক অসম আক্রমণের বদলে যুদ্ধ রূপ নেয় দ্বিপাক্ষিক নিয়মতান্ত্রিক লড়াইয়ে। খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের পরিকল্পনামতো মুসলিম বাহিনীর ডান ও বাম অংশ পেছনে সরে আসে আর কেন্দ্রীয় মূল বাহিনী বাইজান্টাইনের সামনে দুর্জেয় প্রতিরোধব্যূহ গড়ে তোলে।

পাল্টা আক্রমণের প্রথম ধাপ

এ সময় সেনাপতি খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ তাঁর বিশেষ দ্রুতগামী অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসেন এবং রোমানদের অগ্রযাত্রা থামিয়ে দিতে একবার মুসলিম সেনাবাহিনীর ডান অংশে, আরেকবার বাম অংশে চক্কর মারেন।

পাল্টা আক্রমণের দ্বিতীয় ধাপ

এবার খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ তাঁর সেই বিশেষ অশ্বারোহী বাহিনীকে দুই ভাগ করে ফেলেন। এক ভাগ হযরত যিরার ইবনুল আযওয়ারের নেতৃত্বে বাইজান্টাইন বাহিনীর ডান দিক দিয়ে পাঠিয়ে দেন কেন্দ্রীয় অংশে। এ আক্রমণে হযরত যিরার দুই হাজার রোমান অশ্বারোহীর প্রহরা ভেদ করে বাইজান্টাইন বাহিনীর অন্যতম সেনাপতি দারিজানকে হত্যা করতে সক্ষম হন।

শুরুতে মাহানের পরিকল্পনা ভেস্তে যাওয়া এবং পরবর্তীতে সেনাপতি দারিজানের মৃত্যু রোমান সেনাদের মনোবল চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়। উল্টোদিকে আনুপাতিক হারে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের এই ছোট্ট বাহিনীর দারুণ সাফল্য বৃহত্তর মুসলিম বাহিনীর মনস্তত্ত্বকে ব্যাপকভাবে আলোড়িত এবং প্রভাবিত করে।

তৃতীয় দিনের কারনামা

বাইজান্টাইন বাহিনীর আক্রমণ

গতকালের সার্বিক ঘটনা এবং রোমানদের অন্যতম প্রধান সেনাপতি দারিজানের মৃত্যুর পর, তৃতীয় দিনে রোমানদের হামলার পরিকল্পনা অনেকটা সংকুচিত হয়ে আসে। তারা সীমিত চিন্তা থেকে মুসলিম বাহিনীকে আলাদা করে এবং নির্দিষ্ট অংশে আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেয়। সে-মতে আমর ইবনুল আসের নেতৃত্বে থাকা মুসলিম বাহিনীর ডান অংশে আক্রমণের দায়িত্ব নেয় বিপরীতে দাঁড়ানো রোমান সেনাপতি কানাতির। আর শুরাহবিল ইবনু হাসানার দায়িত্বে থাকা মুসলিম বাহিনীর কেন্দ্রীয় অংশে ডান দিকে হামলা করার চিন্তা করে বিপরীতে থাকা রোমান সেনাপ্রধান মাহান। পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রথমে হামলা হয় মুসলিম বাহিনীর ডান অংশে। দায়িত্বে থাকা সেনাপতি আমর ইবনুল আস প্রথম দিকে তাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করে দাঁড়িয়ে থাকেন, কিন্তু সদস্য বৃদ্ধি করে পুনরায় রোমান সেনারা আক্রমণ করলে আমর ইবনুল আস খানিকটা পিছনে সরে আসতে বাধ্য হন। তেমনি বাহিনীর মূল অংশে হামলা হলে কিছুটা পিছিয়ে আসেন সেনাপতি হযরত শুরাহবিল ইবনু হাসানাহও।

পাল্টা আক্রমণ

রোমানদের বাম অংশ তথা মুসলিমদের পতাকাগুলোর ঠিক উত্তর দিক থেকে হঠাৎ মুসলমানদের উপর জোরালো হামলা হয়। সে হামলা থেকে মূল বাহিনীকে বাঁচাতে ছুটে আসে যিরারের বিশেষ দায়িত্বে থাকা অশ্বারোহীদের ছোট ছোট দল। এরপর শুরাহবিল ইবনু হাসানার দিকে তেড়ে আসা মাহানের সেনাদের উপর পাল্টা আক্রমণ করতে দৌড়ে আসে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের বিশেষ দ্রুতগামী সেনা ইউনিট। হঠাৎ মূল বাহিনীর বহির্পক্ষের এমন পাল্টা হামলায় রোমানরা তাদের পূর্ব অবস্থানে ফিরে যেতে বাধ্য হয় এবং এভাবেই—বাইজান্টাইন বাহিনীর আরেকটি

ব্যর্থ দিনের আবরণ সন্ধ্যার কালোতে ঢেকে যায়।

চতুর্থ দিনের কথকতা

মাহানের চিন্তা ও পরিকল্পনামতে গত দিনে মুসলিম বাহিনীতে আক্রমণে উল্টো নিজেদেরই ক্ষতি করেছে রোমানরা। মুসলিম বাহিনী পাল্টা আঘাতে তাদের শক্ত প্রতিরোধ করে বরং তাদেরকেই বিপদের সম্মুখীন করতে সক্ষম হয়েছে। আজ চতুর্থ দিনে আর্মেনীয় সেনাপতি জাবালাহর নেতৃত্বে আরবের খ্রিস্টান অশ্বারোহীরা শুরাহবিল ইবনু হাসানাহর বাহিনীতে শক্ত আক্রমণ করে এবং মুসলিম সেনাপতি শুরাহবিল শুরুতে পাল্টা প্রতিরোধ করলেও শেষপর্যন্ত পেছনে হটে যাওয়া ছাড়া উপায় খুঁজে পান না। অন্যদিকে কানাতিরের বাহিনীর সামনে পশ্চাতে ফিরে আসে হযরত আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুর সেনা টিমও। সেনাপতি জাবালাহর সামনে শুরাহবিল ইবনু হাসানা বেশ চাপে পড়ে যান এবং তার সেনাদের মধ্যে বিশেষ ক্ষয়ক্ষতি দেখা দিতে থাকে।

রোমানদের যুদ্ধের তীব্রতা ঠাণ্ডা করে দিতে মুসলিম সেনাপ্রধান খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ তাঁর বিশেষ সেনা ইউনিট নিয়ে ময়দানে ঢুকে যাবার আগে সেনাপতি আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ এবং ইয়াযিদ ইবনু আবি সুফিয়ানকে হামলা শুরু করার নির্দেশ দেন, যাতে তাদের বিপরীতে থাকা রোমান বাহিনীর কেন্দ্রীয় অংশের ডান দিক এবং মূল বাহিনীর ডান অংশকে যুদ্ধে ব্যস্ত রাখা যায় এবং তারা যেন একযোগে মুসলিম বাহিনীতে হামলে পড়ার কোন সুযোগ পেয়ে না যায়—সেজন্য।

এরপর হযরত খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ ছোট ছোট কিছু কার্যকরী হামলা করে আর্মেনীয়দের মূল বাহিনীকে পেছনে যেতে বাধ্য করেন। যোহর পর্যন্ত তিনি বিশেষ বাহিনী নিয়ে শত্রুদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অংশে আক্রমণ করতে থাকেন এবং আর্মেনীয় অংশের মতো কানাতির স্লাভির নেতৃত্বে থাকা স্লাভ সেনাদেরও পশ্চাদপসরণে পাঠিয়ে দেন। এতে এদিকটায় শত্রুদের সকল টিম তাদের যুদ্ধপূর্ব অবস্থানে ফিরে যায়।

ওদিকে আবু উবাইদা এবং ইয়াযিদের বাহিনীর সাথে রোমানদের যুদ্ধে তখন আগুন জ্বলছে যেন। মুসলিম সেনারা সেখানে প্রচণ্ড তিরক্ষেপণের মুখোমুখি হয়। এতে তিরের আঘাতে অনেক মুসলিম সেনার দৃষ্টিশক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায়। তাদের মধ্যে

কয়েকজন হলেন: আবু সুফিয়ান, মুগিরা ইবনু শুবা, হাশিম ইবনু উতবা ইবনু আবি ওয়াক্কাস, আশআস ইবনু কাইস, আমর ইবনু মাদিকারিব, কাইস ইবনু মাকশুহ এবং আশতার আন-নাখয়ি। দুঃখজনক এ ঘটনার কারণে যুদ্ধের এই পঞ্চম দিনকে ইতিহাস 'ইয়াওমু খাসারাতিল উয়ূন' বা 'দৃষ্টিশক্তি বিনষ্টের দিন' হিসেবে স্মরণ করে। এতগুলো সেনা গুরুতর আহত হয়ে পড়লে আবু উবাইদা এবং ইয়াযিদের বাহিনী জরুরি ভিত্তিতে পেছন দিকে সরে আসে।

মুসলমানদের পাল্টা আক্রমণ

মুসলিম বাহিনীতে পরাজয়ের চিহ্ন ফুটে উঠল। বড় সংখ্যক আহত সেনা নিয়ে তারা সকলে তখন ভীষণ উদ্বিগ্ন। এ সময় ইকরামা ইবনু আবি জাহল দাঁড়িয়ে মুজাহিদদের 'বিজয় অথবা শাহাদাত' কর্মে শপথ করার আহ্বান জানান। তাঁর আহ্বানে চারশো মুজাহিদ তাৎক্ষনিক সাড়া দেয় এবং সে মর্মে শপথ করে। এরপর জীবন বাজি রেখে রোমানদের প্রতিরোধে যুদ্ধ করত থাকেন। রোমানদের সম্মুখভাগের সকলকে হত্যা করে এই বীর মুজাহিদরা তাদের আক্রমণ দমিয়ে দেন। মেরে ফেলেন আরও প্রায় চারশো বাইজান্টাইন সেনা। হঠাৎ এই জানবাজি হামলায় হযরত ইকরামা রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং তার ছেলে আমর প্রাণঘাতী আঘাতের শিকার হয়ে বাহিনীতে ফিরে আসেন। তাঁর এ ক্ষুদ্র সেনাদল রোমানদের আক্রমণ থামাতে পেরেছে বলে তাকে জানানো হলে তিনি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেন এবং আঘাতের প্রভাবে সেখানেই শাহাদাত বরণ করেন। ইসলামের এই বীর সেনাকে কবরস্থ করার কালো শোক মাথায় নিয়েই মুসলমানরা সেদিনের মতো যুদ্ধ সমাপ্ত করে।

পঞ্চম দিনের কারগুজারি

আমরা পূর্বে বলেছি, মুসলিম সেনাপ্রধান হযরত খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ শত্রুপক্ষের সেনাপ্রধান মাহানের তিন দিনের জন্য করা যুদ্ধবিরতির আবেদন নাকচ করে দিয়েছিলেন। তিনি জানতেন, ইকরামার পাল্টা আক্রমণের পর যুদ্ধের প্রতি রোমানদের পূর্ব আগ্রহ আর বহাল নেই। তাছাড়া এ পর্যন্ত মুসলমানরা যুদ্ধ হিসেবে কেবল প্রতিরোধের ধাপ অতিক্রম করেছে, এবার তাই সেনাপতি খালিদ আক্রমণাত্মক যুদ্ধের চিন্তা করলেন। তিনি সে হিসেবে সেনাদের বিন্যাসে পরিবর্তন আনলেন। বেশকিছু অশ্বারোহী সেনাকে তিনি একক আক্রমণের জন্য একত্র করলেন। নিজের অধীনে থাকা দ্রুতগামী অশ্বারোহীদের নিয়ে আসলেন

মূল বাহিনীর কেন্দ্রীয় অংশে। এরপর একত্রিত সে সব অশ্বারোহীদের রোমান ঘোড়সওয়ারদের পদাতিক বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন করার কাজে ব্যবহার করার ছক আঁকলেন। এতে বাহিনীর মূল অংশের পদাতিক সেনাদের পশ্চাৎ ও পার্শ্বহামলা থেকে বাঁচানোর মতো কোনো অশ্বারোহী টিম শত্রুদের সারিতে বাকি থাকবে না। একইসাথে তিনি ডান পাশের বাইজান্টাইন সেনাদের উপর আক্রমণ করে তাদেরকে পশ্চিমে নদীর দিকে সরিয়ে দেয়ারও পরিকল্পনা করলেন।

ষষ্ঠ দিনে যা ঘটল

ইয়াযিদ ইবনু আবি সুফিয়ানের নেতৃত্বে মুসলিম সেনাদের ডান অংশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর ডান পাশের সেনারা হযরত আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুমার নেতৃত্বে তাদের বিপরীত শত্রুদের উপর শক্ত আক্রমণ করেন। এ সময় সেনাপতি খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ তাঁর বিশেষ অশ্বারোহীর দল নিয়ে বাইজান্টাইন সেনাদের ডান অংশ কামড়ে ধরেন এবং একই সময় পরিকল্পনামতো তাঁর অশ্বারোহী টিমের আরেক অংশ বাইজান্টাইন বাহিনীর বাম অংশের বাম দিকে হামলা করে বসে।

আক্রমণের প্রথম ধাপ

ঠিক এই একই সময়ে মুসলিম বাহিনীর ডান অংশের সেনাপতি আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু রোমান, বাইজান্টাইন এবং কানাতিরের নেতৃত্বে থাকা অধিকাংশ স্লাভস সেনাদের বাম অংশে আক্রমণ করেন।

কানাতিরের অধীনে থাকা বাইজান্টাইন বাহিনীর ডান অংশ একইসাথে সম্মুখ এবং বাম দিক থেকে আক্রমণ প্রতিহত করে। কিন্তু তাদের রক্ষার দায়িত্বে থাকা বাইজান্টাইন অশ্বারোহীরা তাদেরকে ছেড়ে তখন মুসলিম অশ্বারোহী দলের মোকাবেলায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ফলে কানাতিরের সেনারা মুসলিম বাহিনীর দ্বিমুখী আক্রমণের মুখে রোমান বাহিনীর মূল অংশ, যেখানে মাহানের নেতৃত্বে লড়াই করছিল আর্মেনীয়রা—সেটার ডান দিকে সরে আসতে বাধ্য হয়ে পড়ে।

কানাতিরের বাহিনীকে এমন পশ্চাদপসরণে দেখে মুসলিম বাহিনীর ডান অংশের সেনাপতি সাহাবি হযরত আমর ইবনুল আস সুযোগটাকে কাজে লাগিয়ে রোমান সেনাদের মূল অংশের বাম দিকে আক্রমণ করার চিন্তা করলেন। এতে সে দিকে

থাকা বাইজেন্টাইনের কেন্দ্রীয় অংশের সেনারা সরতে থাকা স্লাভস সেনাদের চাপে বিপাকে পড়ে গেল।

আক্রমণের দ্বিতীয় ধাপ

একই সময়ে মুসলিম বাহিনীর কেন্দ্রীয় অংশের ডান পাশের সেনাপতি শুরাহবিল ইবনে হাসানা বাইজান্টাইন সেনাদের মূল অংশে সামনে থেকে হামলা করেন।

আক্রমণের তৃতীয় ধাপ

বাইজান্টাইন সেনাদের ডান বাহু পশ্চাৎমুখী হয়ে পড়লে মুসলমানরা সুযোগটাকে কাজে লাগিয়ে উপর্যুপরি আক্রমণ করতে থাকেন। এরই মধ্যে হযরত খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ অশ্বারোহীদের ইশারা দেন মূল বাহিনীর সাথে যুদ্ধ ছেড়ে বাইজান্টাইন অশ্বারোহীদের পদাতিক সেনাদের সারি থেকে একেবারে উত্তর দিকে দূরবর্তী স্থানে সরিয়ে নিয়ে যেতে।

আক্রমণের চতুর্থ ধাপ

মাহান চারপাশের প্রতিকূল পরিস্থিতি দেখে সকল রোমান অশ্বারোহীদের বাইজান্টাইন বাহিনীর পেছন দিক প্রহরার জন্য আহ্বান করল, যাতে মুসলিম অশ্বারোহীদের দিকে পাল্টা আক্রমণে ধেয়ে চলা যায়। কিন্তু মাহান সিদ্ধান্তে যথেষ্ট তৎপর না হওয়ায় ততক্ষণে তার কাছে সেনা জমায়েত হতে হতে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রোমান অশ্বারোহীদের মোকাবেলায় হাজির হয়ে যান। তারা যখন পাল্টা আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছিল, এমন সময় খালিদ সামনে এবং পাশ থেকে তাদের উপর অতর্কিত আক্রমণ করেন। মুসলিম অশ্বারোহীরা হালকা অস্ত্র সাথে রাখায়, সদা প্রস্তুত থাকতে পারত এবং প্রতিপক্ষের চেয়ে দ্রুত আক্রমণ করতে পারত, প্রয়োজনে পেছনে সরে এসে পুনরায় হামলে পড়তে পারত। খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের দ্বিমুখী আক্রমণের তোপে পড়ে বাইজান্টাইন অশ্বারোহী দল পদাতিক সেনাদের তাদের অবস্থায় ফেলেই দ্রুত ঘোড়া চালিয়ে উত্তর দিকে পলায়ন শুরু করে। একই পরিণতি হয় জাবালার নেতৃত্বে থাকা আরোহী সেনাদের, তারাও বিক্ষিপ্ত হয়ে দামেশকের দিকে উল্টো দৌড় দিতে থাকে।

আক্রমণের পঞ্চম ধাপ

বাইজান্টাইন বাহিনীর অশ্বারোহীরা পালিয়ে যাবার পর খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ

মাহান নেতৃত্বাধীন আর্মেনীয় সেনা, রোমান এবং বাইজেন্টাইনের সম্মিলিত বাহিনীর কেন্দ্রীয় অংশে পেছন থেকে আক্রমণ করার মনস্থ করলেন। এই আর্মেনীয়রা বড় সাহসী যোদ্ধা ছিল; এরাই দুদিন আগে মুসলিম বাহিনীকে বিভক্তি টেনে তাদেরকে প্রায় পরাজিত করে ফেলছিল। কিন্তু পেছন থেকে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ, বাম দিক থেকে আমর ইবনুল আস এবং সামনে থেকে শুরাহবিল ইবনু হাসানাহ একযোগে তাদের কেন্দ্রীয় অংশে হামলে পড়লে পেছনে কোনো অশ্বারোহী প্রহরী না থাকায় এবং কানাতারিরের স্লাভস সেনারা তাদের বাহিনীতে চেপে এসে গোলযোগ তৈরি করলে—দুদিন আগের বীর আর্মেনীয়দের সামনে প্রতিরোধের কোনো সুযোগই থাকল না; অগত্যা তারা পরাজয় মেনে নিল।

এবার অবরোধ

আর্মেনীয়দের হার মানার সাথেসাথে হেরে গেল পুরো বাইজান্টাইন বাহিনী। ত্রস্তপদে হুড়মুড়িয়ে দিকদিশা হারিয়ে ছোটাছুটি করে তারা পলায়ন করতে লাগল; বাকি কিছু সেনা সারিবদ্ধভাবে পশ্চিমে 'ওয়াদি-আর-রুক্কাদের' দিকে সরে যেতে থাকল।

কিন্তু পলায়নপর বাইজান্টাইন সেনারা নদীর পাড়ে ছোট্ট খেয়াঘাটে পৌঁছলে যিরার ইবনুল আযওয়ারের নেতৃত্বে মুসলিমদের একটি অশ্বারোহী দলের সাথে তাদের সাক্ষাৎ হয়, যারা পূর্ব থেকেই সেখানে তাদের অপেক্ষা করছিল। গতরাতে যুদ্ধের পরিকল্পনার অংশ হিসেবে সেনাপতি হযরত খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ ৫০০ মিটারের ছোট্ট এই খেয়াঘাট বন্ধ করে দেবার জন্যে প্রায় ৫০০ অশ্বারোহীকে সেখানে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। বস্তুত খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের পরিকল্পনা সফল হলে তিনি চাচ্ছিলেন রোমানরা এই দিকে পলায়নের চেষ্টা করুক, হলোও তা-ই!

সর্বশেষ ধাপ: চূড়ান্ত যুদ্ধ

খেয়াঘাটের পশ্চিম পাশে অপেক্ষমাণ মুসলিম অশ্বারোহীদের সাথে জড়ো হতে পূর্ব দিক থেকে মুসলিম পদাতিক দল এবং উত্তর দিক থেকে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের বিশেষ ঘোড়সওয়ার বাহিনী একসাথে রওনা করল। জায়গাটির দক্ষিণে ছিল ইয়ারমুকের প্রবাহ থেকে বহমান একটি গভীর খাল, বাইজান্টাইন সেনারা সেদিকে এগিয়ে ধীরে ধীরে মুসলিম বাহিনী কর্তৃক অবরুদ্ধ হয়ে পড়ছিল।

শুরু হলো যুদ্ধের চূড়ান্ত ধাপ। সামনের দিক থেকে মুসলমানদের ধাওয়া খেয়ে

বাইজান্টাইন বাহিনী হুড়োহুড়ি করে ছুটল গভীর সেই খালটির দিকে। আবার পাশ থেকে আক্রমণ শুরু হলে সেনারা বাহিনীর মাঝখানে সরতে সরতে চাপে পড়ে গেল। এতে পুরো বাহিনী ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ল।

এ সময় সম্মিলিত বাইজান্টাইন বাহিনী সকল প্রকার তথ্য ও যোগাযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল এবং তারা এমন পরিস্থিতিতে পড়ে গেল, প্রতিটি সেনাপতিই যা থেকে বিরত থাকার প্রাণপণ চেষ্টা করে। তা হলো, তারা এমন এক অবস্থায় আটকে গেল—যেন ধ্বংসস্তুপে পড়ে থাকা অস্ত্রধারী একদল অকেজো সেনা। এমনভাবে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল যে, সেনারা স্বাভাবিকভাবে তাদের অস্ত্রটাও ব্যবহার করতে পারছিল না। ফলে পুরোপুরি ব্যর্থ মনে তারা দ্রুতপায়ে ছুটে কেবল খাল পেরিয়ে পালানোর চেষ্টা করছিল। এই পলায়ন তৎপরতার ভেতরেই অনেকের মৃত্যু ও কতেকের বন্দিত্বের মাধ্যমে ইয়ারমুকের যুদ্ধ সমাপ্ত হয়ে যায়।

আখেরি ধাওয়া

যুদ্ধের ষষ্ঠ দিনের সন্ধ্যা গড়িয়ে গেছে। মুসলমানদের বিজয়ের মধ্য দিয়ে শেষ হয়ে গেছে দীর্ঘমেয়াদী রুক্ষ এ যুদ্ধ; কিন্তু সেনাপতি খালিদ স্বস্তিতে বসে থাকলেন না, বরং সেনাদেরকে পরদিন সন্ধ্যার প্রহর দেখালেন তিনি। মাহানের সাথে বাইজান্টাইনের পলাতক সেনারা দামেশকের পথে হেঁটেছে; খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ তাঁর সেনাদের নিয়ে তাদের পিছু নিলেন। আবারও তাদের সাথে সংঘর্ষে জড়ালেন, উদ্দেশ্য হলো—কোনো মুসলিম সেনার হাতে যেন সেনাপতি মাহানের শির চলে আসে। হঠাৎ এক মুসলিম যোদ্ধা একটি মাথা উপরে তুলে বললেন, 'কসম খোদার, আমি মাহানকে হত্যা করে ফেলেছি।' সে সময়ের স্বাভাবিক রীতি ছিল, পরাস্ত সেনাদের পলায়নের মধ্য দিয়েই যুদ্ধের সমাপ্তি টানা হতো। সেজন্য মাহান ও তার সেনাদের প্রত্যাশাও এর বাইরে কিছু ছিল না যে, খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ তাদের পিছু নেবেন।

ফলাফল ও মূল্যায়ন

সংখ্যাস্বল্পতা সত্ত্বেও দক্ষ নেতৃত্বের মাধ্যমে বেশি শক্তিশালী বাহিনীকে তুলনামূলক কম শক্তিশালী বাহিনী পরাজিত করায় সামরিক ইতিহাসে ইয়ারমুকের যুদ্ধকে উত্তম উদাহরণ হিসেবে ধরা হয়। বাইজান্টাইন কমান্ডাররা প্রতিপক্ষকে নিজ

পছন্দমতো যুদ্ধক্ষেত্রে আসার সুযোগ দেন। কিন্তু এরপরও তাদের আদতে কোনো কৌশলগত অসুবিধা হয়নি। খালিদ তার বাহিনীর সংখ্যাস্বল্পতার কথা বুঝতে পেরেছিলেন এবং প্রায় শেষ দিন পর্যন্ত তাই তিনি প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান থেকে যুদ্ধ করেছেন। তবে শেষ দিনে চূড়ান্ত আক্রমণের সময় তিনি তার কল্পনা, দূরদৃষ্টি ও সাহসের সাথে আক্রমণের পরিকল্পনা করেন এবং এক্ষেত্রে তিনি আশ্চর্যভাবে বাইজান্টাইন কমান্ডারদের ছাড়িয়ে যান। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র বাহিনী পরিচালনা করলেও যুদ্ধবিদ্যাগত দূরদৃষ্টির কারণে তিনি তার একটি অশ্বারোহী বাহিনীকে চূড়ান্ত আক্রমণের আগের রাতে প্রতিপক্ষের পিছু হটার রাস্তা অবরোধ করতেও নিযুক্ত করেছিলেন।

ইয়ারমুকের নেতৃত্বের কারণে খালিদ বিন ওয়ালিদকে ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সেনাপতি হিসেবে গণ্য করা হয়। অশ্বারোহী সেনাদের সফল ব্যবহারের কারণে তাদের শক্তি ও দুর্বলতা সম্পর্কে তার স্পষ্ট ধারণার প্রমাণ পাওয়া যায়। তার বিশেষ অশ্বারোহী বাহিনী দ্রুত এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে পারত। তাদের উপস্থিতি যুদ্ধের অবস্থা বদলে দিতে সক্ষম ছিল এবং যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের এক স্থান থেকে অন্যত্র গমন যুদ্ধক্ষেত্রে দারুণ সফলতা নিয়ে আসে।

মাহান ও তার বাইজান্টাইন কমান্ডাররা এই অশ্বারোহী বাহিনীর সাথে মোকাবেলায় বলতে গেলে একবারও সফল হননি। তারা তাদের বৃহৎ বাহিনীর যথাযোগ্য ব্যবহারেও ব্যর্থ হন। যুদ্ধে বাইজান্টাইন অশ্বারোহীরাও গুরুত্বপূর্ণ কোনো ভূমিকা রাখতে পারেনি এবং ছয় দিনের অধিকাংশ সময়ে তারা রিজার্ভ হিসেবেই অলস সময় কাটিয়েছে। তারা কখনো তাদের আক্রমণ এগিয়ে নিতে পারেনি এবং চতুর্থ দিন একটি ফলাফল নির্ধারণী আক্রমণের সুযোগ হলেও তারা সেটা কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়।

সিরিয়ায় মুসলিমদের ধ্বংস করার জন্য হেরাক্লিয়াসের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে দ্রুত পদক্ষেপের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু কমান্ডাররা এক্ষেত্রে একদমই দক্ষতা দেখাতে পারেননি। হেরাক্লিয়াস যা বৃহৎ কৌশলগত স্কেলে পরিকল্পনা করেছিলেন, খালিদ তা ছোট কৌশলগত স্কেলে বাস্তবায়ন করে নিয়েছেন। নিজ বাহিনীকে নির্দিষ্ট স্থানে দ্রুত সংগঠিত করে খালিদ বৃহৎ বাইজান্টাইন বাহিনীকে সফলভাবে পরাজিত করতে সক্ষম হন। মাহান তার সংখ্যাধিক্যকে কাজে লাগাতে পুরোপরি ব্যর্থ হন এবং সম্ভবত যুদ্ধক্ষেত্রের ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য বড় আকারের সেনাসমাবেশের পক্ষে অসুবিধাজনক ছিল। তবে মাহান কোনো ক্ষেত্রেই তার বৃহৎ বাহিনীকে কাজে

লাগিয়ে সফলভাবে প্রতিপক্ষের সারি ভেদ করতে সক্ষম হননি, যা তাদের জন্য নিতান্ত দুঃখজনক। ছয় দিনের মধ্যে পাঁচ দিন তিনি আক্রমণাত্মক ভূমিকা পালন করলেও তার যুদ্ধবিন্যাস মোটামুটি একই অবস্থায় স্থির ছিল। এসকল কারণে খালিদের জন্য শেষের দিন সুবিধাজনক অবস্থা তৈরি হয় এবং সুযোগের সদ্ব্যবহার করে খালিদ তার সকল অশ্বারোহীদের নিয়ে সুসংগঠিতভাবে আক্রমণ করেন। ফলে বিজয় সহজেই তার হাতে এসে ধরা দেয়।

ইয়ারমুকের এ যুদ্ধ ছিল ইসলামি ইতিহাসের অন্যতম প্রধান যুদ্ধ। ইসলামি বিজয়ান্দোলনে এ যুদ্ধের প্রভাবও ছিল বেশ সুদূরপ্রসারী। সমসাময়িক বিশ্বের সবচে শক্তিশালী রোমান সেনাবাহিনী এ যুদ্ধে মুসলমানদের কাছে কঠোর পরাজয়ের শিকার হয়। তারা নিজেদের সেনাবাহিনীর শৌর্য এবং সৌন্দর্য হারায়। হিমসে অপেক্ষায় থাকা হেরাক্লিয়াস এ পরাজয়ে শোকার্ত হয়ে পড়ে। তার সাম্রাজ্যে নেমে আসে রাজ্যের দুর্যোগ ও বিপর্যয়; অনন্যোপায় হয়ে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে সে হিমস ছেড়ে সিরিয়ার দিকে পা বাড়ায়। মহিমান্বিত এ বিজয়ের ফলে শামে মুসলমানরা আরও থিতু হয়ে বসার সুযোগ পায় এবং এতদাঞ্চলে তাদের জয়ের ধারা সম্পন্ন হয়ে যায়। এবার তারা নিশ্চিন্ত মনে বিজয়ের ঘোড়া ছোটায় উত্তর আফ্রিকার দিকে।

নাহাওয়ান্দ যুদ্ধ

BATTLE OF NAHAVAND

তারিখ:	২০ হিজরি / ৬৪১ খ্রি.
স্থান:	ইরানের নাহাওয়ান্দ শহর
ফলাফল:	মুসলিম বাহিনীর বিজয়

পক্ষ-বিপক্ষ:	খিলাফতে রাশিদা	পারস্যের সাসানি সাম্রাজ্য
সেনাপ্রধান:	নুমান ইবনুল মুকরিন	ফিরজান
সেনাসংখ্যা:	৩০ হাজার	১ লক্ষ ৫০ হাজার
ক্ষয়ক্ষতি:	অজ্ঞাত	১ লক্ষ নিহত

পারস্যের সাথে ফায়সালা চূড়ান্তকারী যুদ্ধগুলোর অন্যতম একটি যুদ্ধ হলো হিজরি ২০ সালে (৬৪১ খ্রিস্টাব্দে) আমিরুল মুমিনিন হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতকালে সংঘটিত নাহাওয়ান্দের যুদ্ধ। তবে কারও মতে ১৯ হিজরিতে পারস্যের নাহাওয়ান্দ শহরে এ-যুদ্ধটি সংঘটিত হয়। সেনাপতি হযরত নুমান ইবনু মুকরিনের নেতৃত্বে এ যুদ্ধে মুসলমানরা পারস্যের সাসানি সেনাদের বিরুদ্ধে মর্যাদাকর বিজয় তুলে নেয়। এ যুদ্ধে সেনাপতি নুমান ইবনু মুকরিন শহিদ হয়ে যান; তবে এ জয় ইরানে বিগত ৪১৬ বছর ধরে রাজত্ব করা সাসানি সাম্রাজ্যের সমাপ্তিরেখা টেনে দেয়।

যুদ্ধের প্রাককথা

কাদিসিয়ার ময়দানে মুসলমানদের কাছে পারস্য বাহিনী শোচনীয় পরাজয় বরণ করার পর সম্রাট ইয়াজদাজারদ 'আল-বাব', সিন্ধু এবং হেলওয়ান শহরবাসীর কাছে একটি চিঠি লিখে পাঠায়। সেখানে সে তাদেরকে পরস্পরে এক হয়ে সেনাবাহিনী গঠন করত মুসলমানদের উপর ঘোরতর আক্রমণের নির্দেশ দেয়। সম্রাটের আদেশমতো তারা সেনা সংগ্রহ করে নাহাওয়ান্দ শহরের কাছে একত্র হয়।

সেনাপতি হযরত সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস আমিরুল মুমিনিনের কাছে দূত পাঠালেন। বললেন: 'পারসিকরা দেড় লাখ সেনা এক করেছে; আমরা দ্রুত প্রস্তুত হবার আগে তারা আমাদের কাছে এলে তাদের শক্তি ও সাহস আরও বেড়ে যাবে। আর যদি আমরা এগিয়ে যাই, তাহলে আমাদের বর্তমান অবস্থা হলো এই।'

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু মুহাম্মদ ইবনু মাসলামাকে পাঠালেন সাদের কাছে। বললেন: 'লোকেরা পারস্য বাহিনীর মোকাবেলায় প্রস্তুত হচ্ছে, চিন্তার কারণ নেই।' কিন্তু সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর মনে হলো, বিষয়টা তিনি পুরোপুরি বোঝাতে পারেননি।

তাই কুফা ছেড়ে তৎক্ষণাৎ তিনি মদিনায় গেলেন। সরাসরি খলিফাতুল মুসলিমিনের সাথে পরিস্থিতির ভয়াবহতা নিয়ে আলোচনা করলেন। সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাসের কথা শুনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সমস্ত মুসলমানকে মদিনায় একত্র করে তাদের সামনে পরিস্থিতির দাবি ও নাজুকতা তুলে ধরলেন এবং আমাদের পক্ষের করণীয় কী হতে পারে—সে ব্যাপারে সকলের কাছে পরামর্শ কামনা করলেন।

তারা বলল: 'আপনি মদিনায় থাকুন; কুফাবাসীদের কাছে একটি চিঠি লিখুন, যেন সেখানকার দুই তৃতীয়াংশ লোক মুসলিম সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় বের হয়। চিঠি লিখুন বসরাতেও, যেন তারা সকলেই পারস্যের মোকাবেলায় ইসলামের বাহিনীতে যোগ দেয়।' উমর বললেন: 'কালকের এ-গুরুদায়িত্ব অর্পণ করতে পারি, এমন কারও নাম প্রস্তাব করুন।' লোকেরা বলল: 'আপনিই সেটা ভালো বুঝবেন, আপনার ক্ষমতাও এক্ষেত্রে বেশি।' উমর বললেন: 'শপথ আল্লাহর, এমন একজনকে আমি আগামীকালের যুদ্ধের দায়িত্ব দিতে চাই, শত্রুপক্ষের মোলাকাতে প্রথম কামড় যে স্বয়ং বসাবে।' সবার চোখে কৌতূহল দেখা দিল: 'কে সে?' উমর বললেন: 'সে হলো, নুমান ইবনুল মুকরিন আল-মুযানি।' নাম শুনেই সকলে তার যোগ্যতা সমস্বরে স্বীকার করে নিল।

খলিফাতুল মুসলিমিন মসজিদে প্রবেশ করলেন। দেখলেন, নুমান ইবনু মুকরিন নামায পড়ছেন। নামায শেষ হতেই উমর বললেন: 'আমি আপনাকে একটি কাজ দিতে চাই।' তিনি বললেন: 'যদি কর আদায়ের দায়িত্ব হয়, তাহলে অমত জানাচ্ছি; আর যদি জিহাদ ফি-সাবিলিল্লাহর দায়িত্ব হয়, তবে সানন্দে রাজি আছি।' এরপর মদিনার একদল সেনা নিয়ে রাসূলের কজন সাহাবিকে সাথে করে ২০ হিজরির সে-সময়টাতেই নুমান শহর ছাড়লেন।

পারস্য সেনারা মুসলমানদের জন্য অগ্রিম ফাঁদ বুনল; নাহাওয়ান্দ শহরের চারপাশের বালুকাময় প্রান্তরে ছড়িয়ে দিল শত শত লোহার পেরেক। গোয়েন্দা মারফত সে খবর জানলেন মুসলিম সেনাপতি নুমান ইবনু মুকরিন। লোক পাঠালেন, শহরের পাশে সত্যিই পেরেক ছিটানো কি-না দেখতে। সেনারা কিছুক্ষণ পায়চারি করল, কিন্তু কিছুই খুঁজে পেল না সেখানে। হঠাৎ একজন তার ঘোড়াকে তাড়া দিলে ঘোড়াটির পায়ে কিছু একটা বিদ্ধ হয়েছে বলে মনে হলো। ঘোড়াটি কিছুতেই জায়গা থেকে নড়ছিল না। উপরে থাকা সেনা নিচে নেমে ঘোড়াটির সামনের পা তুলে দেখল, তাতে পেরেক ফুঁড়ে আছে। দ্রুত সে সেনাপতির কাছে এসে খবরটি জানাল। সেনাপতি অন্যান্য গণ্যমান্যের সাথে পরামর্শ করলেন, কী করা যায়?

তারা বললেন: 'আমরা আপাতত এখান থেকে সরে যাই, যাতে তারা মনে করে, আমরা পালিয়েছি। তাহলে অবশ্যই তারা আমাদের তালাশে বেরিয়ে আসবে।' সেনাপতি তাদের পরামর্শ মানলেন। তৎক্ষণাৎ সে এলাকা ছেড়ে কিছু দূরে গিয়ে লুকিয়ে পড়লেন। পারস্য বাহিনী তাদেরকে না দেখে শহরের আশপাশ ঝাড়ু দিয়ে পেরেকগুলো তুলে নিল। এরপর দলে দলে নেমে এল মুসলিম বাহিনীর খোঁজে। এ-সময় সেনাপতি নুমান তাঁর বাহিনী নিয়ে তাদের সামনে বের হয়ে এলেন।

ময়দানে এসে তিনি সেনাদের বিন্যস্ত করলেন। অস্ত্র ও ঘোড়াগুলোকে প্রস্তুত করলেন। সামনের অগ্রবর্তী বাহিনীর প্রধান করলেন নুআইম ইবনু মুকরিনকে। দুই বাহুতে রাখলেন হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান এবং সুআইদ ইবনু মুকরিনকে। কেন্দ্রীয় অংশের দায়িত্ব দিলেন কাকা ইবনু আমরকে; পেছন অংশের সেনাপতি করলেন মুশাজি ইবনু মাসউদকে। ওদিকে পারস্যের দেড় লাখ সেনা জমা হলো ফিরজানের নেতৃত্বে। বিপুল সেনার এই বিরাট বাহিনীর দুই বাহুতে নেতা হিসেবে দাঁড়াল যারদাক এবং বাহমান জাদুয়া।

হযরত মুগিরা: মুসলিম বাহিনীর দূত

সেনাপতি নুমান ইবনু মুকরিনের নেতৃত্বে নাহাওয়ান্দের পাশে জড়ো হয়েছে মুসলিম সেনাবাহিনী; ওপাশে দাঁড়ানো ফিরজান ও তার অনুগত পারস্য সেনাদল। পিন্দার (Pindar) নামী এক পারসিক সেনাপতি মুসলিম বাহিনীতে এসে বলে, 'আমাদের কাছে একজন লোক পাঠান, আমরা তার সাথে কিছু কথা বলব।' এরপর সেনাপতির নির্দেশে দূত হয়ে গেলেন রাসূলের অন্যতম কৌশলী সাহাবি হযরত মুগিরা ইবনু শুবা রাদিয়াল্লাহু আনহু। লম্বা চুলগুলো ছেড়ে রাখলেন, চেহারায় ধরে রাখলেন স্বভাবসুলভ গাম্ভীর্য। তিনি পারস্য বাহিনীতে পৌঁছলে পিন্দার অন্যদের সাথে পরামর্শ করল: 'তাকে কীভাবে স্বাগত জানানো যায়?' আমাদের সাম্রাজ্যের আভিজাত্য, শৌর্য ও গৌরবের ঝলক দেখিয়ে, যাতে তাদের ভেতর আমাদের ভয় ঢুকে যায়? নাকি সাদাসিধে অনাড়ম্বরভাবে আহ্বান জানাব; এতটা মিতব্যয়ী ও সংযমী হবো, যে তারা আমাদের রাজ্যের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে? পিন্দারের সহযোগীরা পরামর্শ দিল: 'বরং আপনি আমাদের বিপুল সেনা-শৌর্য, আভিজাত্য এবং বিরাট প্রস্তুতির নমুনা দেখিয়ে তাকে ভড়কে দিন।' এরপর তারা হযরত মুগিরা ইবনু শুবা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে স্বাগত জানাতে গর্ব ও আভিজাত্যের পোশাক ও

আসবাব প্রস্তুত করল।

হযরত মুগিরা নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে ঢুকলেন। উজ্জ্বল চিকচিকে বর্শা ও বল্লম হাতে কিছু সেনা তার দিকে এগিয়ে এল। পিন্দারের আদেশে তাগড়া সেনারা তাঁর চারপাশ ঘিরে নিল, যাতে পরিবেশ দেখেই আগন্তুক ঘাবড়ে যান। সেনারা চারপাশ থেকে আগুনচোখে তাকাচ্ছে তাঁর দিকে, তাদের চেহারায় শত্রুতার ছাপ প্রকট। পিন্দার তখন স্বর্ণের সিংহাসনে বসা, তার মাথায় চমকাচ্ছে মূল্যবান মুকুট। চারপাশ ভালো মতন দেখে হযরত মুগিরা বললেন: 'দূতদের সাথে বোধহয় এমন আচরণ শোভাকর নয়।' তারা বলল: 'কিন্তু তুমি তো অতি নিকৃষ্ট লোক।' মুগিরা বললেন: 'আমি আমার সম্প্রদায়ের অন্যতম অভিজাত লোক, অন্তত তোমাদের দলে এই লোকের সম্মানের তুলনায়', এই বলে তিনি পিন্দারের দিকে ইঙ্গিত করলেন।

উপস্থিত সেনারা চটে গেল। ধমকের স্বরে মুগিরা ইবনু শুবাকে বলল: 'বসো এখানে!' তিনি বসলেন। পিন্দার কথা বলতে শুরু করল, পাশ থেকে দোভাষী কেউ তা সাহাবি মুগিরার জন্য অনুবাদ করে দিচ্ছিল। সে বলল: 'তোমরা আরবরা পৃথিবীর অন্যতম কল্যাণহৃত জাতি; ক্ষুধার্ত, দারিদ্র্যপীড়িত, নিকৃষ্ট, চূড়ান্ত অপরিচ্ছন্ন এবং অসামাজিক সম্প্রদায়। আমি আমার চারপাশের সেনাদের তির-বল্লম ছুড়তে বলছি না কেবল এ-জন্য যে, তোমাদের লাশগুলোকেও আমরা অপবিত্র ভাবি; কারণ, তোমরা হলে পরিত্যক্ত বর্জ্য। অতএব, যদি তোমরা তাঁবু গুটিয়ে ফিরে যাও, তাহলে আমরা তোমাদের নিরাপদে ছেড়ে দেব; কিন্তু যদি তোমরা যুদ্ধের জন্য তেড়ে আস, তাহলে দেখতে পাবে—যুদ্ধের ময়দানে আমরা কতটা ধ্বংসাত্মক হয়ে উঠি।'

হযরত মুগিরা তার কথা চুপ করে শুনলেন। এরপর আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের প্রশংসা করে বললেন: 'আল্লাহর শপথ, তুমি আমাদের গুণ ও স্বভাবের সামান্য ভুল বিবরণ দাওনি; আমরা সত্যিই পৃথিবীর অন্যতম কল্যাণহৃত ক্ষুধার্ত, দারিদ্র্যপীড়িত, নিকৃষ্ট, অসামাজিক এবং চূড়ান্ত অপরিচ্ছন্ন সম্প্রদায়ই ছিলাম; কিন্তু এরপর আল্লাহ আমাদের মাঝে তাঁর রাসূল প্রেরণ করলেন। তিনি আমাদেরকে পার্থিব বিজয় ও পরকালীন জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিলেন। খোদার কসম, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে আগমনের পর থেকে আল্লাহর কাছে আমরা কেবল বিজয়েরই প্রত্যাশা করেছি; এই তোমাদের ভূমিতে কদম ফেলা পর্যন্ত—তাঁকে আমরা বিজয়দাতা হিসেবেই চিনেছি এবং তাঁর কসম করে বলি: আমরা সেই পুরনো দুর্ভাগ্য পুনরায় বরণ করে নেব না, যতক্ষণ হয় তোমাদের এ সম্পদ ও গৌরবের উপর তোমাদের পরাস্ত করছি; না-হয় তোমাদের ভূমিতে আমাদের শির

কাটা পড়ছে। তবে এই যে তোমার আভিজাত্যের পোশাক ও গর্বের আসবাবপত্র, আমার পেছনের সেনারা সেগুলো না-নিয়ে ফিরবে বলে তো মনে হয় না।'

হযরত মুগিরা বলেন: 'আমার মনে হলো, যদি গায়ের কাপড় মুঠো করে আমি এক গাধাটার সিংহাসনে চড়ে বসি, তাহলে হয়তো সে এটাকে অশুভ মনে করবে।' তাকে খানিক উদাস দেখে আমি সেই কাজটিই করলাম। লাফিয়ে সিংহাসনে তার পাশে বসে পড়লাম। পিন্দার চেচিয়ে উঠে বলল: 'ধরো একে।' সেনারা আমাকে ধরে মাটিতে ফেলে পা দ্বারা আঘাত করলে লাগল। আমি বললাম: 'দূতদের সাথে এই তবে তোমাদের আচরণ? আমরা কখনোই এমন দুর্ব্যবহার করি না। তোমাদের দূতের সাথেও আমরা, এমন কিছুই করিনি; তাকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো।'

পিন্দার বুঝতে পারল, আমি তার সেনাদের মনস্তত্ত্বে আঘাত করছি। কারণ, আমি ইসলামের উন্নত শিষ্টাচারের নমুনা তুলে ধরতে শুরু করেছি; পাশাপাশি সেখানে উঠে আসছে পারসিকদের কদাচারের কদর্য চিত্র। সে এটা আন্দাজ করতে পেরে তখনই আলোচনা শেষ করে দিতে চাইল। বলল: 'আমরা তোমাদের সাথে সম্পর্ক রাখি কি ছাড়ি, সেটা আমাদের ব্যাপার; তোমরা আমাদের সাথে সম্পর্ক রাখো কি-না, সেটাও তোমাদের ব্যাপার।'

এরপর সাহাবি মুগিরা ইবনু শুবা তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মুসলিম বাহিনীতে ফিরে আসেন। সেনাপতি নুমান ইবনু মুকরিনকে জানালে তিনি বাহিনীকে সামনে অগ্রসর হতে নির্দেশ দেন।

যুদ্ধের নাকারা

সেনাপতি হযরত নুমান ইবনু মুকরিন যুদ্ধ শুরু করলেন বুধবারে। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত সে যুদ্ধ চলল লাগাতার, প্রচণ্ডভাবে। ফলাফল, আপাতবিচারে জয়-পরাজয় উভয় পক্ষের সমান প্রাপ্তি। এ সময় পারস্য বাহিনী অবস্থান নিয়েছিল শহরঘেঁষা পরিখার ভেতর।

মুসলমানদের ভয় হলো, যুদ্ধ বুঝি দীর্ঘমেয়াদের দিকে গড়াচ্ছে। সেনাপতি নুমান সাহাবিদের কাছে পরামর্শ চাইলেন। তারা যা বলল, সেনাপতির কেন জানি তা পছন্দ হলো না। এরপর কথা বলল তুলাইহা নামী একজন। সে বলল: 'প্রশিক্ষিত কিছু ঘোড়া পাঠানো হোক শত্রুদের কাছে। এতে তারা মাথা তুলে তাকাবে এবং

রাগান্বিত হয়ে তির ছুড়তে শুরু করবে। আমাদের সেনারা তাদেরকে রাগিয়ে তুলবে ক্রমাগত, উস্কে দেবে—যাতে তারা পরিখার গর্ত ছেড়ে বের হয়ে আসে। যেই তারা বের হবে, আমাদের সেনারা ছুটে চলে আসবে নিজেদের শিবিরে।' সবার এ মতামত পছন্দ হলো। সেনাপতি নুমান সে-মতে কাকা ইবনু আমরকে নির্দেশ দিলেন যুদ্ধ শুরু করতে। পরিকল্পনামতো তিনি যুদ্ধ শুরু করলেন। মুসলমানদের পরিকল্পনা অনুযায়ী পারস্য সেনারা ধীরে ধীরে পরিখা ছেড়ে বের হয়ে আসতে লাগল। তারা বেরোতে থাকলে আস্তে আস্তে কাকা ইবনু আমর সরে আসতে থাকলেন। একে একে পারস্যের সব সেনা বেরিয়ে যায়, বাকি থাকে কেবল ফটকের প্রহরীদল। ততক্ষণে কাকা ইবনু আমর মুসলিম সেনাদের সাথে এসে মিশে যান।

জুমাবার। দুপুরের তাতানো সূর্য তখন মাথার উপর। সেনাপতি নুমানের নির্দেশের অপেক্ষায় সেনারা যার যার স্থানে দাঁড়িয়ে আছে। ওদিকে পারসিকরা তির ছুড়তে ছুড়তে এগিয়ে আসছে সামনের দিকে। সেই তির উড়ে এসে মুসলিম সেনাদের চারপাশ আহত করে দিচ্ছে। মুসলমানরা তখনও সেনাপতির দিকে তাকিয়ে, যুদ্ধের নির্দেশ কখন আসে। কিন্তু নুমান চাচ্ছিলেন, মুসলিম বাহিনী আরও কিছুক্ষণ ধৈর্য ধারণ করুক!

সূর্য হেলে পড়ার সময় যখন হলো, চারপাশে বয়ে গেল শীতল বাতাস; সেনাপতি তখন যুদ্ধের নির্দেশ দিলেন। এ বিলম্ব কেবল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত অনুসরণের স্বার্থে। তিনি যুদ্ধের জন্য এই সময়টা পছন্দ করতেন। সেনাপতি নুমান এবার ঘোড়ায় চড়ে বসলেন। মুসলিম সেনাদের যুদ্ধের উৎসাহ জোগালেন এবং বললেন: আমি শহিদ হয়ে গেলে সেনাপতির দায়িত্ব নেবে হুযাইফা, সে শহিদ হলে অমুক... এভাবে তিনি পরবর্তী সাতজনের ধারাবাহিক নাম বলে গেলেন।

সেনাপতি নুমান পরপর দুটি তাকবির দিলেন। এরপর বললেন: 'হে আল্লাহ, আপনি আপনার দ্বীনকে সমুন্নত করুন, আপনার বান্দাদের বিজয়ী করুন এবং আপনার দ্বীনের পথে, আপনার বান্দাদের বিজয়ের স্বার্থে আজকের প্রথম শহিদ হিসেবে আমি নুমানকে কবুল করুন। হে আল্লাহ, আপনার কাছে সকাতর কামনা করি, আজকে আমার চক্ষু শীতল করুন এমন বিজয় দিয়ে, ইসলামে যার বেশ প্রভাব ও তাৎপর্য থাকবে।' সেনাপতির শাহাদাত ও বিজয়ের তামান্নামাখা আবেগঘন এমন প্রার্থনায় সেনাদের চোখ ভিজে উঠল।

তৃতীয় তাকবির দিয়েই নুমান যুদ্ধের জন্য ময়দানে ঢুকে গেলেন। সেনাপতিকে আসতে দেখে পারস্য সেনারা ভয়ে ময়দান থেকে সরে যাচ্ছিল। কিন্তু ময়দানে রক্তের স্রোত বয়ে যাওয়ায় সেনাপতি নুমানের ঘোড়া পিছলে পড়ে যায় এবং তিনি ঘোড়ার খুরের আঘাতে মারাত্মক আহত হয়ে পড়েন। এমন সময় একটি তির উড়ে এসে তার গায়ে বিদ্ধ হলে তিনি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মাটিতে শুয়ে পড়েন। তাঁর ভাই নুআইম ইবনু মুকরিন দূর থেকে এ দৃশ্য দেখে এগিয়ে আসেন। কাপড় দিয়ে জখম ঢেকে দেন এবং মাটিতে পড়ার আগেই হাতের পতাকাটি নিয়ে নেন। সেনাপতি নুমানের কথামতো সেই পতাকা পৌঁছে যায় হযরত হুযাইফার হাতে। সাহাবি মুগিরা বলে ওঠেন: 'তোমাদের সেনাপতির আঘাত লুকিয়ে রাখো; আমরা দেখি, আল্লাহ তাদের সাথে আমাদের কী সমাপ্তি রেখেছেন। আহত সেনাপতিকে দেখে সাধারণ সেনাদের মনোবল ভেঙে যেতে পারে।'

সেনাপতি নুমান ইবনু মুকরিন ঘোড়া পিছলে পড়ে যাবার পর হযরত মাকিল ইবনু ইয়াসার একটু পানি নিয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে আসেন। পানিটুকু দিয়ে তাঁর চেহারার মাটি ধুয়ে মুছে দেন। সেনাপতি জিজ্ঞাসা করেন, 'কে তুমি?' তিনি বলেন: 'আমি মাকিল ইবনু ইয়াসার।' নুমান বলেন: 'সেনাদের কী অবস্থা?' তিনি বলেন: 'আল্লাহ তাদের বিজয়ী করেছেন।' বিজয়ের সংবাদ শুনে নুমান শুকরিয়া আদায় করে বললেন: 'আলহামদুলিল্লাহ, বিজয়ের এই সুসংবাদ লিখে উমরের কাছে পত্র পাঠিয়ে দাও।' এ কথা বলেই তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।

বিজয়ের সংবাদ

রাতের আঁধার নেমে এলে পরাজিত পারসিক বাহিনী পালাতে শুরু করে। অন্ধকারে পথ না পেয়ে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে অনেকে এক সরু উপত্যকায় ঢুকে আটকে যায়। প্রথমে একজন ঢুকে পড়ে, এরপর ঢোকে একসাথে ছয়জন। এভাবে তারা সেখানে গাদাগাদি করে বন্দি হতে থাকলে মুসলিম বাহিনীর হাতে ধরা খেয়ে প্রাণ দিতে হলো সেখানকার সবাইকে। এ যুদ্ধে পারসিকদের এক লাখেরও বেশি সেনা নিহত হয়; কেবল রাতের আঁধারে খানা-খন্দকে, সরু উপত্যকায় আটকে মারা যায় প্রায় আশি হাজার সেনা। পারস্যের অন্যতম সেনাপতি বাহমান জাদুয়া মারা পড়ে, কিন্তু ফিরজান পালিয়ে যায়। কাকা ইবনু আমর তার পলায়নের খবর পেয়ে নুআইম ইবনু মুকরিনকে নিয়ে তাকে ধাওয়া করেন। শেষে আরেক গিরিপথে কিসরার প্রাসাদের

দিকে যাওয়া গাধা-খচ্চরে মধুবাহী এক কাফেলায় তাকে পাওয়া যায়। উপায় না পেয়ে সে কাফেলা ছেড়ে পাহাড়ের উপর দিকে উঠে যেতে থাকে। হযরত কাকা ইবনু আমর পায়ে হেঁটে পাহাড় বেয়ে উপরে গিয়ে তাকে ধরেন এবং সেখানেই হত্যা করে ফিরে আসেন।

সেনাপতির মৃত্যুতে মুসলমানদের হৃদয় শোকে ছেয়ে যায়। যুদ্ধ শেষে তারা নতুন সেনাপ্রধান হযরত হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে এবং ২০ হিজরির শুরুর দিকে (৬৪১ খ্রিস্টাব্দে) বিজয়ীর বেশে তারা নাহাওয়ান্দ শহরে প্রবেশ করে।

উমাইয়া খিলাফত

৪০-১৩২ হি.

৬৬১-৭৫০ খ্রি.
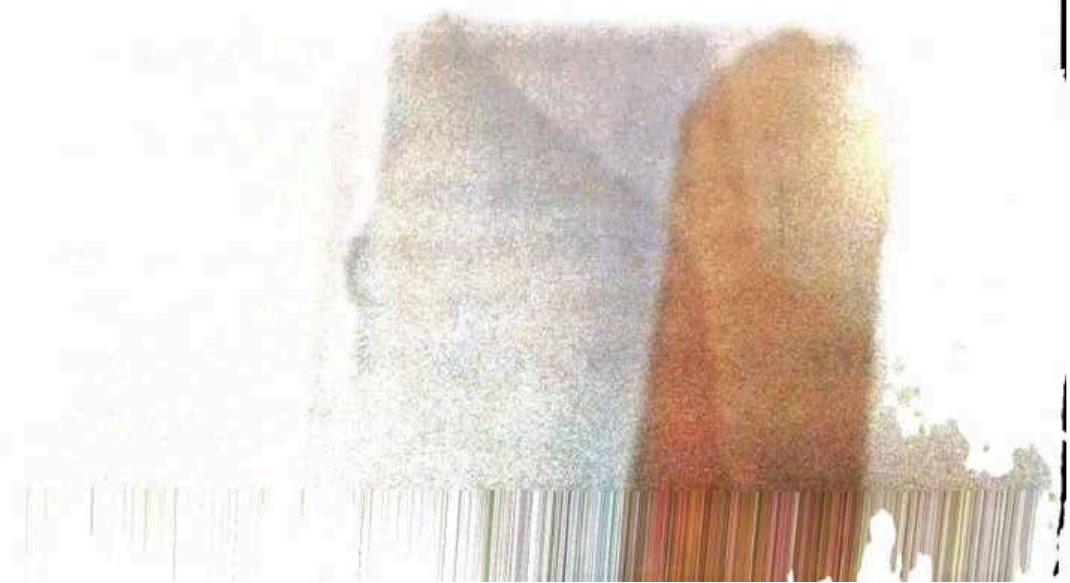
দেবল এবং সিন্ধু বিজয়

খুলাফায়ে রাশিদার যুগেই কয়েকবার সিন্ধু (বর্তমান পাকিস্তান) বিজয়ের জন্য সেনা প্রেরণ করা হয়। বিশেষত হযরত উমর এবং হযরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুমার খিলাফতকালে এ-অঞ্চলে মুসলিম সেনাদের আগমনের প্রমাণ মেলে ইতিহাসের বইপত্রে। মুআবিয়া ইবনু আবি সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলে হিন্দুস্তানের এই কেন্দ্রীয় অঞ্চলে আরও বেশকিছু কার্যকরী অভিযান পরিচালিত হয়। এর কোনোটা লাহোর আবার কোনোটা পাতোকি (Pattoki) পর্যন্ত এসে থেমে যায়। সামান্য কিছু গনিমত আর শহরে কিছুক্ষণের অনুপ্রবেশ ছাড়া প্রাথমিক পর্যায়ের এ অভিযানগুলোর তেমন কোনো বড় ফলাফল অর্জিত হয়নি।

এই মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর সময়কালেই আবদুল্লাহ ইবনু সিওয়ার আল-আবদি নামে এক মুসলিম সেনাপতি কাইকান অঞ্চলে সেনা অভিযান পরিচালনা করেন। গনিমত হিসেবে লাভ করেন কিছু উন্নত জাতের ঘোড়া, সেগুলো তিনি খলিফা হযরত মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হাদিয়াস্বরূপ দিয়ে দেন। এরপর পুনরায় ফিরে যান কাইকানে। তার সেনাদের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে সেখানকার অধিবাসীরা তুর্কিদের সাহায্য কামনা করে। তুর্কিরা এগিয়ে এলে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বেধে যায় এবং সেনাপতি আব্দুল্লাহ ইবনু সিওয়ার আল-আবদি শহিদ হয়ে যান। এই আবদুল্লাহ ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনু আমিরের বংশের লোক।

মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে যিয়াদ ইবনু আবিহ উপমহাদেশের মাকরানে সিনান ইবনু সালামা আল-হুজালি নামে এক সেনাপতিকে প্রেরণ করেন। তিনি শহরটি বিজয় করেন এবং সেখানে আরবদের বসতি স্থাপন করেন। পশ্চিম পাঞ্জাবের এ শহরটিই ছিল, উপমহাদেশের ইসলামি সাম্রাজ্যের অন্তর্গত প্রথম নগর। উল্লেখ্য, সেকালে হিন্দুস্তান বর্তমান সিজিস্তান, যাবুলিস্তান, তাখারুস্তান এবং উত্তরে উখান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

যিয়াদ ইবনু আবিহ হিন্দুস্তানের বিজিত অঞ্চলের দায়িত্ব বুঝে নেন এবং সেখানে নিজের পক্ষ থেকে একজন শাসক নিযুক্ত করেন। প্রথমে তিনি নিয়োগ দেন আযদের অধিবাসী রাশেদ ইবনু আমর আল-জাদিদিকে। তিনি কাইকান অভিযানে সফল হন। এরপর আগ বেড়ে কাইকানের উত্তরে মেদ অভিমুখে অভিযান করলে সেখানে তিনি শহিদ হয়ে যান। তার বিয়োগের পর যিয়াদ তার স্থানে শাসক নিয়োগ দেন সিনান ইবনু সালিমা আল-হুজালিকে। তিনি লাগাতার দু বছর সেখানে শাসনকার্য পরিচালনা করেন।

প্রাচীন হিন্দুস্তানে এরপর অভিযান চালান ইয়াদ ইবনু যিয়াদ। তিনি সিজিস্তান থেকে সানারুজ, রুজবার হয়ে কাশ নামক স্থানে যাত্রাবিরতি করেন। এরপর সেখান থেকে কান্দাহারের দিকে অগ্রসর হয়ে সেটি বিজয় করে নেন। এর মাধ্যমে ইসলামের পূর্ব সীমা কান্দাহার পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে যায়। উনার পর হিন্দুস্তানের এ অঞ্চলে শাসক হিসেবে আগমন করেন মুনযির ইবনুল জারুদ আল-আবদি। তিনি প্রথমে বুকান ও পরে কাইকানে অভিযান পরিচালনা করেন এবং পরবর্তীতে কুসদার বিজয় করেন। এতে বুকান ও কুসদার অঞ্চলে ইসলাম প্রবেশ করে এবং সেখানকার অধিবাসীরা ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে নেয়।

এরও বেশকিছু কাল পরে হাজ্জাজ ইবনু ইউসুফ সাঈদ[১] ইবনু আসলাম ইবনু

---

[১] হাজ্জাজ বিন ইউসুফ। জন্ম জুন ৬৬১ খ্রিস্টাব্দ / ৪০ হিজরি–৭১৪ খ্রিস্টাব্দ / ৯৫ হিজরি। ছিলেন আরব প্রশাসক, রাজনীতিবিদ ও উমাইয়া খিলাফতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী। ইতিহাসের অন্যতম প্রধান বিতর্কিত ব্যক্তিদের একজন। তার হাতে শাহাদাত বরণ করেন সাহাবি আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর, জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ এবং কুমাইল ইবনে জিয়াদ রাদিয়াল্লাহু আনহুমসহ বহু তাবেয়ি এবং পুণ্যবান মানুষ। এছাড়াও তার নানা অভিযানে প্রায় এক লাখ থেকে সোয়া লাখ মানুষ মারা যায় এবং এ কারণে পারস্য ও আরবের এমন কুখ্যাত প্রধান চারজনের তালিকায় তৎকালীন সময়েই তার নাম উঠে যায়, যারা কি না লক্ষাধিক মানুষ মেরেছেন। কিন্তু হাজ্জাজ তার দৃঢ় শাসনের জন্য বহুলবিদিত ছিলেন। কঠোরভাবে তিনি রাজ্যশাসন করতেন, নিয়মের কোনো ব্যত্যয় হতে দিতেন না কোথাও।

শাসনকালে বহু অপরাধ এবং অন্যায়কর্ম করলেও কিছু উল্লেখ করার মতো ভালো কাজও সে করে গিয়েছিল। তার মধ্যে কুরআনের মুসহাফে নুকতা বসানোর কাজটি অন্যতম। শোনা যায়, সে রাত জেগে নামাজ পড়ত; তিলাওয়াত করত। কিন্তু তার যা-কিছু ভালো কাজ ছিল, রক্তলিপ্সু স্বভাবের কারণে তা হারিয়ে যায় কালের অতলে।

হাজ্জাজের হাতে নিহত সর্বশেষ ব্যক্তি ছিলেন হযরত সাইদ ইবনু জুবাইর রহ.। হাজ্জাজ যখন তাঁর শিরশ্ছেদের নির্দেশ দেন, তখন সাইদ বলেছিলেন: 'হাজ্জাজ, মহান আল্লাহর দরবারে আমি তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী হব!' এবং তিনি হাসলেন। হাজ্জাজ হাসির কারণ জিজ্ঞেস করলে সাইদ বললেন, 'আমার প্রতি তোমার হিংসা আর তোমার প্রতি আল্লাহর ধৈর্য দেখে হাসছি।'

সাইদ তিনবার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' পাঠ করেন, প্রথমবার স্পষ্ট শোনা যায়, পরের

যুরআ আল-কিলাবি নামে একজনকে মাকরান ও প্রাচীন হিন্দুস্তানের দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেন। কিন্তু তৎকালীন বিস্তৃত হিন্দুস্তানের কর্তৃত্বলোভী মুহাম্মদ ইবনুল

দুবার অস্পষ্ট। তার মাথা গড়িয়ে পড়ে মেঝেতে। সেটি ছিল ৭১৪ সালের মে মাস। সাইদ ইবনু জুবাইরের বয়স তখন ৪৯ বছর।

এরপরই হাজ্জাজ পাগল হয়ে যান। যখনই তিনি ঘুমাতেন, ঘুমের মাঝে সাইদকে দেখতেন, যেন তিনি তার সমস্ত কাপড়চোপড় আঁকড়ে ধরছেন আর বলছেন, 'হে আল্লাহর দুশমন, তুমি আমাকে কী জন্য হত্যা করলে?' হাজ্জাজ পাগলের মতো বলতেন, 'হায়রে, আমার আর সাইদের মাঝে কী হলো!' তার পেটে পোকা হয়েছিল, দুর্গন্ধের সৃষ্টি হয়েছিল বলে শোনা যায়। হযরত হাসান বসরির কাছে সাইদ বিন জুবাইরের হত্যার সংবাদ পৌঁছানোর পর তিনি বলেন, 'হে আল্লাহ, হে পরাক্রমশালীদের চূর্ণ-বিচূর্ণকারী, হাজ্জাজকে তুমি চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দাও!'

সাইদকে হত্যার এক মাসের মাথায় (১৫ থেকে ৪০ দিনের মাঝে) এবং হাসান বসরির কাছে সংবাদ পৌঁছানোর মাত্র তিনদিন পরে হাজ্জাজ মৃত্যুবরণ করেন। হাসান রহ. তার মৃত্যুর খবর জানবার পর খুশিতে সিজদায় পড়ে যান।

ঐতিহাসিক ইবনে কাসির রহ. হাজ্জাজ সম্পর্কে বলেন, 'হাজ্জাজের যেসব কাজ আমরা নিশ্চিত জানি, তার মাঝে তার রক্তপাত ঘটানো প্রধান। এটিই আল্লাহর কাছে তার শাস্তি পাবার জন্য যথেষ্ট। তবে সে জিহাদের কাজে ও নানা শহর জয়ের ব্যাপারে আগ্রহী ছিল। সে কুরআন চর্চায় অনেক বেশি সময় ও অর্থ খরচ করত। যখন হাজ্জাজ মারা যায়, তখন তার সম্পদ ছিল মাত্র ৩০০ দিরহাম।'

হাসান বসরি রহ.-কে হত্যার জন্য অনেকবার ইচ্ছে প্রকাশ করেন হাজ্জাজ, গিয়েছিলেনও মারতে। কিন্তু হাসান বসরি রহ.-এর কথার কাছে পরাজিত হয়ে ফিরে এসেছিলেন। হাসান বসরি রহ. ছিলেন তাদের একজন, যারা হাজ্জাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হোক চাইতেন না। তার মতে, হাজ্জাজ একটা গজব, তলোয়ার দিয়ে গজবের মোকাবেলা করা যায় না, দুয়া করতে হয়। কাজেই, ধৈর্য ধরে প্রার্থনা করতে হবে।

বর্ণিত আছে, হাজ্জাজের শেষ দিককার বাণী ছিল, 'হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা করে দাও! কারণ, জনগণ ধারণা করে তুমি আমাকে ক্ষমা করবে না। জনগণ আমার আশা কেড়ে নিতে চায়, কিন্তু তোমার প্রতি আমার আশা কখনোই হারাবে না।'

হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহকে যখন এ কথা জানানো হয়, তিনি আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'সত্যি কি হাজ্জাজ এমন বলেছে?'

জনগণ বলল, 'হ্যাঁ।'

হাসান রহ. বললেন, 'তাহলে হাজ্জাজের ক্ষমার আশা করা যায়।'

হাজ্জাজ মৃত্যুর সময় কবিতার ভাষায় যা বলেছিলেন, তা অনুবাদ করলে দাঁড়ায়, 'হে আমার প্রতিপালক, আমার শত্রুরা হলফ করে বলছে যে, আমি জাহান্নামী। তারা তা প্রচারের অহরহ চেষ্টা করছে। তারা কি অজানা একটা ব্যাপারে শপথ করছে না? তাদের দুর্ভাগ্য, মহাক্ষমাকারীর বড় ক্ষমা সম্পর্কে তাদের জ্ঞান বলতে কিছুই নেই... তুমি আমাকে জাহান্নামের গোলামি থেকে মুক্তি দিয়ো।'

এ ব্যাপারে হাসান বসরি রহ. বলেন, 'আল্লাহর কসম, যদি হাজ্জাজ নাজাত পায়, তবে এ কবিতার দ্বারাই পেয়ে যাবে।'

সর্বোপরি প্রবল রক্তপাতকারী হাজ্জাজ কখনো সাহাবি-হন্তারক নামে ঘৃণিত, আবার কখনো সিন্ধু বিজয় আর তার কুরআন-প্রেমের জন্য প্রশংসিত। ইতিহাসের পাতায় তাই বিতর্কিত খলনায়কের পাতাতেই তাই হাজ্জাজ বিন ইউসুফের অবস্থান।

হারিস এবং মুআবিয়া ইবনুল হারিস আল-আল্লাফি নামক দুই আরব বিদ্রোহীর সাথে যুদ্ধ করতে গিয়ে সাঈদ শহিদ হয়ে যান।

তার মৃত্যুর পর হাজ্জাজ মুজ্জাআ ইবনু সির আত-তাইমিকে হিন্দুস্তানের দায়িত্ব দিয়ে পাঠান। সে কান্দাইলের কিছু অংশ দখলে নিলেও এক বছরের মাথায় ইন্তেকাল করে। পরবর্তীতে মুহাম্মদ ইবনু কাসিম[১] কান্দাইলের বিজয় পূর্ণ করেন।

এরপর হাজ্জাজ হিন্দুস্তানের বিজিত অঞ্চলের দেখভালের জন্য পাঠান মুহাম্মদ ইবনু হারুন ইবনু যিরা আন-নামারিকে। সে-সময় সিন্ধু রাজ্যের শাসক ছিল রাজা দাহির। মুহাম্মদ ইবনু হারুনের শাসনকালে দাহিরের সেনাদের সাথে মুসলমানদের বেশকিছু সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এমনই এক সংঘর্ষের ঘটনায় মুহাম্মদ ইবনু হারুন শহিদ হয়ে যান।

অভিযানের পটভূমি

ওয়ালিদ ইবনু আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ানের খেলাফতকালে শ্রীলংকার রাজা ইরাকের আমির হাজ্জাজ ইবনু ইউসুফের কাছে একটি জাহাজ পাঠাল। জাহাজটি বোঝাই করা ছিল দামি মণি-মুক্তো, হিরে-জহরত এবং উচ্চমূল্যের দাসদাসি দিয়ে। হাজ্জাজের নামে তোহফাস্বরূপ এ জাহাজে আরও ছিল বহু পিতৃহীন মুসলিম নারী, যাদের বাবারা বড় ব্যবসায়ী ছিল; কোনো দুর্ঘটনায় তাদের মৃত্যু হয়ে গেছে। পবিত্র কাবার যিয়ারতের তামান্নায় এই নারীরা এ জাহাজে চড়েছিল। এ তোহফা সামগ্রীর দ্বারা রাজার উদ্দেশ্য ছিল, সমসময়ের কেন্দ্রীয় ক্ষমতাশীলদের সাথে সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটানো। সে-মতে ইতিপূর্বে সে দামেশকের দারুল খিলাফাহয়ও বিভিন্ন দুর্লভ ও অমূল্য বস্তু উপহার হিসেবে পাঠিয়েছে।

[১] ইমাদউদ্দিন মুহাম্মদ বিন কাসিম আল সাকাফি (আরবি: عماد الدين محمد بن القاسم الثقفي; ৩১ ডিসেম্বর ৬৯৫ – ১৮ জুলাই ৭১৫) ছিলেন একজন উমাইয়া সেনাপতি। সিন্ধু নদসহ সিন্ধু ও মুলতান অঞ্চল জয় করে তিনি উমাইয়া খিলাফতের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি তাইফে (বর্তমান সৌদি আরব) জন্মগ্রহণ করেন। তার সিন্ধু জয়ের কারণে মুসলিমদের পক্ষে ভারতীয় উপমহাদেশ বিজয়ের পথ প্রশস্ত হয়।

ব্যক্তিজীবনে মুহাম্মদ বিন কাসিম সাকিফ গোত্রের সদস্য ছিলেন। তার পিতা কাসিম বিন ইউসুফ তার বাল্যকালেই মৃত্যুবরণ করেন।

হাজ্জাজ বিন ইউসুফের সাথে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা থাকার কারণে খলিফা সুলাইমান ইবনে আবদুল মালিকের ক্ষমতাগ্রহণের পর তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়।

সাগরের মৃদুমন্দ বাতাসে ঢেউয়ের তালে জাহাজটি হাজ্জাজের শহরের দিকে এগিয়ে চলছে। হঠাৎ উত্তর থেকে ধেয়ে আসল প্রমত্তা দমকা হাওয়া। জাহাজটি তার স্বাভাবিক গতি হারিয়ে উত্তাল ঢেউয়ের ধাক্কায় আছড়ে পড়ল দেবল [১] সমুদ্রের তীরে। দেবলে তখন ভয়ংকর জলদস্যুদের বাস। তারা টের পেয়েই ধারালো অস্ত্র নিয়ে জাহাজটিতে হামলে পড়ল। জাহাজের নাবিক ও কয়েকজন যাত্রীকে হত্যা করে বাকিদের বন্দি করল। পাশাপাশি জাহাজে থাকা মূল্যবান সকল বস্তুসামগ্রী লুট করে নিয়ে গেল। ইতিহাসের কিতাবে পাওয়া যায়, জলদস্যুদের হাতে বন্দি হওয়া এক নারী তখন চিৎকার কর বলেছিল: 'হে হাজ্জাজ, আমাকে উদ্ধার করো।' জাহাজের ডেকে অবস্থান করা অনেক যাত্রী দস্যুদের চোখ এড়িয়ে কোনোভাবে পালিয়ে গেল। তাদেরই কেউ সরাসরি হাজ্জাজের দরবারে গিয়ে দেবলে ঘটে যাওয়া হৃদয়বিদারক ঘটনার আদ্যোপান্ত খুলে বলে। সাথে চিৎকার করে হাজ্জাজের সাহায্য চাওয়া বন্দি সে নারীর কথাও তাকে জানায়। হাজ্জাজ পুরো ঘটনা শুনে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েন। সে নারীর ডাকে সাড়া দিয়ে বলেন: 'লাব্বাইক, হে আমার বোন, অমি তোমাকে উদ্ধার করতে আসছি!'

হাজ্জাজ দেরি না করে সিন্ধু রাজা দাহিরের কাছে পত্র লেখে। জানায়, তোমার রাজ্যে লুট হয়ে যাওয়া দারুল খিলাফাহর উপহার ও বন্দি হওয়া নারীদের অনতিবিলম্বে ফিরিয়ে দাও। কিন্তু রাজা দাবির জবাব দেয়, যারা এ-কাজ করেছে, তারা এ অঞ্চলের কিছু বিচ্ছিন্ন ডাকাত ও নিয়ন্ত্রণহীন জলদস্যু। এরা যতটা দুষ্ট, ততটাই শক্তিশালী। তাদেরকে বাগে আনা এবং রাজ্যের নিয়মের আওতায় এনে শৃঙ্খলিত করা—আমাদের কেন, কারুরই সাধ্যের কাজ নয়।

হাজ্জাজের যুগে বিজয়ের যাত্রা

হাজ্জাজ দাহিরের পত্র পেয়ে চটে যায়। খলিফার কাছে তিনি সিন্ধু ও হিন্দুস্তানে অভিযান প্রেরণের অনুমতি চেয়ে চিঠি লিখে পাঠায়। কিন্তু খলিফা ওয়ালিদ সেবার তাকে অনুমতি দেননি। হাজ্জাজ নাছোড়বান্দা, অনুমতি নেয়া পর্যন্ত সে বারবার খলিফার কাছে পত্র পাঠাতে থাকে। তাকে এর গুরুত্ব ও নানাবিধ প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে থাকে। অগত্যা খলিফা তাকে অনুমতি দিয়ে দেন। সে মতে হাজ্জাজ

[১] এটি সিন্ধু অঞ্চলের সমুদ্র উপকূলবর্তী একটি শহর। বর্তমান করাচি বন্দর থেকে প্রায় ৫০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

আবদুল্লাহ ইবনু নাবহান আস-সুলামিকে দেবল জয়ের জন্য প্রেরণ করে। কিন্তু তিনি শহিদ হয়ে যান। এরপর তিন হাজার সেনা দিয়ে পাঠায় বুদাইল ইবনু তুহফা আল-বাজালিকে। কিন্তু তিনিও শহিদ হয়ে যান। তার শাহাদতের খবরে হাজ্জাজ দুঃখে ভেঙে পড়ে। মুয়াজ্জিনকে বলে: 'হে মুয়াজ্জিন, যতবার আজান ফুঁকো তুমি, সাথে বুদাইলের নামও উচ্চারণ কোরো, যেন আমি তার স্মরণ করি এবং তার শোকে অশ্রু বিসর্জন করি।'

হাজ্জাজ খলিফাকে পরিস্থিতি জানায় এবং সিন্ধু জয়ের জন্য আরও শৃঙ্খলিত বৃহৎ বাহিনী পাঠানোর প্রস্তাব করে। খলিফা তার প্রস্তাবে সম্মতি জানায়। খলিফার সম্মতি পেয়ে হাজ্জাজ পারস্যের দায়িত্বে থাকা সাতাশ বয়সী মুহাম্মদ ইবনু কাসিম আস-সাকাফিকে ডেকে পাঠান। খলিফার কাছে শামের অভিজাত পরিবারের ছয় হাজার সেনা চেয়ে আবেদন জানায়। খলিফা তার আবদার রক্ষা করেন। সে মুহাম্মদ ইবনু কাসিমকে সেই বাহিনীর প্রধান সেনাপতি করে সিন্ধুর পথে রওনা করিয়ে দেয়।

মুহাম্মদ ইবনু কাসিম: বিজয়ের সিপাহসালার

হাজ্জাজ মুহাম্মদ ইবনু কাসিমকে নির্দেশনা দিয়ে বলে: 'সিরাজ রাজ্যের পথ হয়ে অগ্রসর হবে। ধীরে ধীরে সতর্ক দৃষ্টিতে একের পর এক ভূমি অতিক্রম করবে, যাতে তোমার ক্রোধের মাত্রা পূর্ণতা পায়।' হাজ্জাজ বাহিনীর যাবতীয় প্রয়োজনীয় বস্তু জোগাড় করে দেয়; এমনকি পাটের দড়ি এবং ধুনিত তুলো পর্যন্ত। মুহাম্মদ ইবনু কাসিমকে রওনা করিয়ে দেয়ার পূর্বে বলে দেয়: 'পারস্যের সিরাজে কিছুক্ষণ যাত্রাবিরতি করবে, শাম এবং ইরাকের সেনারা সেখানে তোমার বাহিনীর সাথে একত্র হবে।'

মুহাম্মদ ইবনু কাসিম বের হয়ে যান। তিনি যখন সেনা নিয়ে সিরাজে পৌঁছেন, হাজ্জাজের পক্ষ থেকে তখন একটি পত্র আসে। মুহাম্মদ ইবনু কাসিম বের হবার পর হাজ্জাজ তার কাছে অবশিষ্ট থাকা মিনজানিক এবং তির-বর্শাগুলো একত্র করে একটি যুদ্ধজাহাজে তুলে দেয়। দক্ষ ও যোগ্য দুজন সেনাপতির নেতৃত্বে সেটা দেবলের দিকে রওনা করলে সে মুহাম্মদ ইবনু কাসিমকে পত্র লিখে জানায়: 'জাহাজটি পৌঁছা পর্যন্ত দেবলে এর অপেক্ষা করবে।' মুহাম্মদ ইবনু কাসিম সিরাজে যুদ্ধের প্রস্তুতি সেরে নেন। এ সময় তার কাছে ছয় হাজার অশ্বারোহী এবং ভারী

পণ্য ও বস্তুবাহী তিন হাজার উট এসে পৌঁছে। এরপর তিনি সর্বমোট বারো হাজার সেনা নিয়ে সেখান থেকে পূর্ব দিকে যাত্রা করেন। মাকরানে পৌঁছে কিছুদিন অবস্থান করে সেখান থেকে রওনা হন পানাজপুরের দিকে; এরপর আরমাইল নামক স্থানে পৌঁছলে হাজ্জাজের জাহাজগুলো এসে সেখানে নোঙর করে।

দেবল অবরোধ

মুহাম্মদ ইবনু কাসিম দেবলে নেমে শহরের দেয়াল ঘেঁষে পরিখা খনন করেন। ইসলামি খেলাফতের পতাকাগুলো গেড়ে দেন কিছুদূর পরপর। মিনজানিকগুলো মাটিতে পুতে দেন। সে যুদ্ধে মুসলমানদের বাহিনীতে আরুস নামে বিখ্যাত এক মিনজানিক ছিল, যেটা সরাতে-চালাতে প্রায় পাঁচশত লোকের প্রয়োজন হতো। দেবলের মাঝখানে এক বিরাট মন্দির মাথা উঁচু কর দাঁড়িয়ে ছিল। শহরের বাইরে থেকে তার সুউচ্চ চূড়ায় উড়তে দেখা যাচ্ছিল এক সবুজ পতাকা। প্রায় চল্লিশ হাত উঁচু এ মন্দিরের খিলান ছিল আরও চল্লিশ গজ। এর উপর উড়ছিল চার জিহ্বাধারী ত্রিকোণবিশিষ্ট সবুজ এক পতাকা। সেনাপ্রধান মুহাম্মদ ইবনু কাসিম আরুস মিনজানিকের দায়িত্বে থাকা সেনাপতির দিকে তাকিয়ে বললেন: 'তুমি যদি এই মন্দিরের উঁচু শির ও তার ওপর উড়তে থাকা পতাকাটি ধসিয়ে দিতে পারো, তাহলে আমি তোমাকে দশ হাজার দিরহাম পুরস্কার দেব।'

মিনজানিক: দেবলের মন্দির ধ্বংস করল যা

যুদ্ধের নির্ধারিত দিনে মিনজানিকের দায়িত্বে থাকা সেনাপতি মিনজানিক থেকে গোলা নিক্ষেপ শুরু করল। প্রথম গোলা উড়তে থাকা মন্দিরের পতাকা এবং খানিক ইমারত মাটিতে নামিয়ে দিল। দ্বিতীয় গোলা ছুড়লো সেনাপতি। এবার মন্দিরের খিলান পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেল। এরপর তৃতীয় গোলা মন্দিরটিকে একেবারে মাটিতে মিশিয়ে দিল। মন্দির ধসে গেলে শহরে দামামা বেজে উঠল। ভেতরে কড়া নড়ে উঠতে দেখে মুসলিম বাহিনী একসাথে আক্রমণ শুরু করল। মিনজানিক দেয়ালে ঠেকিয়ে তারা উঠে মুজাহিদ দেয়ালের উপরে উঠে গেল। উপায়ান্তর না দেখে শহরবাসী দ্রুত ফটক খুলে দিয়ে সেনাপতি মুহাম্মদ ইবনু কাসিমের কাছে নিরাপত্তা কামনা করল। তিনি তিন দিনের জন্য শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার নির্দেশ দিয়ে হেঁটে গেলেন দেবলের কারাগারে। সেখানে মুসলিম বন্দিদের সাথে

দেখা করে, তাদেরকে মুক্ত করে দিলেন। পরিবর্তে ঢুকিয়ে আসলেন দেবলের নির্মম জলদস্যুদের। এরপর দেবলকে তিনি মুসলিম শহরে পরিবর্তন করলেন। সেখানে বৌদ্ধ ধর্মের যত যা নিদর্শন ছিল, সব মিটিয়ে দিলেন। শিরক ও কুফরের কেন্দ্রগুলো ধুয়ে মুছে তিনি শহরে কয়েকটি মসজিদ নির্মাণ করলেন। চার হাজার মুসলমানের নিরাপদ বাসস্থানের ব্যবস্থা করে শহরটিতে তিনি মুসলিম জনপদে বদলে নিলেন।

বিজয়ের পরিশিষ্ট

দেবল বিজয়ের পর সেনাপতি মুহাম্মদ ইবনু কাসিম দীর্ঘ ছয় দিনে সিন্ধুর উত্তাল জলরাশি পাড়ি দিয়ে পৌঁছেন হায়দ্রাবাদে। মুসলিম সেনাপতির আগমনের খবরে সেখানকার শাসক বিভিন্ন জাতের খাবার ও উপহারসহ দুজন দূত প্রেরণ করে এবং মুসলমানদের জন্য শহরের ফটক খুলে দেয়। শহরবাসী নিঃসংকোচে মুসলিম সেনাদের সাথে বিকিকিনি করতে শুরু করে। সেনাপতি মুহাম্মদ ইবনু কাসিম শহরে ঢুকে সমস্ত মন্দির গুঁড়িয়ে দিয়ে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করেন। এরপর সিওয়াস্তান (সেওয়ান Shewan) দুর্গের দিকে এগিয়ে যান। সেখানকার সাধারণ জনগণ নিরাপত্তাকামী হলেও শাসক তাদের দাবি নাকচ করে দিয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করে। মুহাম্মদ ইবনুল কাসিমও মিনজানিক স্থাপন করে দুর্গের উপর অবরোধ আরোপ করেন। অবরোধের তোপে সেখানকার শাসকের শক্তি খর্ব হয়ে এলে পরাজয় নিশ্চিত বুঝতে পেরে সে রাতের আঁধারে উধাও হয়ে যায়। এরপর শহরবাসী মুসলিম সেনাপতির জন্য শহরের দরোজাগুলো খুলে দেয়।

সিন্ধু বিজয়

সিওয়াস্তান জয়ের পর সেনাপতি মুহাম্মদ ইবনুল কাসিম হায়দ্রাবাদে ফিরে আসেন। সেখান থেকে মেহরান নদী পার হয়ে তিনি সিন্ধুর রাজা দাহিরের সাথে সাক্ষাৎ করার সিদ্ধান্ত নেন। দুজন দূত পাঠিয়ে প্রথমে তাকে আনুগত্য মেনে নেয়ার আহ্বান জানান। সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে ইবনুল কাসিম বৃহত্তর এ নদীটি পাড়ি দেবার মনস্থ করেন এবং সকলের জন্য জাহাজ হাজির করেন। পত্রবিনিময় ও যুদ্ধপ্রস্তুতির এ পঞ্চাশ দিনে মুসলমানদের আহার্য ফুরিয়ে আসে; কমে যায় ঘোড়া ও পশুদের খাবারও। কুষ্ঠ রোগের কারণে কিছু ঘোড়া বিক্রিও করে দিতে হয়। সেনারা সেনাপতির কাছে খাবারের স্বল্পতার কথা জানায়; জানায়, তারা শেষ পর্যন্ত

অসুস্থ ঘোড়ার গোশতও খেয়ে কাটিয়েছে। তাদের সমস্যার কথা জেনে সেনাপতি মুহাম্মদ ইবনুল কাসিম হাজ্জাজ বিন ইউসুফের বরাবর পরিস্থিতির বিবরণ জানিয়ে একটি চিঠি লিখেন। চিঠি পেয়ে হাজ্জাজ মুজাহিদদের মালিকানায় দুই হাজার উৎকৃষ্ট ঘোড়া পাঠিয়ে দেয়। বলে দেয়, এগুলো ধার নয়, তাই পরে ফিরিয়েও নেয়া হবে না। এগুলো সেনাদের মালিকানা।

সেনাপতি মুহাম্মদ ইবনুল কাসিম এবার মেহরান নদীটি পেরোনোর সবচে সহজ এবং ছোট জায়গাটি খুঁজতে শুরু করেন। সেনাদের আদেশ করেন, জাহাজগুলো একটাকে আরেকটার সাথে বেঁধে পারাপারের সেতু তৈরি করতে। ওদিকে দাহিরের একদল সেনা ইবনুল কাসিমকে নোঙর ফেলতে বাধা দিতে পাড়ে এসে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। মুসলিম বাহিনীর জাহাজগুলো উত্তর উপকূলে কোনা ভাসাতেই সেনাপতির নির্দেশে মুসলিম তিরন্দাজরা উপর্যুপরি তির নিক্ষেপ করতে শুরু করে। মুসলমানদের শক্ত আক্রমণের সামনে টিকতে না পেরে দাহিরের সেনারা তির ছেড়ে পিছিয়ে যায়। এতে মুসলমানদের জন্য পাড়ে অবতরণ করা সহজ হয়ে যায়। মুসলিম বাহিনী সিন্ধুর তীরে পা ফেলতেই রাজা দাহিরের সেনারা পিঠ উল্টো করে পালিয়ে যায়। ইবনুল কাসিম তার বাহিনী নিয়ে ঘিওর অঞ্চলের দিকে এগিয়ে যান। দিদহাও নদীর কাছাকাছি একটি জায়গায় গিয়ে যুদ্ধের জন্য অবস্থান গ্রহণ করেন। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত দুই পক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। পাল্টাপাল্টি আক্রমণে উভয় বাহিনী পালাক্রমে পিছু হটে যেতে বাধ্য হয়। রাজা দাহিরের বাহিনীতে ৬০টি (মতান্তরে ১০০টি) হাতি হাজির ছিল। সবচেয়ে বড় হাতিকে বসে রাজা দাহির ময়দান পর্যবেক্ষণ করছিল। এই হাতিগুলো মুসলিম বাহিনীতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ঘটাতে সক্ষম হয়।

যুদ্ধের প্রথম পাঁচদিন অবস্থা অপরিবর্তিত থাকে। ষষ্ঠ দিনে উভয় পক্ষ তাদের সেনাসারিতে রদবদল করে নিল। সপ্তম দিন মুসলমানরা তাদের তিরের আগায় আগুন জ্বেলে দাহিরের সেনা শিবিরের দিকে ছুড়তে থাকে। এক মুসলিম সেনা রাজা দাহিরের শিবিকা বরাবর তির ছড়লে সেটা তার হাওদার মাঝ বরাবর গিয়ে পতিত হয়। দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে আগুন। সেনারা দাহিরের হাতিসহ তাকে পেছনের দিকে টেনে আনে। ততক্ষণে হাতির গায়ে আগুন লেগে গেছে, সে দাহিরকে পিঠে নিয়েই পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মুসলিম অশ্বারোহীরা পেছন থেকে ছুটে এলে দাহিরের সেনারা বিক্ষিপ্ত হয়ে পালিয়ে যায়। পরাজয় তখন নিশ্চিত। দাহির পানি থেকে উঠে আসতে নানা চেষ্টা করে, কিন্তু উপায় মেলে না। মুসলমানদের এক

দক্ষ তিরন্দাজ ধনুক তাক করে তির ছুড়ে দিলে সেটা ঠিক দাহিরকে বিদ্ধ করে। কিন্তু সে নিজেকে সামলে নিয়ে পানি থেকে ডাঙায় উঠে পড়ে। এবার আমর ইবনু খালিদ তার দিকে এগিয়ে গিয়ে তলোয়ার বের করে। দাহিরের মাথায় তরবারির বাঁট দিয়ে সজোরে আঘাত করে তাকে মাটিতে ফেলে দেয়। এরপর ঘাড় থেকে তাকে একেবারে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলে।

মুসলিম সেনারা দাহিরের পলায়নপর সেনাদের পশ্চাদ্ধাবন করে। রাওয়াড় দুর্গে গিয়ে আশ্রয় নেয় নিহত দাহিরের কাপুরুষ সেনাদল। মুসলমানরা সেখানে পৌঁছে দুর্গটি অধিকার করে নেয়। এরপর মুহাম্মদ ইবনুল কাসিম এগিয়ে যান ব্রাহ্মণাবাদের দিকে। সেখানকার লোকেরা নিরাপত্তা চাইলে তাদেরকে নিরাপত্তা দান করেন। অমুসলিমদের উপর জিযিয়া কর আরোপ করে ব্রাহ্মণদেরকে যোগ্যতা অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় নানা পদে নিয়োগ দেন। ধর্মকর্মের প্রতি অনুরাগ অনুপাতে জনসাধারণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন। হিন্দুস্তানের আমির ও শাসকদের স্থানে বসান ধর্মীয় পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণদেরকে। তাদের মাসিক ভাতাও নির্ধারণ করে দেন তিনি। এরপর তিনি ধারাবাহিক জিহাদ চালিয়ে যান। হিন্দুস্তানের বিভিন্ন রাজ্য ও শহর জয় করে নেন; কোনোটা সন্ধিতে, কোনটা জোরপূর্বক যুদ্ধের বিনিময়ে; দখল করে নেন গুরত্বপূর্ণ সিন্ধু রাজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শহর এবং শক্তিশালী আশ্রয়ালয় মুলতান। এ সময় মুসলমানদের রসদ ফুরিয়ে গেলে তিনি এখানে কয়েক মাস অবস্থান করেন। এক নিরাপত্তাপ্রাপ্ত বিধর্মী এ সময় মুসলমানদেরকে স্থানীয়দের পানি পান করার একটি জলসূত্রের দিশা দিলে তিনি সেটা নিরাপত্তাপ্রাপ্তদের জায়গিরে দিয়ে দেন।

মুসলমানদের সাথে এই সময়টাতে চারপাশের হিন্দুদের তুমুল যুদ্ধ হয়। দীর্ঘ সাত দিন মুসলমানরা মুলতানের প্রাচীর কামড়ে ধরে শত্রুদের মোকাবেলা করে যায় এবং মুলতানের বিজয় নিরঙ্কুশ করে নেয়। সেনাপতি মুহাম্মদ ইবনুল কাসিম যে শহরই জয় করতেন, সেখানে গড়ে তুলতেন মসজিদ ও মিম্বর। তাঁর অব্যাহত এ বিজয়যাত্রা কাশ্মিরের সীমান্ত ছুঁয়ে যায়। মাত্র তিন বছরের ব্যবধানে পুরো সিন্ধুকে তিনি ইসলামি খেলাফতের কর্তৃত্বের অধীন করে ছাড়েন।

গনিমত

হিন্দুস্তানের এ অভিযানে মুহাম্মদ ইবনুল কাসিম বিপুল পরিমাণ গনিমত লাভ করেন। এ যুদ্ধে হাজ্জাজের খরচের হিসেব নিলে দেখা যায়, পুরো যুদ্ধকালে মুসলিম সেনাবাহিনীর পেছনে তার ব্যয় ছিল ৬০ মিলিয়ন দিরহাম। কিন্তু মুহাম্মদ ইবনুল

কাসিম গনিমত হিসেবে হাজ্জাজের হাতে তুলে দেন এর দ্বিগুণ তথা ১২০ মিলিয়ন দিরহাম। হাজ্জাজ বলে: 'আমাদের ক্রোধ প্রশমিত হয়েছে, আমরা আমাদের প্রতিশোধ নিয়েছি; মুনাফাস্বরূপ পেয়েছি অতিরিক্ত ৬০ মিলিয়ন দিরহাম এবং রাজা দাহিরের মস্তক।'

সেনাপতি মুহাম্মদ ইবনুল কাসিমের এ দীর্ঘ বিজয়যাত্রার সময়কাল ছিল ৮৯ থেকে ৯৪ হিজরির মধ্যবর্তী দুই বছর। এই মহান সেনাপতি আর এই বিজয়ী সেনাদলের কী আর মহত্ত্বের কথা বলব! কী রহস্য লুকিয়ে আছে সেই ধর্মে, যে মহান ধর্মের স্বার্থকে সামনে রেখে—যুগে যুগে ইবনুল কাসিমেরা মাড়িয়ে যায় হাজার শহর!!

হাজ্জাজ ইবনু ইউসুফের মৃত্যুর পর মুহাম্মদ ইবনু কাসিম আস-সাকাফি বেলমান বিজয় করেন। সেখানকার লোকেরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে নেয়। সেরেস্তের বিখ্যাত ডাকাতদের শহরে তিনি শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। মেদ রাজ্যের অন্তর্গত এ শহরের অধিবাসীরা লবণ উৎপাদনে দক্ষ ছিল। পূর্বে এদের পেশা ছিল সমুদ্রে দস্যুগিরি করে মানুষের জানমাল লুট করা। মুহাম্মদ ইবনুল কাসিমের অভিযানের পর এরা মুসলমানদের আনুগত্য মেনে নেয়।

এরপর তিনি আবার সিন্ধু রাজ্যে ফিরে আসেন। সেখান থেকে অভিযান করেন কির্জ অঞ্চলে। সে অঞ্চলের রাজার নাম ছিল দাহুর; মুহাম্মদ ইবনুল কাসিম তাকে পরাজিত ও হত্যা করেন। এর মধ্য দিয়ে কির্জ অঞ্চলটিও মুসলমানদের অধীনস্থ হয়ে যায়।

ওয়াদি বারবাতের যুদ্ধ

BATTLE OF GUADALETE

তারিখ:	৯২ হিজরি / ৭১১ খ্রি.
স্থান:	বারবাত উপত্যকা
ফলাফল:	মুসলিম বাহিনীর বিজয়

পক্ষ-বিপক্ষ:	উমাইয়া খিলাফাহ	খ্রিস্টানদের গোথ সাম্রাজ্য
সেনাপ্রধান:	তারিক বিন যিয়াদ	রাজা রডারিক
সেনাসংখ্যা:	১২ হাজার পদাতিক	১ লক্ষ অশ্বারোহী
ক্ষয়ক্ষতি:	৩ হাজার শহিদ	নিহতের সংখ্যা বিপুল

বারবাত, শাজুনা বা ওয়াদি লাক্কার যুদ্ধ হিসেবে ইতিহাসে পরিচিত এ যুদ্ধটি সংঘটিত হয় মুসলমান এবং পশ্চিমা গোথ (Goths) সম্প্রদায়ের মধ্যে। এ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন হযরত তারিক ইবনু যিয়াদ এবং শত্রুপক্ষের সেনাপতি ছিল গোথ সাম্রাজ্যের বাদশা রদ্রিগো (Rodrygo); ইসলামের ইতিহাসে যে রডারিক (Roderic) নামে পরিচিত। যুদ্ধে মুসলমানদের নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ হয়, যা পশ্চিমাদের এ গোথ সাম্রাজ্যকে পতনের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়। পাশাপাশি আইবেরিয়া উপদ্বীপাঞ্চলের অধিকাংশ ভূমিই উমাইয়া খিলাফাতের কর্তৃত্বের অধীনে চলে আসে।

যুদ্ধের আগের কথা

৯৬ হিজরির শাবান মাস। মাত্র সাত হাজার মুসলিম সেনা নিয়ে গঠিত হয়েছে তারিক ইবনু যিয়াদের[১] বাহিনী। মুসলমানদের নিয়ে তিনি 'জাবাল আত-তারিক' বা জিব্রাল্টারের সংকীর্ণ গিরিপথ পাড়ি দিলেন। পাথুরে সরু গিরিসংকীর্ণ এরিয়া পাড়ি দিতে গিয়ে এই পাহাড়ের কোলে দিগ্বিজয়ী সেনাপতি তারিক ইবনু যিয়াদ যাত্রাবিরতি করেছিলেন বলেই, তাকে 'জাবাল আত-তারিক' নামে অভিহিত করা হয়। সেই সূত্র ধরে আজ পর্যন্ত—এমনকি স্পেনের ভাষায়ও—এই পাহাড়কে 'জাবাল আত-তারিক' এবং সেই গিরিপথকে 'মাযিকু জাবাল আত-তারিক' নামে স্মরণ করা হয়। সেখান থেকে সেনাপতি তারিক ইবনে যিয়াদ যাত্রা করেন

[১] তারিক বিন জিয়াদ (জন্ম: ৬৭০, মৃত্যু: ৭২০) ৭১১ থেকে ৭১৮ সাল পর্যন্ত ভিসিগথ শাসিত হিস্পানিয়ায় মুসলিম বিজয় অভিযানের একজন সেনানায়ক। শোনা যায়, শুরুজীবনে তিনি সেনাপতি মুসা বিন নুসাইরের দাস ছিলেন। কিন্তু তাঁর যোগ্যতায় অভিভূত হয়ে মুসা বিন নুসাইর তাকে মুক্ত করে দেন এবং নিজের সেনাবাহিনীর জেনারেল হিসেবে নিয়োগ দান করেন। পরবর্তী সামগ্রিক জীবনে তিনি আইবেরিয়ান ইতিহাসে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সেনা কমান্ডার হিসেবে স্বীকৃত হয়ে ওঠেন।

'সবুজ উপদ্বীপ' বা 'জাযিরাতুল খাদ্বরা' নামক এক বিশাল বিস্তৃত অঞ্চলের দিকে। সেখানে আন্দালুসের দক্ষিণাঞ্চলের সেনাদলের সাথে তাদের সাক্ষাৎ হয়। এরা ছিল এতদাঞ্চলের খ্রিস্টবাহিনীর প্রধাক পৃষ্ঠপোষক বা রক্ষক গোষ্ঠী। তবে মুখোমুখি এই শত্রুদল খুব একটা বড় ছিল না। স্বাভাবিক নিয়ম মতোই সেনাপতি তারিক ইবনু যিয়াদ তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দেন। তিনি বলেন: 'ইসলাম গ্রহণ করে নাও, তাহলে আমাদের কল্যাণ তোমাদের কল্যাণ হয়ে যাবে, তোমাদের অকল্যাণ আমাদের অকল্যাণে পরিণত হবে; আমরা তোমাদের ও তোমাদের সম্পদ তোমাদের কাছেই বহাল থাকবে। সেটা মানতে না চাইলে জিযিয়া কর প্রদানে সম্মত হয়ে যাও, আমরা তোমাদের ক্ষমতা ও সম্পদ—তোমাদের হাতেই রেখে যাব। এ দুটির কোনোটি মেনে না নিলে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। তোমাদের সময় মাত্র তিন দিন, এরই মধ্যে ভেবে নাও।' কিন্তু মুসলিম সেনাপতির এমন আহ্বানে এই রক্ষীবাহিনীর আত্মমর্যাদা ফুঁসে উঠল। তারা জানাল, কেবল যুদ্ধ ছাড়া বাকিগুলোতে তাদের কোনো আগ্রহ নেই কোনো।

যুদ্ধ শুরু হলো। দুপক্ষের কাউকেই তখনো জয়ী বা পরাজিত বলা যাচ্ছে না। কিন্তু শেষপর্যন্ত তারিক ইবনু যিয়াদের কাছে তাদের হার মানতে হলো। পরাজিত সেই রক্ষীবাহিনীর প্রধান সম্রাট রডারিকের কাছে গোপনে একটি পত্র লিখে দ্রুত পাঠিয়ে দিল। সম্রাট তখন আন্দালুসের রাজধানী টলেডোতে অবস্থান করছে। চিঠিতে সে সম্রাট রডারিককে বলল: 'শত্রুরা তোমার নাগাল পেয়ে গেছে, হে রডারিক! কেননা আমাদের শহরে এসেছে এমন এক সেনাদল, যারা পৃথিবীর মাটিমানুষ, নাকি আসমান থেকে আগত কোনো বিজয়ের দেবদূত—আমাদের জানা নাই।'

সত্যিই তো! এ সোনার মানুষেরা তো তাদের কাছে অপরিচিতই। তারা তো জানত, কোনো শহরের বিজেতা বা দখলদার মানেই—তার কাজ হবে, সে-শহরে নেতিবাচক ভূমিকা রাখবে; সহায়-সম্পদ লুট করবে, ক্ষেত্রবিশেষ শহরে চালাবে ভয়ানক গণহত্যা। কিন্তু এরা এমন মানুষ পাবে কোথায়? যারা ধর্ম গ্রহণের আহ্বান করে শহরের সকল সম্পদ রেখ যায় শহরেই অথবা বলে জিযিয়া কর দিতে, তাহলে শহরকে রেখে যাবে আগের নিরাপত্তায়। এমন সেনাদল তারা না দেখেছে যাপিত জীবনে, না জেনেছে বিগত দিনের দীর্ঘ ইতিহাসে। এছাড়া এ আসমানি সেনাদল যুদ্ধের ময়দানে যেমন দক্ষ ও যোগ্য; রাতের আঁধারে তেমন বিনিদ্র নামাযি, ইবাদতকারী। তাই সম্রাট রডারিকের কাছে পাঠানো রক্ষীদলের সেনাপতির এমনটা লেখারই কথা যে, 'এরা পৃথিবীর মাটিমানুষ, নাকি আসমান থেকে আগত কোনো

বিজয়ের দেবদূত—আমাদের জানা নাই।'

সে সত্যই বলেছে, যদিও সে মিথ্যাবাদী। এরা আসলেই পৃথিবীর সাধারণ কেউ নয়, এরা আল্লাহর সেনাবাহিনী, তাঁরই বিজয়ী-সফল নির্বাচিতজন। রাব্বুল আলামিন তাঁর পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

> *'তারাই আল্লাহর দল। জেনে রেখো, আল্লাহর দলই সফলকাম হবে।' (সুরা মুজাদালাহ: আয়াত—২২)*

যুদ্ধের পথে

রক্ষীদলের সেনাপতির পাঠানো পত্র পেয়েই সম্রাট রডারিক যেন পাগল হয়ে গেল। অহংকার ও দম্ভ তাকে অন্ধ করে দিল। মুসলমানদের মোকাবেলার জন্য উত্তর থেকে এক লক্ষ অশ্বারোহী দল সে দক্ষিণে এনে হাজির করল। বিপরীতে তারিক ইবনু যিয়াদের সাথে কেবল সাত হাজার মুসলিম সেনা, যাদের অধিকাংশই পদাতিক এবং হাতে গোনা মাত্র কয়েকজনই ঘোড়সওয়ার। রডারিকের পাগলামি দেখে তিনি সাত হাজার সেনাকে এক লক্ষ অশ্বারোহীর সামনে তুলনা করেই তিনি চমকে উঠলেন। মূলত এই তুলনা কেবল কঠিনই নয়, বরং এর আনুপাতিক কোনো তুলনা আসলে হতেই পারে না। দেরি না করে তিনি আরেক সেনাপতি মুসা ইবনু নুসাইরের কাছে সাহায্য চেয়ে চিঠি লিখলেন। তিনি সাথেসাথে তারিফ ইবনু মালিকের নেতৃত্বে পাঁচ হাজার পদাতিক সেনা পাঠিয়ে দিলেন। তারিফ ইবনু মালিক তারিক ইবনু যিয়াদের কাছে এসে পৌঁছলে তাঁর বাহিনীর সেনা দাঁড়াল মোট বারো হাজারে। এবার তিনি যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করলেন। প্রথমে তিনি যুদ্ধের জন্য উপযুক্ত একটি ভূমির খোঁজ করলেন। তাঁর অনুসন্ধান তাকে পৌঁছে দিল এমন এক যুদ্ধক্ষেত্রে, ইতিহাস যাকে 'ওয়াদি আল-বারবাত' নামে চেনে।

সেনাপতি তারিক ইবনু যিয়াদের যুদ্ধের জন্য এই ভূমিটি বেছে নেয়ার বেশকিছু সামরিক এবং গভীর কৌশলগত কারণ ছিল। ভূমিটির ডানে ও পেছনে ছিল সুউচ্চ পাহাড়, যা মুসলিম বাহিনীর পেছনভাগ এবং ডান অংশকে রক্ষা করবে। ফলে কেউই মুসলমানদেরকে চারপাশ থেকে ঘিরে নিতে পারবে না। এর ডান দিকে ছিল বিশাল

সমুদ্র, অতএব এদিকটা মুসলমানদের জন্য ছিল একেবারেই নিরাপদ। দক্ষিণের প্রবেশপথে তিনি তারিফ ইবনু মালিকের নেতৃত্বে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন শক্তিশালী এক ক্ষুদ্র সেনাদল; ফলে চাইলেই শত্রুরা এ-দিক থেকে অতর্কিত হামলে পড়তে পারবে না। সুতরাং মুসলিম বাহিনীর সামনের দিক থেকে কুরুক্ষেত্রে প্রবেশ করা ছাড়া খ্রিস্টান সেনাবাহিনীর আর কোনো পথ খোলা থাকল না। তাদেরকে পেছন থেকে বিপদে ফেলার বা চারপাশ থেকে বেষ্টন করার সব পথই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

দূর থেকে দেখা গেল উন্নত শোভাকর পোশাকে রডারিক আসছে। গায়ে স্বর্ণখচিত জামা, মাথায় সোনার তাজ। দুটো গাধা টেনে আনছে তার স্বর্ণের সিংহাসন। যুদ্ধ ও লড়াইয়ের এমন রুক্ষ সময়েও বোকা বাদশা তার পার্থিব বিলাস ভুলতে পারেনি। এক হাজার প্রশিক্ষিত অশ্বারোহী নিয়ে সে আয়েশী ভঙ্গিতে সামনের দিকে হেলেদুলে এগিয়ে আসছে। বাহিনীর সাথে কিছু খচ্চরের পিঠে দেখা গেল কিছু রশির বোঝা; যুদ্ধ শেষে মুসলমানদেরকে বেঁধে গোলাম বানিয়ে নিয়ে যাবে বলে সম্রাটের নির্দেশে সেগুলো আনা হয়েছে। সে তার গর্ব ও অহমিকাবশত ভেবেই নিয়েছে যুদ্ধ তার পক্ষে যাবে। তার স্পষ্ট কথা ও অনুমানে বারো হাজার মিসকিন মুসাফির তো কেবল আমাদের দয়া ও অনুগ্রহই পেতে পারে। স্বদেশী লক্ষ সেনার সামনে তারা কেবল আনুকূল্য পাবারই যোগ্য!

সারিবদ্ধ বারো হাজার

৯২ হিজরি সনের ২৮শে রমাদান (১৮ই জুলাই, ৭১১ খ্রিস্টাব্দ)। বারবাতের উপত্যকায় উভয় বাহিনীর মোকাবেলার সময় হলো। যুদ্ধ হলো ঘোরতর; মুসলমানদের ইতিহাসের অন্যতম ভয়ানক যুদ্ধ হয়ে উঠল সেটি। উভয়পক্ষে নিরপেক্ষ দৃষ্টি দিলে মুসলমানদের কথা ভাবতেই পুরোপুরি আঁতকে উঠতে হয়। মাত্র বারো হাজার সেনা নিয়ে তারা লক্ষ সেনার বিরুদ্ধে কাতারবদ্ধ হলো কী করে? যুক্তির নিরিখে যদি দেখি, তারা যুদ্ধই করল কীরূপে—বিজয় তো দূরের কথা?

উভয়পক্ষের জাগতিক এবং আনুপাতিক পার্থক্যের জায়গা থেকে চোখ সরিয়ে দুই পক্ষে যদি খানিক অনুসন্ধানী দৃষ্টি দেয়া যায়, তাহলে দেখা যাবে, ভয়ের বিভীষিকা কতটা প্রকট ছিল লক্ষজনের সেনাবাহিনীতে। উভয়পক্ষের যুদ্ধই ছিল সত্যিকারে:

خَصۡمَانِ ٱخۡتَصَمُواْ فِي رَبِّهِمۡ

> *পক্ষ-বিপক্ষ উভয়েই, তাদের প্রতিপালকের জন্য যুদ্ধ করে। (সুরা হজ: আয়াত—১৯)*

বস্তুত এ দুটি দলের মাঝে কত যোজন যোজন দূরত্ব! যে দল জিহাদে আসে স্বেচ্ছায়, অনুগত এবং স্বপ্রণোদিত হয়ে আর যে দল যুদ্ধে নামে অপছন্দে, অন্যের প্ররোচনায় বাধ্য হয়ে—এমন দু'দলের ফারাক কি তুলনা করার মতো? এক দল আসে শাহাদাতের প্রস্তুতি নিয়ে, বিশ্বাসের জন্য যারা জীবনের মায়া ছেড়ে দেয়, পার্থিব স্বার্থ ও সম্পর্কের বাঁধন থেকে যারা নিজেদের উর্ধ্ব জ্ঞান করে, দুচোখে যাদের সবচেয়ে দামি হয়ে ওঠে আল্লাহর পথে মৃত্যুর নেশা; আরেক দল তো এসবে নিতান্ত মিসকিন, তারা এর কিছুই জানে না—ভাবে না, বরং তাদের দুচোখে যুদ্ধ শেষে বাড়ি ফেরার তেষ্টা, পরিবার-পরিজনে গিয়ে জীবনের গোলকে পুনরায় আটকে যাবার খায়েশ—যুদ্ধের ময়দানে এমন দুটি দলের আদৌ কোনো তুলনা হতে পারে?

একপক্ষ দাঁড়ায় কাতারে কাতার, নামাযের মতো; ফকিরের পাশে ধনী, বড়র পাশে ছোট, শাসকের পাশে শাসিত আর রাজার পাশে প্রজা; আরেক পক্ষ একে অন্যের সম্পদের পিয়াসী, একে-অন্যের পূজিত ও পূজারি। এক দলের নেতা খোদাভক্ত তারিক ইবনু যিয়াদ; তাকওয়া ও হিকমাহ যার চোখের তারায়, রহমাহ ও শক্তি যার দিলের ধারায়, সম্মান ও বিনয় যে বদনে মাখায়। অপর দলের নেতা অহংকারী দাম্ভিক, যে সৌখিন বিলাসী দিন কাটায়, অথচ তার অধীনস্থ সাধারণেরা আছে দারিদ্র্য ও ক্ষুধায়, দুর্ভোগ ও ধোঁকায়; নিত্য যাদের পিঠে শিখায়িত হয় জুলুমের চাবুক। এক সেনাদলে বিজয়ের পর বণ্টিত হয় গনিমতের চার-পঞ্চমাংশ; অপর সেনাদল পায় না সিকি-কানাও—সব চলে যায় ধোঁকাবাজ জালিমের খুনের প্রাসাদে। যেন-বা সে একাই যুদ্ধ করে মাঠে।

এক পক্ষের সাহায্যে থাকেন রাজাধিরাজ স্রষ্টা, সমগ্র জাহানের মালিক; আরেক পক্ষ মূর্খ, বঞ্চিত—সাম্রাজ্যের জন্যে যারা যুদ্ধ করে স্বয়ং প্রভুর সাথে, তাঁর কানুন ও শরিয়াহর প্রতি ধৃষ্টতা দেখায়। অল্প কথায় বললে: এক দল পরকালের বাহিনী; আরেক দল ক্ষয়শীল পার্থিব জগতের ধ্বজাবাহী জমায়েত—ভয় তবে কার দিলে জেঁকে থাকার কথা? কোন দলের কাঁধে চেপে বসার কথা ময়দানের বিভীষিকা?

যেখানে আল্লাহ বলেছেন:

كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا۠ وَرُسُلِىٓ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِىٌّ عَزِيزٌ

> *'আল্লাহ লিখে দিয়েছেন, আমি এবং আমার রাসূলগণ অবশ্যই বিজয়ী হব। নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিধর, মহাপরাক্রমশালী।' (সুরা মুজাদালাহ: আয়াত—২১)*

আরও বলেছেন:

وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

> *'এবং আল্লাহ কিছুতেই কাফেরদেরকে মুসলমানদের উপর কর্তৃত্ব দান করবেন না।' (সুরা নিসা: আয়াত—১৪১)*

অতএব বালু-পাথরের রুক্ষ ভূমির এ-রক্তযুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু যারা হিযবুল্লাহ—আল্লাহর দল, তারা রয়ে যাবে পূর্বের মতো—অবিচল, অনড় এবং বিশ্বাসদৃঢ়।

রমাদান মাস এবং ওয়াদি আল-বারবাত

এভাবেই চলে এল মহিমান্বিত রমাদান। বাহ্যিক অসম সমরে আল্লাহর ওয়াদাকে আঁকড়ে ধরে যুদ্ধ চলল আগের মতো। শুরু হলো রোযা ও কুরআনের সেই পরিচিত মাস; যে মাসের গা জুড়ে খচিত আছে বহু যুদ্ধ, বিজয় ও সাফল্যগাথা। কিন্তু শত আক্ষেপের কথা, সে মাস আজ বদলে গেছে সিরিয়াল ও ফিল্ম দেখার খণ্ডকালীন অবসরে। সে মাস পরিবর্তিত হয়ে গেছে দিনভর ঘুম আর রাতভর জাগরণের পাপে; দিনে যার কুরআন নেই, রাতে নেই কিয়ামুল লাইল। সময়ের পালাবদলে বা উত্তরাধুনিকতার নতুন দাবিতে মহিমান্বিত সে-রাত হয়ে গেছে চতুরতার মুখ্য সময়; ধোঁকা আর প্রতারণার কেন্দ্রীয় মওসুম। মুসলমানদের শত বছরের কিয়াম-সিয়ামের সাগ্রহ প্রতীক্ষিত সে মাস, আজ সংকীর্ণ মানস ও জীর্ণ কর্মের মোক্ষমকালে রূপ নিয়েছে।

এ-মাস ছিল ধৈর্য, জিহাদ এবং আত্মগঠনের। এই পবিত্র মাসের শেষ দুয়েক দিন এবং ঈদপরবর্তী আরও আটটি দিবস—যুদ্ধের চাকা ঘুরেছে অবিরত। এটাই ছিল

মুসলমানদের চিরাচরিত ঈদ, খুশি এবং আনন্দের উৎসব। ইসলাম ও শিরকে, মুসলিম ও খ্রিস্টে, যুদ্ধ হয়েছে হিংস্র ও রক্তক্ষয়ী। আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাস স্থাপনকারী কাফিরের দল মুসলমানদের উপর উত্তাল ঢেউয়ের মতো এসে আছড়ে পড়েছে; আর মুসলিম সেনারা সীসাঢালা প্রাচীরের মতো ধৈর্য ও সাহসের সাথে—সে আক্রমণের শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে।

رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَٰهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُۥ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُواْ تَبْدِيلًا

> *'এরা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছে। তাদের কেউ কেউ শাহাদাত বরণ করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষায় রয়েছে। তারা তাদের সংকল্প মোটেও পরিবর্তন আনে নাই।' (সুরা আহযাব: আয়াত—২৩)*

ওয়াদি আল-বারবাতে ধারাবাহিক আট দিন ধরে চলল তুমুল লড়াই। শেষে মুসলমানদের শক্তিশালী বিজয়ের মধ্য দিয়ে যুদ্ধের প্রকোপ থামল। আল্লাহ্ তাদের ঈমানি সততা ও ধৈর্যের সত্যতার প্রমাণ নিয়েই তাদেরকে সর্বশেষ সাফল্য দান করলেন। বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী রডারিক এ যুদ্ধে নিহত হয়; কিন্তু কারও মতে সে উত্তরে পালিয়ে যায় এবং পরবর্তী সারাজীবনের জন্য অনালোচিতই রয়ে যায়।

বিজয়ের ফলাফল

মুসলমানদের জন্য আন্দালুসের মাটিতে এ বিজয়ের ফলাফল ছিল তাৎপর্যপূর্ণ এবং সুদূরপ্রসারী। এর গুরুত্বপূর্ণ কিছু দিক হলো:

১. এ বিজয়ের মধ্য দিয়ে আন্দালুসের মাটি থেকে অত্যাচার, স্বৈরাচার এবং মূর্খতার পরিসমাপ্তি ঘটে। খুলে যায় ইসলামি বিজয়েতিহাসের সভ্যতা ও উন্নতির নতুন দুয়ার।

২. গনিমত হিসেবে মুসলমানদের হাতে আসে বহু দামি ও মূল্যবান সম্পদ। যার মধ্যে অন্যতম ছিল, ঘোড়া। পায়ে হেঁটে আসা মুসলিম সেনারা, এ বিজয়ের মধ্য দিয়ে অশ্বারোহী হয়ে ফিরে যায়।

৩. বারো হাজার সেনা নিয়ে মুসলমানরা লড়াই শুরু করেছিল। যুদ্ধ শেষে তাদের

সংখ্যা অবশিষ্ট থাকে নয় হাজারে। অর্থাৎ, তিন হাজার সেনা আন্দালুসের মাটিতে তাদের দামি রক্ত ঢেলে দিয়ে মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছে আল্লাহর দ্বীন। অতএব, আল্লাহই ইসলামের পক্ষ থেকে সর্বোত্তম কল্যাণ দিন!

জ্বলে উঠল আলোর মশাল

পরের বছরেই উত্তর আফ্রিকার আমাজিগ (বার্বার) মুসলিমদের ঢল নেমে এল আইবেরিয়ায়। জিব্রাল্টার থেকে দক্ষিণ ফ্রান্স পর্যন্ত মুসলিমদের দখলে চলে এল। মুসলিম শাসন সত্ত্বেও খ্রিস্টান আর ইহুদিরা স্বাধীনভাবেই নিজেদের ধর্ম পালন করতে পারত, তাদের উপর জোর করে ধর্ম চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়নি। আর এ কারণেই কয়েক বছরের মধ্যেই ব্যাপক পরিমাণ খ্রিস্টান ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। দশম শতাব্দীর মধ্যেই আল-আন্দালুস পরিণত হলো ইউরোপ, আফ্রিকা আর মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে সফল রাষ্ট্র হিসেবে। পণ্ডিতরা চর্চা করতে থাকল বিজ্ঞান-দর্শনশাস্ত্রের, থেমে যাওয়া প্রাচীন গ্রিক সভ্যতার জ্ঞান-বিজ্ঞান আবারও আলোর মুখ দেখল তাদের হাত ধরে। অন্যদিকে খ্রিস্টধর্মপ্রধান ইউরোপ তখন নিজেদের মধ্যেই ক্ষমতার রেষারেষিতে ব্যস্ত, রেনেসাঁ শুরু হওয়ার পূর্ববর্তী 'ডার্ক এজ' চলছে তখন ইউরোপে। তাছাড়া ইউরোপ, ভূমধ্যসাগর আর আফ্রিকান আটলান্টিক দিয়ে ঘিরে থাকা আল-আন্দালুস হয়ে দাঁড়াল ব্যবসা-বাণিজ্যের পীঠস্থান।

যদিও আল-আন্দালুস তখন বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর লোকজনে বিভক্ত। আদি অধিবাসী ভিজিগথ আর আইবেরো-রোমানরা তো রয়েছেই, সাথে রয়েছে স্পেন জয় করতে আসা আরব আর আমাজিঘ গোত্রের লোকেরা। শুধু মুসলিমদের মধ্যেই রয়েছে আমাজিঘ, আরব, গথিক, স্লাভ, বাইজান্টাইন আর স্পেনের সদ্য মুসলিম হওয়া আইবেরো-রোমানরা। এদিকে যুদ্ধের সময় পাওয়া সম্পদ আরব অভিজাত আর সংখ্যাগরিষ্ঠ আমাজিঘদের মধ্যে ঠিকভাবে ভাগ-বাটোয়ারা না হওয়ায় আমাজিঘরা ৭৪০ সালে বিদ্রোহ করে বসে। তাদেরকে থামানোর জন্য উমাইয়া খলিফা সিরিয়া, জর্ডান, ফিলিস্তিন থেকে আরব সৈন্য পাঠাতে শুরু করে, কিন্তু আল-আন্দালুস পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়নি। এদিকে বারবার আর আরবদের মধ্যের এই রেষারেষির সুযোগ নেয় উত্তরের আস্তুরিয়া অঞ্চলের খ্রিস্টানরা, গঠন করে 'কিংডম অফ আস্তুরিয়া'।

৭৫০ খ্রিস্টাব্দে উমাইয়া খিলাফতের পতনের পর মুসলিম বিশ্বে শুরু হয় আব্বাসীয়

যুগ। গণহত্যার সময় উমাইয়া পরিবারের বেঁচে যাওয়া রাজপুত্র আবদ আল-রহমান পালিয়ে আন্দালুসে চলে আসেন। সেখানেই শুরু হয় তার নতুন রাজ্য-শাসন, আল-আন্দালুসকে ঘোষণা করেন স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে। দামেশক আর বাগদাদের সাথে শুরু হয় অঘোষিত ইসলামিক সাংস্কৃতিক যুদ্ধ। ৭৫৬ সালে নিজেকে আল-আন্দালুসের আমির হিসেবে ঘোষণা করেন আবদ আল-রহমান, ইউরোপের বুকে প্রতিষ্ঠিত হয় প্রথম স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র।

আন্দালুসের সবুজ সময়

পূর্বের আরব রাষ্ট্র কিংবা ইউরোপের খ্রিস্টান রাষ্ট্রগুলোকে সবদিক থেকেই ছাড়িয়ে গিয়েছিল আল-আন্দালুস। রোমানদের কাছ থেকে ধার নেওয়া ইঞ্জিনিয়ারিং আর শহরের পরিকল্পনার সাথে ইসলামি স্থাপত্যকলা মিশিয়ে নতুন করে গড়া হলো আন্দালুসের শহরগুলো। ভ্যালেন্সিয়া আর সেভিল ছিল বর্তমানের দুবাই কিংবা দোহার মতো বিলাসবহুল শহর। জাতিভা শহরে তখন চালু করা হয়েছে কাগজের কারখানা, দুষ্প্রাপ্য আর দামি পার্চমেন্টকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে শুরু হলো বই তৈরি করার বিপ্লব। কালের গর্ভে নষ্ট হয়ে যাওয়া মিশরীয় আর গ্রিক ডকুমেন্টগুলো বইয়ের আকার পেতে শুরু করল। শহরে শহরে তৈরি করা হলো হাম্মামখানা, জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হলো। নারীরা, বিশেষ করে অভিজাতরা, মধ্যযুগীয় খ্রিস্টানদের তুলনায় অনেক বেশি স্বাধীনতা ভোগ করত।

ইসলামের জিম্মা ব্যবস্থার কারণে অন্যান্য ধর্মের লোকেরাও সমানভাবে নিজেদের ধর্ম পালন করার সুযোগ পেত, নিজস্ব সম্প্রদায়ের নিয়ম-কানুন, উৎসবসহ সবকিছুই নিজেরাই নিয়ন্ত্রণ করতে পারত। যদিও তাদেরকে এজন্য নির্দিষ্ট পরিমাণে 'জিযিয়া কর' দিতে হতো। খ্রিস্টানরা একদিকে যেমন নিজেদের ধর্ম পালন করত, অন্যদিকে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াতও দেওয়া হতো। এর ফলে আন্দালুসে থাকা অনেক খ্রিস্টান আর ইহুদি ধর্মান্তরিত হয়েছিল।

ধর্মান্তরিত না হওয়া খ্রিস্টান আর ইহুদিরাও কিছুটা ইসলামি সংস্কৃতিতে প্রভাবান্বিত হয়েছিল। তৎকালীন সময়ের বেশ কিছু খ্রিস্টান সূত্রমতে, আন্দালুসের খ্রিস্টান যুবকদের অনেকেই আরব কবিদের সাহিত্যকর্ম আয়ত্ত করেছিল, এমনকি কুরআনও মুখস্থ করেছিল, যারা কিনা ল্যাটিনে সামান্য একটি চিঠিও লিখতে পারত না। ইহুদি আন্দালুসীয় আবার একইসাথে হিব্রু আর আরবি ব্যবহার করত এবং

দুই ভাষাতেই অনেক সাহিত্যকর্ম রচনা করেছে। আরবি কবিতা রচনাশৈলীর সাথে বাইবেলের হিব্রু ভাষা মিশিয়ে এক নতুন ধরনের সাহিত্যের প্রচলন শুরু হয় এ সময়ে, যা বর্তমানে ইসরায়েলের বিদ্যালয়গুলোতে পড়ানো হয়।

ইহুদি দর্শন আর অ্যারিস্টটলের দর্শনের সাথে পরিচিত হয় আন্দালুসীয়রা, বিখ্যাত মুসলিম দার্শনিক ইবনে রুশদ আর ইহুদি দার্শনিক মাইমোনাইডসের জন্মই হয়েছে আন্দালুসে। ক্লাসিক আরবি আর হিব্রু সাহিত্যের সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় আইবেরীয় লোকগান আর কবিতাগুলো। মোজেজ ইবনে এজরা আর ইবনে শুহাইদের হাত ধরে আরবি আর হিব্রু সাহিত্য এগিয়ে যায় বহুদূর। সেভিল, কর্ডোবা কিংবা গ্রানাডার বাড়িঘরের দেওয়ালে এখনো চোখে পড়বে আরবি ক্যালিগ্রাফি আর জ্যামিতিক নকশাগুলো। জ্ঞান-বিজ্ঞানেও সবাইকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল আন্দালুসীয়রা, গ্যালেন-অ্যারিস্টটলসহ প্রাচীন বিজ্ঞানীদের কর্মগুলো সংরক্ষণ করে রাখা হয়, যা পরবর্তীতে ইউরোপে রেনেসাঁ ঘটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পতনের আওয়াজ

ভূমধ্যসাগরের একদিকে চলছে পবিত্র ভূমি দখলের লড়াই, অন্যদিকে চলছে আল-আন্দালুস থেকে মুসলিম শাসন উচ্ছেদ করার চেষ্টা। ১০৭৬ সালের দিকে স্পেনের টোলেডো শহর দখল করে নেয় ষষ্ঠ আলফোন্সো, একসময়ের ভিজিগথ রাজধানী ছিল এই শহর। পরবর্তী ১৫০ বছর আইবেরীয় উপদ্বীপের মানচিত্র একইরকম থাকে। অবশেষে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে তৃতীয় ফার্নান্দো কর্ডোবা আর সেভিলের মতো গুরুত্বপূর্ণ শহর দখল করে নেন, অন্যদিকে আরাগনের প্রথম জায়ুম দখল করে নেন ভ্যালেন্সিয়া শহর। ৬০০ বছর ধরে রাজত্ব করা বিশাল খিলাফতের হাতে অবশিষ্ট থাকে শুধু গ্রানাডা, তাও সেখানেও নিয়মিতভাবে হানা দিতে থাকে ক্রুসেডার বাহিনী।

আন্দালুসে মুসলিমদের রাজনৈতিক পতনের সাথে সাথে এর শিক্ষা-সংস্কৃতির পতনও শুরু হয়ে যায়। মুসলিম অভিজাতদের বেশিরভাগই চলে যায় উত্তর আফ্রিকা কিংবা আরব অঞ্চলে, যদিও সাধারণ জনগণদের বেশিরভাগ গ্রানাডাতেই থেকে যায়। গ্রানাডাতেও ইহুদিরা একইভাবে সুরক্ষা পেতে থাকে, যেরকমটা তারা কয়েকশ বছর ধরে পেয়ে আসছে।

খ্রিস্টান শাসকরা আন্দালুসীয় চিত্রকলা, স্থাপত্যকলা আর বিজ্ঞানের বেশ বড় মাপের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। টোলেডো খ্রিস্টানরা দখল করে নিলেও এরপরেও কয়েকশ বছর আরবি শেখার অন্যতম পীঠস্থান ছিল এই শহর। দশম আলফোন্সো সেভিলে আরবি শেখার জন্য আলাদা স্কুল তৈরি করে দেন, আন্দালুসীয়দের বিজ্ঞান আর দর্শনশাস্ত্রেও আগ্রহী ছিলেন তিনি। তার সময়ে মুসলিম আর ইহুদিরা নিজেদের ধর্ম পালন করার সমান সুযোগ-সুবিধা পেত। ভ্যালেন্সিয়াতেও প্রায় পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত আরবি সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা ছিল।

যদিও খ্রিস্টান শাসকদের এই উদারমনা অবস্থা বেশিদিন চলেনি, যখন প্রথম ইসাবেলা 'দ্য ক্যাথলিক' এবং আরাগনের দ্বিতীয় ফার্দিন্যান্দ যৌথভাবে স্পেন শাসন করা শুরু করেন। যদিও ফার্দিন্যান্দ ভ্যালেন্সিয়া আর আরাগনে থাকা মুসলিমদের প্রতি বেশ উদার ছিলেন, কিন্তু ইসাবেলা ছিলেন সম্পূর্ণ বিপরীত। অবশেষে ১৪৯২ সালে বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে ছোট্ট গ্রানাডার উপর আক্রমণ চালান তারা দুজন, দখল করে নেয় আল-হামরা থেকে শুরু করে সাধারণ বাড়িঘর। ঐ বছরেই ইহুদিদের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়, স্পেনে থাকতে হলে খ্রিস্টান হতে হবে অথবা চলে যেতে হবে। আর এভাবেই স্পেনের মাটি থেকে হারিয়ে যায় একসময়ে পৃথিবীর ওপর রাজত্ব করা আল-আন্দালুস।

টুরসের যুদ্ধ
BATTLE OF TOURS

তারিখ:	১১৪ হিজরি / ৭৩২ খ্রি.
স্থান:	তলুজ শহর, ফ্রান্স
ফলাফল:	মুসলিম বাহিনীর পরাজয়

পক্ষ-বিপক্ষ:	উমাইয়া খিলাফাহ	ফরাসি মেরোভিঞ্জিয়ান সাম্রাজ্য (খ্রিস্টান)
সেনাপ্রধান:	আব্দুর রহমান আল-গাফেকি	চার্লস মার্টেল
সেনাসংখ্যা:	৫০ হাজার	২ থেকে ৪ লক্ষ
ক্ষয়ক্ষতি:	১০ হাজারের মতো শহিদ	১০/২০ হাজার নিহত

ইতিহাসে বালাত আশ-শুহাদা যুদ্ধ বা বাওয়াতিহ যুদ্ধ নামে পরিচিত ইসলামি ইতিহাসের দুঃখজনক এ যুদ্ধটি সংঘটিত হয় মুসলমান এবং ইউরোপিয়ানদের মধ্যে। এ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর সেনাপ্রধান ছিলেন হযরত আবদুর রহমান আল-গাফেকি এবং ইউরোপীয় বাহিনীর নেতৃত্বে ছিল চার্লস মার্টেল (Charles Martel)। চিরস্মরণীয় এ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর পরাজয় ঘটে এবং তাদের সেনাপতি শহিদ হয়ে যান। এই পরাজয় ইউরোপে মুসলমানদের সামরিক অগ্রযাত্রা ব্যাহত করে।

যুদ্ধের আগে

ইসলামের ইতিহাসে উমাইয়া আমলকে বলা হয় সম্প্রসারণের যুগ। ততদিনে বিশাল পারসিক সাম্রাজ্য পদানত। আস্তে আস্তে অধিকৃত হল সিরিয়া, আর্মেনিয়া ও উত্তর আফ্রিকাসহ বাইজান্টাইনীয় সাম্রাজ্যের বৃহত্তর অংশও। ৭১১ সালে জিব্রাল্টারে তারিক বিন জিয়াদের অবতরণের মাধ্যমে আইবেরিয়ান উপদ্বীপে মুসলিম আরবদের অভিযান শুরু। ৭১৯ সালে আল-আন্দালুসের গভর্নর আল-সাম ইবনে মালিক আল-খাওলানি সেপটিমানিয়া অধিকার করেন।

পরের বছর রাজধানী স্থাপন করেন নারবোনিতে, মুসলিমরা যাকে আববুনা বলত। দ্রুতই তারা নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করল ভিসিগথ কাউন্টদের অধীনে থাকা আলেট, বেজিয়ার্স, আগদি, লোদেভি, ম্যাগুয়েলিনি ও নিমেসের উপর। কিন্তু ৭২১ সালেই টুলো অবরোধ করতে গিয়ে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। বিপর্যস্ত হন একুয়াটাইনের ডিউক অডোর কাছে। আল-সাম মারত্মকভাবে আহত এবং নারবোনিতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

৭৩০ সালের কথা। খিলাফতের পক্ষ থেকে আবদুর রহমান আল-গাফেকিকে

আন্দালুসের শাসনকর্তা নিয়োগ দেয়া হয়েছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েই তিনি আন্দালুসে দীর্ঘদিন ধরে চলা আরব ও বারবারিয়ানদের বিদ্রোহ শক্ত হাতে দমন করেন। এরপর শহরের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং সাংস্কৃতিক উন্নতির প্রতি তিনি বিশেষ নজর দেন।

তবে উত্তরে বিভিন্ন স্থানে মুসলমানদের বিরুদ্ধে গোথ সম্প্রদায় ও ফরাসিদের নানামাত্রিক অপতৎপরতা, আন্দালুসের এই ক্রমবর্ধমান উন্নতি ও প্রশাসনিক সংহতিকে বাধাগ্রস্ত করে। আন্দালুসের শাসক আবদুর রহমান আল-গাফেকির মতো ঈমানি বলে বলীয়ান মহান মুজাহিদের জন্য এতসব জেনেও চুপ থাকাটা ছিল অসম্ভব এবং অকল্পনীয়। তাছাড়া তলুজের (Toulouse) পরাজয়ের দুঃখজনক স্মরণ তার রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল। সে লজ্জার ক্ষত মুছে ফেলতে তিনি কেবল একটি উপযুক্ত সুযোগের অপেক্ষা করছিলেন। আর আজ যখন তেমন একটি সুযোগ হাতছানি দিচ্ছে, তিনি তার সদ্ব্যবহার করলেন। যুদ্ধের জন্য উত্তমরূপে প্রস্তুতি নিয়ে শহরে বিজয়ের প্রতি বিশ্বাস ও দৃঢ়তার কথা জানিয়ে দিলেন। সর্বদিক থেকে মুজাহিদরা সেনাপতির সিদ্ধান্তের প্রতি সম্মতি জানিয়ে পানির প্রবাহের বেগে একত্র হতে শুরু করল। একে একে গাফেকির নেতৃত্বে জমা হয়ে গেল প্রায় পঞ্চাশ হাজার সাহসী মুজাহিদ।

নিপুণ পরিকল্পনা

সেনাপতি আবদুর রহমান মুসলিম বাহিনীকে একত্র করলেন আন্দালুসের উত্তরে পাম্পলনা (Pamplona) নামক স্থানে। ১১৪ হিজরির শুরুর দিকে (৭৩২ খ্রিস্টাব্দে) তিনি এলবার্ট পাহাড় (Mount Elbert) অতিক্রম করে ফ্রান্সে প্রবেশ করেন। এরপর দক্ষিণ দিক হয়ে এগিয়ে যান রোন (Rhone) নদীর তীরবর্তী শহর আরাল নগরীর দিকে। এরা মুসলমানদের জিযিয়া দেবার চুক্তি করেও তা রক্ষা করেনি এবং আনুগত্য মেনে নেয়নি—তাই। সেখানে ধূসরিত এক যুদ্ধের পর তিনি শহরটি অধিকার করে নেন। সেখান থেকে পশ্চিমে ডাচ একিতেনের (Aquitaine) দিকে এগিয়ে যান। দুরদুন নদীর পাড়ে তাদের সাথে চূড়ান্ত যুদ্ধের পর মুসলিম বাহিনী তাদেরকে ধরাশায়ী করে ফেলতে সক্ষম হয়। এ নগরের সেনাদল ধ্বংস-বিধ্বস্ত হয়ে যায়। নিরুপায় হয়ে তাদের শাসক ডিউক ওদো (Duke Odo) তার শহর বিরডাল মুসলমানদের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়ে বেঁচে থাকা সেনাদের নিয়ে উত্তর

দিকে পলায়ন করে। এর মাধ্যমে একিতেন নগরীর পুরো কর্তৃত্ব মুসলমানদের জন্য নিরঙ্কুশ হয়ে যায়। এরপর সেনাপতি আবদুর রহমান লোয়ার নদীর দিকে এগিয়ে যান। সেখানে টুর শহরে অবস্থিত বিখ্যাত সেন্ট মার্টিন চাপিছে (St. Martin Church) ঢুকে সেটা করতলগত করেন।

পলায়নরত ডিউক ওদো নিজের মিরোভিঞ্জিয়া সাম্রাজ্য বাঁচানোর কোনো উপায় না পেয়ে সে অঞ্চলের সার্বিক ক্ষমতাধর শাসক চার্লস মার্টেলের কাছে সাহায্য কামনা করে। চার্লস তার আহ্বানে সাড়া দেয় এবং ওদোর সাম্রাজ্য বাঁচাতে দ্রুত পদক্ষেপ নেয়ার আশ্বাস দেয়। অথচ ইতিপূর্বে সে ডিউক ওদোর সাথে ব্যক্তিগত মতানৈক্য হেতু এতদাঞ্চলে মুসলমানদের সামরিক তৎপরতায় কোনো আগ্রহ দেখানোর গরজ করত না।

ইউরোপীয় বাহিনীর প্রস্তুতি

ডিউকের সাম্রাজ্য বাঁচানোর অজুহাতে চার্লস মার্টেল দীর্ঘ বিরোধের দেনা পরিশোধে প্রতিপক্ষ ওদোর শাসিত একিতেন নিজের করায়ত্ত করার সুযোগ পেয়ে যায়। পাশপাশি ক্রমশ ভয়ানক হয়ে ওঠা ইসলামের বিজয়যাত্রার লাগাম টেনে ধরার একটি মোক্ষম মুহূর্ত হাতে এসে ধরা দিল তার। বিলম্ব না করে সে সেনা সংগ্রহ শুরু করে দেয়, যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে সুযোগ ও চেষ্টায় সামান্য ছাড় দেয় না সে। চারপাশ থেকে তার শিবিরে সেনারা জমা হতে থাকে। প্রশিক্ষিত চার নিজস্ব সেনাদলের সাথে যোগ হয় হিংস্র, উলঙ্গ, রুক্ষ ও রূঢ়স্বভাবী বিভিন্ন জংলি বাহিনী। সেনাদের চূড়ান্ত জমায়েত শেষে প্রতিপক্ষ মুসলিম বাহিনীর কয়েকগুণ অধিক সেনা নিয়ে ইউরোপের ভূমি কাঁপিয়ে সে সামনে অগ্রসর হতে শুরু করে। চিৎকার-চেঁচামেচিতে ফ্রান্সের শহর-নগর, পাহাড়-কন্দরের দিক-বিদিক প্রতিধ্বনিত করে সবশেষে চার্লস লোয়ার নদীর দক্ষিণ পাড়ে এসে পৌঁছে।

যুদ্ধের সূচনা

অব্যাহত সেনা অভিযানের পর মুসলিম বাহিনী তখন বাওয়াতিহ ও টুর নগরীর মাঝামাঝি এক সমতল ভূমিতে অবস্থান করছিল। ততক্ষণে এ শহরদুটি মুসলমানদের অধিকারে চলে এসেছে। এ-সময় হঠাৎ করে পূর্ব কোনো অবগতি

ছাড়াই চার্লসের বাহিনী লোয়ার নদীর তীরে এসে হাজির হয়। যেই মাত্র মুসলিম সেনাপতি আবদুর রহমান আল-গাফেকি লোয়ার পার হয়ে ওপাশে শত্রুকে ধাওয়া করবেন, তখনই অপ্রস্তুত অবস্থায় মুসলিম বাহিনীর কয়েকগুণ সেনা নিয়ে চার্লসের দুঃসাহসী বাহিনী সেখানে উপস্থিত হয়। ফলে আবদুর রহমান তাঁর বাহিনী নিয়ে পেছনে ফিরে এসে বাওয়াতিহ্ ও টুরের মধ্যবর্তী সে বিস্তীর্ণ সমতলে এসে অবস্থান নিতে বাধ্য হয়। চার্লস মার্টেলও তার সেনাদের নিয়ে লোয়ার নদী পার হয়ে গাফেকির বাহিনীর মাত্র কয়েক মাইল দূরে ঘাঁটি স্থাপন করে।

এই বিস্তীর্ণ সমতটেই দুই পক্ষের ঘোরতর লড়াই হয়। ইতিহাসে নির্দিষ্ট করে যুদ্ধের জায়গাটি চেনা না গেলেও কোনো কোনো বর্ণনামতে: বাওয়াতিহ্ এবং শাটলারের (Shatler) মধ্যবর্তী রোমানগামী পথের কাছেই কোনোখানে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। জায়গাটি কারও মতে, বাওয়াতিহের ২০ কিলোমিটার উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত; ইতিহাস যাকে বালাত নামে উচ্চারণ করে। আন্দালুসের ভাষায় শব্দটির অর্থ, এমন কোনো প্রাসাদ বা দুর্গ—যার চারপাশ ঘিরে থাকে সুশোভিত উদ্যান। এ-জন্যই আরবি ইতিহাসের উৎসগ্রন্থগুলোতে এ যুদ্ধকে 'বিলাত আশ-শুহাদা' বলে অভিহিত করা হয়। শুহাদা শব্দযোগের কারণ হলো, এ যুদ্ধে বহু মুসলিম সেনা শাহাদাত বরণ করেছেন। এদিকে ইউরোপীয়ান ইতিহাসগ্রন্থগুলোতে এ যুদ্ধকে 'বাওয়াতিহ্ বা টুর যুদ্ধ' বলে উল্লেখ করা হয়।

১১৪ হিজরির শাবান মাসের শেষ দিক। অক্টোবর, ৭৩২ খ্রিস্টাব্দ। উভয় পক্ষের মাঝে যুদ্ধ চলমান। দীর্ঘ নয় দিন রক্তক্ষয়ী মোকাবেলার পর এ যুদ্ধ পৌঁছে গেল মহিমান্বিত মাস রমাদানে। এখনো কোনো পক্ষেরই চূড়ান্ত কোনো ফলাফল হাতে আসেনি।

যুদ্ধের দশম দিন। দুই পক্ষই একে অন্যের উপর সর্বোচ্চ বীরত্ব ও সাহসের সাথে ঝাঁপিয়ে পড়ল। একপর্যায়ে ফরাসি বাহিনী ক্লান্ত হয়ে গেলে মুসলমানদের ললাটে দেখা গেল বিজয়ের চিহ্ন। খ্রিস্টানরা খেয়াল করল, মুসলমানদের সাথে বিপুল পরিমাণ গনিমতের সম্পদ বিদ্যমান, যেগুলো তারা আন্দালুস থেকে বাওয়াতিহ্ পর্যন্ত বিভিন্ন বিজয়াভিযানে অর্জন করেছে। গনিমতের এ সম্পদগুলো মুসলমানদের পিঠ ভার করে রেখেছে। আরবদের স্বভাব ছিল তারা তাদের গনিমত সাথে করে বয়ে বেড়াত। সেগুলো এবারও তাদের বাহিনীর পেছনে কিছু রক্ষী সেনার নজরদারিতে রাখা ছিল। খ্রিস্টানরা ব্যাপারটা বুঝতে পেরে যুদ্ধের তালে মুসলমানদেরকে ধাওয়া

করে সেই দিকটা থেকে সরিয়ে নিচ্ছিল এবং এতে তারা সফলও হয়ে গেল। পেছন দিকে গনিমতের হেফাজতে থাকা সেনাদের কাছ থেকে মুসলমানদের মূল বাহিনীকে তারা আলাদা করে ফেলল। মুসলমানরা শত্রুপক্ষের এই পরিকল্পনা ধরতে পারেনি। তাই রক্ষী হিসেবে সামান্য কয়েকজন সেনাই গনিমতের সম্পদের কাছে দাঁড়িয়ে রইল এবং মুসলিম বাহিনীর শৃঙ্খলা ভেঙে গেল। এক দল নিরুপায় দাঁড়িয়ে রইল গনিমতের হেফাজতে অপর দল সামনের দিকে খ্রিস্ট বাহিনীর মোকাবেলায় ব্যস্ত হয়ে গেল। সেনাদের সারিগুলো পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে ফাঁকে ফাঁকে ঢুকে যাচ্ছিল খ্রিস্টান সেনাদল।

সেনাপতি আবদুর রহমান আল-গাফেকি নানাভাবে সেনাদের শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনে নিয়ন্ত্রণ নিতে চাচ্ছিলেন। তিনি মুসলিম সেনাদেরকে যুদ্ধের প্রতি উৎসাহ জুগিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু অদৃষ্ট থেকে উড়ে আসা তিরবাহিত মৃত্যু তাকে সে সুযোগ দিল না। আহত বদনে তিনি মৃত্যুর কোলে লুটিয়ে পড়লেন। সেনাপতির শাহাদাতে মুসলিম সেনাদের ভেতর আরও অস্থিরতা এবং বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। বাহিনীর সর্বত্র ছড়িয়ে গেল ভয়। এরপরও যদি সৈন্যসুলভ ঈমান, বিজয়ের নেশা ও মনস্তাত্ত্বিক অবিচলতা না থাকত—তাহলে কয়েকগুণ বৃহৎ এ বাহিনীর সামনে সেদিন মুসলমানদের বড় কোনো দুর্যোগে পড়তে হতো। মুসলিম সেনারা ধৈর্য ধারণ করে যুদ্ধে অটল থাকলেন। এভাবে রাত এসে গেল। আঁধারের অমানিশা কাজে লাগিয়ে মুসলিম সেনাদল সেপ্টিমেনিয়ার (Septimania) দিকে চলে গেল। তাদের ভারী অস্ত্র ও যুদ্ধপ্রাপ্ত সম্পদের সবটুকুই শত্রুর গনিমত হিসেবে ফেলে গেল ময়দানে।

পরদিন সকাল। যুদ্ধের ধারাবাহিকতায় ময়দানে নেমে এল ফরাসি বাহিনী। কিন্তু বিপরীতে দেখা গেল না কোনো মুসলমান। অদূরে কুরিক্ষেত্রের ওপারে পড়ে আছে তাদের অবস্থানের তাঁবু, সেখানে কোনো যোদ্ধা অবশিষ্ট নেই। তারা সতর্কতার সাথে সেদিকে এগিয়ে গেল, হতে পারে এটা কোনো ফাঁদ; কোনো ধোঁকা বা চাল। কিন্তু তারা সেগুলো খালি পড়ে থাকতে দেখল। দেখল, কজন অসুস্থ এবং আহত অচল লোক পড়ে আছে কোথাও—আর কেউ নেই। তারা শত্রুতার ভয়াল তলোয়ারে আহতদের সেখানেই জবাই করে ফেলল। চার্লস মার্টেলের মনে হলো, মুসলমানদের ময়দান ছেড়ে পলায়নই তার বিজয়ের জন্য যথেষ্ট। তাই সে আর আগ বেড়ে তাদের পশ্চাদ্ধাবনের চিন্তা করল না। সে দুঃসাহস না দেখিয়ে সে তার বাহিনী নিয়ে উত্তরে যেখান থেকে এসেছিল—সেদিকে রওনা করল।

পরাজয়ের তত্ত্বগুলি

এমন লাঞ্ছনাকর পরাজয়ের পেছনে একইসাথে কার্যকর ছিল বেশ কিছু কারণ। যেমন:

- আন্দালুস থেকে বের হয়ে এ-যাবৎ মুসলিম বাহিনী পাড়ি দিয়েছে বহু পথ। ফ্রান্সে আসার পরও লাগাতার যুদ্ধ তাদেরকে কাবু করে ফেলেছে; বহু ক্রোশের যাত্রা তাদেরকে ক্লান্ত করে দিয়েছে। তদুপরি এ দীর্ঘ যুদ্ধযাত্রায় তারা নতুন কোনো সহায়তা পায়নি, যা তাদেরকে সপ্রাণ করবে; তাদের দায়িত্বপালনে শক্তি জোগাবে। কারণ, দামেশকের দারুল খিলাফাহ থেকে তাদের অবস্থান ছিল বেশ দূরে। ফলে ফ্রান্সের কোনায় কোনায় তাদের এ-যাত্রা ক্রমশ তাদেরকে ইতিহাসের বিপর্যয়কর অতীত রূপকথার কাছাকাছি করে দিচ্ছিল। এদিকে আন্দালুসের রাজধানী কর্ডোবাও তাদেরকে কোনো সহায়তা করতে সক্ষম ছিল না; কারণ, শহরটির মাইলে মাইলে তখন বহু আরববিজেতার দুঃসাহসী পদচারণা চলমান।

- গনিমতের সম্পদ রক্ষায় মুসলমানদের অতি আগ্রহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাঁর পবিত্র গ্রন্থ কুরআনে বলেন:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ

> *'হে মানুষ, নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা সত্য। সুতরাং, পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে কিছুতেই প্রতারিত না করে। এবং সেই প্রবঞ্চক যেন কিছুতেই তোমাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে প্রবঞ্চিত না করে।'* [১]

এ-যুদ্ধে লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, তারা পার্থিব জীবনের প্রবঞ্চনাও পড়ে গিয়েছিলেন। বিজিত অঞ্চলের সম্পদ সংরক্ষণে তাদের কামনা ও আগ্রহ ছিল চোখে পড়ার মতো। *বুখারি* এবং *মুসলিম* শরিফে হযরত আমর ইবনু আওফ আল-আনসারি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত এক হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

---

[১] সূরা ফাতির: আয়াত—০৫

فَوَاللهِ مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ وَلَكِنِّيْ أَخْشَى أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمْ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوْهَا كَمَا تَنَافَسُوْهَا وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ

> *'আল্লাহর কসম, আমি তোমাদের জন্য দরিদ্রতার আশঙ্কা করি না। বরং আমি আশঙ্কা করি যে, তোমাদের কাছে দুনিয়ার প্রাচুর্য আসবে; যেমন তোমাদের পূর্বেকার লোকেদের কাছে এসেছিল। তখন তোমরা সেটা পাওয়ার জন্য পরস্পর প্রতিযোগিতা করবে, যেমনভাবে তারা করেছিল। আর তা তাদেরকে যেমনিভাবে ধ্বংস করেছিল, তোমাদেরকেও তেমনিভাবে ধ্বংস করে দেবে।'* [১]

এ হাদিস আমাদের বোঝালো, সৃষ্টিজগতের সাথে আল্লাহ তাআলার স্বাভাবিক আচরণনীতি হলো, মুসলমানদের সামনে যদি দুনিয়া উন্মুক্ত করে দেয়া হয় আর তারা পূর্ববর্তী জাতিসমূহের মতো সেগুলো নিয়ে পরস্পর বাদানুবাদে লিপ্ত হয়—তাহলে পূর্বের সে-সব জাতির মতো আল্লাহ মুসলমানদেরকেও ধ্বংস করে দেন। আর তিনি ইরশাদ করেন:

فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحْوِيلًا

> *'অতএব আপনি আল্লাহর বিধানে পরিবর্তন পাবেন না এবং আল্লাহর রীতি-নীতিতে কোনো ব্যতিক্রমও দেখবেন না।'* [২]

যুদ্ধের ফলাফল

টুরসের যুদ্ধে উমাইয়াদের নিহত সৈন্যসংখ্যা ছিল ১০ হাজারের মতো, যেখানে ফ্রাঙ্কিশ বাহিনীতে নিহত হয়েছিল মাত্র ১ হাজার সেনা। চার্লসকে মার্টেল বা হাতুরি উপাধি দেয়া হয় এ যুদ্ধে উমাইয়া বাহিনীকে গুঁড়িয়ে দেবার জন্য। তবে ফ্রাঙ্কিশ বাহিনীর বীরত্ব প্রকাশের জন্য ইউরোপিয়ান ইতিহাসে দাবি করা হয়, ৩ লাখ ৭৫ হাজার আরবকে হত্যা করা হয়েছে, আদতে যা ভিত্তিহীন। যুদ্ধের পর চার্লস মার্টেল

---

[১] *বুখারি:* হাদিস নং—৬০৬১, *মুসলিম:* হাদিস নং—২৯৬১

[২] সুরা ফাতির: আয়াত—৪৩

জার্মান মিত্রদের তাড়িয়ে দিয়ে বিজয় চূড়ান্ত ও নিজেদের পক্ষে কুক্ষিগত করেন। অন্যদিকে আবদুর রহমানের মৃত্যুর পর সৃষ্ট শূন্যস্থান পূরণ করার মতো যোগ্যতম কাউকে পাওয়া যাচ্ছিল না। যদিও ৭৩৬ সালে তার পুত্র এদিকে আরেকটি অভিযান চালায়। তথাপি পিরোনিজের ওপাশে তারা আর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি।

তবে চার্লস লোম্বার্ডের রাজা লিউটপ্রান্ডের সহযোগিতায় একে একে দখল করেন মন্টিফিরিন, আভিগনন, আরলেস প্রভৃতি অঞ্চল। এমন শক্তিশালী উমাইয়া বাহিনীকে পরাজিত করলেও নারবোনি শহর দখল করতে ফ্রাঙ্কিশরা ব্যর্থ হয়। ৭৩৫ সালে একুয়াটাইনের ডিউক অডোর মৃত্যুর পর চার্লস তার রাজ্যকে নিজের রাজ্যের সাথে একীভূত করতে চাইলেও অভিজাতরা অডোর পুত্র হুনল্ডকে ডিউক হিসাবে ঘোষণা দেন—যদিও দিনশেষে হুনল্ড চার্লসকেই প্রভু হিসাবে স্বীকার করে নেন।

৭৩৫ সালে আল-আন্দালুসের নতুন গভর্নর উকবা বিন আল-হাজ্জাজ টুরসের যুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় অভিযান চালনা করেন এবং আরলেস ও এভিগনন দখল করে নেন। এরপর চার্লস ৭৩৬ এবং ৭৩৯ সালে দুইবার সেপটিমানিয়া আক্রমণ করলে তাকে ফিরিয়ে দেয়া হয়। বস্তুত টুরসের যুদ্ধেরও ২৭ বছর পর পর্যন্ত নারবোনি ও সেপটিমানিয়া উমাইয়াদের অধীনেই থেকে যায়। ৭৫০ সালে উমাইয়া খেলাফতের পতন ও আব্বাসীয় খেলাফতের সূচনা ঘটলে বিচ্ছিন্নতার এ সুযোগে ৭৫৯ সালে পেপিন দ্যা শর্টের কাছে আত্মসমর্পন করে ফ্রাঙ্কিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় নারবোনি।

শেষ করার আগে

বস্তুত এ যুদ্ধ নিয়ে বহু জলঘোলা করা হয়েছে। বহু আলোচনা, সমালোচনা এবং পর্যালোচনা হয়েছে। ইউরোপীয় ঐতিহাসিকরা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে তাদের গ্রন্থগুলোতে ঠাঁই দিয়েছে এ যুদ্ধের ইতিহাস। এটাকে তারা নানানভাবে চূড়ান্ত ফায়সালাকারী যুদ্ধ হিসেবে দেখাতে চেয়েছে। তাদের এতটা গুরুত্বের রহস্য কারও কাছে অজানা নয়। তাদের অধিকাংশ এ যুদ্ধকে ইউরোপের মুক্তির ঘটনা বলেও আখ্যায়িত করতে চায়। ঐতিহাসিক এডওয়ার্ড গিবন (Edward Gibbon) তার বিখ্যাত The History of the Decline and Fall of the Roman Empire বা রোমান সাম্রাজ্যের পতন গ্রন্থে এ যুদ্ধ সম্পর্কে বলেন: ‘এ যুদ্ধে আমাদের ব্রিটিশ

পূর্বপুরুষ এবং প্রতিবেশী ফরাসিরা আমাদের শহরকে মদিনার কুরআন ও ধর্মের আগুন থেকে রক্ষা করেছেন। রোমের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখেছেন এবং খ্রিস্ট শক্তিকে আরও সংহত করেছেন।'

স্যার এডওয়ার্ড ক্রেজি (Edward Crazy) বলেন: '৭৩২ হিজরি সনে আরবদের বিরুদ্ধে চার্লস মার্টিন যে অনন্য বিজয় লাভ করেছিলেন, সেটা আরবদের জন্য পশ্চিম ইউরোপে চূড়ান্ত সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে এবং খ্রিস্টানদেরকে রক্ষা করেছে বর্বর ইসলাম থেকে।'

তবে একদল নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক এ বিজয়ে ইউরোপের এক বিরাট দুর্দৈবের কথা উল্লেখ করেছেন। তাদের মতে, চার্লসের এ বিজয় ইউরোপকে মদিনার সভ্যতা ও কৃষ্টি থেকে ইউরোপকে বঞ্চিত করেছে। ঐতিহাসিক গুস্তাভ লে বন (Gustave Le Bon) তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ Arab Civilization-এ বলেন: (যা পরবর্তীতে আদিল জুআইতার নামী একজনের হাতে الحضارة العربية বা আরব সভ্যতা নামে আরবি অনুবাদ হয়ে আসে) 'আরবরা যদি ফ্রান্সের কর্তৃত্ব হাতে নিতে পারত, তাহলে প্যারিসও আন্দালুসের কর্ডোবার মতো সভ্যতা ও জ্ঞানের কেন্দ্রীয় নগরী হয়ে উঠত। যখন কর্ডোবায় লোকেরা রাজপথে দাঁড়িয়ে বই পড়ে, বই লেখে বা কবিতা রচনা করে—ইউরোপের রাজা বাদশারা তখন নিজেদের নাম পর্যন্ত লিখতে জানে না।'

বিলাত আশ-শুহাদার এ যুদ্ধে পরাজয়ের পর ইউরোপে ঢোকার আর কোনো সুযোগ মুসলমানদের সামনে আসেনি। এরপর যখন খ্রিস্ট শক্তিরা ক্রমশ পরস্পর ঐক্য গড়ে তুলছিল, মুসলমানদের মধ্যে তখন দেখা দিচ্ছিল বাকবিতণ্ডা; জ্বলে উঠছিল বিরোধ ও বিদ্বেষের আগুন এবং শুরু হয়েছিল আন্দালুসে মুসলিম সেনাদের বিজিত অঞ্চলগুলোতে, ইউরোপীয়ানদের কর্তৃত্ব দখল ও ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের সময়।

আব্বাসি খিলাফত

১৩২-৬৫৬ হি.

৭৫০-১২৫৮ খ্রি.

তালাস নদীর যুদ্ধ
BATTLE OF TALAS

তারিখ:	১৩৩ হিজরি / ৭৫১ খ্রি.
স্থান:	তালাস (বর্তমান কিরগিজিস্তানের অন্তর্গত একটি শহর)
ফলাফল:	চৈনিকদের পরাজয় এবং গাও শিয়ানশির পলায়ন

পক্ষ-বিপক্ষ:	আব্বাসি খিলাফাহ	চিনের ট্যাং রাজবংশ
সেনাপ্রধান:	যিয়াদ ইবনু সালিহ, আবু মুসলিম	গাও শিয়ানশি
সেনাসংখ্যা:	জানা যায় নি	৩০ হাজার, মতান্তরে ১ লক্ষ
ক্ষয়ক্ষতি:	অজ্ঞাত	নিহত কয়েক হাজার, বন্দি ২০ হাজারের মতো

কাগজের জন্ম কোন দেশে, এমন প্রশ্নের জবাবে আমরা সকলে একবাক্যে বলি—চিনে। সভ্যতার গতিপথ বদলে দেওয়া অনন্য এই আবিষ্কারের জন্য আজও বিশ্বসভ্যতা চৈনিকদের কাছে ঋণী। তবে আবিষ্কারের সাথে সাথেই কাগজের প্রযুক্তি বিশ্ববাসী জানতে পারেনি। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, বহিঃবিশ্ব থেকে নিজেদের আলাদা করে রাখতে সর্বদা আগ্রহী চিনারা কাগজ তৈরির নিগূঢ় রহস্য গোপন করে রাখতে পেরেছিল প্রায় আটশ বছর! কিন্তু হঠাৎ একদিন চিনের এই টপ সিক্রেট জেনে যায় সারাবিশ্ব। অবশ্য সেটা কোনো শান্তিপূর্ণ কনফারেন্সের মাধ্যমে নয়, বরং রীতিমত এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে। পৃথিবীর ইতিহাসে নতুন বাঁকের সূচনা করা এই যুদ্ধ ইতিহাসে 'ব্যাটেল অফ তালাস রিভার' বা 'তালাস নদীর যুদ্ধ' হিসেবে পরিচিত। ১৩৩ হিজরি মোতাবেক ৭৫১ খ্রিস্টাব্দে বর্তমান কিরগিজিস্তানের অন্তর্গত তালাস নদীর অববাহিকায় আরবদের সাথে চিনদের প্রথম এবং একইসাথে শেষ এ যুদ্ধটি সংঘটিত হয়। ফলাফলে চৈনিক বাহিনীর উপর মুসলিম সেনাদের বিজয়, মধ্য এশিয়ায় আব্বাসি খিলাফাহর শেকড় আরও শক্তিশালী করে দেয়।

পূর্বকথা

সময়টা অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি। চিনের ট্যাং রাজবংশ (৬১৮-৯০৬ খ্রি.) তখন পূর্বদিকের একচ্ছত্র অধিপতি। একে একে মধ্য এশিয়ার তুর্কি রাজ্যগুলো চলে আসছিল তাদের করায়ত্তে। পরপর ধারাবাহিকভাবে তারা দখল করে নিচ্ছিল বর্তমান উজবেকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, তাজিকিস্তান এবং কিরগিজিস্তানের মতো বড় বড় প্রাচীন রাজ্যগুলো। চিনা সরকারকে রাষ্ট্রীয়ভাবে কর না দিয়ে রাষ্ট্র বাঁচানোর কোনো উপায় তখন এদের সামনে খোলা নেই।

এদিকে মধ্যপ্রাচ্যে জেগে উঠেছে ইসলামি খেলাফত। হযরত উমার ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতের সময় (৬৩৪-৬৪৪ খ্রি.) বিশাল পারস্য সাম্রাজ্য জয় করে মধ্য এশিয়ার উপকণ্ঠে পৌঁছে গিয়েছিল মুসলিম বাহিনী। তাঁর মৃত্যুপরবর্তী একশো বছর অর্থাৎ খুলাফায়ে রাশেদিন (৬৪৪-৬৬১ খ্রি.) এবং উমাইয়া আমলে (৬৬১-৭৫০ খ্রি.) সেই ধারা অব্যাহত ছিল। অবশ্য এ সময়ে মুসলিম বাহিনীর বিজয়ের গতি ছিল প্রথম যুগের তুলনায় মন্থর। তবে বেশকিছু কারণে চিনারা শুরুতে মুসলিম শক্তিকে নিজেদের জন্য ততটা আগ্রাসী বলে ভাবছিল না। যেমন: মুসলমানদের বিজয়যাত্রা তখনো চিন থেকে বহু দূরে। তদুপরি মধ্য এশিয়ায় তাদের সবচে বড় শত্রু পারস্যের সাসানি রাজ্যের মরণকামড় থেকে বাঁচতে চিন নিজেও তখন মরিয়া হয়ে আছে। বড় কোনো বিপর্যয় এড়াতে জেনেবুঝেই যেন তারা সাসানিদের মূল রসদ জোগানো পারস্য সম্রাটের কথা ভুলে থাকতে চাচ্ছিল।

তবে মুসলমানদের সাথে তাদের মূল সংঘর্ষ বাধে তখন, যখন খিলাফতের সেনারা ইরানের ক্ষমতা হাতে তুলে নেয়। নিজেদের বিজিত রাজ্যের সীমান্ত রক্ষার প্রয়োজনেই মধ্য এশিয়ার কর্তৃত্ব হাতে নেয়া তখন মুসলমানদের কর্তব্য হয়ে পড়ে। সেই দায়িত্বের বোধ থেকে তারা জয় করে নেয় বর্তমান আফগানের কাবুল, হেরাত ও গজনি। এতদাঞ্চলের বিজয়ের ইতিহাসে তৎকালীন খোরাসানের শাসকদের বীরত্বের প্রভাব ছিল প্রকট। বর্তমানে যাকে আমরা আফগানিস্তান বলে চিনি, বিধর্মীদের হাত থেকে এই ভূমি উদ্ধারের পেছনে সাহসী ভূমিকা ছিল খোরাসানের অধিপতি ইবনু আবি সুফরা রহিমাহুল্লাহর।

৮৫ হিজরি সালে (৭০৪ খ্রি.) একদা হাজ্জাজ বিন ইউসুফ তার সেনাদের জমা করে বলেন: 'কে আছো চিনের দিকে যাত্রা করতে আগ্রহী, আমি তাকে সেখানকার শাসক বানিয়ে দেব?' এরপর সে কুতাইবা ইবনু মুসলিম আল-বাহিলিকে এ কাজের উপযুক্ত ভেবে ৮৫ হিজরিতে খোরাসানের দায়িত্ব দিয়ে বেশকিছু বিজয়ের প্রতিজ্ঞা করে রওনা করিয়ে দেন। সাহসী এ সেনাপতির খোরাসানে আগমনের পরবর্তী দুই দশকের মধ্যে সমরখন্দ, বুখারাসহ মধ্য এশিয়া, বিশেষ করে আফগানিস্তান ও উজবেকিস্তানের বিরাট অংশ মুসলিম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। ফলে আরব ও চিন—প্রাচ্য এবং মধ্যপ্রাচ্যের দুই পরাশক্তির মধ্যে মোকাবেলা তখন সময়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

মুসলিম সেনাদল ঘাড়ে এসে নিশ্বাস নিলেও মোটাদাগে চিন তখনো নিজেদের আন্তঃরাষ্ট্রীয় সমস্যা ও অর্থনৈতিক দৈন্যতার কারণে সামরিকভাবে তাদের

মোকাবেলার জন্য সক্ষম ছিল না। চৈনিক সমাজের সর্বত্র কেবল মুসলমানদের বিপক্ষে সেনা অভিযানের প্রয়োজনীয়তার আলোচনা, নেতাদের একে অপরকে উৎসাহিত করার প্রবণতাই লক্ষ করা যাচ্ছিল; কিন্তু দরকারি কোনো পদক্ষেপই যেন তারা নিতে পারছিল না। তাছাড়া মুসলিম বাহিনীর ব্যাপারে তারা যা শুনে আসছিল দীর্ঘদিন ধরে, তা তাদেরকে ভড়কে দেবার জন্য যথেষ্ট ছিল। চিনের এই সীমান্তে এসে দাঁড়াবার আগে, তারা পারস্যের মতো বিশাল দুর্দমনীয় শক্তিকে নাস্তানাবুদ করে এসেছে। ধ্বংস করে দিয়েছে রোমানদের আধিপত্য, এমনকি ইউরোপের ফ্রান্স পর্যন্ত তাদের বিজয়বাহিনীর হাত থেকে নিস্তার পায়নি।

যুদ্ধের আগে যুদ্ধ

ট্যাং রাজবংশের সাথে উমাইয়া খিলাফতের প্রথম সংঘর্ষ বাঁধে ৭১৫ খ্রিস্টাব্দে। কারণটা ছিল ফারগানা উপতক্যায় আধিপত্য বিস্তার। সে সময় তিব্বতীয় রাজবংশ উমাইয়াদের পক্ষাবলম্বন করেছিল। প্রাথমিকভাবে উমাইয়া ও তিব্বতীয়দের মিলিত শক্তির লক্ষ্য অর্জিত হলে অচিরেই ট্যাং সেনাবাহিনী তাদের হৃত স্বার্থ পুনরুদ্ধার করে ফেলতে সক্ষম হয়। এদিকে দুই বছর পর ৭১৭ সালে উমাইয়া ও তিব্বতীয়রা মিলিতভাবে শিনজিয়াং আক্রমণ করে এবং আকসু অঞ্চলের দুটি শহর অবরোধ করে রাখে। অবশ্য ট্যাং রাজবংশের অনুগত কারলুক তুর্কদের একটি বাহিনী সেই অবরোধ ভেঙে শহর দুটিকে পুনরায় ট্যাং রাজবংশের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। এই কারলুকরাই পরবর্তী সময়ে তালাস নদীর যুদ্ধে, জয়ে-বিজয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

পরের তিন দশক পরিস্থিতি অনেকটাই শান্ত ছিল। উমাইয়াদের সাথে তুর্কি রাজ্যগুলোর বেশ কিছু সংঘর্ষ হলেও এ সময় উমাইয়া খিলাফতের সীমানায় খুব বেশি পরিবর্তন আসেনি। তবে এ সময়ে মধ্য এশিয়ায় ট্যাং রাজবংশের আধিপত্য ও প্রতিপত্তি যথেষ্ট বেড়ে গিয়েছিল। বলা হয়, ট্যাং রাজবংশ তাদের তিন শতাব্দী রাজত্বকালের ইতিহাসে ৭৫০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ প্রতিপত্তির একদম চূড়ায় আরোহণ করেছিল। তবে ভাগ্যের এক নির্মম পরিহাস এবং ইতিহাসের অমোঘ সত্য হলো, পর্বতের চূড়ায় আরোহণ করতে দীর্ঘসময় লাগলেও পতনকাল কিন্তু খুবই সামান্য হয়ে থাকে; ট্যাং রাজবংশের ক্ষেত্রেও ঠিক সেটাই ঘটেছিল।

উমাইয়াদের পতন ও শিয়ানশির সফল অভিযান

ক্ষমতা দখল ও রক্ষাকে কেন্দ্র করে বিদ্রোহীদের ষড়যন্ত্রে উমাইয়া শাসনের অবস্থা তখন টালমাটাল। এদিকে মধ্য এশিয়ার বেশকিছু অঞ্চল মুসলিম সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হলেও গুরুত্বপূর্ণ আরও কিছু ভূমি তখনো রয়ে গেছে চৈনিকদের দখলে। তাই উমাইয়াদের আন্তঃবিদ্রোহের এই দুর্বলতাকে গাও প্রাধান্য বিস্তারের মোক্ষম সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে এবং এতদাঞ্চলে তাদের হস্তচ্যুত এলাকাগুলো পুনরুদ্ধারের জন্য সেনা অভিযান শুরু করে দেয়।

হঠাৎ মুসলিম সাম্রাজ্যের এক আচানক পরিবর্তন সব হিসাব নিকাশ পাল্টে ফেলে। উমাইয়াদের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিনের বিদ্রোহ সফলতার মুখ দেখে। প্রায় নব্বই বছর মুসলিম বিশ্বকে শাসন করার পর ৭৫১ খ্রিস্টাব্দে উমাইয়াদের খিলাফতের অবসান ঘটে আব্বাসীয়দের হাতে। উমাইয়াদের পতন চিনাদের আরও উগ্র করে তোলে। ৭৪৭ থেকে ৭৫০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ট্যাং সেনাবাহিনীর কোরীয় সেনাপতি গাও শিয়ানশি তৎকালীন তিব্বত রাজ্যের অন্তর্গত গিলগিট (বর্তমানে পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণে) জয় করে ও মধ্য এশিয়ার বেশ কিছু ছোট ছোট রাজ্যকে ট্যাং সাম্রাজ্যের করদ রাজ্যে পরিণত করে। এরপর সোৎসাহে ছুটে চলে এতদাঞ্চলের মুসলিম অধিকৃত জনপদগুলো চৈনিকদের করতলগত করার লালসায়। বর্তমান উজবেকিস্তানের বেশকিছু ছোট-বড় রাজ্য দখলে নিয়ে তারা তখন মধ্য এশিয়ায় মুসলমানদের কেন্দ্রীয় শহর কাবুলে হুমকি-ধমকি দিতে শুরু করে।

কিন্তু শুরুর দিকে আব্বাসীয় খিলাফতের বিজয়নেশা উমাইয়াদের চেয়েও তীক্ষ্ণ ছিল। আর এ কারণেই ক্ষমতায় বসেই আব্বাসিরা মধ্য এশিয়ার দিকে মনোনিবেশ করেন। এ অঞ্চলে মুসলিমশাসিত রাজ্যগুলোর সীমান্ত রক্ষার তাগিদে ১৩৩ হিজরি সনে খলিফা আবুল আব্বাস সাফফাহ খোরাসানের শাসক আবু মুসলিম বরাবর একটি চিঠি লিখেন। বলেন, মধ্য এশিয়ার তুর্কিস্তানে মুসলমানদের মর্যাদা অটুট রাখতে সেনা অভিযান পরিচালনা করা দরকার। আবু মুসলিম খলিফার নির্দেশে নিজের বাহিনী নিয়ে মার্ভ নামক স্থানে গিয়ে অবস্থান নেন। সেখানে তাখারিস্তান (বর্তমান আফগানিস্তানের অন্তর্ভুক্ত) থেকে বড় অংকের সেনাসাহায্য আবু মুসলিমের বাহিনীতে এসে যোগ হয়। তিনি সকলকে নিয়ে এগিয়ে যান সমরকন্দের দিকে।

এবারও ফারগানা উপত্যকা ছিল আরব ও চিন, দুই পরাশক্তির দ্বন্দ্বের অন্যতম

ক্ষেত্র। ছোট্ট রাজ্য ফারগানা ও তাসখন্দের[১] মধ্যকার দ্বন্দ্বই মূলত দুই পরাশক্তিকে যুদ্ধের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। ফারগানার আমিরের আমন্ত্রণে গাও শিয়ানশির সৈন্যরা তাসখন্দ দখল করে নিলে অনন্যোপায় তাসখন্দের আমির স্থানীয় আরবদের সাহায্য চেয়ে বসে। তাসখন্দের আমিরের আহ্বানে সাড়া দিয়ে কুফার সাবেক গভর্নর মুসলিম সেনাপতি যিয়াদ ইবনে সালিহ তাঁর সৈন্যদের নিয়ে সমরকন্দের দিকে অগ্রসর হন। সেখানে খলিফা প্রেরিত খোরাসানের আমির আবু মুসলিমের বাহিনীর সাথে তার সাক্ষাৎ হয় এবং দুজনের সেনাদল এক বাহিনীতে পরিণত হয়।

এদিকে মুসলিম বাহিনীর আগমনের খবর জেনে চিনারা সেনা জমায়েত শুরু করে। যুদ্ধে কোন পক্ষে সৈন্য সংখ্যা কত ছিল, এ নিয়ে দু'দলের পরস্পরবিরোধী দাবি লক্ষ করা যায়। চিনাদের ভাষ্যমতে, আব্বাসি সেনাদল এবং তাদের মিত্রদের নিয়ে গঠিত বাহিনীর সংখ্যা ছিল দুই লক্ষাধিক। এদিকে ট্যাং ও তাদের মিত্রদের দ্বারা গঠিত গাও শিয়ানশির নেতৃত্বাধীন চৈনিক বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা সম্পর্কে আব্বাসীয়দের দাবি হলো, তারা ছিল এক লক্ষের কাছাকাছি। তবে নিরপেক্ষ বিচার বিশ্লেষণ এবং আধুনিক গবেষণা থেকে জানা যায়, উভয় পক্ষেরই সৈন্যসংখ্যা ছিল মোটামুটি ২৫-৩০ হাজারের মতো; অর্থাৎ দুই পক্ষের শক্তিমত্তা অনেকটাই সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল।

যুদ্ধের কথা

অনিবার্য সংঘর্ষের আগে পূর্ব ও পশ্চিমের দুই পরাশক্তি এবং তাদের মিত্রদের নিয়ে গঠিত সেনাদল মিলিত হলো তালাস নদীর পাড়ে। তালাস নদী কিরগিজস্তান এবং কাজাখস্তানের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। 'তালাস নদীর যুদ্ধ' যে তালাস নদীর পাড়ে বা এর আশেপাশে সংঘটিত হয়েছিল, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই ঐতিহাসিক স্থানটি ঠিক কোথায় অবস্থিত, তা আজও চিহ্নিত করা যায়নি। তবে ধারণা করা হয়, খুব সম্ভবত জায়গাটি কিরগিজস্তান এবং কাজাখস্তান সীমান্তের কাছে কোথাও।

প্রথম পাঁচদিন উভয় পক্ষের লড়াই চলেছে সমানে সমানে। বলতে গেলে ট্যাং সেনাবাহিনীই কিছুটা সুবিধাজনক অবস্থায় আছে বলে বোধ হচ্ছিল। আমাদের মনে রাখতে হবে, খিলাফতের প্রাণকেন্দ্রগুলো থেকে মধ্য এশিয়ার বিশাল দূরত্ব এবং এসব অঞ্চলের অধিকাংশ মানুষ অনারব ও অমুসলিম হওয়ায় আব্বাসীয় বাহিনী

[১] উজবেকিস্তানের বর্তমান রাজধানীর নাম তাসখন্দ।

পশ্চিমদিকের ফ্রন্টগুলোতে যতটুকু শক্তিশালী ছিল, মধ্য এশিয়া ফ্রন্টে ততটা শক্তিশালী ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করতে পারেনি। এতদসত্ত্বেও কারলুক তুর্কদের[১] এক রহস্যজনক ভূমিকায় ষষ্ঠ দিনে যুদ্ধের ফলাফল আব্বাসীয়দের পক্ষে এসে যায়। পরাজয় ঘটে ট্যাং সেনাবাহিনীর। চৈনিক সূত্রগুলোর দাবি, কারলুক তুর্করা যুদ্ধের মাঝখানে আচমকা বিশ্বাসঘাতকতা করে আব্বাসীয়দের পক্ষাবলম্বন করায় তাদের পরাজয় বরণ করতে হয়েছে। এদিকে আব্বাসীয়দের দাবি, কারলুক তুর্করা যুদ্ধের আগেই তাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ ছিল এবং তারা দূর থেকে ময়দানের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছিল। পরে সুযোগ বুঝে তারা যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হয়।

কারলুকদের দ্বন্দ্বময় ভূমিকা: ইতিহাস কী বলে?

কারলুকদের ভূমিকা নিয়ে দুই পক্ষের এমন পরস্পরবিরোধী দাবি থেকে সত্যটা নিরূপণ করা বেশ কঠিন। তবে চৈনিকদের দাবি যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে কারলুক তুর্করা তাদের সাথেই আব্বাসীয়দের বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধ করছিল। হঠাৎ করে এতগুলো সৈন্যের পক্ষ পরিবর্তন করার কাহিনি শুনতে বেশ অবিশ্বাস্য লাগে। তার চেয়ে বরং দুই পক্ষের দাবি থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি—কারলুক তুর্করা প্রথম পাঁচদিন যুদ্ধ না করে দূরে ছাউনি ফেলে অবস্থান করছিল। পূর্বের মিত্রতা থেকে ট্যাং সেনাবাহিনী মনে করেছিল, এবারও বুঝি কারলুকদের সমর্থন পাওয়া যাবে। কিন্তু ভেতরে ভেতরে যে কারলুক ও আব্বাসীয় বাহিনীর চুক্তি হয়ে গেছে, সেই কথা তারা ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি। তাই কারলুকদের এই আচমকা আক্রমণ ট্যাংদের দৃষ্টিকোণ থেকে অনেকটা বিশ্বাসঘাতকতারই শামিল ছিল। এছাড়া এই তত্ত্ব মেনে নিলে আব্বাসীয়দের সাথে যে কারলুকরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল, সেটাও সত্য বলে প্রতীয়মান হয়।

সে যা-ই হোক, যুদ্ধের একপর্যায়ে মুসলিম বাহিনী তাদের মিত্রদের সঙ্গে নিয়ে চৈনিক সেনাদেরকে চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলে। পূর্বেই মুসলিম সেনারা ময়দানের চারপাশে পরিখা খনন করে রেখেছিল; চৈনিক সেনারা অবরোধ থেকে পালানোর চেষ্টা করলে অনেকেই এসব পরিখায় পড়ে প্রাণ হারায়। সেনাপতি গাও শিয়ানশি

[১] মধ্য এশিয়ার আলতাই পর্বতমালার পশ্চিমে তারবাগাতাই পাহাড়ের পাদদেশে বাস করা এক যাযাবর তুর্কি উপজাতির নাম কারলুক। স্থানীয়দের কাছে এরা গেলোলু নামেও পরিচিত। উইঘুর গোষ্ঠীর সাথে এদের জাতিগত নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান।

পরাজয় অনুভব করতে পেরে ময়দান ছেড়ে পলায়ন করে এবং তালাস নদীর এ যুদ্ধে চিনাদের শোচনীয় পরাজয় ঘটে। মুসলিম সেনাপতি যিয়াদ ইবনু সালিহ ২০ হাজারের মতো চৈনিক সেনা বন্দি করে বাগদাদে পাঠিয়ে দেয়, সেখানে দাস-বিক্রি-বাজারে তাদেরকে গোলাম হিসেবে বেচে দেয়া হয়।

তালাস নদীর এ-যুদ্ধে চৈনিকদের কেন পরাজয় হয়েছিল সেই বিশ্লেষণের চেয়ে এই পরাজয়ের সুদূরপ্রসাবী ভূমিকা কী ছিল— ঐতিহাসিকভাবে সেটাই অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

যুদ্ধের পর

এই যুদ্ধে আব্বাসীয়দের একতরফা বিজয় অর্জিত হলেও সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করলে বলতে হয়, প্রাথমিকভাবে এই যুদ্ধ থেকে কোনো পক্ষই আসলে তেমন সুবিধা নিতে পারেনি। কারণ আব্বাসীয়রা এই বিজয়কে পুঁজি করে সামনের দিকে অর্থাৎ চিনের মূল ভূখণ্ডে অগ্রসর হতে পারত। কিন্তু বিভিন্ন কারণে সেটা সম্ভব হয়নি। সে-সব কারণের অন্যতম ছিল— দূরত্ব। এত লম্বা দূরত্বে যোগাযোগ রক্ষা করা যেকোনো সেনাবাহিনীর পক্ষে প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। এছাড়া প্রতিশোধের নেশায় মত্ত ট্যাং রাজবংশও পরবর্তীতে আব্বাসীয়দের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক কোনো ব্যবস্থা নিতে পারেনি। ৭৫৫ খ্রিস্টাব্দের শেষদিকে শুরু হওয়া বিদ্রোহের ভয়াবহ দাবানলে উল্টো ট্যাং সাম্রাজ্যই অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে। ট্যাং রাজবংশের মসনদ কাঁপিয়ে দেওয়া এই বিদ্রোহ ইতিহাসে লুশান বিদ্রোহ নামে পরিচিত। লুশান বিদ্রোহ স্থায়ী হয়েছিল প্রায় ৭ বছর। আব্বাসীয়রা তালাসের যুদ্ধ জয়ের পর থেকেই এতদাঞ্চলে ট্যাংদের গতিবিধি লক্ষ রাখছিল। বিদ্রোহে প্রায় ঢলে পড়া এই সময়ে সুযোগ বুঝে কৌশলে তারা ট্যাং রাজবংশের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। মুসলমানদের এই সাহায্যে দুই পরাশক্তির বৈরিতার অবসান হয় এবং এতদাঞ্চলের পুরোটায় ধীরে ধীরে ইসলামের রঙ ছড়িয়ে পড়ে। ট্যাংরা দলে দলে মুসলিম হতে শুরু করলে মধ্য এশিয়ায় দিকে দিকে ইসলামি সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রসার ঘটতে থাকে। পরবর্তীতে এই ভূমিতে জন্ম নেয় ইসলামের বিভিন্ন শাস্ত্রের জগদ্বিখ্যাত ইমামগণ; বিশেষত হাদিসশাস্ত্রের প্রথমসারির কিতাব সহিহ বুখারি ও জামে আত-তিরমিযির সংকলক ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনু ইসমাইল বুখারি এবং ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরি।

যেভাবে দুনিয়া জেনে গেল কাগজের অজানা রহস্য

এদিকে তালাস নদীর যুদ্ধে বহু সংখ্যক চিনা সৈন্য যুদ্ধবন্দি ও নিহত হয়। বিশাল ট্যাং সেনাবাহিনীর সেনাপতি গাও শিয়ানশি অল্প কিছু সৈন্যসহ প্রাণ নিয়ে পালাতে সক্ষম হন। এই যুদ্ধবন্দি চিনাদের মধ্যে অনেকে ছিলেন কাগজ তৈরির দক্ষ কারিগর এবং প্রকৌশলী। তাদের মাধ্যমেই কাগজের প্রযুক্তি আরবদের হস্তগত হয়। সেই খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে সাই লুন কাগজ আবিষ্কার করার পর দীর্ঘ আটশ বছর এই কৌশল কেবল চিনা, কোরীয় ও জাপানিদেরই জ্ঞানায়ত্ত ছিল।

কিন্তু তালাস নদীর যুদ্ধের পর কাগজ তৈরির প্রযুক্তি প্রথমবারের মতো পূর্ব এশিয়ার বাইরে ছড়িয়ে পড়ে। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সমরকন্দে স্থাপিত হয় কাগজের কল এবং ক্রমান্বয়ে বাগদাদসহ আব্বাসীয় খিলাফতের গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোতে এই শিল্পের অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটে। ইউরোপের প্রথম কাগজকল স্থাপিত হয়েছিল স্পেনের ভ্যালেন্সিয়ায়, ১০৫৬ সালে। অবশ্যি সেটাও আরব বণিকদেরই প্রভাবে; কেননা সে সময়ে আইবেরীয় উপদ্বীপ অর্থাৎ স্পেন-পর্তুগালের বিশাল অংশ মুসলিম-আরবদের করতলগত ছিল।

তালাস নদীর যুদ্ধের সুদূরপ্রসারী প্রভাব

শুধু কাগজের প্রযুক্তি স্থানান্তরের জন্যে নয়, তালাস নদীর যুদ্ধ বহুমাত্রিক কারণে ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে আছে। প্রথমত, মধ্য এশিয়ার পরবর্তী চার শতাব্দীর ভূ-রাজনীতি বদলে দিয়েছিল এই একটি যুদ্ধ। সাথে সাথে দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব বিস্তার করেছিল এতদাঞ্চলের ধর্ম, সংস্কৃতি ও অর্থনীতিতে। কারণ তালাস নদীর যুদ্ধ অনেকটা অলিখিতভাবে নির্ধারণ করে দিয়েছিল মধ্যে এশিয়ার কতটুকু অংশ আব্বাসীয় খেলাফতের নিয়ন্ত্রণে থাকবে আর কতটুকু থাকবে ট্যাং রাজবংশের হাতে। অর্থাৎ সে সময়ের দুই পরাশক্তির স্থানগত সীমানা নির্ধারিত হয়েছিল নদীপাড়ের এই যুদ্ধে।

তালাস নদীর যুদ্ধে বিজয়ের পর সিল্করুটের একটা বড় অংশ আব্বাসীয়দের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে, যা তাদের জন্য অর্থনৈতিকভাবে অত্যন্ত লাভজনক ছিল। এছাড়া মধ্য এশিয়ার তুর্কি গোত্রগুলো এ সময় মুসলিমদের সান্নিধ্যে আসে এবং পরবর্তী তিন শতাব্দীতে ক্রমান্বয়ে এদের অধিকাংশই ইসলাম গ্রহণ করে। এদিকে

তালাস নদীর যুদ্ধের পর তিব্বত ও চিনের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ প্রায় বন্ধ হয়ে আসে। এ কারণে পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে তিব্বত এবং চিনের বৌদ্ধ ধর্ম ভিন্ন দিকে বিবর্তিত হয়েছিল, যার ফলশ্রুতিতে বৌদ্ধ ধর্মের চিনা সংস্করণ এবং তিব্বতীয় সংস্করণে মৌলিকভাবে এত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।[১]

---

[১] বৌদ্ধ ধর্ম গৌতম বুদ্ধ কর্তৃক প্রচারিত একটি ধর্ম বিশ্বাস। এই ধর্ম আপাত অর্থে জীবন দর্শন। অনুসারীদের সংখ্যায় বৌদ্ধধর্ম বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম ধর্ম বলে মনে হয়। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে গৌতম বুদ্ধের জন্ম। বুদ্ধের পরিনির্বাণের পরে ভারতীয় উপমহাদেশসহ এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার হয়। বর্তমানে বৌদ্ধ ধর্ম দুটি প্রধান মতবাদে বিভক্ত। প্রধান অংশটি হচ্ছে হীনযান বা থেরবাদ। দ্বিতীয়টি মহাযান নামে পরিচিত। বজ্রযান বা তান্ত্রিক মতবাদটি মহাযানের একটি অংশ। শ্রীলংকা, ভারত, ভুটান, নেপাল, লাওস, কম্বোডিয়া, মায়ানমার, চিন, জাপান, মঙ্গোলিয়া, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, ও কোরিয়াসহ পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনেক দেশে এই ধর্মবিশ্বাসের অনুসারী রয়েছে। সবচেয়ে বেশি বৌদ্ধধর্মাবলম্বী বাস করেন চিনে। বাংলাদেশের উপজাতীদের বৃহত্তর অংশ বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত।

মূলত চিন ও তিব্বতের বৌদ্ধধর্মের পার্থক্য একটি ঐতিহাসিক বিবর্তন। পুরো বিষয়টি নানামাত্রিক উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে যাওয়ায় লম্বা আলোচনা ব্যতীত এই পার্থক্যসূচির সমাধা করা সম্ভব নয়। এখানে সে আলোচনা আনার সুযোগ নেই, তাই অল্পকথায় সেরে যাচ্ছি।

গৌতম বুদ্ধের জন্ম খ্রিস্টপূর্ব ৫৬৩ অব্দে। কথিত আছে, ৩৫ বছর বয়সে তিনি গৃহত্যাগী অবস্থায় দীর্ঘদিন সাধনার পর এক আশ্চর্য বোধিজ্ঞান লাভ করেন এবং পরবর্তী ৪৫ বছর তিনি ভারতের বিভিন্ন জায়গায় সেটা প্রচার করেন। হিমালয়ের কোলে অবস্থিত বিশেষ কিছু অঞ্চলে এই মতবাদটি অধিক চর্চিত হয়ে একসময় এক স্বতন্ত্র ধর্মের রূপ পরিগ্রহ করে। ফলে বুদ্ধের এই বৌদ্ধধর্ম মূলত তিব্বত, ভুটান, ভারতের সিকিম, লাদাখ উপত্যকায় নিজস্বতা লাভ করে।

চিন ও ভারত এই দুই দেশের বিশাল সীমান্ত জুড়ে আছে হিমালয় পর্বতমালা। তিব্বত থেকে নেমে এসেছে খরস্রোতা ইয়ালুজাংপো, ভারতে তার নাম ব্রহ্মপুত্র। খুব একটা নাব্য নয় পার্বত্য এই নদ। চিন ও ভারতের মধ্যকার সম্পর্ক দু'হাজার বছরেরও বেশি পুরনো হলেও দু'দেশের মধ্যে যাতায়াতের পথ কিন্তু কোনো সময়ই সুগম ছিল না। তুষারাবৃত গিরিপর্বত, শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্য, জনমানবহীন মরুভূমির মধ্য দিয়ে বিপদকে হাতে নিয়ে যাত্রীদল সিল্করুট ধরে যাতায়াত করতেন। খ্রিস্টপূর্ব ২০৬ বছরে জুয়ান জ্যাং নামক এক বৌদ্ধভিক্ষু এই পথেই ধর্মীয় বোধের পূর্ণতা লাভের জন্য তিব্বতে আসেন। এরপর চিনের তৎকালীন সম্রাট মিং, ভিক্ষু কুমারজিব এবং বৌদ্ধ সন্যাসী ফা-সিয়ান ধর্মীয় দীক্ষার জন্য এই বিপদসংকুল পথ পেরিয়ে ভারতে আসেন। তাদের মাধ্যমেই চিনে বৌদ্ধধর্ম পরিপূর্ণরূপে প্রবেশ করে। পরবর্তীতে অধিক চর্চা এবং জনসংখ্যার আধিক্যের দরুণ তিব্বতের চেয়ে চিনেই ধর্মটি ব্যাপকতা লাভ করে বেশি।

তবে বর্তমান চিনের ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ যাচাই করলে দেখা যায়, শানধর্ম-থাওধর্মই বর্তমানে তাদের বৃহত্তম ধর্ম। চিনের ২০-৩০% লোক এই ধর্মগুলি পালন করেন। এদের মধ্যে প্রায় ১৬ কোটি লোক, অর্থাৎ চিনের মোট জনসংখ্যার প্রায় ১১% মাৎসু নামের দেবীর পূজা করে। বৌদ্ধধর্ম এখন চিনের ২য় বৃহত্তম ধর্ম (১৮-২০% লোক)। তাছাড়া দেশের ৩-৪% লোক খ্রিস্টান এবং ১-২% মুসলমান।

ইতিহাসে পাতায় তালাসের যুদ্ধ

কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, তৎকালীন মুসলিম ঐতিহাসিকদের কলমে ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই যুদ্ধের তেমন কোনো বিবরণ পাওয়া যায় না। এমনকি জগৎবিখ্যাত ঐতিহাসিক এবং তাফসিরকারক ইবনু জারির তাবারি রহ. (৮৩৯-৯২৩) তাঁর ইতিহাসগ্রন্থ তারিখে তাবারিতে তালাস নদীর এ যুদ্ধের কথা উল্লেখ করেননি। তবে এই যুদ্ধের প্রায় অর্ধ সহস্রাব্দ পর ইবনে আসির রহ. (১১৬০-১২৩৩) এবং ইমাম যাহাবি রহি. (১২৭৪-১৩৪৮)-এর কিতাবে এই যুদ্ধের উল্লেখ পাওয়া যায়। সে যা-ই হোক, সে-সময়ের ভূ-রাজনীতির বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, তালাস নদীর এ যুদ্ধ সময়ের পটবদলে অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রেখেছিল, যা কোনো অংশেই টুরসের যুদ্ধ কিংবা আইন জালুতের যুদ্ধের চেয়ে কম নয়। কিন্তু বিস্ময়করভাবে, এই যুদ্ধটি সাধারণ মানুষ তো বটেই, ইতিহাসের অনেক উৎসুক পাঠকদের কাছেও বেশ অপরিচিত।

তবে মৌলিকভাবে চিন ও তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্মে সময়ের পালাবদলে যে ব্যতিক্রমগুলো দেখা যায়, তা বেশ আলোচনাসাপেক্ষ। অল্পকথায় কিছু এখানে তুলে ধরছি:

- চৈনিকরা গৌতম বুদ্ধের জীবন, দর্শন এবং শিক্ষাকে পুরোপরি আঁকড়ে আছে এখনও; কিন্তু তিব্বতীয়রা অনেকাংশেই সেটা থেকে সরে এসেছে। অনেকে মনে করেন, এটা তাদের রাজ্যে প্রচলিত জৈন ধর্মের প্রভাবেই ঘটেছে।
- তিব্বতীয়দের বিশ্বাসমতে, সবকিছুতেই আত্মা আছে। এমনকি পাথরে, পানিতে, খাদ্যদ্রব্যসহ সকল বস্তুর ভেতরেই আত্মা প্রবিষ্ট আছে। তবে চিনারা এমনকিছু মনে করে না। তিব্বতীয়দের ভাষ্যমতে, চিনে নাস্তিক্য মতবাদের প্রভাবে ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেও নাকি পরবির্তন এসে গেছে।
- চিনে প্রাণিহত্যা ধর্মীয়ভাবে নিষিদ্ধ হলেও অনন্যোপায় ব্যক্তির জন্য খাদ্য হিসেবে প্রাণিহত্যা বৈধ। পক্ষান্তরে তিব্বতীয়দের বিশ্বাসমতে, মরে গেলেও কোনো প্রাণীকে সামান্য আঘাত দেয়াও বৈধ নয়।
- হিন্দুধর্মের প্রভাবে তিব্বতীয় বৌদ্ধরা ভাবে, মানুষের মৃত্যুর পর তার আত্মা জীবিত ঘোরাফেরা করে। কিন্তু চিনের বৌদ্ধ এমন কোনো বিশ্বাসকে পাত্তা দেয় না। তাদের মতে, মৃত্যুর পর ব্যক্তির আর কিছুই বাকি থাকে না। সব মাটির সাথে মিশে যায়।

সূত্র :

http://www.chinatoday.com.cn/ctenglish/se/txt/2009-06/19/content_203310.htm

Bell, Charles: Tibet Past & Present. Reprint, New Delhi, 1990 (originally published in Oxford, 1924)

আম্মুরিয়ার যুদ্ধ

SACK OF AMORIUM

২২৩ হিজরি মোতাবেক ৮৩৮ খ্রিস্টাব্দ সনে সংঘটিত 'আম্মুরিয়ার যুদ্ধ' ঐতিহাসিকদের মতে মধ্য এশিয়ায় আব্বাসি খেলাফতের অন্যতম প্রধান বিজয় ছিল। আম্মুরিয়া তুরস্কের ফ্রিজিয়া অঞ্চলে অবস্থিত একটি শহরের নাম, যা বর্তমানে আমোরিয়াম নামে পরিচিত। তৎকালীন ভূগোলমতে, শহরটি মধ্য এশিয়ার বেশ ভেতরে সুরক্ষিত স্থানে অবস্থিত ছিল। ইবনু জারির তাবারি বলেন, 'আম্মুরিয়া শহরটিকে সে-সময় রোমান সাম্রাজ্যের অন্যতম প্রধান নগরী বলে ধরা হতো।'

কেন যুদ্ধের পথে হাঁটা

খলিফা মামুন শুয়ে আছেন মৃত্যুশয্যায়। হাতের ইশারায় তিনি ভাই মুতাসিম বিল্লাহকে[১] ডাকলেন। শেষ ওসিয়ত হিসেবে বলে গেলেন, 'যে-কোনো মূল্যে তুমি বাবাক খুররামির লাগাম টেনে ধরবে; তার ফিতনার অবসান ঘটাবে—কথা দাও।' খলিফা মুতাসিম মুমূর্ষু ভাইকে কথা দিলেন। কে এই বাবাক খুররামি? কেন মৃত্যুবর্তী কালে এসেও খলিফা মামুন তাকে মেরে ফেলার ওসিয়ত করছেন?

মাদায়েনের এক সাধারণ তেলবিক্রেতার ঘরে ১৮২ হিজরিতে বাবাকের জন্ম। তার জন্মের কিছুদিন পরই তার বাবা বাবা মারা যায়। পিতৃহীন বাবাক কিছুদিন তাবরিয ও অন্যান্য শহরে আমিরদের গৃহে কাজ করে। সেই সূত্রে একসময় সে আজারবাইজানের ক্ষুদ্র একটি অঞ্চলের শাসক জাভেদানের গৃহে কর্মচারী হিসেবে কাজ শুরু করে।

[১] মুতাসিম বিল্লাহ ছিলেন ৮ম আব্বাসি খলিফা। ৮৩৩ সাল থেকে ৮৪২ সালে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি শাসনকার্য পরিচালনা করেন। খলিফা মামুনের মতো তিনিও ছিলেন মুতাযিলা মতবাদের অনুসারী। নিজের মতবাদ টিকিয়ে রাখার জন্য ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বালসহ আহলুস সুন্নাহর অন্যান্য আলেমদের উপর তিনি প্রচণ্ড নির্যাতন চালান।

জাভেদান ছিল খুররামিয়্যাহ ফিরকার একজন গুরু। তারা বিশ্বাস করত, পৃথিবীতে দুজন সৃষ্টিকর্তা আছেন। একজন ভালো বিষয়ের দেখভাল করেন, অন্যজন মন্দের। এরা সকল নারীকে নিজের জন্য বৈধ মনে করত। জাভেদান ধীরেধীরে বাবাককে তার একান্ত শিষ্য হিসেবে গড়ে তোলে। বাবাক অগ্নিপূজকদের ধর্মে দীক্ষিত হয়। গুজব আছে, জাভেদানের স্ত্রীর সাথে বাবাকের প্রেমের সম্পর্ক শুরু হয় এবং দুজন মিলে জাভেদানকে বিষপানে হত্যা করে। বাস্তবতা যাই হোক, জাভেদানের আকস্মিক মৃত্যুর ফলে তার শাসিত বিশাল এলাকা ও জনবল বাবাকের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।

২০১ হিজরিতে সে আজারবাইজানের বাদিন পাহাড়ে নিজের ঘাঁটি মজবুত করে। এরপর আশপাশের বিভিন্ন দুর্গ দখল করতে থাকে। একই সময়ে হাতের কাছে পাওয়া মুসলমানদের উপর নির্মম নির্যাতন চালাতে থাকে। একসময় সে আব্বাসি খিলাফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। আজারবাইজানে খুব দ্রুত ফুঁসে উঠতে থাকে বাবাক; পাশাপাশি তার ভ্রান্ত চিন্তা ছড়িয়ে পড়ে হামদান, আসফাহান, জুরজানসহ কুর্দিদের বিভিন্ন শহরগুলোতে। খলিফা মামুন তাকে নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েন। নানাভাবে তাকে থামানোর চেষ্টা করেও তিনি ব্যর্থ হন। তাকে দমনের দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেন বেশকিছু শক্তিশালী সেনা টিম, কিন্তু তারা খলিফাকে কোনো সাফল্যের মুখ দেখাতে পারেনি। ২০৪ হিজরিতে খলিফা মামুনুর রশিদ আরমেনিয়া ও আজারবাইজানের শাসক ঈসা বিন মুহাম্মদকে পাঠান বাবাককে দমন করতে। ঈসার উপর আদেশ ছিল বাবাককে হত্যা করে তার কর্তিত মস্তক বাগদাদে পাঠাতে হবে। ঈসা এই অভিযানে পরাজিত হন। বাধ্য হয়ে ২০৯ হিজরিতে খলিফা মামুন তার বিশ্বস্ত সেনাপতি যারিককে আজারবাইজান প্রেরণ করেন।

যারিক তার সঙ্গী আহমাদ বিন জুনাইদকে নিয়ে বাবাকের বিরুদ্ধে অভিযানে নামেন। এক যুদ্ধে আহমাদ বিন জুনাইদ বন্দি হন। বাবাক তাকে হত্যা করে ফেলে। এই সংবাদে খলিফা মামুন ক্রোধান্বিত হন। তিনি যারিককে অপসারণ করে ইবরাহিম বিন লাইসকে পাঠান। কিছুদিন পর পাঠান মুহাম্মদ বিন হামিদ তুসিকে। ২১২ হিজরিতে মুহাম্মদ বিন হামিদ তুসির তীব্র আক্রমণে বাবাক পিছু হটতে বাধ্য হয়। সে পাহাড়ের আরও ভেতরের দিকে চলে যায়। মুহাম্মদ বিন হামিদ তুসি তাকে ধাওয়া করে পর্বতমালার ভেতরের দিকে চলে যান। ইতিমধ্যে পাহাড়ে লুকিয়ে থাকা বাবাকের সেনারা তীব্র আক্রমণ চালালে মুসলিম বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। মুহাম্মদ বিন হামিদ তুসি নিহত হন।

এই সংবাদে খলিফা মামুন প্রচণ্ড ব্যথিত হন। তিনি বাবাকের উপর চূড়ান্ত আক্রমণের পরিকল্পনা করছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে রাজত্বের নানা ঝামেলায় ব্যস্ত হয়ে যাওয়ায় তিনি অভিযান মুলতবি রাখতে বাধ্য হন। পরবর্তী ৬ বছর মামুন আর কোনো অভিযান প্রেরণ করতে পারেননি। এই সুযোগে বাবাক নিজের রাজত্ব আরও বড় করে নেয়। শেষপর্যন্ত বাবাকের ফায়সালার ভার ভাই মুতাসিমের উপর ছেড়েই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন খলিফা মামুন।

বাইজান্টাইনরা লুফে নেয় সাম্রাজ্য দখলের সুযোগ

বেশকিছু বছর কেটে যায় এভাবে। বাবাককে দমানো যেন আব্বাসি খেলাফতের সাধ্যবহির্ভূত কাজ হয়ে দাঁড়ায়। ধারাবাহিক কয়েক বছর সে খেলাফতের বিরুদ্ধে প্রপাগান্ডা চালায়, সাম্রাজ্যের ভিত নাড়িয়ে দেয়; হত্যা করে ফেলে বিখ্যাত সেনাপতি ও প্রসিদ্ধ বীরদের। খলিফা মুতাসিমের জন্য সে হয়ে ওঠে প্রধান প্রতিপক্ষ। ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকেই তিনি এই দুষ্কর্মা লোকের পেছনে পড়ে থাকেন, কিন্তু কিছুতেই সে হাতে এসে ধরা দেয় না।

আব্বাসি খেলাফতের প্রধান ব্যক্তিকে নিজেদের একজন বিদ্রোহী দমনে ব্যস্ত দেখে খেলাফতের সীমান্তে চোখ পড়ে বাইজান্টাইনের। মুসলিম সাম্রাজ্যের সীমানায় তারা পা বাড়ানোর সাহস পেয়ে যায়। বিভিন্ন ফন্দি-ফিকির করে বিশাল সেনা জমায়েতের সিদ্ধান্ত নেয়। দৃষ্টিসীমা-সমান বাহিনী এক করে তার নেতৃত্ব হাতে তুলে নেয় সাম্রাজ্যের সম্রাট নিজেই। তাদের টার্গেট শাম এবং জাযিরাতুল আরব।

বাবাকের এলাকায় অবরোধ পড়েছে। ধীরে ধীরে গলার ফাঁস শক্ত হয়ে আসছে তার। সে বিশ্বাস করে নিল, খলিফার তির এবার আর লক্ষ্যচ্যুত হবে না। তার কুটিল মস্তিষ্কে খেলা করল নতুন কিছু। শহরের পায়রাগুলোর পায়ে সে একটি চিঠি বেঁধে দিল, গন্তব্য বাইজান্টাইন। সম্রাট থিওফেলকে বলল, 'আব্বাসি সাম্রাজ্যের সীমান্তে কামড় বসাও। খেলাফতের সেনাদের আমি আটকে রেখেছি আমার দুয়ারে। তোমাদের জন্য আমি নিবেদিতপ্রা।' এ-জাতীয় বিভিন্ন উৎসাহবাক্য লিখে সে বাইজান্টাইনের লোভ বাড়াতে চাইল। কিন্তু এসবের পেছনে তার উদ্দেশ্য ছিল নিজেকে বাঁচানো। সে মনে করছিল, পেছনে তাড়া পড়লে খেলাফতের সেনারা তার কপাট ছেড়ে চলে যাবে। ঢিলে হয়ে যাবে অবরোধের রশি। তাই সে থিওফেলকে বলল, 'খলিফার শহরে তোমাদের প্রতিরোধ করার মতো পর্যাপ্ত সেনা নেই।

পেছনে আমি ও আমার অনুসারীরা তোমাদের সহযোগী হিসেবে থাকব।'

বাবাকের পায়রা বাইজান্টাইনে পৌঁছলে আব্বাসি সাম্রাজ্যকে ছিঁড়েখুঁড়ে খাবার নেশা তাদেরকে মাতাল করে তোলে। সম্রাট থিওফেল চিন্তা করে, প্রথমে খুররামিয়াদের সাথে যোগাযোগব্যবস্থা নির্ঝঞ্ঝাট করতে হবে। সে জন্য তারা ফোরাতের তীরে বেড়ে ওঠা জনপদগুলো জ্বালিয়ে সাফ করে দেয়, যাতে আর্মেনিয়া এবং আজারবাইজানে খুররামিয়া মতবাদের লোকদের সাথে যোগাযোগ সহজ হয়। এরপর যাত্রা করে জিবাত্রা নামক এলাকায়। সেখানে খলিফার মুহতারামা আম্মার শিরশ্ছেদ করে দেয় তারা। এগিয়ে যায় সুমাইসাত এবং মালিতার দিকে। শহরদুটি দখল করে বসতিগুলোয় আগুন ধরিয়ে দেয়। মুসলিম যুবকদের ধরে জবাই করে তাদের শরীর ভয়ানকভাবে বিকৃত করে ফেলে। চোখ ফুঁড়ে দেয়, কান কেটে দেয় এবং নাক তুলে নেয় ধারালো অস্ত্র দিয়ে। সহস্রাধিক মুসলিম মা-বোনদের বন্দি করে নিয়ে যায় সাথে। এই বন্দি মুসলিমাদের এক হাশেমি বোনই চিৎকার করে উচ্চারণ করেছিল সেই ঐতিহাসিক বাক্য, 'ওয়া মুতাসিমাহ্!' (হে মুতাসিম, রক্ষা করো মোদের!)

মুসলিম জনপদগুলোতে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে রোমান বাহিনী খিলখিলিয়ে ফিরে চলে বাইজান্টাইনের দিকে। তাদের চোখেমুখে আনন্দের জ্যোতি; যে তিয়াস মিটেছে আজ, যে সম্পদ লব্ধ হয়েছে হাতে—তাতে তাদের খুশির যেন অন্ত নেই কোনো। বাহিনীর শহরে যাবার আগেই তাদের কুকীর্তির খবর ছড়িয়ে পড়েছে সবখানে। শহরবাসী ঢালে নেমে এসে সম্রাট ও সেনাদের বরণ করে নেয় ফুলেল আমন্ত্রণে।

মুতাসিমের অবস্থানঃ যুদ্ধের প্রস্তুতি

রোমানদের এই নৃসংশতার খবর পৌঁছে গেল খলিফা মুতাসিমের কানে। বাবাক খুররামির গলায় তিনি দড়ি পরিয়ে ফেলেছেন প্রায়, এমন সময় বাইজান্টাইন সেনাদের নৃশংসতা থেকে পালিয়ে বাঁচা কিছু লোক এসে তাকে জানাল—কী ঘটেছে সুমাইসাতে, মালিতায় এবং অন্যান্য শহরে। একই সঙ্গে তাঁকে সেই হাশেমি নারীর চিৎকার করে বলা বাক্যটি শোনাল। ইবনু খালদুন লিখেছেন, 'এই কথা শুনে মুতাসিম 'লাব্বাইক লাব্বাইক' বলে সিংহাসন থেকে দাঁড়িয়ে যান। রাগে তার চোখ লাল হয়ে আসে। যুদ্ধের শিরস্ত্রাণ চেয়ে নিয়ে সেটা মাথায় বসান। সেনাদল একত্র করে অনতিবিলম্বে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেবার ঘোষণা দেন। বাইজান্টাইনের এমন সুযোগসন্ধানী আক্রমণ তিনি কেবল আব্বাসি খেলাফতের ক্ষেত্রে নয়, বরং নিজের

জন্যও রোমানদের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়া বলে মনে করেন। বীরত্বের সাথে তিনি গ্রহণ করে নেন এমন নির্মম চ্যালেঞ্জ।

প্রথমে সিদ্ধান্ত নেন জিবাত্রা শহর দখলের প্রতিশোধ নেবেন। আজিফ ইবনে আনবাসার নেতৃত্বে একদল সেনা পাঠান শহরটি পুনরুদ্ধারের জন্যে। তিনি পলাতক শহরবাসীকে নিরাপদে পৌঁছে দিয়ে শহর পুনরায় দখল করে নিতে সক্ষম হন। এরই মধ্যে খলিফা মুতাসিমের অন্যতম বীর সেনাপতি আফশিন খুররামি ফিতনা দমনে সফলতা পান। ২২২ হিজরির ১০ই শাওয়াল ইতিহাসের জঘন্য ফিতনাবাজ বাবাক খুররামির গলায় তিনি বেড়ি পরাতে সক্ষম হন।

খলিফা রাগে ফুঁসছিলেন। তিনি সভাসদদের জিজ্ঞেস করেন, 'রোমানদের সবচেয়ে সমৃদ্ধ ও সুরক্ষিত শহর কোনটি?' সবাই বলল, 'রোমানদের কাছে সবচেয়ে সম্মানিত ও সুরক্ষিত শহর আম্মুরিয়া। এই শহর তাদের কাছে কনস্টান্টিনোপলের চেয়েও সম্মানিত। ইসলামের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত মুসলমানেরা কখনো এই শহর নিজেদের আয়ত্তে নিতে পারেনি।' 'আমাদের পরবর্তী গন্তব্য আম্মুরিয়া। এই শহরকে আমরা দখল করবো'—দৃঢ় কণ্ঠে নিজের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেন খলিফা মুতাসিম বিল্লাহ। ইবনু কাসির লিখেছেন, 'খলিফা এমন বাহিনী প্রস্তুত করেন, যা ইতিপূর্বে আর কেউ করতে সক্ষম হয়নি। বাহিনীর সাথে প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র ও জিনিসপত্র নেয়া হয়। এত বেশি সরঞ্জাম নেয়া হয়, যার কথা ইতিপূর্বে কেউ শোনেওনি।'

২২৩ হিজরির জুমাদাল উলা মাসে তিনি আম্মুরিয়ার দিকে বের হন। সে-সময়ের সমরবিদদের ধারণা মতে, সময়টা যুদ্ধের জন্য অনুকূল ছিল না। বড় কোনো লড়াইয়ের জন্য কোনো বাহিনীই এই সময়টাকে বেছে নিত না। কিন্তু খলিফা মুতাসিমের চোখে তখন প্রতিশোধের আগুন। গণক ও নক্ষত্রবিদদের সময়তত্ত্ব তিনি ছুড়ে ফেললেন। তারা পরামর্শ দিয়েছিল, এ-সময় হামলা করলে আপনি ব্যর্থ হতে পারেন। কিন্তু খলিফা তাদের কোন কথাই কানে তোলেননি।

বিজয়ের রথযাত্রা

খলিফা তার বাহিনী নিয়ে প্রথমে সামাররা[১] পৌঁছেন। আনকারা শহরকে তিনি হামলার প্রথম টার্গেট বানান। বাহিনীর অগ্রভাগের সেনাপতির দায়িত্বে দেন আবু জাফর আশিনাস তুর্কিকে। আরেক তুর্কি ইতাখ খাযারিকে রাখেন ডান অংশের দায়িত্বে। জাফর ইবনু দিনারকে বাম অংশ এবং আজিফ ইবনু আনবাসাকে বাহিনীর মধ্যভাগের সেনাপতি নিযুক্ত করেন। আলাদা একটি বাহিনী দিয়ে যুদ্ধের শরিক রাখেন সেনাপতি আফশিনকেও। বাহিনীর পতাকায় এবং সেনাদের ঢালে তিনি 'আম্মুরিয়া' শব্দটি লিখে দেন। এরপর বাইজান্টাইনের ভূমিতে তিন দিক থেকে প্রবেশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আফশিনের নেতৃত্বে এক বাহিনী পাঠান পূর্ব দিক থেকে সারুজের দিকে; বলে দেন, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দারবুল হারিস হয়ে শহরে প্রবেশ করতে। আশিনাসের বাহিনীকে পশ্চিম দিকে পাঠান। নির্দেশ দেন, তাইরুস পাহাড় পার হয়ে সাফসাফ শহরের দিকে এগিয়ে গিয়ে আনকারার সমতলে পূর্ববাহিনীর সাথে যোগ হতে। বাহিনীর তৃতীয় ভাগ নিয়ে খলিফা শহরের সোজা পথ ধরে এগিয়ে যান আনকারার দিকে। খলিফার কৌশলী পরিকল্পনা ছিল বাহিনীর তিন ভাগ এক সাথে আনকারায় একত্র হয়ে শহরে আক্রমণ করবেন।

বাইজান্টাইনের তৎপরতা

ঝড়ের বেগে খবর পৌঁছে যায় বাইজান্টাইনে। সম্রাট থিওফেল যখন আনকারা ও আম্মুরিয়াকে ঘিরে খলিফার পরিকল্পনার কথা জানতে পারে, তখন সে আম্মুরিয়া থেকে তিন মাইল দূরে দরিলায়েম এলাকায় অবস্থান করছিল। সাথেসাথে সে রোমানদের সবচে সমৃদ্ধ ও পবিত্র শহর মুসলমানদের হাত থেকে রক্ষার নির্দেশ পাঠায়। সেদিকে প্রয়োজনীয় সাহায্য রওনা করিয়ে দেয়। আর যুদ্ধের পরিকল্পনা হিসেবে সে যুদ্ধ চলাকালীন আনকারার উত্তর দিক থেকে মুসলিম বাহিনীর উপর অতর্কিত হামলে পড়ার ছক আঁকে। এজন্য হালিস নদীর পাড়ে সেনা জমায়েত ঘটায় সে। পুরো বাহিনী নিয়ে নদী পার হয়ে সহসা খলিফার সামনে হাজির হওয়ার প্রস্তুতি নেয়। তার ধারণা ছিল, মুসলিম বাহিনী আনকারার পথে তখন কিলিকিয়ার গিরিপথ

[১] এটি বাগদাদ থেকে ১২৫ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত একটি শহর। ২২১ হিজরিতে খলিফা মুতাসিম বিল্লাহ এই শহর নির্মাণ করেন। তখন এর নাম ছিল সুররা মান রআ। মুতাসিম বিল্লাহ বাগদাদ থেকে রাজধানী সরিয়ে এখানে নিয়ে আসেন।

পাড়ি দিচ্ছে হয়তো। তবে সে আফশিনের বাহিনীর কথা একেবারেই জানত না।

এদিকে যাত্রাপথে খলিফা জেনে গেলেন বাইজান্টাইন বাহিনীর প্রস্তুতির কথা। তখনই তিনি অকস্মাৎ বাহিনীকে সাময়িক যাত্রাবিরতির নির্দেশ দিলেন। সেনাপতি আশিনাসের কাছে একটি পত্র লিখে তাকে আপাতত সামরিক যাত্রা বন্ধ রাখার রহস্যের কথা জানালেন। তিনি তখন লুলুআ পাহাড়ের অদূরে 'মারজ আসকাফ' নামক স্থানে পৌঁছে গিয়েছিলেন। খলিফার নির্দেশে মূল বাহিনীর পেছন ভাগের সেনারা যুদ্ধের সরঞ্জাম নিয়ে পৌঁছা পর্যন্ত আশিনাস সেখানেই যাত্রাবিরতি করলেন।

কিন্তু সম্রাট থিওফেল ততক্ষণে গোয়েন্দা মারফত পূর্ব দিক থেকে আফশিনের বাহিনীর আগমনের খবর জেনে যায়। তখনই সে পরিকল্পনা বদলে ফেলে। বাধ্য হয়ে বাহিনীকে দুই ভাগ করে একভাগ নিয়ে নিজে আফশিনের মোকাবেলার জন্য এগিয়ে যায়; আরেক ভাগ পাঠিয়ে দেয় খলিফার বাহিনীর অগ্রযাত্রা রোধ করতে। তার চিন্তা ছিল, যেন কোনোভাবেই মুসলমানদের দুই বাহিনী একত্র হতে না পারে।

আনকারা বিজয়

এদিকে খলিফা মুতাসিম বিল্লাহ্ থিওফেলের তৎপরতার কথা জানতে পেরে আফশিনকে সে ব্যাপারে সতর্ক করা জরুরি মনে করলেন। কিন্তু আফশিন ততক্ষণে মধ্য এশিয়ার সীমান্তে ঢুকে পড়েছে। ফলে খলিফার পত্রবাহক তাকে ধরতে পারল না। ওদিকে খলিফার নির্দেশনা পেয়ে আশিনাস আনকারার দিকে যাত্রা শুরু করেছে। পেছনে চলছেন খলিফা নিজে। তাদের দুই বাহিনীর মাঝে দূরত্ব প্রায় একদিনের; কিন্তু কারও কাছেই আফশিনের বাহিনীর কোনো খবর নেই।

খলিফা তার বাহিনী নিয়ে যখন আনকারার কাছাকাছি, আফশিন তখন সিভাস পার হয়ে চলে গেছেন তোকাতে। ফলে বাইজান্টাইন সম্রাটের মোকাবেলা তার জন্য অনিবার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে ততক্ষণে। ২২৩ হিজরির শাবান মাসের ২৪ তারিখ (জুলাই, ৮৩৮ খ্রি.) সকালবেলা দুই বাহিনী যুদ্ধের জন্য মুখোমুখি হয়। বাইজান্টাইন বাহিনী প্রথম দিকে বিজয়ের দ্বারে উঠে গেলেও মুসলিম অশ্বারোহীরা অচিরেই নিজেদের পরাজয়কে বিজয়ের রূপান্তর করেন। এ-সময় বাইজান্টাইন বাহিনীতে কোনোভাবে ছড়িয়ে যায়, সম্রাট মারা গেছে। এ সংবাদ শুনেই তার সেনারা পরাজয় মেনে নিয়ে মাঠ ছেড়ে পালাতে শুরু করে। সেনারা পশ্চাতে চলে

গেলে সম্রাট কিছুক্ষণ পর ক্লান্ত হয়ে ময়দান থেকে বিদেয় হয়। এরপর আমাসিয়ার উত্তরে খিলুকুমান নামক স্থানে পলাতক সেনাদের একত্র করে হালিসের তীরে তার অপর বাহিনীর দিকে যাত্রা করে সে। এদিকে আনকারা রক্ষার জন্য জরুরি ভিত্তিতে তার কাছের কোনো মিত্রকে রওনা করিয়ে যায়। কিন্তু ততক্ষণে সময় গড়িয়েছে বহু দূর। মুসলমানদের বিক্ষিপ্ত দলগুলো একত্র হয়েছে আনকারার সমতটে। শহরে শুরু করেছে প্রতিশোধমূলক ধ্বংসযজ্ঞ।

সন্ধির জন্য মরিয়া সম্রাট

আনকারার পতন ও ময়দানে সেনাদের লজ্জাজনক পরাজয়ের কারণে সম্রাট থিওফেল নতুন কোনো অপচেষ্টা করার সাহস হারিয়ে ফেলে। উপায় না পেয়ে সে খলিফা মুতাসিমের কাছে দূত পাঠিয়ে সন্ধির প্রস্তাব করে। জিবাত্রার ঘটনার জন্য ক্ষমা চায়। প্রতিজ্ঞা করে, ধসে যাওয়া ভবন পুনর্নির্মাণ করে অধিবাসীদের ফিরিয়ে দেবে; মুক্ত করে দেবে তার কাছে থাকা সকল মুসলিম বন্দিদেরও। কিন্তু খলিফা তার সন্ধির প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করলেন এবং আম্মুরিয়া বিজয় সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত সম্রাটের পাঠানো দূতকে ফিরে যাবার অনুমতি দিলেন না। এরপর বাহিনী সমেত রওনা করলেন আম্মুরিয়া শহরের দিকে। ওদিকে সম্রাট থিওফেল এগিয়ে দরিলায়েমের দিকে চলে আসে; সেখানে অপেক্ষা করে আম্মুরিয়ায় অনিবার্য কী ঘটতে যাচ্ছে—তা দেখার জন্য।

আম্মুরিয়া অবরোধ

সম্রাটের পরাজয়ের খবরে পুরো আনকারা পূর্বেই খালি হয়ে গিয়েছিল। মুসলমানরা অনায়াসে এগোন আম্মুরিয়ার দিকে। সেখানে তারা শহর অবরোধ করেন। দিনটি ছিল রমাদানের ৬ তারিখ। অবরোধ চলতে থাকে। উপর থেকে শহররক্ষীরা তির, পাথর ছুড়তে থাকে অনবরত। উভয়পক্ষে আহত-নিহতের সংখ্যা বাড়তে থাকে। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিল, অবরোধের সময়কাল দীর্ঘ হতে যাচ্ছে। এমন সময় শহরের একজন বাসিন্দা মুসলিম শিবিরে চলে আসেন। তাবারির বর্ণনামতে, এই লোকটি আগে মুসলমান ছিল। পরে ধর্ম পরিবর্তন করে খ্রিস্টান হয়ে যায়। তবে অন্য বর্ণনামতে, সে ছিল একজন আরব মুসলমান। রোমানদের হাতে বন্দি হয়ে সে আম্মুরিয়ার কারাগারে আটকে ছিল। সে মুসলিম সেনাপতিকে জানায়,

শহরের প্রতিরক্ষাপ্রাচীরের একাংশ বন্যার কারণে দুর্বল হয়ে গেছে। সেখানে হামলা করলে সহজেই প্রাচীর ভেঙে ফেলা যাবে। খলিফা আদেশ দেন প্রাচীরের সেদিকে মিনজানিক স্থাপন করার জন্য। এরপর প্রাচীরের সেই দুর্বল অংশে একটানা পাথর নিক্ষেপ চলতে থাকে। এ সময় শহরবাসী রোমান সম্রাটের কাছে সাহায্য চেয়ে দুজন দূত প্রেরণ করে। তবে তারা দুজনই মুসলিম বাহিনীর হাতে বন্দি হয় এবং দুজনেই ইসলাম গ্রহণ করে নেয়। এদিকে খলিফার নির্দেশে পাথর নিক্ষেপ জোরদার করা হয়। একদিন বিকট শব্দে প্রাচীরের একাংশ ধসে পড়ে। সাথে ধসে পড়ে দুর্গবাসীর প্রতিরোধের মনোবলও।

প্রাচীরের একাংশ ধসে যাওয়ার পর মুসলিম বাহিনীর সামনে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল প্রাচীরের বাইরের পরিখা পার হওয়া। পরিখা বেশ গভীর এবং প্রশস্ত ছিল। এই সমস্যার সমাধানের জন্য খলিফা একটি পদ্ধতি অবলম্বন করেন। মুসলিম বাহিনী রসদ হিসেবে সাথে করে প্রচুর ভেড়া নিয়ে এসেছিল। খলিফার আদেশে সবগুলো ভেড়া জবাই করে গোশত সংরক্ষণ করা হয়। ভেড়ার চামড়ার ভেতর মাটি ঢুকিয়ে চামড়া সেলাই করে ফেলা হয়। এরপর মাটিভর্তি চামড়াগুলোকে পরিখায় ফেলা হয়। পরিখার কিছু অংশ ভরাট হয়ে গেলে মুসলিম সেনাদের অনায়াসে চলার পথ হয়ে যায়। পরদিন মুসলিম সেনারা এই পথে শহরে প্রবেশের চেষ্টা চালায়। কিন্তু শহরবাসী তির নিক্ষেপ করে তাদের আটকে দেয়ার সর্বশেষ চেষ্টা করে যায়। সারাদিন প্রচণ্ড লড়াই হয়। দুপক্ষেই পাল্লা দিয়ে হতাহতের সংখ্যা বাড়তে থাকে।

যুদ্ধের তৃতীয় দিনে (১৭ রমাদান ২২৩ হিজরি, ১২ আগস্ট ৮৩৮ খ্রিস্টাব্দ) মুসলিম বাহিনী শহরে প্রবেশ করে। অল্পসময়ে পুরো শহর তাদের দখলে চলে আসে। খলিফার আদেশে পাইকারি হারে রোমান সেনাদের হত্যা করা হয়। গির্জার দরজা পুড়িয়ে দেয়া হয়। ইবনু খালদুন লিখেছেন, 'এককেজন মুসলমান সেনা পাঁচ-ছয়জন রোমান সেনাকে বকরির মতো বেঁধে নিয়ে যাচ্ছিল। প্রচুর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ মুসলমানদের হাতে আসে। খলিফার আদেশ ছিল, যা বহন করা যাবে তা সাথে নিতে আর বাকি সব জ্বালিয়ে দিতে। রোমানদের অস্ত্রশস্ত্রও জ্বালিয়ে দেয়া হয়। অপরদিকে তিনি জিবাত্রা শহরের ইমারতগুলো মেরামত ও প্রশাসনিক সুরক্ষা জোরদার করার নির্দেশ পাঠিয়ে দেন।'

বিজয়ের তাৎপর্য

খলিফা মুতাসিমের এ হামলা বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের দুর্বলতার চিত্র পৃথিবীর সামনে উন্মোচন করে দেয়। যারা এতদিন বিভিন্ন কারণে কন্সটান্টিনোপলের পথ খোলা পেয়ে ধারাবাহিক সেনাঅভিযান পরিচালনা করে খলিফাকে আতঙ্কিত করত, যাদের অসহায়ত্ব জেনে যায় পুরো বিশ্ব। এ বিজয়ের পর খলিফা দ্রুত ইরাকে চলে যান, কারণ তার অনুপস্থিতিতে সেখানে এক সেনাকর্মকর্তার ষড়যন্ত্রের প্রমাণ মিলেছে।

তবে আম্মুরিয়ার পর মধ্য এশিয়ায় মুতাসিমের বিজয়যাত্রা অব্যাহত চলতে থাকে। সিসিলি উপদ্বীপে অগ্রসর হতে থাকে আফ্রিকার মুসলমানরা। বর্তমান গ্রিসের ক্রেট উপকূলীয় অঞ্চলেও যোগ হয় আব্বাসি খেলাফতের বিজয়গাথা। এ সবকিছুর পর খোদ সম্রাট থিওকেলেরও বিশ্বাস হয়ে যায়, তার সাম্রাজ্য ক্রমবর্ধমান মুসলিম সেনাবাহিনীর মোকাবেলায় একেবারেই মিসকিন। ফলে সে বিনয়ের সাথে খলিফা বরাবর সন্ধির আবেদন পাঠায়। ২২৭ হিজরি সনে (৮৪২ খ্রি.) খলিফা তার আবেদন মঞ্জুর করলে উভয় পক্ষে যুদ্ধহীন শান্তির গোলাপ প্রস্ফুটিত হয়।

সোমনাথ অভিযান

SOMNATH TEMPLE ATTACK

বিজয়ের পূর্বকথা

সোমনাথ সম্পর্কে ইবনে খালদুন লিখেছেন, সমুদ্রতীরে নির্মিত এই মন্দির পর্যন্ত জোয়ার-ভাটার ঢেউ খেলত। আর হিন্দুরা বিশ্বাস করত, এই মন্দির চুম্বন করার জন্য সমুদ্র মন্দিরের কাছে এসে আছড়ে পড়ে। তাদের আরও বিশ্বাস ছিল, আত্মাসমূহ দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর সোমনাথে এসে সমবেত হয় এবং দেবতা সোমনাথ ওইসব আত্মাকে দেহে সংযোজন করে দেয়। তাছাড়া হিন্দুরা বহু উত্তম ও মূল্যবান জিনিসপত্র সোমনাথের নামে মানত করত। তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী, গঙ্গা সাগর বেহেশত হতে নির্গত, তাই মুক্তির আশায় তাতে মৃতদের হাড় নিক্ষেপ করা হতো। সোমনাথকে গঙ্গা সাগরের পানি দিয়ে প্রত্যেকদিন কয়েকবার ধৌত করা হতো। সোমনাথের নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ে ইবনে খালদুন মনোজ্ঞ আলোচনার পর সুলতান মাহমুদ[১] কেন এটা জয় করার মনস্থ করেন তারও সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। হিন্দুস্তান অভিযানকালে সুলতান মাহমুদের বিভিন্ন দুর্গ জয়ের খবরে কিংবা কোনো মন্দির ধ্বংসের খবরে হিন্দুরা পরস্পর বলাবলি করত, সোমনাথ অচিরেই সুলতান

[১] ইয়ামিনউদ্দৌলা আবুল কাসিম মাহমুদ ইবনে সবুক্তগিন (ফার্সি: یمین‌الدوله ابوالقاسم محمود بن سبکتگین) সাধারণভাবে মাহমুদ গজনভি (محمود غزنوی; ২ নভেম্বর ৯৭১– ৩০ এপ্রিল ১০৩০ খ্রি.), সুলতান মাহমুদ ও মাহমুদে জাবুলি (محمود زابلی) নামেই তিনি পরিচিত। ছিলেন গজনভি সাম্রাজ্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শাসক। ৯৯৭ থেকে ১০৩০ সালে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি পূর্ব ইরানীয় ভূমি এবং ভারত উপমহাদেশের উত্তর পশ্চিম অংশ (বর্তমান আফগানিস্তান ও পাকিস্তান) জয় করে নেন। সুলতান মাহমুদ সাবেক প্রাদেশিক রাজধানী গজনিকে এক বৃহৎ সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধশালী রাজধানীতে পরিণত করেন। তার সাম্রাজ্য বর্তমান আফগানিস্তান, পূর্ব ইরান ও পাকিস্তানের অধিকাংশ এলাকা জুড়ে বিস্তৃত ছিল। তিনি ছিলেন সুলতান ('কর্তৃপক্ষ') উপাধিধারী প্রথম শাসক, যিনি আব্বাসীয় খিলাফতের আনুগত্য স্বীকার করেই নিজের শাসন চালু রাখেন। ঐতিহাসিকদের মতে, নিজ শাসনামলে তিনি ১৭ বার ভারত আক্রমণ করেন।

মাহমুদকে ধ্বংস করে ফেলবেন, যদি আমরা ঠিকঠাক তার উপাসনা করতে থাকি। সুলতান মাহমুদের কাছে এ খবর পৌঁছার পর তিনি মূর্তিপূজা বন্ধ করার এসব বাতিল 'মাবুদের' অসহায়ত্ব প্রমাণ করার এবং হিন্দুদের বেকুবীয় এসব দাবির অসারতা প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে জিহাদের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সে-মতে প্রথমে সেখানকার রাজাকে পরাজিত করেন তিনি সোমনাথে পদার্পণ করেন। সোমনাথের অধিবাসীরা সুলতান মাহমুদের আগমনের খবর পেয়ে বলতে থাকে, 'আমাদের প্রভু সোমনাথ এখানে তোমাদেরকে এ জন্যই নিয়ে এসেছেন যে, একই সঙ্গে তোমাদের সকলকে এই মাটিতে ধ্বংস করবেন। তোমরা হিন্দুস্তানের মহাত্মাদেরকে হত্যা করেছ, এখন তোমাদের থেকেও আমাদের প্রভু সেই প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন।'

সোমনাথ মন্দির [১]

পশ্চিম হিন্দুস্তানে গুজরাট রাজ্যের গঙ্গা নদের মোহনা থেকে দুইশো ফারসাখ[২] দূরে সোমনাথ মন্দিরের অবস্থান। এখানে একটি বিশেষ মূর্তিকে কেন্দ্র করে গড়ে

[১] সোমনাথ মন্দির ভারতের একটি প্রসিদ্ধ শিব মন্দির। গুজরাট রাজ্যের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত সৌরাষ্ট্র অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত বেরাবলের নিকটস্থ প্রভাসক্ষেত্রে এই মন্দির অবস্থিত। এটি হিন্দু দেবতা শিবের দ্বাদশ লিঙ্গের মধ্যে পবিত্রতম বলে মনে করা হয়। সোমনাথ শব্দটির অর্থ 'চন্দ্র দেবতার রক্ষাকর্তা'। সোমনাথ মন্দিরটি স্থানীয়দের কাছে 'চিরন্তন পীঠ' নামেও পরিচিত। কারণ অতীতে ছয় বার ধ্বংসপ্রাপ্ত হলেও মন্দিরটি প্রতিবারই সত্বর পুনর্নির্মিত হয়। সর্বশেষ ১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসে জুনাগড়ের ভারতভুক্তির সময় এই অঞ্চল পরিদর্শন করে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল বর্তমান মন্দিরটি নির্মাণের পরিকল্পনা করেন। তাঁর মৃত্যুর পর মন্দিরের কাজ এগিয়ে নিয়ে যান ভারত সরকারের অপর এক মন্ত্রী কে. এম. মুন্সি।

হিন্দু পুরাণ অনুসারে, দক্ষ প্রজাপতি কর্তৃক অভিশপ্ত হয়ে চন্দ্র প্রভাস তীর্থে শিবের আরাধনা করলে শিব তাঁর অভিশাপ অংশত নির্মূল করেন। এই কারণে চন্দ্র সোমনাথে শিবের একটি স্বর্ণমন্দির নির্মাণ করেন। পরে রাবণ রৌপ্য ও কৃষ্ণ চন্দনকাঠ দ্বারা মন্দিরটি পুনর্নিমাণ করেছিলেন বলে হিন্দুদের বিশ্বাস। পরবর্তীতে গুজরাটের সোলাঙ্কি শাসক ভীমদেব মন্দিরটি নির্মাণ করেন প্রস্তরে। প্রসঙ্গত, সোলাঙ্কি ছিল ভারতের পাঁচ রাজপুত রাজ্যের অন্যতম।

[২] প্রাচীন আরবের দূরত্ব-নির্ণয়ের একটি পরিভাষা। শব্দটি মূলত ফারসি 'পারসাংগ' শব্দ থেকে এসেছে; যার অর্থ শান্ত হওয়া। যেহেতু সফরে মানুষ কিছু দূর গিয়ে গিয়ে বিশ্রাম নিয়ে খানিক শান্ত হয়ে আবার যাত্রা শুরু করে, তাই আরবরা তাকে ফারসাখ বলে অভিহিত করত। পরবর্তীতে শব্দটি একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব বোঝাতে ব্যবহার হতে শুরু করে। বর্তমানে যার পরিমাণ কেউ তিন মাইল বলেছেন, কেউ বলেছেন ছয় মাইল। তবে বিশুদ্ধ মতানুসারে তিন মাইল হওয়াই সংগত। (*লিসানুল আরব*)

উঠেছে প্রায় দশ হাজার গ্রাম। মন্দিরের ধর্মকৃষ্টি ও পূজা পালনের জন্য সোমনাথের পাশেই থাকে প্রায় হাজারখানেক পরিবার। তিনশত লোক পর্যটকদের দাড়ি-চুল মুণ্ডানোর জন্য নির্ধারিত; তিনশত মেয়ে-পুরুষ মূর্তির দরোজায় দাঁড়িয়ে নাচ-গানে মত্ত থাকে। তবে মূল সোমনাথ নির্মিত ৫৬টি সীসাগলানো পাতের খুঁটির উপর। মূর্তিটির দৈর্ঘ পাঁচ হাত। সোমনাথ মন্দিরের আলাদা কোনো বিশেষ চিত্র বা আকৃতি নেই; এটি সাধারণ তিন বাহুবিশিষ্ট একটি উঁচু ইমারত।

বিজয়ের চিন্তা থেকে

সুলতান মাহমুদ সোমনাথ মন্দির ও তাকে ঘিরে হিন্দুদের অযৌক্তিক বিশ্বাসের কথা জেনে সে দিকে অভিযান পরিচালনা করে মূর্তি ধ্বংস এবং মন্দির বিজয়ের চিন্তা করেন। তাঁর ধারণা ছিল, হিন্দুরা যখন দেখবে সর্বময় ক্ষমতাধর (!) সোমনাথ আর নেই, তখন তারা বুঝতে পারবে, তাদের এতদিনকার দাবি-দাওয়া সব মিথ্যা ছিল; ফলত তারা ইসলাম ধর্মের দিকে ঝুঁকতে থাকবে। সুতরাং সোমনাথ অভিমুখে পরিচালিত জিহাদে সুলতান মাহমুদের উদ্দেশ্য ছিল, কেবল ইসলামের দাওয়াত এবং প্রসার। সে-মতে তিনি আল্লাহর কাছে ইসতেখারা[১] করলেন।

[১] ইস্তিখারা শব্দটি আরবি। এর শাব্দিক অর্থ হলো, কল্যাণের কামনা করা। আমাদের জীবনে অনেক সময় এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, কোন কাজ করব কি করব না, সিদ্ধান্ত নিতে পারি না। অবশ্য এই বিষয়টি ফরয ওয়াজিব কাজ করা বা হারাম নাজায়েয কাজ না করার ক্ষেত্রে হলে চলবে না। কারণ, ফরয বা ওয়াজিব কাজ আমাদের মন চাইলেও করতে হবে এবং হারাম বা নাজায়েয কাজ থেকে হাজার মন চাইলেও আমাদেরকে দূরে থাকতেই হবে। ইসতেখারা শুধু মুবাহ বা জায়েজ কাজ করা না করা আর মোস্তাহাব বা উত্তম—দ্বি-অবকাশমুখী কাজের মাঝে কোনটি করবে, তা নির্ণয়ের জন্য হয়ে থাকে।

পরিভাষায় ইসতেখারা নামাজ ও দুআর একটি সমন্বিত পদ্ধতি। সৌভাগ্যবান সে, যে ইসতেখারা করে; আর হতভাগা সে, যে ইসতেখারা করে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আদমসন্তানের সৌভাগ্যের বিষয়সমূহ থেকে একটি হল ইসতেখারা করা ও আল্লাহর ফয়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকা। আর মানুষের দুর্ভাগ্য হল ইসতেখারা না করা ও আল্লাহর ফয়সালার উপর অসন্তুষ্ট থাকা।' (*মুসনাদে আহমাদ:* ১৩৬৭)

ইসতেখারার নিয়ম হলো, প্রথমে উযু করে দু'রাকাত নফল নামায পড়ে নিতে হবে। এরপর তাসবিহ, তাহমিদ এবং কয়েকবার দুরুদ শরিফ পড়ে নিম্নের দুআটি পড়তে হবে:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ،
فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلاَّمُ الغُيُوبِ ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ
تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ ثم تسميه بعينه خَيْرًا لِي فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ
قال أو فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي

ইতিবাচক অনুভব হলে তিনি ৪১৬ হিজরির ১০ই শাবান (৬ই অক্টোবর, ১০২৫ খ্রি.) তার সেনাদের নিয়ে রওনা করলেন। পথে স্বেচ্ছায় জিহাদে অংশগ্রহণে আগ্রহীরাও বিভিন্ন জায়গা থেকে তাঁর বাহিনীতে এসে যোগ দেয়।

সম্মুখে বিশাল মরুপ্রান্তর। এক ফোঁটা পানি বা এক সত্তি রসদ নেই কোথাও। প্রাণনাশী এই মরুভূমিও সুলতান মাহমুদকে দমাতে পারল না সামান্য। আল্লাহর নামে জিহাদের তামান্নায় তিনি মাড়িয়ে গেলেন দীর্ঘ প্রতিকূল সেই মরুএলাকা। সোমনাথ যাত্রায় হিন্দুদের বিভিন্ন জাতি-উপজাতি তাঁর পথ আগলে দাঁড়াতে চাইল; কিন্তু তিনি কারও পরোয়া করলেন না। সবকটাতে দলে-মথে এগোতে থাকলেন অভীষ্ট লক্ষ্যপানে। সকলেই তার অভিপ্রায় জানত। জানত, তিনি কেবল এ-জন্য এগোচ্ছেন সেদিকে—যেন হিন্দুদের খানিক শুভবুদ্ধি হয়, যেন তারা বিবেক

فِيهِ ، اللهم وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّه شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أمري وَآجِلِهِ ، فَاصْرِفْنِي عَنْهُ [واصْرِفْهُ عَنِّى]، وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رضِّنِي به،

হে আল্লাহ, আমি আপনার জ্ঞানের সাহায্যে আপনার কাছে কল্যাণ প্রার্থনা করছি। আমি আপনার শক্তির সাহায্যে শক্তি ও আপনার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি। কেননা আপনিই ক্ষমতা রাখেন; আমি ক্ষমতা রাখি না। আপনি জ্ঞান রাখেন, আমার জ্ঞান নেই এবং আপনি অদৃশ্য বিষয়ে সম্পূর্ণ পরিজ্ঞাত। হে আল্লাহ, আপনার জ্ঞানে আমার এ কাজ (নিজের প্রয়োজনের উল্লেখ করতে হবে) আমার বর্তমান ও ভবিষ্যত জীবনের জন্য কিংবা বলবে আমার দ্বীনদারি, জীবন-জীবিকা ও কর্মের পরিণামে কল্যাণকর হলে আপনি তা আমার জন্য নির্ধারণ করে দিন। সেটা আমার জন্য সহজ করে দিন এবং তাতে বরকত দিন। হে আল্লাহ, আর যদি আপনার জ্ঞানে আমার এ কাজ আমার দ্বীনদারি, জীবন-জীবিকা ও কর্মের পরিণামে কিংবা বলবে, আমার বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য অকল্যাণকর হয়, তবে আপনি আমাকে তা থেকে ফিরিয়ে দিন এবং সেটাকেও আমার থেকে ফিরিয়ে রাখুন। আমার জন্য সর্বক্ষেত্রে কল্যাণ নির্ধারণ করে রাখুন এবং আমাকে সেটার প্রতি সন্তুষ্ট করে দিন। [সহিহ বুখারি: ৬৮৪১]

এরপর রাব্বুল আলামিনের কাছে কায়মনোবাক্যে দুআ করে সে বিষয়টি উল্লেখ করতে হবে। মনের ভেতর কাজটি করার প্রতি শুভ ইঙ্গিত আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। আর যদি না-করার প্রতি ইশারা পাওয়া যায়, তাহলে তা বর্জন করতে হবে। বেশকিছু দিন চলে গেলেও যদি কোনো ইঙ্গিত না পাওয়া যায়, তাহলে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস নিয়ে বারবার ইসতেখারা করে যেতে হবে। পারতপক্ষে এটার কথা কাউকে জানানো যাবে না।

উম্মতের প্রতি রাসূলের অগাধ ভালোবাসা ও দয়ার জ্বলন্ত প্রমাণ এই যে, তিনি উম্মতকে শিখিয়ে গেছেন প্রত্যেক কাজের ভাল-মন্দ আল্লাহ তাআলা থেকে চেয়ে নাও এবং সম্পর্ক একমাত্র আল্লাহর সাথে রাখো।

হাদিসে বর্ণিত ইসতেখারার দুআ এ শিক্ষা দেয় যে, কোনো মানুষ তার ব্যক্তিগত যোগ্যতায় তথা নির্ভুল পদক্ষেপ, সুউচ্চ জ্ঞান বৃদ্ধি, অর্থ সম্পদ, বংশ-মর্যাদা ও আধিপত্যের দ্বারা মন্দ কাজ থেকে বেঁচে ভালো কাজ করার ক্ষমতা রাখে না। বরং মহান আল্লাহ যাকে চান, সে-ই শুধু ভাল কাজ করতে পারে ও মন্দ কাজ থেকে বাঁচতে পারে।

খাটাতে পারে এ মর্মে যে, পাথরে তৈরি সোমনাথ আদতে না নিজের রক্ষা করতে পারে, না অন্য কারও।

সুলতান মাহমুদ তাঁর সেনা নিয়ে সোমনাথের দুই মনজিল [১] দূরে দুবুলুয়ারা শহরে গিয়ে পৌঁছলেন। শহরবাসী মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য কাতারে দাঁড়াল। তাদের মূল শক্তি ও পুঁজি ছিল, সোমনাথ দেবতা তাদের রক্ষা করবে; তাদের পক্ষে লড়বে। অতএব, মুসলমানদের আজকে আর রক্ষে নেই। তাদের পুরো বাহিনী আজ দেবতার হাতে বলি হবে। সুলতান মাহমুদ এতকাল যা বিজয় করেছে, যা অর্জন কুড়িয়েছে, আজকে সোমনাথ মূর্তির পায়ে সব বিসর্জন দিয়ে যেতে হবে। কিন্তু হলো তার উল্টো। মুসলমানরা এই ভীতু কাপুরুষদের চোখের পলকে মাড়িয়ে চলে গেছে। শিরকের অন্ধকার যাদের দিল-দেমাগ ছেয়ে নিয়েছে, তারা আবার কী মোকাবেলা করবে? ঐশী স্নেহধন্য সুলতানের বাহিনী এদেরকে পিষে ফেলে ৪১৬ হিজরির ১৫ই যিলকদ (৭ই জানুয়ারি, ১০২৬ খ্রি.) তারা সোমনাথ এসে পৌঁছে। সেখানে তারা নদীর তীরঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একটি প্রকাণ্ড দুর্গ, যার দেয়ালে দাঁড়ানো মুশরিকের দল মুসলমানদের উপর ফেটে পড়ার অপেক্ষায় তাদের মুখগুলো লাল হয়ে আছে। তাদের চোখে এক নির্লজ্জ দৃঢ়তা যে, দেবতা তাদের পেছনে আছে; সে তাদের পক্ষে লড়বে, মুসলমানদের ধ্বংস করে দেবে।

ধ্বসে গেল সোমনাথের প্রাচীর

৪১৬ হিজরির ১৬ই যিলকদ (৮ই জানুয়ারি, ১০২৬ খ্রি.)। আবহমানকালের মুসলিম বিজয়ী দলের রীতি অনুসারে সূর্য ঢলে যাবার সময় সুলতান মাহমুদ তাঁর বীর সেনাদের নিয়ে সোমনাথে আক্রমণ করলেন। প্রতিপক্ষ হিন্দুদের উপর প্রচণ্ড হিংসাত্মক হয়ে উঠলেন তিনি। মুসলিম বাহিনীর যুদ্ধের তীব্রতায় হিন্দুরা হতবিহ্বল হয়ে পড়ল। অথচ তারা ভেবেছিল, তাদের কথিত উপাস্য তাদেরকে রক্ষা করবে; প্রতিপক্ষকে বাধা দেবে এবং ধ্বংস করে ফেলবে। মুসলমানরা কৃত্রিম সিঁড়ি তৈরি করে শহরের প্রাচীর বেয়ে উপরে উঠে যেতে লাগল। তাদের মুখে উচ্চস্বরে উচ্চারিত হচ্ছিল তাকবির এবং তাওহিদ। দুর্বার ঢেউয়ের মতো তারা শহরের ভেতর ঢুকে যেতে লাগল একে একে।

যুদ্ধ তখন তুমুলে। হিন্দুদের একদল দৌড়ে গেল তাদের প্রভু (!) সোমনাথের

[১] ১ মনজিল—১২ মাইল

কাছে। মুখে ধুলো মেখে তার পায়ে গড়াগড়ি করল। বলল, 'আমাদেরকে বিজয়ী করুন, প্রভু।' তাকে গলায় জড়িয়ে ধরে কান্নাকাটি করতে লাগল। এরপর প্রবল বিশ্বাস বুকে তুলে আবার নেমে আসল যুদ্ধের জন্য। মুসলমানরা তাদের সবগুলোতে কচুকাটা করলেন। এভাবে একেক দল সোমনাথের কাছে যায়, পা ধরে রোনাজারি করে মিথ্যা আশ্বাসে বের হয়ে আসে আর সুলতান মাহমুদের সেনাদের হাতে তাদের চূড়ান্ত যবনিকাপাত ঘটে। আল্লাহ সুবহান যেন এদেরকে চতুষ্পদ জন্তুর চেয়েও অধিক পথভ্রান্ত করেছেন। পৃথিবীর অন্য কোনো জাতি, ভিন্ন কোনো গোষ্ঠী হিন্দুদের মতো এতটা ভ্রষ্ট ও বিবেকহীন আছে বলে জানা নেই। সোমনাথ মূর্তির দুয়ারে এরা লড়তে লড়তে মৃত্যুর মুখোমুখি হল। এভাবে মূর্তির চোখের সামনে তার ৫০ হাজার পরমপূজারির লাশ পড়ে থাকল নিথর হয়ে, মূর্তির তা দেখারও চোখ নেই; অনুভবেরও মন নেই। একপর্যায়ে তারা বুঝতে পারল, এভাবে মিথ্যা প্রলোভনে পড়ে থাকলে মুসলমানরা তাদের একটাকেও বাঁচতে দেবে না। এই ভেবে পরাজয় মেনে নিয়ে মন্দিরের পেছন পথে এরা বিভিন্ন জলযানে উঠে পালাতে লাগল। কিন্তু মুসলিম সেনারা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করলেন, একটাকেও ছাড় দিলেন না। দিনটি এসব অথর্ব মুশরিকদের জন্য সত্যিই বড় কঠিন ছিল। সুলতান মাহমুদ নির্দেশ দিলেন, সোমনাথ মূর্তিটি ভেঙে ফেলা হোক! সেনারা সেটি গুঁড়িয়ে দিল। সুলতান মূর্তির পাথরগুলো নিয়ে গেলেন। গজনির বড় জামে মসজিদের চৌকাঠ তৈরি করলেন সেই পাথর দিয়ে, যাতে নামাজি মুসলমানদের পদভারে এতদিনের শিরকের নাপাকি থেকে পাথরগুলো কিছুটা হলেও পবিত্র হয়ে যায়। শুকরিয়া তোমার—হে মহামহিম!

রক্তের মহড়ায় আদর্শের মেসাল

যতটা গর্দভপনাই হোক, ইসলামি অনুশাসনে যে-কেউ যেকোনো ধর্ম পালনের অধিকার রাখে। সকলের ধর্মপালনের স্বাধীনতা প্রদান, ইসলামের ন্যায়, উদারতা এমনকি জিহাদ ফি-সাবিল্লিল্লাহরও একান্ত দাবি। জিহাদ ফি-সাবিল্লিল্লাহর দ্বারা ইসলামের মুজাহিদরা কখনো পার্থিব স্বার্থ বা দুনিয়াবি প্রাচুর্য কামনা করে না। বরং জিহাদ হলো, আল্লাহর পথে, আল্লাহর নামে জান ও মাল কুরবান করার অন্যতম নজরানা; দ্বীন প্রচারের সর্বোচ্চ প্রধান তরিকা। জিহাদের মাধ্যমে কুফরের শক্তি ভোঁতা হয়, উদ্ধত শিরকের দম্ভ চূর্ণ হয় এবং পৃথিবীর কোনায় কোনায়, মানবজাতির শিরায় শিরায় পৌঁছে যায় ইসলামের দাওয়াত—লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ!

হিন্দুদের অন্যতম প্রধান দেবতা ও প্রভু সোমনাথের মূর্তির সামনে যখন রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলমান, একদল বিবেকবান শিক্ষিত হিন্দু পুরোহিত দেখল, যদি মুসলমানদের নিবৃত্ত করা না যায়, তাহলে তারা সোমনাথের একটি ইটও আস্ত রাখবে না। তাদের সামনে অস্ত্র তোলা একজন হিন্দুকেও তারা জীবিত থাকতে দেবে না। কিন্তু শক্তিতে যে তাদের দমানো যাবে না, সেটা ততক্ষণে স্পষ্ট হয়ে গেছে। সুলতান মাহমুদকে সন্তুষ্ট করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে তারা চাইল, কোনোভাবে তাকে নিজেদের দলে ভেড়ানো যায় কি না। সেই ভেবে তারা সুলতান মাহমুদকে অঢেল সম্পদের লোভ দেখাল। বলল: 'আপনি সোমনাথ ছেড়ে চলে যান, আমরা আপনাকে এত এত সম্পদ, কাঁড়িকাঁড়ি সোনা-রুপা দিতে প্রস্তুত আছি।' তারা ভেবেছিল, এত দূর থেকে মুসলমানরা কেবল সম্পদের জন্য, কিছু পার্থিব ভোগবিলাসের জন্য সোমনাথে ছুটে এসেছে। তাদেরকে সাধারণ হিন্দুদের আকলবিক্রিত অর্থ থেকে কিছু টাকাকড়ি দিয়ে দিলেই খেলা শেষ।

সুলতান মাহমুদ হিন্দুদের এমন প্রস্তাব পেয়ে মুসলিম বাহিনীর সেনাপতিদের জড়ো করলেন। জানালেন, হিন্দুরা এমনটা বলে তোমাদের পরামর্শ কী? তারা বলল, 'সুলতান, দীর্ঘ পথযাত্রায় আমাদের বহু সম্পদ ব্যয় হয়ে গেছে; এখানে আজকের আক্রমণ পর্যন্ত খরচ হয়ে গেছে অনেক অর্থ। আপনি বরং আমাদের খরচা বাবদ তাদের প্রস্তাবিত সম্পদ নিয়ে নিন।' সুলতান কোনো কথা বললেন না। উঠে গেলেন।

নিশুতি রাত। সুলতানের চোখে সামান্য ঘুম নেই। তাঁর মাথার ভেতর ঘুরপাক খাচ্ছে হিন্দু পুরোহিতদের প্রস্তাব এবং তার সেনাদের মতামত। সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না। উঠে দাঁড়ালেন। আল্লাহর সামনে সেজদাবনত হয়ে কান্না করলেন। ইসতেখারা করলেন। খোদার দুয়ারে মিনতি জানিয়ে পথনির্দেশ দাবি করলেন। সেনারা জানে না, পরদিন সকালে যুদ্ধ হবে, নাকি সুলতান পুরোহিতদের দেয়া সম্পদ নিয়ে বাড়ির পথে ছুটবেন।

সকাল হয়ে এল। সূর্যের তেজ বেড়ে ওঠার আগেই সুলতানের গলা তেজদীপ্ত হয়ে উঠল। তিনি সাফ জানিয়ে দিলেন, 'আমরা সোমনাথ গুঁড়িয়ে দেব। সম্পদের কোনো লোভ আমাদের দিলে নাই। আমরা জিহাদের জন্য এসেছি, লুটেরা সেজে নয়।' বললেন: 'প্রস্তাবিত বিষয়টি নিয়ে আমি চিন্তা করেছি। আমার মনে হয়েছে, পরকালে খোদার ফেরেশতা যদি ডাকে: কোথায় সে মাহমুদ, যে দুনিয়াতে শিরকের মূর্তি গুঁড়িয়ে দিয়েছিল?—সেটা আমার জন্য প্রিয়তর হবে এমন ডাক শোনার

চেয়ে যে, কোথায় সে মাহমুদ, যে পার্থিব ধনসম্পদের লোভে মূর্তি না ভেঙে ফিরে এসেছিল?'

খোদাভীরু সেনাপতিদের আমরা যুগে যুগে এমনটাই দেখেছি। যারা এতটাই মহান হয়ে থাকেন যে, দুনিয়ার স্বার্থ তাদেরকে পরকাল থেকে ফেরাতে পারে না। ইসলামের বার্তা ও দাওয়াহ পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে তারা কুরবান করে দেন অঢেল ধনসম্পদ ও বিত্তভাণ্ডার। যারা জীবনের পরতে পরতে আমাদের জন্য রেখে গেছেন স্পষ্ট আকিদা ও বিশুদ্ধ বিশ্বাসের সহস্র উপমা। যারা স্পষ্ট করে গেছেন, জিহাদ ফি-সাবিলিল্লাহর বাস্তবতা, এর পেছনের দাবি ও আবেদন এবং এর চূড়ান্ত চূড়া ও মহান লক্ষ্যের যৌক্তিকতা। জাযাহুমুল্লাহু আহসানাল জাযা!

সোমনাথ বিজয় এবং হিন্দুদের সাম্প্রদায়িক মিথ

উপমহাদেশের ইতিহাসে যে সকল রাজ্যবিজেতা নিজ যোগ্যতাবলে ইতিহাসের স্বর্ণসিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন, সুলতান মাহমুদ ছিলেন তাদের অন্যতম। আফগান সিংহাসনে বসে সুলতান মাহমুদ যে পরিমাণ সামরিক অভিযান পরিচালনা করেছেন এবং যে উল্লেখ্যযোগ্য সংখ্যক বিজয় লাভ করেছেন, ইতিহাসে এমন উপমা সচরাচর নয়। শত্রুদের কোমর ভেঙে ফেলা আর বিদ্রোহীদের নখর গুঁড়িয়ে ফেলা যে তার সহজাত স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাঁর জীবনী পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তিনি সবচে বেশি অভিযান পরিচালনা করেছেন ভারতের বিরুদ্ধে। সবমিলিয়ে প্রায় সতেরো বার তিনি দেশটিতে আক্রমণ করেন এবং সবগুলো যুদ্ধেই তিনি বিজয় লাভ করে ফিরে যান।

দুঃখজনকভাবে তাঁর সে-সব বিজয়গাথাকে কেন্দ্র করে উপমহাদেশের একদল লোক সাম্প্রদায়িক তোষামোদি থেকে কুৎসা রটাতে পছন্দ করে। হিন্দুস্তানের কিছু পক্ষপাতী বুদ্ধিজীবী সেগুলো উগড়ে দেয় আর বাঙলাদেশের কিছু চিহ্নিত জ্ঞানপাপী মিসকিন মহল সে-সব প্রচার করে বেড়ায়। মোটাদাগে তাদের চোখে তিনি ছিলেন একজন দস্যু, শান্তি বিনষ্টকারী, লুটপাটকারী এবং নির্দয় খুনি।

তবে কথা হলো, তিনি তো ছিলেন আফগানের শাসক। ভারত তার মূল আবাস ছিল না, তেমনি তিনি বিজয়ের পর ভারতে আসন পেতে বসে থাকেননি। তাহলে তিনি কেমন শাসক ছিলেন, কেমন ছিল তাঁর কর্তৃত্বকাল—সেটা কেন ভারতবাসী

বিচার করবে? সে সিদ্ধান্ত দেবার অধিকার তারা পেল কোথায়? স্বাভাবিকতই সে ব্যাপারে নিরঙ্কুশ ইতিহাস জানতে হলে, তাঁর ব্যাপারে সত্য সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হলে, আমাদেরকে দেখতে হবে—শাসক হিসেবে তিনি তৎকালীন আফগানিদের কাছে কেমন ছিলেন।

বরং আফগান-ইতিহাসে সুলতান মাহমুদ বহুমাত্রিক প্রতিভাধর ব্যক্তি হিসেবেই পরিচিত। ছিলেন একাধারে ধর্মভীরু, বীর যোদ্ধা, দক্ষ প্রশাসক, শিল্পসাহিত্যের সফল পৃষ্ঠপোষক এবং প্রজাদের ব্যাপারে সর্বোচ্চ ন্যায়ানুগ বিচারক। তার ধর্মীয় জীবন নিয়ে জানা যায়, তিনি ফরয-ওয়াজিবের পাশাপাশি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ নফল নামায পড়তেন। নির্দিষ্ট পরিমাণ কুরআন তিলাওয়াত করতেন। যুদ্ধক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের উপরই ভরসা করতেন এবং ব্যক্তিজীবনের প্রতিটি পরতেই তিনি ধর্মীয় বিধিনিষেধ মেনে চলতেন।

তবে সবকিছু ছাপিয়ে যে-কারণে তিনি ইতিহাসে অনন্য হয়ে উঠেছেন, তা হলো, তিনি দক্ষ সমরাভিজ্ঞ লোক ছিলেন। সিংহাসনে বসেই শুরু হয় তার সামরিক জীবন। আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দিনের মধ্য দিয়ে সূচিত হওয়া এ যুদ্ধজীবনে বহু শত্রুর মোকাবেলা তাকে করতে হয়েছে এবং প্রায় সবগুলো যুদ্ধেই অসাধারণ সামরিক নৈপুণ্যে তিনি বিজয় লাভ করেছেন।

আরও যে গুণ তাকে স্মরণ করার ক্ষেত্র তৈরি করেছে, তা হলো, তার অসীম জ্ঞানানুরাগ। তার সময়ে গজনি হয়ে ওঠে জ্ঞানী-গুণীদের মিলনায়তন। তিনি নিজে সে-সব সাহিত্যসভায় হাজির থাকতেন। তার দরবারে আসা যাওয়া ছিল শাহনামার রচয়িতা ফেরদৌসি, দার্শনিক ফারাবি, ঐতিহাসিক উৎবি, কবি আলগারি, উজারিসহ আরও অনেকের। রাজ্য সম্প্রসারণ, শিল্পসাহিত্যের বিপ্লব, ন্যায় ও ইনসাফের প্রচার-প্রসার ইত্যাদি কারণে আফগানের ইতিহাসে তিনি একজন অমর বিজেতা হয়ে আছেন।

স্বদেশের লোকদের কাছে পরম সম্মানের এমন একজন ব্যক্তিকে নিছক যুদ্ধাভিযানের কারণে লুটেরা, নির্দয়, খুনি এবং সাম্প্রদায়িক উস্কানিদাতা ঠাওরানো কতটা যৌক্তিক, সেটা বিবেকবান ব্যক্তি মাত্রেরই সহজ অনুমেয়। প্রশ্ন হতে পারে, কেন তাহলে তিনি ভারত অভিমুখে এতগুলো অভিযান পরিচালনা করেছিলেন? কেন সোমনাথে আক্রমণ করে মূর্তি ভেঙেছিলেন এবং সেখান থেকে এত অঢেল সম্পদ সাথে করে গজনি নিয়ে গিয়েছিলেন?

সে-সব প্রশ্নের উত্তর জানতে আমাদেরকে প্রথমে সোমনাথ এবং সুলতান মাহমুদের অন্যান্য অভিযানের কারণ খুঁজে বের করতে হবে। আসুন দেখি, ইতিহাস কী বলে:

এক.

তৎকালীন হিন্দুদের জন্য সোমনাথ মন্দির ছিল আরাধ্যের সর্বোচ্চ কেন্দ্র। তারা তাদের মূল্যবান সম্পদ, জরুরি বৈঠক এবং গুরুত্বপূর্ণ ষড়যন্ত্রগুলো এখানে বসেই করত। সুলতান মাহমুদের কানে আসে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে নানা কিসিমের ষড়যন্ত্রের জন্য রাজপুতরা সোমনাথে আসা-যাওয়া বাড়িয়েছে। তো স্বাভাবিক যে, তিনি নিজের এবং মুসলিম সমাজের স্বার্থে হিন্দু ষড়যন্ত্রকারীদের কেন্দ্র হয়ে ওঠা এই বৈঠকখানা গুঁড়িয়ে দিবেন। একজন সচেতন শাসক এটা না করে কী করে নিবৃত্ত থাকতেন?

দুই

ভারতীয় হিন্দুদের আরেকটি অমানবিক কু-রীতি ছিল বিভিন্ন উপলক্ষে দেবদেবীর নামে কুমারী মেয়েদের বলিদান দেয়া। পৃথিবীর কোনো জাতি, কোনো সভ্য মানুষ এটা মেনে নিতে পারে? যার শক্তি নেই সে ছি ছি করে বসে থাকে। কিন্তু সুলতান মাহমুদের মতো শাসক যখন এমন কাণ্ড জানলেন, যেহেতু তার ক্ষমতা ছিল এমন অমানবিক কর্মকাণ্ড রোধ করার, তাই তিনি সোমনাথকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা ধর্মের নামে এমন বোধহীন কুসংস্কার উপড়ে ফেলতে সোমনাথে অভিযান করেছিলেন।

তিন.

সুলতান মাহমুদ আরও জানতে পারেন, সোমনাথে নাকি একটি মূর্তি আছে, যেটা শূন্যে ঝুলে থাকে। তাওহিদপন্থি সুলতান এটা শুনে খানিক হাসেন। তার কাছে এটাকে নিছক অবান্তর লাগে। তিনি চিন্তা করেন, সাধারণ হিন্দুদের সামনে মন্দিরকর্তাদের গোমর ফাঁস করে দেয়া দরকার, যাতে তারা প্রকৃত ব্যাপারটি বুঝতে পারে। ধর্মের নামে চালানো ঠাকুরদের এই বাটপারি ধরতে পারে। তিনি তাই অভিযানের সময় সাথে দক্ষ প্রকৌশলী এবং ধাতুবিদদের নিয়ে এসেছিলেন। তারা যুদ্ধশেষে মূর্তিটি পরীক্ষা করে বলেন, এটি লোহার তৈরি আর মন্দিরের চারপাশের দেয়ালে চুম্বক লাগিয়ে কৃত্রিমভাবে এটাকে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। দেয়ালের সেই চৌম্বক পাথরগুলো খুলে নেয়ার সাথেসাথে মূর্তিটি মাটিতে পড়ে যায়।

চার.

আমরা যুদ্ধের ধারাবাহিক বর্ণনা পড়ে এসেছি। সুলতান মাহমুদের বাহিনীর শক্তি এবং অপ্রতিরোধ্য গতিও দেখেছি। আমাদের কথা হলো, গুজরাটে, কাশ্মিরে এবং দিল্লিতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাতে হিন্দুরা সাধারণ মুসলমানদের যে-পরিমাণ ক্ষতি করেছে, তাতে একটি সশস্ত্র সেনাবাহিনীর ভেতর যদি হিন্দুবিদ্বেষই কাজ করত, তাহলে তিনি চাইলে কী করতে পারতেন? মন্দির জ্বালিয়ে সিভিলিয়ান হিন্দুদের পুড়িয়ে মারতে পারতেন না? তিনি কি তা করেছিলেন? বরং ইতিহাস বলে, তিনি মন্দিরের পুরোহিত এবং ব্রাহ্মণদেরও সামান্য কোন ক্ষতি করেননি। তাহলে কীভাবে তার অভিযানকে সাম্প্রদায়িক ট্যাগ লাগানো যেতে পারে?

পাঁচ.

গজনি থেকে সোমনাথে আসতে তাকে পাড়ি দিতে হয়েছে প্রায় এক হাজার মাইল পথ। তিনি যদি সাম্প্রদায়িক মনোভাবেই এই অভিযান করতেন, তাহলে এই হাজার মাইলের পথে যতগুলো মন্দির পড়েছিল, কেন তিনি সেগুলো ভেঙে গুঁড়িয়ে দিলেন না? কেন সেগুলো স্বহালে বহাল রেখে তিনি সোমনাথ পর্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে পৌঁছালেন?

ছয়.

সুলতান মাহমুদের বহুকাল পরে এসে সুলতান আলাউদ্দিন খিলজি এবং সুলতান মহিউদ্দিন আওরঙ্গজেবও সোমনাথ অভিমুখে অভিযান পরিচালনা করেছেন। যা প্রমাণ করে, সুলতান মাহমুদ ধর্মীয় দ্বেষ থেকে এসে থাকলে এই মন্দির সেবারই মাটির সাথে মিশে যাবার কথা। কিন্তু তিনি তেমন কিছু করেননি। এমনকি ইতিহাস বলে, তিনি যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরে একজন সাধারণ হিন্দুর গায়েও টোকা দেননি। যদি তার ভেতর সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ থাকত, তাহলে তিনি সব হিন্দুকে বাছবিচার ছাড়াই কচুকাটা করার কথা; তিনি কি তা করেছিলেন?

সাত.

বারবার তাকে হিন্দুস্তানে আসতে হয়েছে। কারণ, তৎকালীন হিন্দুস্তানের রাজপুত শাসকদের স্বভাব ছিল একেবারে বক্র কিসিমের। নিজেদের মধ্যেই তারা চুক্তি রক্ষা করে অভ্যস্ত ছিল না। সুলতান মাহমুদের সাথেও তারা একই আচরণ করেছে। বারবার চুক্তি করেছে এবং বারবারই সেটা ভঙ্গ করেছে। যার ফলে সুলতানকেও

বারবার তাদেরকে শিক্ষা দিতে হিন্দুস্তানে আসতে হয়েছে।

আট.

সুলতান মাহমুদ যে হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন না, এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো, কনৌজের রাজা রাজ্যপাল সুলতান মাহমুদের আনুগত্য স্বীকার করলে অন্যান্য পরাক্রমশালী হিন্দু রাজপুত রাজাগণ এতে অপমান বোধ করেন। কালিঞ্জরের চান্দেলার রাজা গোয়ালিয়রের রাজপুতের সাথে জোটবদ্ধ হয়ে সুলতান মাহমুদের মিত্র কনৌজের রাজা রাজ্যপালের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে এবং সকল রাজপুত রাজা মিলে কনৌজের রাজা রাজ্যপালকে হত্যা করে ফেলে। এরপর সুলতান মাহমুদ তার সাথে চুক্তিবদ্ধ থাকা হিন্দু রাজা রাজ্যপালের হত্যার প্রতিশোধকল্পে ১০১৯ খ্রিস্টাব্দে চান্দেলার রাজা গোন্তার বিরুদ্ধে সমরাভিযান পরিচালনা করেন। চান্দেলার রাজা গোন্তা সুলতান মাহমুদের বাহিনীর প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হয়ে রণক্ষেত্র থেকে পলায়ন করেন। পরবর্তীতে সুলতান মাহমুদ কনৌজের রাজা রাজ্যপালের ছেলেকে কনৌজ ও চান্দেলা উভয় রাজ্যের রাজা হিসেবে ঘোষণা করেন।

সে-মতে সুলতান মাহমুদের ভারত বর্ষের ১৩তম অভিযান শুধুমাত্র তার কনৌজের রাজা রাজ্যপালের হত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্যই করেছিলেন। তিনি যদি সত্যিই হিন্দুবিদ্বেষী সাম্প্রদায়িক হতেন, তাহলে কনৌজের রাজা রাজ্যপালের হত্যার প্রতিশোধ কেন নিতে গেলেন, মাথা খোলাসা করে একটু কি ভাবা দরকার না? হিন্দুরা পরস্পরে মারামারি করে মারা গেলে, একজন কট্টরপন্থী (!) সাম্প্রদায়িক মুসলিমের তাতে কী আসে যায়?

নয়.

ইসলামে জিম্মাচুক্তি বলে একটা বিধান আছে। শুধুমাত্র এই একটা বিধান প্রমাণ করে দেয়, ইসলাম পরধর্মের প্রতি কতটা শান্তিপূর্ণ মনোভাব রাখে। সুতরাং একজন খোদাভীরু সৎস্বভাবী শাসকের ক্ষেত্রে এটা চিন্তাই করা যায় না যে, তিনি ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ এই বিধানকে উপেক্ষা করবেন। মানা যায় না যে, তিনি যুদ্ধ এবং বিধর্মী বিষয়ক রাসূলের ভূরিভূরি উপদেশকে তোয়াক্কা না করে সাম্প্রদায়িক মনোবাঞ্ছা পূরণ করবেন।

দশ.

উনার প্রতি অভিযোগের যেন সমাপ্তি নেয়। সোমনাথ থেকে তিনি নাকি কাঁড়িকাঁড়ি

সম্পদ লুট করেছিলেন। আশ্চর্য লাগে, এ-সব বোধহীন কথাবার্তা শুনলে। তিনি সোমনাথে যুদ্ধ করতে এসেছিলেন। সেখানকার লোকেরা তার উপর বিজয় লাভ করলে, তার সাথে থাকা সম্পদ কী করত? যদি চিত্র উল্টো হতো, যদি হিন্দুরা কোনো মুসলিম ভূমিতে আক্রমণ করে তাদেরকে পরাজিত করে ফেলত—তবে কি তারা আক্রান্ত জনপদের সম্পদ নিজেদের কাঁখে তুলে নিত না? যুদ্ধের ব্যাপারে যাদের বোধ একেবারে শূন্যের পর্যায়ে, তাদের মাথা থেকেই কেবল এ-সব কথা আসতে পারে। গনিমত মুসলমানের জন্য সবচে হালাল সম্পদ। তারা যুদ্ধ করেছে, ডাকাতি করেনি। অতএব প্রাপ্ত সম্পদ তাদের ন্যায্য অধিকার। এটা তো গর্বের বিষয় যে, মুসলমান বাহিনী বিজয় লাভ করে সম্পদ নিয়ে গেছে; হিন্দুরা তো নিজেদের পরম আরাধ্য সোমনাথকেও বাঁচাতে পারেনি, না সোমনাথ তাদের সামান্য কোনো উপকার করতে পেরেছে! এখন পরাজিত হয়ে কেউ যদি কান্নাকাটি করে বলে, আমাকে লুটে নিয়ে গেছে—এটা কেউ কেন শুনবে? যুদ্ধে জেতার সামর্থ্য যদি না-ই থাকে, তাহলে তরবারি উঠালে কেন? আত্মসমর্পণ করে নিতে পারতে।

সবচেয়ে বড় কথা, যুদ্ধ যখন তুমুল আকার ধারণ করেছিল। যখন সুলতান মাহমুদের বাহিনীর কাছে কাপুরুষ হিন্দুরা কচুকাটা হচ্ছিল, তখন পুরোহিতরা সুলতানকে অঢেল সম্পদের লোভ দেখিয়েছিল; আমরা যেমনটা উপরে পড়ে এসেছি। বাহিনীর অন্য অনেকে সেটা গ্রহণ করার পক্ষে মত দিলেও সুলতান সেটা মেনে নেননি। যদি সম্পদই তার নেশা হত, তাহলে কেন তিনি বাহিনীর খরচ বাঁচিয়ে তাদের দেয়া সম্পদ নিয়ে ফিরে গেলেন না? বরং তিনি যে লক্ষ্যে অভিযান করেছিলেন, সেটা অর্জন করার জন্যেই সম্পদের লোভ ত্যাগ করেন। এটা অশিক্ষিত মূর্খরাও বুঝবে।

মূলত এ-জাতীয় কটূক্তিকারী হিন্দুদের জবাব দেয়ারই প্রয়োজন নেই। এরা কখনোই সত্য বিষয়টা মানতে চাইবে না। এরা কাশ্মিরে আমাদের মারবে, গুজরাটে মারবে, দিল্লিতে আমার ঘর পোড়াবে, আমার দোকান তছনছ করে দেবে, আমাদের বাবরি মসজিদ গুঁড়িয়ে দেবে এবং বাধা দিতে গেলে নির্বিচারে আমার ভাইদের হত্যা করবে। এরপর সেটাকে বৈধতা দিতে মিথ্যা ইতিহাস ফাঁদবে। সোমনাথ মন্দিরকে ঘিরে ঘুরপাক খাওয়া প্রশ্নগুলো নিছক সেই স্বকর্ম-বৈধকরণেরই একটি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া। কিন্তু সত্যসন্ধানী ইতিহাসবিদদের কাছে সুলতান মাহমুদ একজন শ্রেষ্ঠ বিজেতা হিসেবে মহান হয়ে আছেন। সফল শাসক, দক্ষ কূটনীতিক এবং ধর্মভীরু মানুষ হিসেবে—তিনি আজও সকল যোদ্ধা ও শাসকের জন্য অমর হয়ে আছেন।

মানজিকার্টের যুদ্ধ
BATTLE OF MALAZGIRT

তারিখ:	৪৬৩ হিজরি / ১০৭১ খ্রি.
স্থান:	মানজিকার্ট, তুরস্ক
ফলাফল:	মুসলিম বাহিনীর বিজয়

পক্ষ-বিপক্ষ:	সেলজুক সাম্রাজ্য	বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য
সেনাপ্রধান:	আলপ আরসালান	রোমানোস
সেনাসংখ্যা:	১৫ হাজার	২ লক্ষ
ক্ষয়ক্ষতি:	অজ্ঞাত	অসংখ্য

মানজিকার্টের যুদ্ধ সেলজুক সাম্রাজ্যের ইতিহাসের অন্যতম প্রধান যুদ্ধ হিসেবে পরিচিত। ৪৬৩ হিজরির যিলকদ মাসে (আগস্ট, ১০৭১ খ্রি.) সুলতান আলপ আরসালানের নেতৃত্বে এ যুদ্ধে মুসলমানদের সম্মানজনক বিজয় লাভ হয়। বাইজান্টাইন বাহিনীর সেনাপ্রধান সম্রাট রোমানোস সেলজুক সুলতানের হাতে আটক হয় এবং এর মধ্য দিয়ে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের পতনের কফিনে প্রথম পেরেক ঠুকে যায়; যদিও সুলতান তাঁর মহানুভবতার পরিচয় দিয়ে সম্রাটকে মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দেন এবং বাইজান্টাইনে মুসলমানদের বিজিত এলাকায় সেলজুকদের শাসনের শর্ত দিয়ে আগামী পঞ্চাশ বছরের জন্য বাইজান্টাইনের সাথে সন্ধি করে নেন।

পূর্বালাপ

৪৫৫ হিজরি সাল। সেলজুক সাম্রাজ্যে স্থপতি এবং প্রথম স্বাধীন সুলতান তুগ্রিল বেগ কিছুক্ষণ আগে মৃত্যুবরণ করেছেন। মাথার কাছে রাখা তার ক্ষুরধার তলোয়ার, যা দিয়ে তিনি এই কিছুদিন আগেও বুয়িদ সাম্রাজ্যের শিয়াদের হটিয়ে বাগদাদ আবারও খলিফা কাইম বি-আমরিল্লাহর হাতে ফিরিয়ে দিয়েছেন। আর উপহারস্বরূপ খলিফার কাছ থেকে পেয়েছেন সুলতান উপাধি। সুলতান একটি আরবি শব্দ। যার অর্থ হয়—রক্ষাকবচ বা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত নেতা। তুগ্রিল বেগ মারা গিয়েছেন, খালি পড়ে আছে তার সিংহাসন। শিয়রে বসে আছেন তারই পালকপুত্র সুলাইমান আর বারান্দায় অস্থিরচিত্তে পায়চারি করছেন তুগ্রিল বেগের প্রধানমন্ত্রী আমিদুল-মালিক কুন্দুরি। সুলাইমান তুগ্রিল বেগের ভাই চেগরির সন্তান। নিজের সন্তান নেই বলে তিনি ভাইয়ের সন্তানকে নিজের কাছে এনে রেখে বড় করেছিলেন শাহজাদার সম্মান ও আদর দিয়ে।

মৃত্যুর আগে তুগ্রিল বেগ কুন্দুরির কাছে ওসিয়ত করে গিয়েছেন, তার মৃত্যুর পর মহান সেলজুক সিংহাসনে বসবেন তারই পালকপুত্র সুলাইমান। কিন্তু এটা নিয়েই বেশ চিন্তিত দেখাচ্ছে কুন্দুরিকে। কারণ তুগ্রিল বেগের চাচাতো ভাই কুলতামিশ এবং তারই আরেক ভাতিজা সুলাইমানের ভাই আলপ আরসালানও তুগ্রিল বেগের মৃত্যুর পর সিংহাসন নিজেদের অধিকারে নিতে চায়। কুন্দুরি নিজেকে সংযত করলেন এবং তুগ্রিল বেগের দাফন শেষ করে সুলাইমানকে নতুন সেলজুক সুলতান হিসেবে অভিষেক করালেন। উপর্যুপরি, তিনি আরও যে ভুলটা করলেন—খোরাসানে আলপ আরসালান বরাবর একটি চিঠি পাঠিয়ে কড়া হুঁশিয়ারি দিলেন, যাতে সে কোনোভাবেই সুলতান-বিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত না হয় এবং সুলাইমানকে সুলতান হিসাবে মেনে নিয়ে সাম্রাজ্যে কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির প্রচেষ্টা না করে। কিন্তু তার কয়েকদিন পরই কুন্দুরি খবর পেলেন, আলপ আরসালান তার বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে খোরাসান থেকে যাত্রা শুরু করেছেন রাজধানী রায় নগরী অভিমুখে এবং সে সিংহাসনের দখল নিতেও দৃঢ়প্রত্যয়ী। কুন্দুরি ভয় পেয়ে গেলেন এবং আরসালানের বশ্যতা স্বীকার করে নিয়ে মসজিদে মসজিদে আরসালানের নামে খুতবা দিতে আদেশ করলেন। আর সুলাইমান পালিয়ে গেলেন শিরাজ শহরের উদ্দেশে। ঠিক সেই প্রেক্ষাপটেই খবর এল আরেকটি বাহিনী নিয়ে কুলতামিশ এগিয়ে আসছেন সেলজুক রাজধানী রায় দখল করার জন্য। কে আর থামায় কাকে—বেঁধে গেল পরস্পরের গৃহযুদ্ধ!

কে তিনি?

তুগ্রিল বেগের পর সেলজুকদের মহান সুলতান হন—আলপ আরসালান, যিনি তুগ্রিল বেগের বড় ভাই চেগরির সন্তান ছিলেন। তার নামের অর্থ সিংহযোদ্ধা; তবে তার মূল নাম ছিল মুহাম্মদ। জন্ম ২০ জানুয়ারি ১০২৯। প্রাথমিক জীবনে তিনি তার চাচা তুগ্রিল বেগের সাথে ফাতেমীয় শিয়াদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হন। ১০৫৯ খ্রিস্টাব্দে বাবার মৃত্যুর পর তিনি খোরাসানের শাসক হিসেবে নিযুক্ত হন।

কুলতামিশ তার সৈন্যদের নিয়ে কুন্দুরির রাজবাহিনীকে হারিয়ে সিংহাসন দখল করে নেন। এরপর সামনে এগিয়ে দামঘান প্রান্তরে উপস্থিত হন আলপ আরসালানের যাত্রা থামিয়ে দিতে। পথে তিনি হাচিব এরদেম নামক আরসালানের জনৈক সেনাপতিকে তার ক্ষুদ্র বাহিনীসহ পরাজিত করেন। কিন্তু আরসালানের

সামনে আসতেই ঘটে বিপত্তি। তার বিশাল সেলজুক বাহিনী দেখে কুলতামিশের বেশিরভাগ সৈন্যই পালিয়ে যায়। অবশিষ্ট সামান্য সংখ্যক সেনা নিয়ে আপ্রাণ লড়েও পরাজিত হন কুলতামিশ। রাজধানী রায় দখল করে ২৭ এপ্রিল ১০৬৪ খ্রিস্টাব্দে সেলজুকদের নতুন সুলতান হিসেবে মসনদে বসেন আলপ আরসালান। ক্ষমতায় বসেই তিনি কুন্দুরিকে হত্যা করেন। এরপর ইবনে আলি আত-তুসিকে প্রধানমন্ত্রী ও নিজামুল মুলক সাম্রাজ্যের ব্যবস্থাপক হিসেবে নিয়োগ দেন। ইনিই ইতিহাস-বিখ্যাত সেই নিজামুল মুলক তুসি।

সেলজুক সুলতান হওয়ার পর আলপ আরসালান প্রথমেই যার কাছ থেকে বাধাপ্রাপ্ত হন, তিনি খোদ আব্বাসি খলিফা। খলিফা তাকে বাগদাদ ছাড়তে নানাভাবে চাপ দিতে থাকেন। মূলত সে সুলতানের ক্রমশ বর্ধিষ্ণু শক্তিকে নিজের প্রতিযোগী ভাবতে শুরু করেছিলেন। আদতে খলিফার তখন শক্তিমত্তা বলতে কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। অধিকন্তু তিনি অন্য মুসলিম সুলতানদের একযোগে সুলতান আলপ আরসালানের উপর আক্রমণের জন্য প্ররোচিত করতে থাকেন। কিন্তু বাকিরা আরসালানের বাহিনীর ভয়ে তার বিরুদ্ধে আঙুল ওঠানো থেকে নিজেদের বিরত রাখে। তুগ্রিল বেগ মৃত্যুর আগে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার লক্ষ্যে খলিফার মেয়েকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। আরসালান খলিফাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য তার মেয়েকে আবার বাগদাদে পাঠিয়ে দেন। খলিফা এবার সত্যিই ভয় পেয়ে ভড়কে যান। নতুন কোন প্ররোচনা খাটাবার আগেই আরসালানের সালতানাত মেনে নেওয়ার প্রকাশ্য ঘোষণা করেন।

খলিফার উপদ্রব থেকে মুক্তি লাভ করে এবার আরসালান তুগ্রিল বেগের মৃত্যুর পর মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা সাম্রাজ্যের নানাজনের বিদ্রোহ দমাতে অগ্রসর হন। প্রথমে তিনি জর্জিয়া শান্ত করেন; এরপর পূর্ব আনাতোলিয়ার দিকে এগিয়ে যান। এখানে তাকে সঙ্গ দেন তারই যোগ্য পুত্র শাহজাদা মালিক শাহ ও তার প্রধানমন্ত্রী। আনাতোলিয়া দখল করতে তাকে বেশ বেগ পেতে হয়। বাধ্য হয়ে ঘোরতর এক যুদ্ধেও জড়াতে হয়। কিন্তু শেষপর্যন্ত বিদ্রোহীরা পরাস্ত হয়। স্থানীয় সুলতানসহ বিদ্রোহীরা সুলতানের বশ্যতা মেনে নিতে বাধ্য হয়ে যায়। এরপর সুলতান কারস দখল করে সেখানে ইসলাম প্রচার করেন। এগিয়ে যান অ্যানি রাজ্যের দিকে। শহর দখলে নিতে তিনি শহরের প্রাচীরের বাইরে থেকে বোমার মতো করে উত্তপ্ত তেল ছুড়ে মারেন। লোকজন ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে অবিলম্বে আত্মসমর্পণ করে নেয়। সুলতান যখন একদিকে বিদ্রোহ দমন করতে ব্যস্ত, ঠিক তখনই তার সাম্রাজ্যের

কিরামান, হাউতেল্লান আর সোগানিয়ান এলাকা নতুন করে বিদ্রোহের ঘোষণা দেয়। সুলতান সেদিকে গিয়ে প্রদেশগুলোর ক্ষমতা পুনর্দখল করেন। তারপর একে একে গুরগেন্স, ম্যাঙ্গিস্লাক প্রভৃতি শহরগুলোও সফলভাবে নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন।

১০৬৫ খ্রিস্টাব্দে ভলগা আলফ থেকে খাওয়ারিজম এর কিছু অঞ্চল দখল করে ছেলে মালিক শাহকে দায়িত্ব দিয়ে নিজে জেন্দের দিকে এগিয়ে যান। ওদিকে গিয়েই খান ইব্রাহিম থেকে মাভেরান নগরের কিছু অংশ নিজের সাম্রাজ্যে অন্তর্ভুক্ত করেন। ১০৬৬ খ্রিস্টাব্দের দিকে তার সেনাবাহিনী বাইজান্টাইনে ছোট ছোট আক্রমণ শুরু করে। তার সেনাপতি গোমস্তগিন এডেসা আক্রমণ করে তা দখল করে নেয় এবং ওখানকার শাসককে বন্দি করে নেয়। পরে ২০০০০ দিনারের বিনিময় করে তাকে তার রাজ্যে ফিরিয়ে দেয়।

বাইজান্টাইনে কী ঘটছে তখন?

১০৬৭ খ্রিস্টাব্দের দিকের ঘটনা। পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের রাজা ১০ম কন্সটান্টিন মাত্র মারা গিয়েছে। রোমান সাম্রাজ্যের ভার পড়েছে কন্সটান্টিনের বিধবা স্ত্রী ইউডোকিয়ার উপর। এই সুযোগে ইউডোকিয়াকে বিয়ে করে ১০৬৮ খ্রিস্টাব্দে রানিসমেত রাজ্য লাভ করে রোমানোস ৪র্থ। তার ক্ষমতা লাভে কিছুটা বিরক্তি ও ক্রোধের থাপ দেখা যায় জর্জিয়ার প্রয়াত শাসক ডুকাসের ছেলে এন্ড্রুনিকাস ডুকাসের কপালে। কিন্তু এন্ড্রুনিকাস তখনই কোনো প্রতিক্রিয়া না করে নিজেকে সামলে নেয় এবং সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। অন্যদিকে সেলজুকরা তখন মিশরি ফাতেমি সাম্রাজ্যের শিয়াদের সাথে লেভান্টে যুদ্ধরত। রাজা হয়েই রোমানোস সেলজুকদের দুর্বলতার এই সুযোগকে কাজে লাগাতে চায়। তাদেরকে আজীবনের জন্য চুপ করিয়ে দিতে ইরান, খোরাসান, ইরাক এবং সিরিয়া দখল করতে উদ্যত হয় সে। এই উপলক্ষে ১০৬৮ সালের মার্চ মাসে প্রায় ২০০০০০ সৈন্য নিয়ে কায়সেরিয়ার উদ্দেশে রওনা করে রোমানোস। কিন্তু পথে নেমেই সে খবর পায়, সেলজুকরা তার সাম্রাজ্যের নিউ-কায়সারিয়া দখল করে নিয়েছে। সহসা সে আবার উত্তর দিকে বাহিনীর মোড় ঘুরিয়ে দেয় এবং তেফ্রিকে গিয়ে তার আরেক বাহিনীর সাথে মিলিত হয়। এরপর সেলজুকদের হাত থেকে হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধার করে নেয়।

মানজিকার্টের যুদ্ধ

৪৫৫ হিজরিতে ক্ষমতার মসনদে বসার পর থেকেই চাচা তুগ্রিল বেগের বিশাল সাম্রাজ্য সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। সীমান্তগুলোর সুরক্ষা, বিদ্রোহীদের দমন এবং রোমানদের কূটচাল থেকে সেলজুক সালতানাতের হেফাজতেই কেটে যায় তার বেশকিছু বছর। তবে সীমান্তে শ্বাস ফেলা রোমান শত্রুদের দম্ভ চূর্ণ করতেও তিনি সমানভাবে তৎপর ছিলেন। যেখানেই তাদের অতিরিক্ত আস্ফালন লক্ষ করেন, সেখানেই তিনি জ্বলে ওঠেন আপন মহিমায়। এভাবে সময়ের আবেদনে তিনি ও তাঁর সেনারা রোমানদের বেশকিছু অঞ্চলে তিনি দখলদারি কায়েম করে ফেলেন। রোমান রাজ্য ছাড়াও তখন বিভিন্ন দিতে সেলজুক সাম্রাজ্যের ডালপালা কেবলই বিস্তৃতি পাচ্ছে ক্রমান্বয়ে। এমনিতেই সেলজুক সীমানায় চোখ বিছিয়ে রাখা নতুন সম্রাট রোমানোসের জন্য যা অসহ্যকর হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু সে বুঝতে পারে, সেলজুকের এই উত্থান সহজে রুখে যাবার নয়। তবে যদি এভাবেই চলতে থাকে, তাহলে সেলজুক সেনাদের তোপের সামনে একসময় ধূলিস্যাৎ হয়ে যাবে রোমান সাম্রাজ্যের পুরোটা। ফলে সে উত্তর শামের বিভিন্ন এলাকায় তার পূর্ব আক্রমণ জোরদার করে, সেলজুকদের মনোযোগ রোমান রাজ্য থেকে ফিরিয়ে রাখার সিদ্ধান্ত নেয়।

সে মতে বাইজান্টাইনের অন্যতম সেনাপতি ম্যানুয়াল কমিনসকে সেলজুকদের মুখোমুখি যুদ্ধের জন্য পাঠায় রোমানোস। সে সেলজুকদের সাথে প্রথম মুখোমুখি হয় তেফ্রিকে। যুদ্ধে ঘটনাক্রমে রোমান বাহিনী জয়লাভ করে। ফলে তারা সাহস পেয়ে যায় এব সিরিয়ার দিকে এগিয়ে গিয়ে মানবিজ শহর দখল করে। এরপর সেখানে নির্মম ধ্বংসযজ্ঞ এবং নৃশংস গণহত্যা চালায়।

এই খবর আলপ আরসালানের কানে গিয়ে পৌঁছায়। তিনি দেরি না করে তার সৈন্যবাহিনী সাথে করে প্রতিশোধ নিতে এগিয়ে আসেন। ইকুনিয়ামের কাছে কোনো এক স্থানে সেলজুকরা রোমানদের পরাজিত করে। যুদ্ধে ম্যানুয়াল কমিনস ধরা পড়ে। কিন্তু মহানুভব সুলতান তার সাথে শান্তিচুক্তি করে তাকে সেবারের মতো মুক্তি দিয়ে দেন। ১০৭১ খ্রিস্টাব্দের দিকে রোমানোস ম্যানুয়েলের সাথে করা সেলজুকদের শান্তিচুক্তি ভঙ্গ করে পুনরায় সেলজুক সাম্রাজ্যের উপর চড়াও হয়। সে মনে করে, সেলজুকদের দমাতে হলে বিরাট রণক্ষেত্র তৈরি করতে হবে। তাদের ছোটখাট কোন এলাকা নয়, দখল করতে হবে তাদের সদর দপ্তর রায় নগরী।

সে-মতে রোমানোস যুদ্ধের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে কিছু গুপ্তচরকে চুক্তি নবায়ন করার কথা বলে সেলজুক সাম্রাজ্যের রাজধানীতে পাঠায়। তার মূল উদ্দেশ্য ছিল সেলজুকদের সামরিক অবস্থা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা। আলপ আরসালান তখন ফাতেমিদের সাথে ঝামেলা মেটাতে ব্যস্ত। সুযোগে গুপ্তচররা তাদের কাজ সেরে যায় সালতানাতের প্রাসাদ থেকে।

শক্তির দম্ভ : দম্ভের দুর্বলতা

রোমানিয়াস প্রায় ১০০০০০ বা মতান্তরে তার চেয়ে বেশি সৈন্য [১] নিয়ে সেলজুকদের দিকে এগিয়ে আসে। তার বাহিনীতে যোগ দেয় ফরাসি, বালগারি, পারসিক, রুশ এবং ইউনানিসহ আরও বহু জাতির বহু সেনা। সব সেনাকে একত্র করে সে দম্ভের সাথে কন্সটান্টিনোপল ত্যাগ করে। ইবনে কাসির রহিমাহুল্লাহর বর্ণনামতে, রোমান বাহিনীর অস্ত্রশস্ত্র বহন করছিল প্রায় দুই হাজার গরুর গাড়ি। স্বভাবসুলভ হিংসা থেকে সে ভেবে নিয়েছিল, সেলজুকদের পরাজয় সুনিশ্চিত। মূলত তার সেনাসংখ্যা ও সরঞ্জামের আধিক্য তাকে প্রবঞ্চিত করেছিল। রোমানোসের সেনাপতিরা তাকে দ্রুত অগ্রসর হতে বাধা দেয়। বলে, আপনি আরও ভেবেচিন্তে আস্তেধীরে এগোন। কিন্তু রোমানোস তাদের বাধাকে অগ্রাহ্য করে সরাসরি মানজিকার্টে [২] গিয়ে তাঁবু ফেলে এবং তার সৈন্যবাহিনীকে দুইভাগে বিভক্ত করে নেয়।

রোমানোসের মানজিকার্টে আসার কথা শুনে আলপ আরসালান দ্রুত রাজধানীতে ফিরে আসেন। খোঁজখবর নিয়ে তিনি জানতে পারেন রোমানোসের বৃহৎ প্রস্তুতির কথা। তার ভয় ধরে যায় মনে। এদিকে সেলজুক বাহিনীতে সেনাসংখ্যা মাত্র পনেরো হাজার। তিনি প্রথমে রোমান বাহিনীর সামনের অংশে কিছু টুকরো হামলার নির্দেশ দেন, কিন্তু তখনো চূড়ান্ত যুদ্ধের জন্য তিনি সিদ্ধান্ত নেননি। তাঁর ইচ্ছে ছিল, রোমানদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের শক্তিমত্তা এখনো কতটা বাকি—সেটা খানিক বাজিয়ে দেখা। প্রাথমিক এই হামলাগুলো যদিও সফল হয়, কিন্তু আলপ আরসালান তারপরও এত বড় বাহিনীর সাথে বিভিন্ন রাজনৈতিক কারণেই যুদ্ধে জড়াতে চান না। অনেক ঐতিহাসিকের মতে—সে-জন্য তিনি সন্ধির প্রস্তাব দিয়ে

---

[১] সৈন্য সংখ্যা নিয়ে বেশ কয়েকটি মত আছে। তবে নির্ভরযোগ্য মত হলো, রোমানোসের সেনা ছিল দুই লক্ষ। *আল-কামিল ফিত-তারিখ*, ৮/৩৮৮

[২] বর্তমানে পূর্ব তুরস্কের অন্তর্গত একটি শহর, যাকে সেখানে সকলে 'মালাজগির্ত' নামে চেনে।

রোমানোসের কাছে একজন দূত পাঠান। অহংকারে অন্ধ রোমানোস কোনোভাবেই সন্ধিপ্রস্তাব মেনে না নিয়ে দাম্ভিকতার সাথে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়ে দেয়। নিজের বাহিনীর বিজয়ে সে এতটা আত্মপ্রত্যয়ান্ধ ছিল যে, সুলতানের দূত কী বলছে, তা শোনারও প্রয়োজন বোধ করে না। বলে দেয়, সন্ধি হলে সেলজুকদের রাজধানী রায় শহরে গিয়েই হবে। এখানে কোনো সন্ধি নেই।

অবশেষে যুদ্ধ

সুলতান বুঝতে পারলেন, যুদ্ধ না করে উপায় নেই। কিন্তু তাকে খানিকটা চিন্তিত দেখাল। সেলজুক সালতানাতের ফকিহ ও ইমাম আবু নসর মুহাম্মদ ইবনু আবদিল মালিক সুলতানের চিন্তা বুঝতে পেরে কাছে আসেন। তার মনোবল চাঙ্গা করতে বলেন: 'আপনি তো আল্লাহর দ্বীনের পক্ষে যুদ্ধ করেন; যে দ্বীন অন্য সব ধর্মের উপর বিজয়ী হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ। সুলতান, বিষণ্ণ হবেন না। আমার বিশ্বাস, এবারও আল্লাহ আপনার জন্য বিজয়ের ফায়সালা রেখেছেন। আগামী জুমাবার সূর্য হেলে পড়বে যখন, ইসলামি সাম্রাজ্যের মিম্বরগুলোতে যখন খুতবা হবে—ঠিক সেই সময়টায় আপনি তাদের সাথে মিলিত হোন। জুমার সময় খতিব সাহেবরা সকল মসজিদে ইনশাআল্লাহ মুজাহিদদের বিজয়ের জন্য দুআ করবে। এ-সময় তাদের দুআ আল্লাহ কবুল করবেন।'

মানজিকার্টের ময়দানে

৪৬৩ হিজরির যিলকদ মাসের শেষ দিক। ইমাম আবু নসর আল-বুখারির ইমামতিতে নামায পড়লেন সুলতান ও তার সেনাদল। নামাযের পর উপরের দিকে হাত তুলে অঝোরে কাঁদলেন তিনি; কাঁদল পুরো সেলজুক সেনাবাহিনী। সকলে মিলে বিজয়ের মালিকের কাছে বিজয় তামান্না করলেন। এরপর সুলতান সাদা রঙের কাপড় গায়ে জড়িয়ে বললেন: 'যদি আমি শহিদ হই, তবে এটাই আমার কাফন হবে।' এরপর বাহিনী নিয়ে আল্লাহর নামে বেরিয়ে পড়লেন মানজিকার্টের দিকে।

এ সময় সুলতানের সেনাদের সাথে যোগ দেয় তার পুত্র মালিক শাহর অধীনে থাকা ১০০০০ সৈন্য। প্রায় ৩০ হাজার সেনা নিয়ে আলপ আরসালান রোমানোসকে বাধা দিতে এগিয়ে চলেন। এদিকে রোমানোস তার বাহিনীকে দুইভাগে ভাগ করে

৩০০০০ সৈন্যের একটি দল পাঠিয়ে দেন ল্যাক ভ্যানের (lake van) পশ্চিমে। কারণ, তার ধারণা ছিল—সুলতান আলপ আরসালান এদিক দিয়ে আক্রমণ করবে। কিন্তু সুলতান যে কী চিজ ছিলেন, তা বোঝার সাধ্য আসলেই বেচারার ছিল না। সুলতান ল্যাক ভ্যানের পশ্চিম পাশে না গিয়ে আপেক্ষিক খারাপ রাস্তা ধরে পূর্ব দিক দিয়ে সামনে এগোন এবং বহু চড়াই-উৎরাই ডিঙিয়ে ল্যাক ভ্যান পার হয়ে রোমানোসের অপেক্ষাকৃত দুর্বল বাহিনীতে অতর্কিত আক্রমণ করেন। তাদেরকে একচোট পরাজিত করে তিনি ময়দানে রোমানদের মুখোমুখি এসে দাঁড়ান।

রোমানোস তার বাহিনীকে চার ভাগে বিভক্ত করল। রাইট ফ্ল্যাংকের দায়িত্বে ছিল রাসেল-ডি-বাইল্লুল, লেফট ফ্ল্যাংক ব্রায়েন্নিয়াস, মাঝখানে ইনফ্যান্ট্রিতে সম্রাট নিজে এবং পেছনে রিজার্ভ বাহিনীর জন্য এন্ড্রুনিকাস ডুকাস। রোমানোস প্রথমে নিজে ময়দানে না গিয়ে তার এক সেনাপতি বাসিলাসকে পাঠান। সেলজুকরা তাকে পরাজিত করেন। এবার রোমানোস তার পাখির ডানার শেইপের বাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসেন। কিন্তু সেলজুকরা চালাকি করে সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত না হয়ে বরং Heat and Run টেকনিকে পেছনে জায়গা দিয়ে সরে যান। ফলে রোমানোসের বাহিনী তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। এদিকে রিজার্ভ বাহিনী তখনো যুদ্ধে অংশ নেয়নি। এভাবেই রোমানোস সেলজুকদের পিছু হটাতে হটাতে তাদের তাঁবু পর্যন্ত নিয়ে আসেন। সূর্য গড়িয়ে ক্রমশ সন্ধ্যা হয়ে আসে। রোমানোস তার বাহিনীকে তাঁবুতে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেন। তিন বাহিনী আলাদা আলাদা থাকাতে রোমানোসের কথায় বাহিনীতে একপ্রকার গোলযোগ সৃষ্টি হয়। রাইট উইং সম্রাটের কথা না শুনতে পেয়ে তখনো ময়দানে যুদ্ধ চালাতে থাকে, অথচ বাকিরা ময়দান ছেড়ে যাচ্ছে। এই সুযোগে সেলজুকদের সেন্ট্রাল বাহিনী দৌড়ে গিয়ে ঘিরে ফেলে রোমানোসের রাইট উইংকে। রোমানোস খবর পেয়ে সাহায্যার্থে এগিয়ে আসার আগেই রাইট উইংকে পাইকারি হারে যমালয়ে পাঠিয়ে দেয় সেলজুক সেনারা। রোমান বাহিনীর সবখানে ছড়িয়ে পড়ে রোমানোস পরাজিত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে। ফলে ল্যাফট উইং ময়দান ছেড়ে পালায়। ওদিকে রিজার্ভ ফোর্সের দায়িত্বে থাকা এন্ড্রুনিকাস রোমানোসের প্রতি পূর্বশত্রুতার সূত্র থেকে এই সুযোগে ময়দান ছেড়ে তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে চলে যায়।

রোমানোসের বাকি সেনাদের সেলজুকরা চারপাশ থেকে ঘিরে ধরে। সন্ধ্যার লালের সাথেসাথে মানজিকার্টের জমিন কাফেরের রক্তে লাল হয়ে ওঠে। অন্ধকার নেমে আসার আগেই রোমানদের ল্যাঠা চুকে যায়। ময়দানে যত্রতত্র পড়ে থাকে পরাজিত

সেনাদের লাশ। বন্দি হয় সম্রাট রোমানোস। সেনারা তাকে ধরে এনে আলপ আরসালানের তাঁবুর সামনে ফেলে রাখে।

সুলতান জিজ্ঞেস করেন: 'আমি তোমার হাতে বন্দি হলে, আমার সাথে কেমন আচরণ করবে বলে ভেবে রেখেছিলে?'

রোমানোস বলে: 'আমি খুবই খারাপ কিছু করতাম।'

সুলতান: 'আমি এখন তোমার সাথে কী করব বলে তুমি মনে করো?'

রোমানোস: 'আমাকে হত্যা করে ফেলবে বা শামের শহরগুলোতে আমাকে বেঁধে ঘোরাবে। আরেকটা কাজ করতে পারো, কিন্তু সেটা একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার তোমার পক্ষে। তা হলো, মুক্তিপণ নিয়ে আমাকে ছেড়ে দেবে এবং আমাকে তোমার প্রতিনিধি নির্বাচন করবে।'

সুলতান: 'আমি এর বাইরে কিছু ভাবছি না।'

রোমানোসের মুক্তি

সুলতান সকলকে অবাক করে দিয়ে রোমানোসকে ক্ষমা করে দিলেন। তার কাছে ইসলামের সৌন্দর্য ও মাহাত্ম্য তুলে ধরলেন এবং কয়েকটি শর্তে তার সাথে শান্তি চুক্তি করে নিলেন। শর্তগুলো ছিল—

- এন্টিয়ক, এডেসা, হিরাপোলিস এবং মানজিকার্টের অধিকৃত রাজ্যগুলো সুলতানের জন্য ছেড়ে দিতে হবে।
- প্রথমবারে মুক্তিপণস্বরূপ ১.৫ মিলিয়ন স্বর্ণ মুদ্রা এবং বাৎসরিক
- লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা সুলতানকে জিযিয়া হিসেবে পাঠাতে হবে।
- সুলতানের ছেলে এবং রোমানোসের মেয়ের বিয়ে দিতে হবে।
- রোমানদের কারাগারে আটকে থাকা সকল মুসলিম বন্দিদের অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে।

- এই শান্তিচুক্তির সময়সীমা আগামী পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত বলবৎ থাকবে এবং সেটা অবশ্যই রক্ষা করতে হবে।

শান্তিচুক্তির পর সুলতান রোমানোসকে অনেক উপহারসামগ্রী দিয়ে আবার কন্সটান্টিনিপোলে ফেরত পাঠান। সফরে খরচ করার জন্য বড় অংকের সম্পদ দেন এবং সুন্দর একটি ঘোড়ায় চড়িয়ে তাকে সসম্মানে বিদায় জানিয়ে দেন।

কিন্তু কন্সটান্টিনিপোল এ ততক্ষণে অন্য গল্প দাঁড়িয়ে গেছে। মানজিকার্টের পরাজয়ের খবর পৌঁছে যাবার পর ওখানের লোকেরা ৭ম মাইকেলকে তাদের নতুন রাজা হিসেবে ঘোষণা করে দিয়েছে। রোমানোস তার রাজ্যে পৌঁছালে এন্ড্রুনিকাস আর মাইকেল মিলে তার চোখ অন্ধ করে দেয় এবং প্রত্যন্ত এক দ্বীপে তাকে নির্বাসন করে দেয়। ১০৭২ খ্রিস্টাব্দে রোমানোস সেখানেই মারা যায়।

মানজিকার্ট যুদ্ধের প্রভাব ও ফলাফল

মানজিকার্টের যুদ্ধ শুধু আনাতোলিয়াই নয়, বরং পরবর্তী সময়ের উসমানি সাম্রাজ্যের জন্যও একটি অন্যতম গুরত্বপূর্ণ ঘটনা। কারণ, এর মাধ্যমে বাইজান্টাইন সম্রাজ্য প্রায় মুখ থুবড়ে পড়ে এবং আনাতোলিয়ার প্রবেশদ্বার মুসলিম তুর্কিদের জন্য খুলে যায় আজীবনের জন্য। তুর্কিরা ধীরে ধীরে সেখানে তাদের জায়গা পাকাপোক্ত করে নেয়। কোনিয়া, আক, কোতাহিয়াসহ বড় বড় রাজ্য জয় করে তারা ক্রমশ মধ্য এশিয়ার ভেতরে ঢুকে যেতে থাকে। এরপর সেখানে সেলজুকদের নতুন শাখা 'রোমান সেলজুক সালতানাত' প্রতিষ্ঠা করে নেয়। যে শাখা সালতানাতের শাসকেরা মানজিকার্ট বিজয়ের পরবর্তী দুই শতাব্দী অব্যাহতভাবে সেখানকার শহরগুলো শাসন করে গেছেন। তাদের শাসিত সে অংশগুলো আজও বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে।

বদর, ইয়ারমুক, কাদিসিয়া, হিত্তিন, আইন জালুত ইত্যাদি ঐতিহাসিক যুদ্ধের কাতারে জায়গা করে নেয় মানজিকার্ট; মুসলমানদের যে যুদ্ধগুলো সমসময়ের ইতিহাসের রোখ পাল্টে দিয়েছিল; নির্ধারণ করে দিয়েছিল সময়ের নতুন গতিপথ। এ যুদ্ধের মাধ্যমে মুসলমানদের পদানত হয় রোমান সাম্রাজ্যের অধিকাংশ রাজ্য। পৃথিবীতে তাদের দম্ভ, অহংকার একেবারে ধুলোয় মিশে যায়। তারা পরবর্তী কোনো সময়েই আর মুসলমানদের গলার কাঁটা হয়ে উঠতে পারেনি। এভাবে অনুগত রাষ্ট্র হিসেবে বেঁচে থেকে একসময় উসমানি সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহের হাতে

পতনের চূড়ান্তে পৌঁছে যায় বাইজান্টাইন।

পাশাপাশি এ যুদ্ধ ক্রুসেড যুদ্ধের প্রথম সম্ভাবনা তৈরি করে উভয় জাতির ভেতর। সেলজুকদের শক্তিশালী করে রোমান সাম্রাজ্যকে অনাগত যুদ্ধের অনিবার্য ফলাফলের কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়। এ যুদ্ধের ফলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ক্ষেত্রে পশ্চিম ইউরোপ তার পূর্ব ফটকের পরাজিত রক্ষীদের উপর আর ভরসা করতে পারে না। বরং তারা নিজেরাই মুসলমানদের বিরুদ্ধে বড় কোনো যুদ্ধের ছক আঁকতে শুরু করে। শতাব্দীকালের সেই হিংস্র চারাগাছই একসময় প্রথম ক্রুসেডের জন্ম দেয়।

মহানুভব সুলতানের মহাপ্রয়াণ

মানজিকার্ট যুদ্ধের পরের বছর। ১০৭২ খ্রিস্টাব্দে ১৫ই ডিসেম্বর ইসলামের এই মহান বীর ইহকালের মায়া ত্যাগ করে মহামহিম আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যান। মার্ভ শহরে তাকে দাফন করা হয়। সুলতান আলপ আরসালানের মৃত্যুর পর মসনদে বসেন তাঁর সুযোগ্য পুত্র মালিক শাহ সেলজুকি; পশ্চিমারা যাকে দ্যা গ্রেট উপাধিতে স্মরণ করে থাকে। ইতিহাস বলে, এই মালিকশাহের শাসনামলে সেলজুক সাম্রাজ্য তার বিস্তৃতি ও উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে যায়।

সুলতান আলপ আরসালান যত বড় যোদ্ধা ছিলেন, ঠিক ততখানি মায়া ও মহানুভবতা ছিল তাঁর মনে। শত্রুকে হাতের কাছে পেয়েও ছেড়ে দেওয়ার যে উদাহরণ তিনি রেখে গিয়েছেন, ওমর খৈয়াম সে ঘটনায় নিজের মুগ্ধতার বয়ান দিতে গিয়ে বলেন:

মরুভূমির মধ্যে গিয়ে একটি যদি শহর গড়ো;
একটি হৃদয় সুখী করা তার চাইতেও অনেক বড়।

আনাতোলিয়ার দরজা খুলে দিয়ে তুর্কিদের যেই জয়রথের যাত্রা শুরু করেছিলেন আলপ আরসালান, তারই সুদূরপ্রসারী অনিবার্য ফল ছিল উসমানি খিলাফত। যুগ যুগ ধরে মানুষের হৃদয়ের পাতায় এবং ইতিহাসের প্রস্তরখণ্ডে আলপ আরসালান একজন মহানুভব সুলতান হিসেবেই বাস করবেন!

আন্দালুসের যুগ

৯২-৮৯৭ হি.

৭১১-১৪৯২ খ্রি.

যাল্লাকার যুদ্ধ

BATTLE OF SAGRAJAS

তারিখ:	৪৭৯ হিজরি / ১০৮৬ খ্রি.
স্থান:	যাল্লাকার প্রান্তর
ফলাফল:	মুসলিম বাহিনীর বিজয়

পক্ষ-বিপক্ষ:	মুরাবিতিন সাম্রাজ্য	ক্যাস্টোলা রাজ্য
সেনাপ্রধান:	ইউসুফ বিন তাশফিন	ষষ্ঠ আলফোন্সো
সেনাসংখ্যা:	৪৮ হাজারে মতো	৬০ হাজারের মতো
ক্ষয়ক্ষতি:	কয়েক হাজার শহিদ	অধিকাংশ সেনা নিহত, শ পাঁচেক সৈন্যের জীবন্ত পলায়ন

৪৭৯ হিজরির ১২ই রজব মোতাবেক ২৩ অক্টোবর ১০৮৬ খ্রিস্টাব্দে মুতামিদ ইবনু আব্বাদের নেতৃত্বে মুরাবিতিনরা কাস্টলি সম্রাট ৭ম আলফোন্সোর সাথে যাল্লাকার ময়দানে আন্দালুসে ইসলামের ভবিষ্যত বিনির্মাণমূলক তাৎপর্যপূর্ণ এক যুদ্ধে মুখোমুখি হয়।

যাল্লাকা শব্দের অর্থ, পিচ্ছিল জায়গা। আন্দালুসের দক্ষিণে অবস্থিত ঐতিহাসিক এ ভূমিটুকুর এমন নামকরণের কারণ হিসেবে বলা হয়, ৪৭৯ হিজরির যুদ্ধে নিহতদের রক্তে ময়দান পিচ্ছিল হয়ে যাওয়ায় যোদ্ধারা বারবার পিছলে পড়ে যাচ্ছিল। সেই থেকেই জায়গাটিকে আরবরা যাল্লাকা নামে স্মরণ করে আসছে। যাল্লাকার এই রক্তপিচ্ছিল যুদ্ধ আন্দালুসের ইসলামি ইতিহাসে যোগ করেছিল নতুন মাত্রা। এ যুদ্ধ ইসলামি কতিপয় বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠীকর্তৃক শাসিত ভূমিতে ক্রুসেডারদের ধারাবাহিক আক্রমণ বন্ধ করে দেয় এবং আন্দালুসে ইসলামি সাম্রাজ্যের পতন পরবর্তী আড়াই শতাব্দীর জন্য প্রলম্বিত করে দেয়।

যুদ্ধের আগে

ততদিনে আন্দালুসে উমাইয়া শাসনের সমাপ্তি হয়েছে। খিলাফতের এই বিরতিকালে গোষ্ঠীকেন্দ্রীক কিছু বিচ্ছিন্ন মুসলিম শাসকেরা সেখানে ইসলামের শাসন টিকিয়ে রেখেছে। নির্দিষ্ট সাম্রাজ্যের নিয়মতান্ত্রিক শাসনবহির্ভূত এই সময়টা, ইতিহাসে নিজেদের বহু লড়াই ও রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধের সাক্ষী হয়ে আছে। আপসের এই বিরোধপূর্ণ অবস্থান আন্দালুসে যেমন ইসলামের অবস্থানকে নাড়িয়ে তুলেছে, সাময়িকভাবে দুর্বল করে দিয়েছে; তেমনি সুযোগসন্ধানী খ্রিস্টানদের সুযোগ করে দিয়েছে উত্তরে তাদের সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি বাড়ানোর।

আন্দালুসে উমাইয়া পতনের এই সময়ে মুসলমানরা যখন পরস্পরবিচ্ছিন্ন হয়ে

মতবৈরিতায় লিপ্ত, ঠিক তখনই খ্রিস্টানদের প্রধান দুই শাসক সম্প্রদায় লায়ন ও ক্যাস্টল প্রথম ফার্ডিনান্ডের হাতে ঐক্যের শপথ করছে এবং সে ঐক্যের ভিত্তিতে ভূমি-পূনর্দখল-যুদ্ধ তথা আন্দালুসকে মুসলমানদের হাত থেকে ছিনিয়ে খ্রিস্টানদের পক্ষে নিয়ে আসার যুদ্ধের ব্রত নিচ্ছে তারা।

রাজা ফার্ডিনান্ড মারা গেছে ততদিনে। ছেলে সপ্তম আলফোন্সো হাতে তুলে নিয়েছে বাবার অপূর্ণ দায়িত্ব। ভূমি পুনর্দখলের যুদ্ধ ধারাবাহিকতা পেয়েছে তার হাতে। ৪৭৮ হিজরিতে আন্দালুসে মুসলমানদের অন্যতম বড় কেন্দ্র এবং গুরুত্বপূর্ণ সামরিক শহর টলেডো দখল করে নেয় আলফোন্সো। টলেডো শহরটির পতন আন্দালুসে মুসলিমশাসিত অন্য শহরগুলোতে মন্দ কিছুর বার্তা শুনিয়ে যায়। এর সবচে বড় কারণ ছিল, টলেডো দখলের পর আলফোন্সোর হিংসাত্মক এলান। সে বলেছিল: 'এটা মনে করার কারণ নেই যে, টলেডোর পতন আমাকে শান্ত করে দিয়েছে। আমি আন্দালুসের বাকি শহরগুলোকে অবনমিত না করে শান্ত হব না। এই কর্ডোভা আমার পায়ে এসে পড়বে এবং মুসলমানদের রাজধানীও টলেডোর পরিণতি বরণ করবে।'

কিন্তু আলফোন্সোর হাতে টলেডোর এই পতনের চেয়ে দুঃখের ব্যাপার ছিল আন্দালুসের কোনো শাসকই শহরটি পুনরুদ্ধারের আগ্রহ দেখায়নি; বরং এক্ষেত্রে তাদের চিন্তা ও অবস্থান ছিল লজ্জাজনক। এমনকি তাদের কেউ কেউ সরাসরি আলফোন্সোর দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। কেউ মনে করে, আমাকে আমার রাজ্যে নিরাপদ থাকতে হলে আলফোন্সোর সাথে সখ্য গড়ার বিকল্প নাই। তাই তারা তাকে মিত্র হিসেবে নিয়ে নেয় এবং বাৎসরিক কর প্রদানে সম্মত হয়ে যায়। আরও কষ্টের কথা হলো, অনেক মুসলিম শাসক টলেডোর পতনের ক্ষেত্রেও আলফোন্সোকে সেনা ও সরঞ্জাম সরবরাহ করে এবং লাজলজ্জার মাথা খেয়ে এক মুসলিম শাসক তার মেয়েকে আলফোন্সোর গোপন কক্ষে কুকর্মের জন্য পাঠিয়ে দেয়!

আন্দালুসের মুসলিম শাসকদের এমন তোষামোদী আচরণে আলফোন্সো বুঝতে পারে, তারা কতটা দুর্বল এবং কাপুরুষ। সে বুঝতে পারে, এরা নিজেদের রাজ্য টিকিয়ে রাখতে প্রয়োজনে নিজের ধর্মের জলাঞ্জলি দিতেও পুরোপুরি প্রস্তুত। এদের ভেতরে জমে গেছে পার্থিব বিলাস ও দুনিয়ার জাঁকজমক। জিহাদের প্রতি অনুরাগ তাদের শূন্যের কোঠায় চলে গেছে; অথচ সেটাই তাদের একমাত্র সম্মানের পথ ছিল, এ পথেই তারা অবশিষ্ট দ্বীন, ঈমান এবং মানবতাটুকু বাঁচাতে পারত। এজন্য

সুদূরপ্রসারী চিন্তা করল আলফোন্সো। ভাবল, চূড়ান্তভাবে ধ্বংস করার আগে এদের চেতনার গিঁটগুলো আগে ঢিলে করে দিই। পৃথিবীর বুক থেকে হটানোর আগে এদের বুকের ভেতরই এদেরকে হত্যা করে ফেলি। প্রথমে সে রাজ্যলোভী মুসলিম শাসকদের কোষাগার উজাড় করতে চাইল। মোটা অংকের কর আরোপ করে তাদের হাতের ঘণ্টিও লুটে নিতে উদ্যত হলো। এরপর নামে-বেনামে গুপ্ত হামলা করে বিভিন্ন গোষ্ঠী দ্বারা চুরি ডাকাতি করিয়ে লুফে নিতে চাইল তাদের ক্ষেত-খামার এবং ফসলের স্তুপ। বিভিন্ন কায়দা করে ধীরে ধীরে কেড়ে নিতে চাইল তাদের ভূমিরাজ্যের সবটুকু। এরপর সুযোগ বুঝে তাদের উপর হামলে পড়তে চাইল চিরতরে; যাতে তাদের দুর্গ, প্রাসাদ এবং জায়গিরদারির পাশাপাশি আন্দালুস থেকে মিটে যায় তাদের চিন্তা ও চেতনার সকল পদচিহ্ন।

মনে হলো, আলফোন্সো তার চিন্তায় সফলও হয়ে গেল। তার চোখের সামনে নির্বোধ মুসলিম শাসকেরা ক্রমান্বয়ে দুর্বল হতে থাকল। তার সাথে মিত্র গড়তে আসা কাপুরুষদের হেয় করে সে বলত: 'আসো আসো! এমন জাতিকে আমি কী করে আনুকূল্য না করে থাকি, যারা নিজেদেরকে খলিফা বা শাসক নাম তো দেয়, কিন্তু না নিজেকে বাঁচাতে অস্ত্র তোলে, না অধীনস্তদের উপর ধেয়ে আসা অন্যায় ও অত্যাচার দূর করতে কোন কার্যকর চিন্তা করে!' এমন তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যমূলক কথা বলে বলে সে আত্মমর্যাদাহীন সে-সব শাসকের সাথে ভৃত্য-মনিবের মতো আচরণ করত।

এদিকে টলেডো জয় করায় আলফোন্সো তখন সেভিল এবং সেখানকার শাসক মুতামিদ ইবনু আব্বাদের প্রতিবেশী হয়ে যায়। স্বাভাবিকভাবেই মুতামিদ তখন আলফোন্সোকে নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। তবে অন্যান্য শাসকদের সন্ধি ও মৈত্রীর লজ্জাজনক পরিণতি তিনি জানতেন, তাই রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার দোহাইয়ে আলফোন্সোর সাথে সন্ধি করে নেয়ার কোনো ফায়দা দেখলেন না। তিনি বুঝতে পারলেন, শত্রুপক্ষের আনুকূল্য মুসলমানদের জন্য কত ভারী হয়ে উঠতে পারে। যদি কখনো ময়দানে নামেন আর সেখানে কোনো আসমানি মদদ তাদের সঙ্গ না দেয়, তাহলে খ্রিস্টানদের এত বিশাল বাহিনীর সামনে খেলাফতবিচ্ছিন্ন আন্দালুসের কী করুণ পরিণতি হতে পারে, মুতামিদ জানতেন। তবে আলফোন্সোর সাথে জোট না করলে, তার আনুগত্য মেনে না নিলে, অচিরেই সে সেভিলের দিকে তির তাক করবে—সেটাও ততদিনে নিশ্চিত হয়ে গেছে। তাই তিনি কারও সহায়তা গ্রহণের কথা ভাবছিলেন। সর্বপ্রথমেই তিনি মুরাবিতিন সাম্রাজ্যের শাসক

ইউসুফ বিন তাশফিনের[১] কথা চিন্তা করলেন। তার মনে হলো, আন্দালুসের এমন দুর্দিনে উত্তর স্পেন থেকে উড়ে আসা খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে মুরাবিতপ্রধান ইউসুফ বিন তাশফিনই আশপাশের ফ্রান্স, আলমানিয়া এবং ইতালির মুসলিমদের শাসক সেজে বসে থাকা ক্রুসেডের সহযোগীদের চেয়ে বহু গুণে উত্তম। সে-জন্যে তিনি আন্দালুসের পরিস্থিতি জানিয়ে বিন তাশফিন বরাবর পত্র পাঠাবেন বলে ভেবে রাখলেন।

আলফোন্সোর সাথে মুতামিদের দ্বন্দের শুরু

৪৭৫ হিজরি। সেভিলের প্রাসাদে বসে আছে আলফোন্সোর পাঠানো প্রতিনিধিদল। তারা বাৎসরিক কর আদায়ের জন্য এসেছে মুতামিদ ইবনু আব্বাদের কাছে। এ দলের প্রধানের নাম ইবনু শালিব। সে মুতামিদকে তাদের ও তাদের সম্রাটের দাবির কথা জানাল। মুতামিদ নির্দ্বিধ কণ্ঠে সাফ জানিয়ে দিলেন, 'আমরা কোনো কাফিরকে কর দিচ্ছি না। ইসলামের পক্ষে এত বড় অপমান আমরা সইতে পারি না।' এতে প্রতিনিধিদলের প্রধান নাক ফুলিয়ে চটে উঠল। হুমকি দিয়ে বলল, 'ভালোয় ভালোয় কর দিয়ে দাও, নইলে সেভিলের যে শহরগুলো তোমাকে দাপুটে করে তুলেছে, সেগুলো অচিরেই আমাদের পায়ের কাছে গড়াগড়ি করবে।'

মুতামিদের আত্মমর্যাদা জেগে উঠল। কুরসি ছেড়ে দাঁড়িয়ে তিনি ইবনু শালিবের কণ্ঠ চেপে ধরলেন। নির্দেশ দিলেন, 'একে শূলে চড়ানো হোক।' তার অন্য সঙ্গীদেরকে টেনে নিয়ে আটকে ফেলা হলো সেভিলের কারাগারে। স্বাভাবিকত এখানে ধর্মীয় বৈধ-অবৈধতার প্রশ্ন এসে যায়। তাই তিনি ফকিহদের কাছে পরামর্শ কামনা করলেন। তারা সকলে এটাকে জায়েয বলে ফতোয়া দিলেন। তাদের মনে ভয়

---

[১] ইউসুফ বিন তাশফিনের জন্ম ৪০০ হিজরিতে। ৪৫৩ হিজরিতে তিনি উত্তর সেনেগাল ও দক্ষিণ মৌরিতানিয়ার দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি মরক্কো, আলজেরিয়া, তিউনেসিয়া, পুরো সেনেগাল ও পুরো মৌরিতানিয়া কব্জা করে নেন। ৪৬৮ হিজরিতে দেখা যায় তার দলে অশ্বারোহী সেনাসংখ্যাই এক লক্ষ।

ততদিনে তিনি প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছেন মারাকিশ শহর। নিজের জন্য তিনি বেছে নেন আমিরুল মুসলিমিন উপাধি। নিজেকে পরিচয় দিতেন বাগদাদের খলিফার একজন নগণ্য কর্মচারী বলে। অথচ ততদিনে বাগদাদের দুর্বল আব্বাসি সাম্রাজ্য থেকে মুরাবিতি সাম্রাজ্য হাজারগুণ শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। তার সাম্রাজ্যের প্রায় দুহাজার মসজিদে আব্বাসি খলিফার নামে খুতবা পাঠ করা হতো। ইউসুফ বিন তাশফিন ইন্তেকাল করেন ৫০০ হিজরিতে, ১০০ বছর বয়সে।

ছিল, অবৈধ বলে দিলে মুতামিদ খ্রিস্টানদের মোকাবেলার এমন শক্ত মনোভাব থেকে পাছে সরে না আসে।

আলফোন্সোর কাছে খবর এল, সেভিলে কী ঘটেছে। রাগে ক্ষোভে ফুঁসে উঠল সে। তখনই সেনা জমায়েত করে সেভিলের দিকে ছুটল। সীমান্তের পাশে যারাগোজা শহরে শক্ত অবরোধ গড়ে তুলল প্রতিশোধের নেশায়। তার মাথায় ঘুরছে সেভিলের মানুষের উপর অমানুষিক নির্যাতন করে তাদের বাড়িঘর, সহায়সম্পদ লুট করার অদম্য ক্রোধ। এদিকে মুতামিদও দমে যাবার লোক নন। তিনি খ্রিস্টানদের ক্রোধের হাত থেকে সেভিল বাঁচাতে বদ্ধপরিকর হয়ে রইলেন। এ সময় আলফোন্সোর সাথে মুতামিদের কিছু পত্র চালাচালি হয়। মুতামিদ ছিলেন আত্মমর্যাদায় বলীয়ান একজন শাসক। চাইলেই তিনি অন্য মুসলিম রাজ্যগুলোর মতো কর দিয়ে আলফোন্সোর বশ্যতা স্বীকার করে নিয়ে নিজের রাজ্য বাঁচাতে পারতেন। কিন্তু তিনি আলফোন্সোর প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন। অবরোধ চলতে থাকে। আলফোন্সো মুতামিদের কাছে পত্র লিখে বলে, 'অবরোধ দীর্ঘ হচ্ছে। এখানে খুব গরম আর মাছির বেশ উপদ্রব। আমার জন্য একটি পাখা পাঠাও, যেন বাতাসে জিরোতে পারি আর মাছি তাড়াতে পারি।'

আলফোন্সো বুঝাতে চাচ্ছিল, অবরোধ করতে তার আপত্তি নাই। মুসলিম বাহিনী নিয়েও সে চিন্তিত নয়, বরং এ মুহূর্তে মাছিই তাকে বেশি পেরেশান করছে। মুতামিদ এ পত্র পেয়ে পত্রের উলটো পিঠে লিখে দিলেন, 'তোমার পত্র পেয়েছি। শীঘ্রই আমি তোমার জন্য লামতি চামড়ার পাখা পাঠাবো। এ পাখা থাকবে মুরাবিতী সেনাদের হাতে। এ পাখার বাতাস আমাদেরকে তোমার হাত থেকে স্বস্তি দিবে, কিন্তু তোমাকে কোনো স্বস্তি দিবে না।'

পত্র গেল উত্তর আফ্রিকায়

সেভিল বাঁচাতে মুতামিদ তার সর্বোচ্চ চেষ্টা করলেন। সেনাশক্তি সংহত করলেন, দুর্গ মেরামত করে আগের চেয়ে শক্তিশালী করলেন। প্রতিরক্ষার অন্য সকল সম্ভাব্য মাধ্যমই তিনি গ্রহণ করলেন। কিন্তু আলফোন্সোর অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিল না, সে সহজে সেভিল ত্যাগ করার কোনো ইচ্ছা রাখে। সেভিলের জনগণের সর্বস্ব দিয়েও তার মনে হলো, আলফোন্সোকে প্রতিরোধ করা সম্ভব না। পূর্ব থেকেই তিনি ভাবছিলেন, সেভিল বাঁচাতে মুরাবিতিনদের সাহায্য চাইবেন।

মুরাবিতিনরা তখন উত্তর আফ্রিকা শাসন করছে। তাদের আমির ইউসুফ বিন তাশফিন। তার শৌর্যবীর্যের গল্প শোনা যায় আন্দালুস থেকেও। মুতামিদ বিন আব্বাদ সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি ইউসুফ বিন তাশফিনকে পত্র লিখবেন। তাকে বলবেন, একবার অন্তত আন্দালুসে এসে মুসলিম ভাইদের সাহায্য করতে। মুতামিদ তার সভাসদদের নিজের সিদ্ধান্ত জানালেন। কেউ কেউ তার সিদ্ধান্ত স্বাগত জানালেও অনেকে প্রতিবাদ করল। বিশেষ করে বিভক্ত রাজ্যসমূহের শাসকরা তার সিদ্ধান্ত শুনে নাখোশ হলো। তারা বারবার তার সাথে দেখা করে তাকে বুঝাচ্ছিল, তিনি যেন ইউসুফ বিন তাশফিনের সাহায্য না চান।

তারা বলছিল, ইউসুফ বিন তাশফিন হয়তো আপনাকে সাহায্য করবেন, কিন্তু একইসাথে তিনি আপনাকে রাজ্যছাড়া করে নিজেই এ রাজ্য করায়ত্ত করতে পারেন। খোদ মুতামিদের ছেলে রশিদ তাকে বলল: 'বাবা, আপনি আন্দালুসে এমন আফ্রিকানদের টেনে আনতে চান, যারা আমাদের শহরে লুটপাট করবে আর আমাদের ঐক্যে চিড় ধরাবে?' ছেলের এ-কথার জবাবে মুতামিদ বিন আব্বাদ যা বলেছিলেন, তা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হয়ে আছে। তিনি বলেছিলেন, 'বৎস আমার, তুমি কখনো শুনবে না তোমার বাবা জীবিত থাকতে আন্দালুস পুনরায় কাফিরের রাজ্যে পরিণত হয়েছে। আমি সেটা হতে দেব না কিছুতেই; এ-দেহে শেষ রক্ত ফোঁটা থাকতে আমি খ্রিস্টানদের হাতে মুসলিম শহর সেভিল তুলে দেব না। নতুবা আমার উপর দ্বীনের পক্ষ থেকে অভিশাপ পড়বে, যেমন পড়েছে আশপাশের আরও অনেক শাসকের উপর। আমি শূকরের রাখাল হওয়ার চাইতে উট চরানো আমার জন্য উত্তম মনে করি।' অর্থাৎ আলফোন্সোর হাতে বন্দি হয়ে শূকর চরানোর চাইতে ইউসুফ বিন তাশফিনের গোলাম হয়ে উত্তর আফ্রিকায় উট চরানো আমার কাছে ভালো।

নিজেদের মুক্তির কথা চিন্তায় রেখে শাসকদের মধ্যে গ্রানাডার শাসক আবদুল্লাহ বিন বুলুক্কিন ও বাতালইয়ুস শাসক মুতাওয়াক্কিল বিন আফতাস মুতামিদের সাথে একমত হন। ফলে সিদ্ধান্ত হলো, গ্রানাডা, সেভিল ও বাতালইয়ুস একত্রে মুরাবিতিন আমিরের কাছে সাহায্য চাইবে। এদের নেতা থাকবে মুতামিদ আর আমির হবেন ইউসুফ বিন তাশফিন। নিজের মতের পক্ষে লোক পেয়ে মুতামিদ আর দেরি না করে প্রতিনিধিদল গঠন করলেন।

এই দলে ছিলেন গ্রানাডার বিচারক আবু জাফর কালিয়ি, কর্ডোভার বিচারক আবু বকর বিন আদহাম, বাতলইয়ুসের বিচারক আবু ইসহাক বিন মুকানা। এই

প্রতিনিধিদলের চতুর্থ সদস্য ছিলেন মুতামিদের উযির আবু বকর বিন যাইদুন। তিন বিচারকের দায়িত্ব ছিল তারা ইউসুফ বিন তাশফিনের সাথে আলোচনা করবেন। আর উযিরের দায়িত্ব ছিল কোনো চুক্তি করতে হলে তিনি তা সম্পাদন করবেন।

৪৭৮ হিজরিতে এই প্রতিনিধিদল ইউসুফ বিন তাশফিনের সাথে সাক্ষাৎ করে। তিনি মনোযোগ দিয়ে তাদের কথা শোনেন। ইউসুফ বিন তাশফিন তো আগ থেকেই ভাবছিলেন আন্দালুসের ভাইদের সাহায্য করার কথা। অভিযান নির্বিঘ্ন করার জন্যই তিনি সাক্কুত বারগুয়ারির হাত থেকে সিউটা নৌবন্দর দখল করেন।

তিনি অপেক্ষায় ছিলেন সেভিল কিংবা গ্রানাডা থেকে কোনো বার্তা আসে কিনা। কারণ এই দুই রাজ্য অতিক্রম করা ছাড়া আন্দালুসে প্রবেশের উপায় ছিল না। এখন মুতামিদ বিন আব্বাদের প্রতিনিধিদল আসায় ইউসুফ বিন তাশফিনের কাজ সহজ হয়ে গেল। ইউসুফ বিন তাশফিন প্রতিনিধিদলকে কথা দেন শীঘ্রই তিনি আন্দালুস আসবেন। তবে শর্ত দেন, আলগেরিকা শহরটি তাকে সঁপে দিতে হবে, যাতে এ অঞ্চলে মুরাবিতিনদের আসা-যাওয়া নির্বিঘ্ন হতে পারে। মুতামিদ তার শর্ত মেনে নেন।

আন্দালুসের জাহাজ

মুতামিদের প্রতিনিধিদলকে বিদায় জানিয়েই তিনি সেনাপতি দাউদ ইবনু আয়িশার নেতৃত্বে একদল অশ্বারোহী পাঠান আলগেরিকায়। সমুদ্রপথে এ বাহিনী আলগেরিকা গিয়ে ৪৭৯ হিজরির রবিউল আউয়াল মাসে (আগস্ট, ১০৮৬ খ্রি.) চুক্তিমতো আলগেরিকায় নিজেদের নিয়ন্ত্রণ বুঝে নেয়।

এদিকে ইউসুফ বিন তাশফিন যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন। বড় ছেলে তখন খুবই অসুস্থ। কিন্তু তবুও তিনি বিলম্ব করতে চাচ্ছিলেন না। তার কানে ভেসে আসছিল আন্দালুসের মুসলমানদের আহ্বান। বারবার মনে পড়ছিল টলেডোর কথা। তিনি চাচ্ছিলেন না সেভিলের ভাগ্যেও নেমে আসুক টলেডোর মতো নির্মম বিপর্যয়। ইতিমধ্যে আলফোন্সো তার আন্দালুস আগমনের সংবাদ পেয়ে দম্ভে ভরা একটি দীর্ঘ পত্র লিখে পাঠিয়েছে। পত্রের ভাষ্য ছিল—

'...আপনাদের ধারণা, আল্লাহ আমাদের দশজনের বিরুদ্ধে আপনাদের একজনকে লড়তে বলেছেন। যান, এটা আরও সহজ করে দিলাম। এখন আমাদের একজনের

বিরুদ্ধে আপনাদের দশজন লড়লেই হবে।

...শুনলাম আপনি নাকি সাগর পাড়ি দিতে পারছেন না। এক কাজ করুন। আমার জন্য কিছু নৌকা পাঠিয়ে দিন। আমি সমুদ্র অতিক্রম করে আপনার দেশে আসব। তারপর আপনার পছন্দসই কোনো স্থানে আপনার সাথে লড়ব।

ইউসুফ বিন তাশফিন এই পত্রের কোনো জবাব না দিয়ে নিজের কাজে মন দেন। সেনা-সরঞ্জাম গুছিয়ে তিনি সমুদ্রপথে আন্দালুসের দিকে রওনা করেন। জিব্রাল্টার প্রণালি অতিক্রমকালে মুরাবিতদের বহনকারী জাহাজগুলো সামুদ্রিক ঝড়ের কবলে পড়ে। ইউসুফ বিন তাশফিন তখন সমুদ্রের উত্তাল চেহারা উপেক্ষা করে নামাযে দাঁড়ান। হাত তুলে মুনাজাত ধরে বলেন, 'হে আল্লাহ, যদি আমাদের এ সমুদ্রযাত্রায় মুসলমানদের কোনো কল্যাণ থাকে, তাহলে এই সফর আমাদের জন্য সহজ করে দিন। আর যদি এতে কোনো কল্যাণ না থাকে, তাহলে আমাদের জন্য এ সফর কঠিন করে দিন; যাতে আমরা এই সমুদ্র পার হতে না পারি।'

বিন তাশফিনের দোয়ার কিছুক্ষণ পরই সমুদ্র শান্ত হয়ে যায়। মুরাবিতিনরা নিরাপদে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আন্দালুসে পৌঁছে যায়। জাহাজ পাড়ে নোঙর করতেই ইউসুফ বিন তাশফিন নেমে সিজদায়ে শোকর আদায় করে নেন।

আন্দালুস নেমে ইউসুফ বিন তাশফিন সেভিলের পথ ধরেন। এ সময় আন্দালুসের মুসলমানরা তাকে স্বাগত জানায়। সেভিল থেকে তিনি সেনাপতি দাউদ বিন আয়িশাকে বলেন, বাতালইয়ুসের দিকে যাত্রা করতে। কারণ, ষষ্ঠ আলফোন্সো মুসলিম বাহিনীর মোকাবেলা করার জন্য যে যাল্লাকা ময়দানে শিবির স্থাপন করেছে, তা বাতালইয়ুসের নিকটেই। তদুপরি যেহেতু আন্দালুসের বাহিনী থাকবে মুতামিদের নেতৃত্বে, তাই তিনি চাচ্ছিলেন, মুরাবিতিনদের শিবির ভিন্ন থাকুক। বিন তাশফিন খুবই সতর্কতার সাথে প্রতিটি পদক্ষেপ নিচ্ছিলেন। যেহেতু এটাই খ্রিস্টানদের সাথে তার প্রথম সাক্ষাৎ এবং আন্দালুসের খেলাফতবিচ্ছিন্ন মিত্রদেরকে তিনি ততখানি ভরসাও করতে পারছেন না, এ জন্য তিনি চাচ্ছিলেন, আন্দালুসের পুরোপুরি ভেতরে না ঢুকে বাতালইয়ুসের কাছাকাছি থেকে যুদ্ধ করতে।

আন্দালুসে প্রবেশ করে এবার ইউসুফ বিন তাশফিন আলফোন্সোর সেই দম্ভভরা চিঠির জবাব দিলেন। তিনি লিখলেন, 'তুমি সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আমার সাথে লড়তে চেয়েছিলে। এখন আমিই তোমার কাছে চলে এসেছি। অপেক্ষা করো, শীঘ্রই কোনো ময়দানে আমরা মুখোমুখি হবো।'

এরপর তিনি আলফোন্সোকে ইসলাম গ্রহণ, জিযিয়া আদায় অথবা যুদ্ধ—তিনটির কোনো একটি বেছে নিতে বলেন। এই পত্র পেয়ে আলফোন্সো রেগে যায়। আশি বছর ধরে তারা আন্দালুসের মুসলমানদের থেকে জিযিয়া আদায় করছে, আজ কেউ তাকে শক্ত চ্যালেঞ্জ করল।

'আমি যুদ্ধ বেছে নিলাম। তুমি কী ভাবছো?' ফিরতি জবাব লিখল আলফোন্সো।

'আমার জবাব তুমি চোখের সামনে দেখবে'—লিখলেন ইউসুফ বিন তাশফিন।

যাল্লাকার ময়দানঃ মহান বিজয়ের সাক্ষী

ইউসুফ বিন তাশফিনের আগমনের সংবাদ পেয়েই আলফোন্সো যারগোজা শহরের অবরোধ তুলে নিয়ে পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলোতে যুদ্ধের ঘোষণা দেয়। ভ্যালেন্সিয়া থেকে জরুরি ভিত্তিতে ডেকে আনে সেনাপতি বারানুসকে। উত্তর স্পেন এবং পিরানেস পাহাড়গুলোর ওপাশে চলে যায় তার সাহায্যের আবেদন। ফ্রান্স, ইতালি এবং অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলো থেকে মুসলিম স্পেনে মুসলমানদের কবর রচনা করার মানসে দলে দলে সৈন্য যোগদান করতে থাকে তার বাহিনীতে। পাদরি ও বিশপরা সাধারণ জনতাকে যুদ্ধের জন্য উত্তেজিত করতে থাকে। ধর্মগ্রন্থ ইনজিল এবং ধর্মচিহ্ন ক্রুশ হাতে নিয়ে তারাও ময়দানে নেমে পড়ে। এভাবে আলফোন্সোর বাহিনী দৃষ্টিসীমার চেয়েও বিস্তৃত হয়ে যায়। ঐতিহাসিকদের মতে যাল্লাকার ময়দানে আলফোন্সোর সৈন্যসংখ্যা ছিল প্রায় তিন লাখ, যা কিনা মুসলিম বাহিনীর চেয়ে দশগুণ বেশি। মুতামিদ বিন আব্বাদের বাহিনী থেকে মাত্র তিন মাইল দূরে এসে অবস্থান নেয় আলফোন্সোর এই বিরাট সেনাদল। দুই বাহিনীর মাঝখানে তখন মাত্র ছোট্ট একটি নদীর ব্যবধান।

সেনা জমায়েত করে তিন দিন দুই পক্ষ মুখোমুখি অবস্থানে বসে থাকে। এ-সময় আলফোন্সো মুসলিম বাহিনীকে ধোঁকা দেয়ার জন্য যুদ্ধের দিন নির্ধারণ করে দেয়। আলফোন্সো তার এক বার্তায় জানায়, 'আগামীকাল শুক্রবার। এ দিন আপনাদের সাপ্তাহিক আনন্দের দিন। তাই এ দিন লড়া ঠিক হবে না। পরদিন শনিবার। এ দিন ইহুদিদের সাপ্তাহিক আনন্দের দিন। সেদিনও লড়া যাবে না। এরপর দিন রবিবার। আমাদের সাপ্তাহিক ধর্মীয় আচার পালনের দিন। তাই আমার মনে হয়, সোমবারে আমাদের লড়াই হলেই ভালো।' এই বার্তা পেয়ে ইউসুফ বিন তাশফিন সোমবারের

যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন।

'এটা হতো ভুল সিদ্ধান্ত' নিজের সেনাদের দিকে তাকিয়ে ভাবলেন ইউসুফ বিন তাশফিন। তিনি আলফোন্সোর ধূর্ততা ধরতে পারেননি; ভেবেছিলেন, সোমবারেই যুদ্ধ হবে। কিন্তু মুতামিদ বিন আব্বাদ আলফোন্সোর চাল ধরে ফেলেন। তিনি ইউসুফ বিন তাশফিনকে সতর্ক করেন। তিনি বলেন, আলফোন্সো সম্ভবত শুক্রবারেই হামলা করবে। এ কথা শুনে ইউসুফ বিন তাশফিন সতর্ক হন। নিজের সেনাপতিদেরকেও সতর্ক করে রাখেন।

'সতর্ক না হলে আজকের যুদ্ধ কঠিন হতো' ঘোড়ার কেশরে হাত বুলাতে বুলাতে ভাবলেন ইউসুফ বিন তাশফিন। গত বছর হিময়ার গোত্রের এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে কিনেছেন ঘোড়াটি। গতরাতে খুব একটা ঘুমানোর সুযোগ হয়নি। সারারাত নফল ও মুনাজাত আদায় চলেছে। ফকিহরা সেনাদেরকে বারবার যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়নের শাস্তির কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিলেন।

ঘোড়ার হ্রেষা ডাক শোনা যায়। ইউসুফ বিন তাশফিন ফিরে তাকালেন। একটু দূরে আবুল আব্বাস আহমাদ বিন রুমাইলাকে দেখা যাচ্ছে। ইউসুফ বিন তাশফিনের চেহারায় মুচকি হাসি ফুটে ওঠে। তার মনে পড়ে, সকালেই ইবনে রুমাইলা তাকে একটি স্বপ্নের কথা শুনিয়েছেন।

গতরাতে ইবনে রুমাইলা স্বপ্নে দেখেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেছেন, 'ইবনে রুমাইলা, তোমরাই বিজয়ী হবে এবং তুমি আমার সাথে মিলিত হবে।' ইউসুফ বিন তাশফিন আরও একবার আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে ওঠেন। এই স্বপ্ন সুসংবাদ। ইনশাআল্লাহ, আজ বিজয় মুসলমানদেরই হবে।

তবে এখনো বিজয়ের কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। মুতামিদ বিন আব্বাদের বাহিনী লড়ে চলছে আলফোন্সোর বাহিনীর বিরুদ্ধে। মুতামিদের কথামতো ইউসুফ বিন তাশফিন আজকের লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। মুসলিম বাহিনীর সেনাসংখ্যা ছিল ৪৮ হাজার। দুই ভাগে ভাগ করে সামনের দিকে দায়িত্ব নেয় মুতামিদ নিজে। মুরাবিতিনরা দুই অংশ হয়ে যায়। প্রথম অংশ হিসেবে দাউদ ইবনু আয়িশার নেতৃত্বে অশ্বারোহীদের একটি ছোট দল আন্দালুসের সেনাদের সাথে সামনের দিকে যায়। আর মুরাবিতিনদের মূল বাহিনী নিয়ে ইউসুফ বিন তাশফিন টিলার আড়ালে লুকিয়ে থাকবেন। এটি একটি যুদ্ধকৌশল, যা ইউসুফ বিন তাশফিন ইতিহাস থেকে শিখেছেন। ইতিপূর্বে খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ওয়ালাজার যুদ্ধে এই

কৌশল অবলম্বন করেছিলেন।

এছাড়া নোমান বিন মুকাররিনও নিহাওয়ান্দের যুদ্ধে এই কৌশল অবলম্বন করে সাফল্য অর্জন করেন। গতরাতেই সেনাদের এভাবে সাজানো হয়। আশঙ্কা ছিল, সকালেই হয়তো আলফোন্সো ওয়াদা ভঙ্গ করে হামলা চালাবে। আর বাস্তবে তাই হলো। ১২ই রজব ৪৭৯ হিজরি, রোজ শুক্রবার ভোর বেলাতেই আলফোন্সো তার বাহিনী নিয়ে মুসলমানদের সম্মুখভাগে হামলে পড়ে।

টিলার আড়াল থেকে ইউসুফ বিন তাশফিন যুদ্ধের খবর রাখছিলেন। প্রথম থেকেই মুসলিম বাহিনী বীরত্বের সাথে লড়াই করে। কিন্তু আলফোন্সো তার সেনাধিক্যের কারণে এগিয়ে যায়। অনেক মুসলিম সেনা নিহত হন। বাকিরা বাতালইয়ুসের দিকে পিছু হটে যায়। এমনকি সেনাপতি মুতামিদও আহত হন। তিনবার তার ঘোড়া মারা যায়। খ্রিস্টান সেনারা মুসলিম বাহিনীর রক্ষণব্যূহ ভেঙে ফেলে। মুতামিদের সাথে ময়দানে মাত্র অল্পকিছু সেনা যুদ্ধ করে যায়। কিন্তু খ্রিস্টানদের শক্ত আক্রমণ ঠেকাতে তারা ব্যর্থ হয়ে পড়ছিল।

অবশিষ্ট মুসলিম সেনারা দৃঢ় থাকা সত্ত্বেও বিজয়ের পাল্লা খ্রিস্টান বাহিনীর দিকে ঝুঁকে পড়ে। ইউসুফ বিন তাশফিন বুঝলেন, এখনই সময়। এখনই খ্রিস্টান বাহিনীর উপর হামলা করতে হবে। তিনি নিজের কাছে থাকা বাহিনীকে দু ভাগ করলেন। সায়র বিন আবু বকরের নেতৃত্বে একটি দলকে পাঠালেন মুতামিদের বাহিনীকে সাহায্য করতে। অন্য দলটি নিয়ে তিনি আজব এক কার্যকর কৌশল করে খ্রিস্টবাহিনীকে বিক্ষিপ্ত করে দিলেন। তিনি ঘুরে ময়দানের শেষ দিকে চলে গেলেন। এখানেই আলফোন্সোর শিবির। সারি সারি তাঁবু। ভেতরে আলফোন্সোর বাহিনীর রসদ। শিবিরের প্রহরায় সামান্য কজন সৈন্য।

ইউসুফ বিন তাশফিনের জোরালো হামলায় তারা খড়কুটোর মতোই ভেসে গেল। যারা বেঁচে গেল, তারা প্রতিরোধের পরিবর্তে পালিয়ে আলফোন্সোর বাহিনীর দিকে চলে গেল। ইউসুফ বিন তাশফিন তাঁবুতে আগুন ধরিয়ে দিলেন। জ্বলতে থাকল আলফোন্সোর বাহিনীর রসদ। আগুনের লোলিহান শিখা আলফোন্সোর শিবির ভেদ করে আকাশের দিকে উঠে যায়। মুখে আগুনের উত্তাপ অনুভব করেন ইউসুফ বিন তাশফিন। নিজের বাহিনীকে এবার তিনি ময়দানের দিকে ঘুরিয়ে দিলেন।

এদিকে আলফোন্সোর শিবিরের পলাতক প্রহরীরা তাকে শিবিরে হামলার কথা জানায়। আলফোন্সো তার বাহিনীর একাংশকে শিবিরের দিকে প্রেরণ করে। এই

বাহিনী শিবিরের দিকে যাওয়ার আগেই ইউসুফ বিন তাশফিন তাদের উপর হামলে পড়েন। খ্রিস্টান বাহিনী এখন দুদিক থেকেই হামলার মুখোমুখি। তীব্র লড়াই হয়। দুপক্ষের যোদ্ধারা বীরত্বের সাথে লড়তে থাকে।

৭৯ বছর বয়সী ইউসুফ বিন তাশফিনও একজন সাধারণ যোদ্ধার মতোই লড়েন। জয়ের পাল্লা স্থির হয়ে যায়। সন্ধ্যা পর্যন্ত একটানা লড়াই চলে। অবশেষে খ্রিস্টান বাহিনী পরাজিত হয়। একের পর এক খ্রিস্টান সেনার লাশ মাটিতে লুটিয়ে পড়তে থাকে। খ্রিস্টান বাহিনীর মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। আলফোন্সো তার একান্ত সহচরদের সাথে পালাতে থাকে।

ইউসুফ বিন তাশফিন তার নেতৃত্বে থাকা চার হাজার সুদানি বাহিনীকে ইশারা দেন আলফোন্সোকে ধাওয়া করতে এবং খ্রিস্টান বাহিনীকে চূড়ান্ত আক্রমণ করতে। এই বাহিনী আলফোন্সোর বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তুমুল লড়াই চলে। এ সময় এক সুদানি যোদ্ধার নিক্ষিপ্ত বর্শা পালাতে থাকা আলফোন্সোর উরু ভেদ করে যায়। আলফোন্সো মারাত্মক আহত হয়ে পলায়ন করে। এই আঘাতের ফলে সারাজীবন তাকে খুড়িয়ে চলতে হতো। সবশেষে মাত্র ৪০০ সেনা নিয়ে পালাতে সক্ষম হয় আলফোন্সো। তবে এদের অধিকাংশই ছিল আহত এবং আঘাতপ্রাপ্ত। যেতে যেতে ব্যথায় ও রক্তক্ষরণে ৩০০ সেনাই পথে মারা যায়। মাত্র ১০০ সেনা নিয়ে সে নিজ শহরে দাখিল হতে পারে।

এসময় মুতামিদের সাথে ইউসুফ বিন তাশফিনের মতের অমিল হয়। মুতামিদ চাচ্ছিলেন আলফোন্সোকে ধাওয়া করে হত্যা করতে। ইউসুফ বিন তাশফিনের বক্তব্য ছিল, সারাদিনের যুদ্ধে মুসলিমরা ক্লান্ত। আর আলফোন্সোর দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে সে হয়তো নির্মমভাবে রুখে দাঁড়াবে, যা আমাদের পরিশ্রান্ত সেনাদের জন্য বিপদ হতে পারে। তাই তিনি খ্রিস্টানদের ধাওয়া করতে চাচ্ছিলেন না। এভাবেই আলফোন্সো যাল্লাকার ময়দান থেকে জীবিত পালিয়ে যায়। আন্দালুসের পরবর্তী ইতিহাসের দিকে তাকালে মুতামিদের সিদ্ধান্তকে সঠিক বলে মনে হয়।

যুদ্ধের পর

যুদ্ধলব্ধ সম্পদ একত্রিত করা হয়। প্রচুর গনিমত অর্জিত হয়। গনিমত ভাগের সময় মুরাবিতদেরকেও একটি ভাগ দেয়ার কথা হয়। ইউসুফ বিন তাশফিন সাফ জানিয়ে

দেন, তিনি গনিমত নিবেন না। ৭৯ বছর বয়সে দীর্ঘ সমুদ্র পাড়ি দিয়ে এই অভিযানে তিনি গণিমতের জন্য আসেননি। তিনি এসেছেন মুসলিম ভাইদের সাহায্য করতে। জিহাদের ফজিলত অর্জন করতে। তিনি এর প্রতিদান চান আল্লাহর কাছে। তাই তিনি পার্থিব কিছুই গ্রহণ করবেন না।

ইউসুফ বিন তাশফিন গনিমতের ভাগ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকেন। ইতিমধ্যে মরক্কো থেকে সংবাদ আসে ইউসুফ বিন তাশফিনের বড় ছেলে ইন্তেকাল করেছেন। এ সংবাদে ইউসুফ বিন তাশফিন ব্যথিত হন। তিনি সেনাবাহিনীসহ মরক্কো ফিরে যান। এদিকে আন্দালুসের প্রতিটি মসজিদের মিম্বর থেকে তখন ইউসুফ বিন তাশফিনের জন্য দোয়া করা হচ্ছে।

ফলাফল

যাল্লাকার যুদ্ধের বিজয় আন্দালুসের কোনায় কোনায় পৌঁছে যায়। পশ্চিমের সবকটি জানালায় আনন্দ হয়ে বাজতে থাকে মুতামিদের বিজয়ের সুর। এ বিজয়ের মধ্য দিয়ে আশপাশের নমনীয় জাতবিকৃত শাসকেরা আলফোন্সোকে কর দেয়ার হাত থেকে বেঁচে যায়। আন্দালুসের পশ্চিম দিকটাও, খ্রিস্টানদের নখরথাবা থেকে নিরাপদ হয়ে যায়। আলফোন্সো হারায় তার বিশাল সেনাবাহিনী এবং নিশ্চিত পতনের হাত থেকে মুক্ত হয়ে যায় যারগোজা শহর। আন্দালুসের পুরোটা জুড়ে ক্রুশধ্বনি উচ্চারিত হবার বদলে যাল্লাকার বিজয়ের ফলে আগামী আড়াই শতাব্দী সেখানে ইসলামের স্থিতি বিরাজমান হয়ে যায়।

মুরাবিতি সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি

এক সহস্রাব্দ দূরে দাঁড়িয়ে ইতিহাসের এক নগণ্য পাঠক যখন ভাবে ইউসুফ বিন তাশফিনের কথা, তখন তার কীর্তিগাথা বিস্ময়কর মনে হয়। ৭৯ বছর বয়সে তিনি দীর্ঘ সফরের ক্লান্তি উপেক্ষা করে ছুটে এসেছিলেন আন্দালুসে, কোনো পার্থিব স্বার্থ ছাড়া; কেবলই ইসলামি ভ্রাতৃত্ববোধের জায়গা থেকে। তার কারণেই আন্দালুসে মুসলিম শাসন টিকে ছিল আরও কয়েক শতাব্দী। যাল্লাকার যুদ্ধের পর আরও দুবার তিনি আন্দালুসে গমন করেন।

৪৮১ হিজরিতে দ্বিতীয়বার, ৪৮৩ হিজরিতে তৃতীয়বার। তিনি চাচ্ছিলেন, মুসলিম

শাসকদের সাহায্য করতে, মুসলিম শাসন টিকিয়ে রাখতে। কিন্তু মুসলিম শাসকরা নিজেদের পারস্পরিক দ্বন্দ্বে ক্রমেই দুর্বল হচ্ছিল, এমনকি তারা একে অপরের বিরুদ্ধে গোপনে হাত মিলাচ্ছিল খ্রিস্টানদের সাথে। যাল্লাকার বিজয়কে কাজে লাগিয়ে স্থানীয় মুসলিম শাসকরা অবশিষ্ট খ্রিস্টানদের হটিয়ে আন্দালুসে ইসলামি শাসন পাকাপোক্ত করতে পারত, কিন্তু তারা তা করেনি। এমনকি আলফোন্সোর হাতে সদ্য দখল হওয়া টলেডো বাঁচাতেও কারও তেমন আগ্রহ লক্ষ করা যায়নি। এর মধ্যে ইউসুফ বিন তাশফিনের হাতে এমন একটি পত্র আসে, যাতে একজন মুসলিম শাসক ইউসুফ বিন তাশফিনের সাথে লড়াই করার জন্য খ্রিস্টানদের সাহায্য চেয়েছিল। এসব তিনি ইউসুফ বিন তাশফিন অত্যন্ত ব্যথিত হন। এতদিন তার রাজ্যজয়ের কোনো চিন্তা ছিল না; কিন্তু এবার মনে হলো, আন্দালুসের মুসলমানদের কল্যাণের জন্যই এইসব অথর্ব শাসকদের হটানোর কোন বিকল্প নাই। তাই ৪৮৩ হিজরিতে ইউসুফ বিন তাশফিনের অভিযান ছিল রাজ্যজয়ের অভিযান। একের পর এক আন্দালুসের শহরগুলো দখল করে নেন তিনি।

একে মুরাবিতি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। তবে এ হামলার আগে তিনি আলেমদের কাছে পত্র লিখে আন্দালুসের বিস্তারিত অবস্থা জানান এবং হামলা চালানোর ব্যাপারে ফতোয়া জানতে চান। আলেমরা সবাই তাকে হামলা চালানোর বৈধতা দেন। যারা তাকে হামলা চালানোর বৈধতা দিয়েছেন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন বাগদাদের একজন আলেম, ইতিহাস যাকে চেনে ইমাম গাজালি নামে।

আর্কের যুদ্ধ
BATTLE OF ALARCOS

তারিখ:	৫৯১ হিজরি / ১১৯৫ খ্রি.
স্থান:	টলেডোর দক্ষিণে আর্ক দুর্গ-সংলগ্ন প্রান্তরে
ফলাফল:	মুসলিম বাহিনীর বিজয়

পক্ষ-বিপক্ষ:	মুওয়াহহিদিন সাম্রাজ্য	ক্যাস্টোলা রাজ্য
সেনাপ্রধান:	সুলতান আবু ইউসুফ ইয়াকুব আল-মানসুর	অষ্টম আলফোন্সো
সেনাসংখ্যা:	২ লাখের মতো সেনা	২ লাখ ২৫ হাজার
ক্ষয়ক্ষতি:	কয়েক হাজার শহিদ	৩০ হাজার নিহত

সুলতান আবু ইউসুফ ইয়াকুব আল-মানসুর[১] এবং ক্যাস্টোলার রাজা অষ্টম আলফোন্সোর মধ্যে ৫৯১ হিজরিতে সংঘটিত হয় আন্দালুসের ভৌগোলিক ইতিহাসের পটপরিবর্তন করে দেয়া আর্কের যুদ্ধ। এ যুদ্ধে মুওয়াহহিদিন সাম্রাজ্য আন্দালুসে তাদের অবস্থান আরও পাকাপোক্ত করে নেয়। তাদের কর্তৃত্ব এবং ক্ষমতা বিস্তার লাভ করে এবং রাজা আলফোন্সো সুলতানের সাথে সমঝোতা ও সন্ধি করে নিতে বাধ্য হয়। আর্ক দুর্গের পাশে সংঘটিত এ যুদ্ধকে ঐতিহাসিকরা আইবেরিয়ার খ্রিস্টানদের মানসিক পরাজয়ের ক্ষেত্রে যাল্লাকার সমান প্রভাবক মনে করেন। এ যুদ্ধ ক্যাস্টোলা সাম্রাজ্যকে আন্দালুসে একেবারে কোণঠাসা করে ফেলে। আর্কের পরাজয় তাদের দীর্ঘকাল তাদের বুকে পাথর হয়ে ঝুলে থাকে।

যুদ্ধের আগে

৫৮৭ হিজরি। ক্রুসেডারদের সাহায্য নিয়ে পর্তুগালের রাজা প্রথম শাঞ্চু হঠাৎ করে মুসলিম রাজ্য সিলভাসে আক্রমণ করার মনস্থ করল। মুওয়াহহিদিন[২] সাম্রাজ্যের

---

[১] পুরো নাম: আবু ইউসুফ ইয়াকুব ইবনু ইউসুফ আল-মানসুর। ১১৬০ থেকে ১১৯৯ মাত্র ৩৯ বছর জীবিত ছিলেন। বাবার মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারী হিসেবে ১১৮৪ সালে মুওয়াহহিদিন সাম্রাজ্যের মসনদে সমাসীন হন। এরপর ১১৯৯ সালে মারাকেশে মৃত্যুবরণ করা পর্যন্ত তিনি বাবার দায়িত্ব পালন করে গেছেন। তার শাসনামলে সর্বত্র ইসলামি শরিয়ার বিস্তার ঘটেছিল। মারাকেশের সেনানগরীতে তিনি সুবিশাল এক মসজিদ নির্মাণ করেন। মসজিদে হাসসান নামে রিবাতে তিনি তৎকালীন বিশ্বের সবচেয়ে বড় মসজিদটি নির্মাণ করে যান। তিনি সংস্কৃতি এবং স্থাপত্যের প্রেম লালন করতেন। মৃত্যুপূর্ব সময়েও তিনি হাসসান টাওয়ার (বর্তমান মরোক্কোতে অবস্থিত) নামে একটি দৃষ্টিনন্দন টাওয়ার নির্মাণের কাজ শুরু করেন। কিন্তু সেটা পরিপূর্ণ হবার আগেই তার মৃত্যু হয়ে যায়।

[২] ১১২১ সালে বর্তমান লিবিয়ার ইথনিক গ্রুপের পূর্বপুরুষ মুহাম্মদ ইবনু তুমরুত (মৃত্যু: ৫২৪ হি.)-এর অনুসারিরা এ সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করে। এরপর আবদুল মুমিন ইবনু আলি আল-কুমি এটাকে পুরো আফ্রিকা (লিবিয়া এবং তিউনিসিয়াসহ) এবং আন্দালুসের উত্তর সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত করে

সুলতান আন্দালুসের দিকে যাত্রা করলেন। ৫৯১ হিজরির রজবের ২০ তারিখ এই বাহিনী আলজেরিকার দ্বীপ পার হয়ে সামান্য বিশ্রাম করল। সেনাদেরকে আরও খানিক সংহত করে ছুটে চলল ক্যাস্টোলার দিকে। প্রায় ২ লক্ষ সেনাসমর নিয়ে সুলতান মানসুর সেভিলে যাত্রাবিরতি করলেন। সেখানে আরও কিছু সরঞ্জাম সংগ্রহ করে সেনাদের বিন্যাস সমাপ্ত করে ক্যাস্টোলার রাজধানী টলেডোর দিকে এগিয়ে চলেন।

গোয়েন্দা মারফত সংবাদ আসে—আলফোন্সো লিয়ন, নাভাররে, আলমানিয়া, ইংল্যান্ড এবং হল্যান্ড থেকে সাহায্য নিয়ে প্রায় ২ লক্ষ ২৫ হাজার সেনা জমায়েত করেছে। তাদের সাথে ময়দানের পেছনে ভিড় করেছে কিছু ইহুদি ব্যবসায়ী, যুদ্ধ শেষে তারা মুসলিম সেনাদের গোলাম হিসেবে কিনে নিয়ে আন্দালুসের বাজারে বিক্রি করবে। এ-কথা শুনে সুলতান স্মিত হাসলেন। গুপ্তচর জানাল, এই বাহিনী রাবাহ এবং আর্ক কেল্লার মধ্যবর্তী কোথাও তাঁবু গেড়েছে। সুলতান সাথেসাথে বাহিনীর মোড় ঘুরিয়ে সেদিকে চললেন। আলফোন্সোর সেনা-শিবির থেকে দুই দিনের দূরত্বে এসে যাত্রা থামালেন। ঘোড়াগুলোকে পানি পান করতে দিয়ে সেনাপতিদের নিয়ে পরামর্শে বসলেন। তখন শাবানের ৪ তারিখ, সুলতান যুদ্ধের বিস্তারিত পরিকল্পনা সেরে নিলেন।

সুলতানের বাহিনীতে ছিলেন সাম্রাজ্যের অন্যতম চৌকস সেনাপতি আবু আবদুল্লাহ ইবনু সানাদিদ। আন্দালুসের লোক হওয়ায় তিনি এতদাঞ্চলের সেনাদের মন-মগজ জানতেন। তাদের যুদ্ধকৌশল কী হতে পারে, তিনি আগ থেকে তা আঁচ করতে পারতেন। তিনি সুলতানকে পরামর্শ দিলেন, প্রথমত পুরো বাহিনীর একজন প্রধান সেনাপতি নির্ধারণ করুন। এরপর সেনাদেরকে মোট পাঁচ ভাগে বিভক্ত করে ফেলুন:

১. আন্দালুসের বাহিনী। তাদেরকে মূল বাহিনীর ডান দিকে রাখা হবে এবং তাদের নিজেদের মধ্যকার কাউকে সেনাপতি করে দেয়া হবে। নতুবা অন্য কোনো অপরিচিত সেনাপতির নির্দেশ মানতে তাদের অস্বাভাবিক লাগতে পারে।

২. ডান অংশে রাখুন আরব সেনাদেরকে। সেনাপতি তাদেরই কেউ হোক।

৩. মুওয়াহহিদি সাম্রাজ্যের সুশৃঙ্খল সেনাদল। এদেরকে রাখুন মূল বাহিনীর মধ্যভাগে।

৪. আরব, আন্দালুস এবং অন্যান্য দেশ থেকে আসা স্বেচ্ছাসেবী যোদ্ধা—যারা

অন্যান্য সৈন্যদের মতো যুদ্ধবিদ্যায় ততটা যোগ্য না—এদেরকে মূল বাহিনীর পেছন ভাগে রাখা হোক।

৫. সুলতান, তার রক্ষীদল এবং সেনাবাহিনী বিশেষ টিম। এরা সুলতানকে নিয়ে সতর্কতাবশত যুদ্ধক্ষেত্রের পাশে টিলার পেছনে লুকিয়ে থাকবে। পরিস্থিতি প্রতিকূল দেখলে এরা অতর্কিত শত্রুদের উপর হামলে পড়বে।

সুলতান তার পরামর্শ আমলে নিলেন। আন্দালুসি সেনাদের জন্য তাকেই সেনাপতি হিসেবে নিযুক্ত করলেন। পুরো বাহিনীর প্রধান সেনাপতি হিসেবে দায়িত্ব দিলেন আবু ইয়াহয়া ইবনু আবি হাফসকে। নিজে বাহিনীর কাতারে কাতারে গিয়ে যুদ্ধের জন্য সেনাদের উৎসাহ দিলেন। তাদেরকে বীরত্বের সবক দিলেন, আল্লাহপ্রদত্ত বিজয়ের জন্য আশ্বাস জোগালেন। শুধু তাই নয়, বাহিনীর গঠন এবং বিন্যাস শেষ করে সুলতান সবার জন্য একটি খোলা চিঠি লিখলেন। দরাজ গলার একজন আমির সেনাদের সামনে সেটা পাঠ করে শোনালেন। সেখানে সুলতান বললেন: 'তোমরা আমাকে ক্ষমা করে দিয়ো। নিজেরাও পরস্পর ক্ষমা চেয়ে নিয়ো; কারণ, এটা ক্ষমা প্রার্থনার দিন। অন্তর পরিচ্ছন্ন রাখবে এবং নিয়তকে একমাত্র আল্লাহর জন্য সনিষ্ঠ করে নেবে।' সুলতানের এই বার্তা সেনাদের অন্তরে গভীর রেখাপাত করল। তারা বুঝতে পারল, এটা সুলতানের বিদায়ী কথন। তারা সুলতানের নির্দেশ পালনার্থে এমন ঘোরতর বিপদের কালে, একে অন্যের সাথে আলিঙ্গন করল। পরস্পরে ক্ষমা চাইল এবং দুনিয়ার মায়া ছেড়ে পরকালের দিকে যাত্রা শুরু করল।

যুদ্ধের ক্ষণ

যুদ্ধক্ষেত্রে আগে অবস্থানের কারণে খ্রিস্টানরা এ যুদ্ধে উপত্যকার উপরিভাগে শিবির গেড়েছিল, মুসলিমদেরকে নিচ থেকে তাদের মোকাবেলা করতে হচ্ছিল। কিন্তু যারা জীবনের মায়া ছেড়ে পরকালযাত্রার নিয়তে ময়দানে আসে, তারা তো এইটুকু প্রতিকূলতায় দমে যেতে পারে না। রণক্ষেত্রের এই বৈপরিত্য তাই মুসলমানদের ভেতর কোনো প্রতিক্রিয়া করতে পারল না।

যুদ্ধ শুরু হলো। উপর দিক থেকে শত্রুপক্ষের সেনারা জোয়ারের পানির মতো মুসলমানদের উপর আছড়ে পড়তে লাগল। এক দল সামাল দিতেই হামলে পড়ছিল আরেক দল। নিম্নগামী ঝরনার মতো এমন ঝুরঝুরে আক্রমণে মুসলিম বাহিনী

দিশেহারা হয়ে পড়ল। বহু সেনা শাহাদাত বরণ করল এবং বাকিরা ধীরে ধীরে পেছনের দিকে সরে আসতে লাগল। সুলতান বুঝতে পারলেন, সেনাদের মনোবল ভেঙে যাচ্ছে। তিনি টিলার পেছন থেকে বের হয়ে প্রত্যেক কাতারে কাতারে গিয়ে সেনাদেরকে পুনরায় উৎসাহিত করলেন। তাদেরকে বললেন, 'তোমরা তোমাদের নিয়ত নবায়ন করে নাও, তোমাদের অন্তর হাজির করে নাও এবং চূড়ান্ত আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়ো।' এরপর তিনি পুনরায় যুদ্ধ-পরিকল্পনামতো তার আগের জায়গায় ফিরে এলেন।

সুলতানের মুখে উদ্দীপক শব্দবাক্য শুনে সেনাদের জোশ ফিরে এল। তরবারির মুঠি শক্ত করে তারা পাল্টা আক্রমণ শুরু করল। এতে যুদ্ধের চিত্র বদলে গিয়ে খ্রিস্টানরা পেছন দিকে সরতে লাগল। কিন্তু তারা আবারও পূর্বের মতো একযোগে হামলে পড়লে মুসলিম বাহিনী দ্বিতীয়বারের মতো পেছনে হটতে লাগল। এভাবে কয়েকবার যুদ্ধ উভয় বাহিনীতে ভার তৈরি করল। যুদ্ধ কোনো ফলাফলের দিকে এগোচ্ছে না দেখে প্রতিপক্ষের সেনাপতি খ্রিস্টান অশ্বারোহীদেরকে মুসলিম বাহিনীর কেন্দ্রীয় অংশে শক্ত আক্রমণের নির্দেশ দিল। সেনাপতির নির্দেশে তারা মুওয়াহহিদি সাম্রাজ্যের মধ্যভাগের সেনাদের উপর হামলা করে তাদেরকে পেছনের দিকে নিয়ে যেতে থাকল। আক্রমণ এতটা ভয়ানক ছিল যে, বিজয় নিশ্চিত ভেবে আলফোন্সো তার দশ হাজার রক্ষী সেনাদের নিয়ে ময়দানে নেমে এল। এই সুযোগটা কাজে লাগালেন মুসলিম বাহিনীর ডান পাশে আন্দালুস সেনাদের নেতৃত্বে থাকা আবু আবদুল্লাহ ইবনু সানাদিদ। তিনি প্রতিপক্ষের অশ্বারোহীদেরকে মুসলিম বাহিনীর কেন্দ্রীয় অংশে ব্যস্ত দেখে তার সেনাদের নিয়ে আলফোন্সোর রক্ষীদের উপর হামলে পড়লেন। অল্প কিছুক্ষণ না যেতেই তিনি আলফোন্সোকে চারপাশ থেকে ঘিরে ফেললেন।

নিজেদের সম্রাটকে মুসলিম বাহিনীর বেষ্টনিতে দেখে খ্রিস্টান সেনাদের ভেতর বিশৃঙ্খলা লক্ষ করা গেল। তরবারি থেকে তাদের হাত ঢিল হয়ে এল। বাহিনীর কাতারগুলোতে ছেয়ে গেল পরাজয়ের ভয়। কিন্তু সেনাপতির নির্দেশে তারা মুসলিম বাহিনীর উপর আক্রমণে নামলে যুদ্ধের মূল সময় শুরু হলো তখন। রণক্ষেত্র পরিণত হলো গগনমুখী ধুলোয়। ঘন ধুলোর প্রাচীর ভেদ করে উড়ে আসছিল কেবল তরবারির আওয়াজ। থেকে থেকে উঁচু হয়ে উঠছিল মুসলিম সেনাদের তাকবিরধ্বনি। ধীরে ধীরে বিজয় চলে আসছিল মুসলমানদের থলেতে। খ্রিস্টানরা ততক্ষণে তাদের সম্রাটের চারপাশে একেবারে কোণঠাসা হয়ে গেছে।

সুলতান আবু ইউসুফ আল-মানসুর টিলার ওপাশে লুকিয়ে থাকা তার বাহিনীকে নির্দেশ দিলেন আক্রমণের। তিনি নিজেও তাদের সাথে তরবারি কোষহীন করে নেমে এলেন ময়দানে। সম্মুখে এক সেনার হাতে দেখা গেল, কালিমাখচিত একটি শুভ্র পতাকা। তাতে স্পষ্ট লেখা আছে, 'লা গালিবা ইল্লাল্লাহ।' যুদ্ধরত সেনারা সুলতান ও তার পতাকা দেখে মানসিক শক্তি পেল। তাদের মনোবল পূর্বের চেয়ে কয়েকগুণ বেড়ে গেল। শাবানের ৯ তারিখ বিকেলেই আর্কের এই ময়দান মুসলমানদের গৌরবময় এক বিজয়ের সাক্ষীতে পরিণত হলো। কেউ এ যুদ্ধকে যাল্লাকার সমপর্যায়ে ভাবেন, কেউ-বা গুরুত্ববিচারে এটাকে যাল্লাকারও উপরে রাখতে চান। সম্রাট অষ্টম আলফোন্সো সামান্য কিছু সেনা নিয়ে টলেডোর দিকে পালিয়ে যায়। বিজয়ের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে মুওয়াহহিদিন সাম্রাজ্যের দিকে দিকে। কোনায় কোনায় উড়তে থাকে সুলতান আবু ইউসুফ আল-মানসুরের প্রশংসাবচন। হিত্তিনের ময়দানে ক্রুসেডারদের সম্মিলিত পরাজয়ের মাত্র আট বছরের মাথায় আর্কের ময়দানে তাদেরকে মুসলিম বাহিনীর কাছে আরেকবার মাথা নত করাতে পারার এই সৌভাগ্য ভাষায় বর্ণনা করার মতো নয়।

যুদ্ধের ফলাফল

১. সম্মিলিত ক্রুসেডবাহিনীর শোচনীয় পরাজয়

এ যুদ্ধের ক্রুসেডারদের প্রচুর সেনা নিহত এবং বন্দি হয়। ঐতিহাসিকদের মতে, প্রথম দিনই তিরিশ হাজার খ্রিস্টান সেনা নিহত হয়। আন্দালুসের ইতিহাস নিয়ে লিখিত নাফহুত তিব গ্রন্থমতে, এ যুদ্ধে খ্রিস্টানদের ২ লক্ষ ২৫ হাজার সেনাবাহিনীর ১ লক্ষ ৪৬ হাজারই যুদ্ধক্ষেত্রে মারা যায়। বন্দি হয় প্রায় তিরিশ হাজারের মতো সেনা। তাদেরকে সুলতান মানসুর অনুগ্রহপূর্বক বিনা মুক্তিপণে জীবিত ছেড়ে দেন।

২. সুদূরপ্রসারী জয়

এ যুদ্ধে মুসলমানদের প্রাপ্ত গনিমত ছিল বহু। ঐতিহাসিকদের মতে, গনিমত হিসেবে প্রাপ্ত ঘোড়ার সংখ্যাই ছিল ৮০ হাজার। সাথে ছিল এক লক্ষ খচ্চর এবং অসংখ্য মূল্যবান তাঁবু। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহমতো সুলতান মানসুর সেগুলোর চার পঞ্চমাংশ যোদ্ধাদের মাঝে বিতরণ করে দেন। বাকি এক পঞ্চমাংশ ব্যয়ে সেভিলে এক বিরাট মসজিদ নির্মাণ করেন, যাতে আর্কের এই

যুদ্ধের স্মরণ বহু দিন মুসলমানদের মধ্যে জীবন্ত থাকে। সেই মসজিদের মিনারের উচ্চতা ছিল ২০০ মিটার, যা সে-সময়ে আন্দালুসের সবচেয়ে উঁচু মিনার হিসেবে পরিগণিত হতো।

৩. নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিজয়

এ যুদ্ধের অন্যতম প্রধান প্রাপ্তি ছিল, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মুসলিমদের হৃদয়জগতের অসামান্য নৈতিক ও মানসিক বিজয়। আর্কের ঘটনার পর মুওয়াহহিদিন সাম্রাজ্যের তারকার দ্যুতি ও জ্যোতি বেড়ে যায়। তাদের স্থিতি মজবুত হয় এবং গতি বিস্তৃতি পায়। বিপরীতে সমান আনুপাতিক হারে খ্রিস্টানদের মৌন শক্তির পতন ঘটে। তাদের শহরগুলোতে ছড়িয়ে যায় পরাজয়ের গ্লানি এবং কাপুরুষতার ধোঁয়া। এদিকে মুসলমানদের আনন্দ যেন বাধ সাধে না। তারা বিজয়ের খুশিতে দান-সদকা করতে থাকে, অধীনস্ত গোলামদের অবমুক্ত করতে শুরু করে।

এর সুদূরপ্রসারী ফল হিসেবে মুসলমানদের বিজয়যাত্রার ধারা বেগবান হয়। আর্কের বিজয়ই তাদেরকে আরও বেশকিছু যুদ্ধে বিজয়ের হাতছানি দিয়ে যায়। এ যুদ্ধের কদিন বাদেই তারা নতুন কিছু দুর্গ হাতিয়ে নেয়। মুরাবিতিন সাম্রাজ্যের দখল থেকে ছুটে যাওয়া উত্তর-পূর্ব আন্দালুসের ভূমিগুলো তারা পুনরায় নিজেদের করে নেয়। বেশ কয়েকবার তারা টলেডোও অবরোধ করে রাখে। কিন্তু সেটা আন্দালুসের সবচে শক্ত এবং সুরক্ষিত শহর হওয়ায় প্রতিবারই মুসলিম বাহিনীকে ব্যর্থ হয়ে ফিরতে হয়।

৪. খ্রিস্টানদের রাজ্যগুলোর পরস্পর দ্বন্দ্ব

আর্কের পরাজয়ের দায় নিয়ে নাভাররে এবং লিয়ন রাজ্যের সাথে ক্যাস্টোলার সম্রাট আলফোন্সোর বিরোধ দেখা দেয়। আলফোন্সো পরাজয়ের পুরো দায় চাপাতে চায় নাভাররে এবং লিয়নের উপর। এতে উভয়পক্ষের সেনাদের মনোবল ভেঙে যায়। তারা নেতাদের উপর তাদের আস্থা হারিয়ে ফেলে। ইতিমধ্যে ইউরোপ থেকে প্রতিনিধিরা এসে আলফোন্সোকে সুলতান মানসুরের সাথে সন্ধি করে নেবার নির্দেশ দিতে শুরু করে। ইংল্যান্ড থেকে দূত আসার পর, তার সামনে আর অন্য কোনো পথ খোলা থাকে না। তবে ততদিনে সুলতান মানসুর তার জীবনের শেষ সময়ে চলে এসেছেন।

৫. ক্যাস্টোলার সাথে মুসলমানদের পুনরায় সন্ধি

আর্কের পরাজয়ের সুদূরপ্রসারী ফল হিসেবে সম্রাট আলফোন্সো মুওয়াহহিদিন সাম্রাজ্যের সুলতান আবু ইউসুফ মানসুরের সাথে পুনরায় দশ বছরের যুদ্ধবিরতি এবং শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। সুলতানের ইচ্ছে ছিল, এই সময়টাতে তিনি তার সেনাবাহিনীতে প্রয়োজনীয় সংস্কার এবং মেরামত সেরে নিবেন।

লাস নাভাস ডি টলোসা

BATTLE OF LAS NAVAS DE TOLOSA

তারিখ:	৬০৯ হিজরি / ১২১২ খ্রি.	
স্থান:	নাভাস উপত্যকা, টলোসা, আন্দালুস	
ফলাফল:	খ্রিস্টানদের বিজয়	
পক্ষ-বিপক্ষ:	মুওয়াহহিদিন সাম্রাজ্য	ক্যাস্টোলা, আরাগন, পর্তুগাল এবং নাভাররে
সেনাপ্রধান:	সুলতান আন-নাসির মুহাম্মদ ইবনু ইয়াকুব	• ক্যাস্টোলার রাজা অষ্টম আলফোন্সো • নাভাররের রাজা সপ্তম শাঙ্খ • পর্তুগালের রাজা দ্বিতীয় আলফোন্সো • আরাগনের রাজা দ্বিতীয় পিটার
সেনাসংখ্যা:	২ লাখ, মতান্তরে ৫ লাখ	২ লাখ, মতান্তরে ৬০ হাজার
ক্ষয়ক্ষতি:	৭০ হাজার শহিদ	নির্দিষ্ট করে জানা যায় না, তবে মুসলমানদের চেয়ে অনেক কম

জায়েন শহর। কর্ডোভার পূর্বে ও গ্রানাডার উত্তরে অবস্থিত এ শহরের আশপাশে রয়েছে জলপাইগাছের বিশাল বিশাল বাগিচা। স্থানীয়দের মতে, সমগ্র জায়েন প্রদেশে ৫ কোটিরও বেশি জলপাইগাছ রয়েছে। এ শহরের লোকসংখ্যা প্রায় সোয়া লাখ। এখানে দেখা যায়, মুসলমানদের অসংখ্য পাহাড়সম সটান সুউচ্চ কেল্লা। দেখা যায়, বড় বড় মিনার, যেগুলোর ওপর থেকে পুরো জায়েন শহর একনজরে দৃশ্যমান হয়। কেল্লার নিচ ধরে এগিয়ে গেছে এখানকার প্রাচীনতম এলাকা। শহরের ভিল্লার ডসপার ডোর নামক প্রাসাদের নিচে আরব আমলের গোসল-হাম্মামখানা আবিষ্কৃত হয়েছে। স্পেনে এগুলো খুবই বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। জায়েনের আধুনিক অংশে প্রধান সড়কের পাশে, প্লাজা ডিলাস বাটা লাম নামক চতুষ্কোণের একটা স্মৃতিসৌধ বানিয়েছে স্পেন; লাস নাভাস ডি টলোসা এবং বেইলিনে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে তাদের ঐতিহাসিক যুদ্ধের চিরকালীন স্মরণে। এই লাস নাভাস ডি টলোসা যুদ্ধ ছিল অনেকটা ওয়াটারলুর যুদ্ধের মতো। সুলতান নাসির মুহাম্মদের নেতৃত্বে মুওয়াহহিদিন সাম্রাজ্য এ যুদ্ধে সম্রাট অষ্টম আলফোন্সোর সম্মিলিত বাহিনীর কাছে পরাজিত হলে স্পেনে মুসলমানদের ভবিষ্যৎ শেষ হয়ে যায়; যদিও দক্ষিণের সামান্য কিছু অংশ নিয়ে গ্রানাডা নামে একটি ক্ষুদ্র মুসলিম রাজ্য পরবর্তী ১৪৯২ সাল পর্যন্ত টিকে ছিল; তবে তাদের কোনো স্বায়ত্তাধিকার ছিল না। ১২১২ সালের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ এ যুদ্ধটি সংঘটিত হয় স্পেনের টলোসা শহরের নাভাস নামক স্থানে। এ-জন্যই যুদ্ধটি 'লাস নাভাস ডি টলোসা' নামে পরিচিত। এদিকে নাভাসের কাছেই ছিল ইকাব নামক উমাইয়া আমলের এক প্রাচীন দুর্গ। তাই আরব ইতিহাসবিদদের কলমে এ যুদ্ধটি 'ইকাবের যুদ্ধ' নামেও উল্লিখিত হয়ে থাকে।

পটভূমি

১১৯৫ সালে আর্কের যুদ্ধে সম্রাট অষ্টম আলফোন্সোকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করার পর স্পেনে মুসলমানদের শেকড় ক্রমশ মজবুত হতে থাকে। তাদের সাম্রাজ্য বিস্তৃতি পায় এবং বহু দুর্গ ও নগর তাদের শাসনে চলে আসে। এতে স্বভাবতই পরাজিত সম্রাট আলফোন্সোর মনে ধাক্কা লাগে। সে প্রতিশোধ গ্রহণের উপযুক্ত কোনো সুযোগ খুঁজতে থাকে, যদিও সে ইংল্যান্ডের চাপে পড়ে মুওয়াহহিদিন সম্রাটের সাথে শান্তিচুক্তি করে নিয়েছিল।

এই সময়টা সে তার শক্তি সঞ্চার করে। আর্কের ময়দানে হারানো সেনাদলের পুনসংযোজন এবং সংস্কার করে নেয়। তেমনি ইউরোপের খ্রিস্টান রাজ্যগুলোর দ্বারে দ্বারে দৌড়ে তাদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করে। ক্রমাগত প্রচেষ্টার পর সে আইবেরিয়ার তার প্রতি বিরাগ পোষা রাজ্যগুলোরও সম্মতি আদায় করতে সক্ষম হয়। পর্তুগাল, নাভাররে এবং আরাগনের সম্রাটদেরকে সে নিজের মতে সহমত করিয়ে নেয়। এরপরই ১২০৯ সালে সে মুওয়াহহিদিনদের সাথে কৃত পূর্ব শান্তিচুক্তি ভঙ্গ করে দেয়। আন্দালুসের মধ্যবর্তী দুর্গ রাবাহে প্রথমে আক্রমণ করে। এরপর বাহিনী নিয়ে একে একে দখল করে নেয় জায়েন, বায়েজা এবং মুরসিয়া শহরের কিয়দাংশ।

বাবা মনসুরের মৃত্যুর পর মুওয়াহহিদিন সাম্রাজ্যের মসনদে তখন সুলতান আন-নাসির মুহাম্মদ। ঐতিহাসিকদের মতে, তখন তার সভাসদে স্বদেশী ও বিদেশি দায়িত্বশীলদের সমাবেশ ঘটেছিল। আন্দালুসের উজিরদের কথা না শুনে অনেকক্ষেত্রেই তিনি আরব বা আফ্রিকার সে-সব আমির-উজিরদের কথায় কান দিতেন, যাদের আন্দালুসের ব্যাপারে তেমন কোনো অভিজ্ঞতাই ছিল না। লাস নাভাস ডি টলোসার এ যুদ্ধেও সুলতানের এমন মনোভাবকেই অনেক ঐতিহাসিক পরাজয়ের বড় কারণ বলে মনে করেন।

আলফোন্সোর হঠাৎ এমন আক্রমণের মুখে সেনা অভিযান ছাড়া সুলতানের সামনে দ্বিতীয় কোনো পথ খোলা ছিল না। তিনি মুসলমানদের মধ্যে জিহাদের আহ্বান ছড়িয়ে দিলেন এবং সেনাপতিদেরকে সেনা ও সরঞ্জাম সংগ্রহের নির্দেশ দিলেন। ঐতিহাসিকদের মতে আরব ও আন্দালুসের মুজাহিদ মিলিয়ে সেবার সুলতানের বাহিনীতে একত্র হয়েছিল প্রায় পাঁচ লক্ষ মুসলিম সেনা, যা আলফোন্সোর সম্মিলিত খ্রিস্টান বাহিনীর দুই গুণেরও বেশি ছিল। এ ব্যাপারে ইতিহাসের গ্রন্থগুলোর

মতানৈক্য বিবেচনায় সবচে কম সংখ্যা ছিল দুই লক্ষ ষাট হাজার; অপরদিকে খ্রিস্টানদের সেনাসংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ষাট হাজারের মতো। তবে যে মতই গ্রহণ করা হোক, মুসলমানদের বাহিনীতে খ্রিস্টানদের দুই কি আড়াই গুণ সেনা বেশি ছিল।

১২১১ সালের ৪ঠা মে সুলতান তার বাহিনী নিয়ে আন্দালুসের বন্দরনগর পাড়ি দিয়ে সেভিলে পৌঁছেন। সেখানে সেনাদের বিন্যাস ও প্রস্তুতি সেরে কিছুদিন বাদে রওনা করেন ক্যাস্টোলার রাজধানীর দিকে। সেখানে তিনি সালবাতরা কেল্লা অবরোধ করেন। দুর্গটি ছিল টলেডোর দক্ষিণে একটি দুর্গম পাহাড়ে অবস্থিত। অল্পকিছু খ্রিস্টান রক্ষী অবস্থান করলেও প্রাকৃতিকভাবে দুর্গটি ছিল বেশ শক্ত এবং সুরক্ষিত। তাই অনেক দিন হয়ে গেলেও, মুসলমানরা দুর্গটি নিজেদের অধিকারে নিতে পারল না। শেষমেশ সুলতান আন্দালুসের উজির ও সেনাপতিদের সাথে পরামর্শ ডাকলেন। তারা সুলতানকে দুর্গটি অধিকারের চিন্তা ছেড়ে উত্তরে খ্রিস্টানদের মূল বাহিনীর দিকে অগ্রসর হবার পরামর্শ দিল। তাদের ভয় ছিল, এভাবে কোনো অর্জন ছাড়া বাহিনী এই দুর্গের দুয়ারে পড়ে থাকলে বাহিনীর শক্তি শেষ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু সুলতান আন-নাসির মুহাম্মদ তাদের কথা শুনলেন না; তিনি শুনলেন তার আফ্রিকান উজিরের কথা; যে বলেছিল, আমার মনে হয় দুর্গের পতন না ঘটিয়ে আমাদের এ জায়গা ছেড়ে যাওয়া কাপুরুষতা হবে। এরপর দীর্ঘ আটটি মাস সুলতান তার বাহিনী নিয়ে দুর্গের পাশে নিষ্ফল পড়ে রইলেন।

একগুঁয়েমির পরিণাম: পরাজয়ের পূর্বাভাস

স্বদেশী উজিরদের কথায় কান না দিয়ে সুলতানের এমন একগুঁয়েমির যে ফল দাঁড়িয়েছিল, তা হলো:

১. দীর্ঘ আটটি মাস অযথা কেটে গেল, যে সময়টায় তিনি উত্তর দিকে এগিয়ে গিয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে পারতেন এবং খ্রিস্টবাহিনী তাদের প্রস্তুতি নেবার আগেই সুলতান বিজয় তুলে আনতে পারতেন।

২. খ্রিস্টানরা এই লম্বা সময়ে তাদের পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি সেরে নেয়। পাশাপাশি ইউরোপ থেকে আরও বহু সেনা তাদের বাহিনীতে যোগ করে নেয়।

৩. অবরোধের এই সময়ে হাজার হাজার মুসলিম সেনা আন্দালুসের পাহাড়ি তুষারপাত সইতে না পেরে ঠান্ডায় মারা গেছে। অথচ সুলতান আন্দালুসে ঢুকেছেন

মে মাসে, তখন যুদ্ধের জন্য ঋতু ছিল একেবারে উপযোগী। কিন্তু এই দুর্গের অবরোধে গোঁ ধরে থাকায় ততদিনে হাড়কাঁপানো শীত এসে গেছে। এই দীর্ঘ অবরোধে ক্লান্ত হয়ে পড়া সেনারা তাই একে একে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে।

আলফোন্সোর শিবির

সালবাতরা দুর্গে মুসলমানরা অবরোধ করেছে শুনেই আলফোন্সো ইউরোপের প্রত্যেকটা শহর থেকে সেনা জমায়েত করে নিয়েছে। একদল প্রতিনিধি পাঠিয়েছে রোমের প্রধান পোপ তৃতীয় আনুসেন্টের কাছে, যাতে তিনি পুরো ইউরোপে ক্রুসেডের ডাক দেন। পোপ ধর্মযুদ্ধের ডাক দিতেই ইউরোপের আমজনতা সকলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য ঘটি-বাটি নিয়ে এগোতে থাকে স্পেনের দিকে। 'আমরা সকলে ক্রুসেডার' স্লোগান তুলে স্পেনের প্রত্যেকটা শহরের কোনা থেকে নেমে আসে হাজারও জনগণ টলেডোর দিকে যাত্রা করে।

আলফোন্সোর প্রচেষ্টা সাফল্যের মুখ দেখে। যে-সব শাসক বা রাজ্যপ্রধান আলফোন্সোর সহযোগিতায় আসতে দেরি করছিল, পোপ আনুসেন্ট তাদেরকে এই দেরি করার ফলে ইউরোপের গির্জাগুলোও হারাতে হতে পারে বলে হুঁশিয়ারি দেয়। এতে সকলে ধর্মীয় ভাবাবেগ থেকে সেনাদেরকে টলেডোতে পাঠাতে শুরু করে। প্রায় সত্তর হাজার নতুন সেনা আলফোন্সোর রাজ্যে প্রবেশ করলে শহরে তাদেরকে জায়গা দেয়াও কষ্টকর হয়ে যায়।

প্রায় লক্ষাধিক সৈন্য নিয়ে ২রা জুন আলফোন্সো টলেডো ছেড়ে যাত্রা করে। আন্দালুসের সীমান্ত পার হয়ে রাবাহ দুর্গে অবরোধ বসায়। দুর্গটির দায়িত্বে থাকা সত্তরজন রক্ষী তাদের সর্বোচ্চ দিয়ে দুর্গ বাঁচানোর শেষ চেষ্টা করে যায়। দুর্গপতি আবুল হাজ্জাজ ইউসুফ ইবনু কাদিস সুলতান নাসিরের কাছে সাহায্য চেয়ে পত্র পাঠায়; কিন্তু একটি পত্রও সুলতানের কাছে পৌঁছে না। এভাবে অবরোধ দীর্ঘ হয়ে একসময় আবুল হাজ্জাজ মনে করেন, অস্ত্র হারানো আর শক্তি কমানো ছাড়া আর কোনো লাভ হচ্ছে না প্রতিরোধে; এদিকে সুলতানের সাহায্য আসারও কোনো নামগন্ধ নেই। তাই তিনি আলফোন্সোর সাথে সন্ধি করে দুর্গ তাকে সঁপে দেয়ার চিন্তা করলেন। শর্ত দিলেন, সেনাদেরকে নিরাপদে দুর্গ ছেড়ে যেতে দেয়া হবে।

দুর্গ আলফোন্সোর দখলে দিয়ে আবুল হাজ্জাজ যখন সুলতানের সাথে দেখা করে

সব খুলে বলেন, তখন দুষ্কৃতিকারী উজির আবু সাইদ ইবনু জামে কেল্লারক্ষায় কাপুরুষতা দেখানোর অপরাধে তাকে হত্যা করে ফেলার পরামর্শ দেয়। সুলতানও তাতে প্ররোচিত হয়ে কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব না করে তাকে ধরে আনার আদেশ ছুড়ে দেয়। এভাবে নিজেদের হাতে একজন মুজাহিদকে হত্যা করার মধ্য দিয়ে শুরু হয় লাস নাভাস ডি টলোসার যুদ্ধ।

এই ঘটনা নিঃসন্দেহে সুলতান নাসিরের জন্য দুর্দিন টেনে আনছিল। তার পূর্বের সকল ভুল এবং নির্বুদ্ধিতার সাথে আরও যা যোগ হয়েছিল, তা হলো:

১. দুর্গপতি আবুল হাজ্জাজ ইউসুফ ইবনু কাদিস দুর্গ ছেড়ে চলে এসে কোনো ভুল করেননি। বরং তিনি যুদ্ধে অংশ নেবার জন্য কৌশল হিসেবে এই কাজ করেছিলেন। তিনি যদি দুর্গ রক্ষায় পড়ে থাকতেন, তাহলে হয় নিহত হতেন, নতুবা এদিকে ময়দানে যুদ্ধ চলত আর তিনি দুর্গে বন্দি হয়ে পড়ে থাকতেন।

২. যদি মেনে নিই যে, তিনি ভুল করেছিলেন, তারপরও তার এমন অপরাধ হত্যাযোগ্য কিছু ছিল না। বিশেষত যখন তিনি ইচ্ছে করে এটা করেননি, বরং দুর্গ ছেড়ে চলে আসাটা তার একটা কৌশলই ছিল।

সুলতানের পরিকল্পনা এবং বাহারি ভুল

পূর্বের ভুলগুলোর পরিপূর্ণতা দিতে সুলতান নাসির এক আজগুবি যুদ্ধ পরিকল্পনা সাজান। এমন, যা আগে কেউ করেনি। তিনি জানতেন না ইতিহাসের সামান্য কিছুও, কেমন ছিলেন তার বাবা আবু ইউসুফ মানসুর বা কেমন পরিকল্পনা করতেন তার পূর্বপুরুষ ইউসুফ বিন তাশফিন। তিনি পুরো সেনাবাহিনীকে দুই ভাগ করে একভাগ সামনে এবং একভাগ পেছনে রাখলেন। আবার যাদেরকে সামনে রাখলেন, তারা ছিল অপ্রশিক্ষিত যুদ্ধাগ্রহী সাধারণ স্বেচ্ছাজনতা। আর সাম্রাজ্যের নিয়মিত শিক্ষিত সেনাদের রাখলেন একেবারে সামনে কিছু এবং পেছনের পুরোভাগে। সম্মুখভাগের এই সাধারণ সেনারা কোনো কৌশল জানতেন না। যুদ্ধের কোনো পূর্ববিদ্যা বা অভিজ্ঞতা তাদের ছিল না। কেবলমাত্র যুদ্ধের চেতনা বা শাহাদাতের আগ্রহ নিয়ে তারা দাঁড়িয়েছিল প্রশিক্ষিত এবং নির্বাচিত সেরা ক্রুসেড সেনাদের সামনে। অপরদিকে ক্রুসেড বাহিনী বিভক্ত ছিল তিন ভাগে। প্রথমভাগে ইউরোপিয়ান সেনা, দ্বিতীয় ভাগে আরাগনের সেনা এবং তৃতীয় ভাগে ক্যাস্টোলা,

পর্তুগাল, লিয়ন এবং নাভাররের সম্মিলিত সেনাদল।

সুতরাং সার্বিক বিবেচনায় সুলতান নাসিরের উচিত ছিল, সামনে যোগ্য ও অভিজ্ঞ এমন সেনাদের দাঁড় করানো, যারা ক্রুসেডারদের প্রথম হামলাটা অন্তত ঠেকিয়ে দিতে পারবে, যাতে তিনি অন্তত তার প্রথম পরিকল্পনা মাঠে নামাতে পারেন এবং তাতে মুসলিম বাহিনীর মনোবল খানিকটা শক্তিশালী হতে পারে। কিন্তু তিনি করেছেন পুরো উল্টো, সামনে রেখেছেন এমন এক বাহিনীকে, যাদের চেতনা কেবল বিপদকালে কাজে লাগানো যায়। এখানেই শেষ নয়, তিনি আন্দালুসের সেনাদেরকে রেখেছেন বাহিনীর ডান অংশে। যাদের হৃদয়ে তখনো তাদের যোগ্য সেনাপতি আবুল হাজ্জাজ ইউসুফ ইবনু কাদিসের নির্মম হত্যার দুঃখ ছেয়ে আছে। যাদের চোখে এখনো তরতাজা সে দৃশ্য, যাদের বুকের ভেতর এখনো তা হাতুড়িপেটা করছে অনর্গল; তাদেরকেই তিনি রেখেছেন ক্রুসেডারদের প্রথমবারের আক্রমণের মুখে।

যুদ্ধ বা তিক্ত ইতিহাস

যেন পুরনো সেই হুনাইনের চিত্র। সুলতান নাসিরের সাথে ইকাবের প্রান্তরে যেন সেই হুনাইনই প্রতিচিত্রায়িত হলো। তার সাথে ছিল ৯৬ হিজরিতে আন্দালুস বিজয় থেকে আজ অব্দিকালের সবচে বড় এবং সবচে বিপুল সেনাবাহিনী। কিন্তু ধারাবাহিক ভুলের পরিণামে পরাজয় যেন তিনি টাকায় কিনে নিয়েছিলেন। জুলাইয়ের ১৬ তারিখে মুসলিম বাহিনীর সম্মুখভাগের অনভিজ্ঞ সেনারা ক্রুসেড বাহিনীর সামনের অংশে হামলে পড়ল। কিন্তু ক্যাস্টোলার প্রশিক্ষিত শক্তিশালী সেনারা পাথরের মতো জমে দাঁড়িয়ে রইল। তাদের শক্তিশালী প্রতিরোধে উল্টো মুসলিমরা বিধ্বস্ত হয়ে গেল। হাজারে হাজারে তাদের লাশ পড়তে থাকল। আক্রমণ করতে গিয়ে উল্টো আক্রমণের শিকার হলো তারা। নিজেদের শিবিরের পাশে দাঁড়িয়ে নিরীহ মুসলিম সেনাদের কচুকাটা করতে থাকল খ্রিস্টানরা।

একবারের আক্রমণেই আলফোন্সোর বাহিনী মুসলমানদের সম্মুখভাগের সকলকে শেষ করে দিল। ঐতিহাসিকদের মতে যাদের সংখ্যা ছিল প্রায় ১ লক্ষ ৬০ হাজার। পুরো ময়দান নিজেদের লাশে ভরে থাকতে দেখে অবশিষ্ট সেনাদের আগ্রহে ভাটা পড়ল। এবার খ্রিস্টানরা মুসলমানদের কেন্দ্রীয় অংশের দিকে এগিয়ে এল। শুরু হলো তুমুল যুদ্ধ। সাম্রাজ্যের নিয়মিত সেনারা এবারের মতো ঠেকিয়ে দিল ক্রুসেডারদের

নাঙ্গা তলোয়ার। কিন্তু ততক্ষণে এতগুলো লাশ ফেলতে পেরে ক্রুসেড বাহিনীর মনোবল উঠে গেছে তুঙ্গে। মুসলিম বাহিনীর কেন্দ্রীয়ভাগের সাফল্য তাই তাদেরকে সামান্য বিচলিত করতে পারল না।

আলফোন্সো দেখল যে, মুসলিম বাহিনী ক্রুসেডারদের এবারের হামলা ঠেকিয়ে দিলেও তার সেনাদের মনোবল চাঙ্গা আছে। তাই সে আরেকবার আক্রমণ করার চিন্তা করল। কিন্তু এদিকে মুসলিম বাহিনীতে ঘটে গেল বিরাট বিপর্যয়। আন্দালুসের যে সেনাদল ডান অংশের দায়িত্বে ছিল, তারা যখন ময়দানভর্তি মুসলমানদের লাশ দেখল; এদিকে পূর্ব থেকেই তাদের মন কেঁদে ফিরছে দুর্গপতির মৃত্যুতে, তাছাড়া তারা মুওয়াহহিদিনদের সাথে লড়তে এসেছে স্বেচ্ছায়—মৃত্যু ও পরাজয়ের ভয়ে অনেকটা সম্রাটের প্রতি বিরাগভাজন হয়ে তারা ময়দান ত্যাগ করে পালিয়ে গেল।

মুসলিম বাহিনীর ডান দিক খালি দেখেই ক্রুসেডাররা তাদেরকে চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলল। শয়ে শয়ে হাজারে হাজারে মুসলিম সেনাকে হত্যার নৃশংস উৎসবে মেতে উঠল তারা। প্রায় সত্তর হাজার সৈন্যকে তারা সেই দিন পরপারে পাঠিয়ে দিল। শরীরে বেশকিছু তির-বল্লমের আঘাত নিয়ে সুলতান নাসির ময়দান ছেড়ে পালিয়ে গেলেন। তার সাথে গেল সামান্য কিছু সেনা। পালানোর সময় সুলতান বলেছিলেন, 'আল্লাহ সত্য বলেছেন আর মিথ্যা বলেছে শয়তান।' আমি ময়দানে এসেছিলাম এমন বিশ্বাসে যে, সংখ্যাধিক্যই আজকে আমাদের বিজয়ের কারণ হবে। মূলত এটা শয়তানের পক্ষ থেকে আমার জন্য বিভ্রান্তি ও ভ্রম ছিল। আল্লাহ তাআলা বলেন:

لَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِى مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْـًٔا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ

> *'আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেছেন অনেক ক্ষেত্রে এবং হুনাইনের দিনে—যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদের প্রফুল্ল করেছিল, কিন্তু তা তোমাদের কোনো কাজে আসেনি এবং পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের জন্য সংকুচিত হয়ে গিয়েছিল। এরপর তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করেছিলে।'*

হ্যাঁ, এবারও সুলতান নাসির পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করল। পরাজয়ের তিক্ততা সুলতানের আরও যে ভুলে পূর্ণতা পেল, তা হলো—পলায়নপর সুলতান যুদ্ধের

কাছাকাছি শহরে বায়েজাতে দাঁড়ালেন না, দাঁড়ালেন না উব্বাজাতেও। এক দৌড়ে তিনি গিয়ে উঠলেন সেভিলে। পেছনে ক্রুসেডাররা আশপাশের শহরগুলো দখলে নিয়ে নিল আর সুলতানের নামের পাশে ইতিহাস, পরাজিত ভীত কাপুরুষ শব্দগুলো লিখে দিল অনেকটা বাধ্য হয়েই।

পরাজয়পরবর্তী ভয়াবহতা

সুলতান পালিয়ে গেলে আলফোন্সো তার সেনাদের নিয়ে বায়েজা শহর অবরোধ করেন। সেখানে অবস্থান করছিল অসুস্থ পুরুষলোক এবং মুসলমান নারী ও শিশুরা। আলফোন্সো তাদেরকে শহরের জামে মসজিদে একত্র করে একে একে সবার গলা কেটে দিল। এরপর গেল উব্বাজা শহরে। সেখানে তেরো দিন অবরোধ করে পরিশেষে বলল, 'তোমরা স্বেচ্ছায় শহর ছেড়ে বেরিয়ে এলে আমি তোমাদের কোনো ক্ষতি করব না।' কিন্তু লোকেরা শহর থেকে নেমে এলেই আলফোন্সো নির্দয় কুকুরের মতো তাদের সকলকে মেরে ফেলার হুকুম জারি করে। খ্রিস্টান সেনারা প্রতিযোগিতা করে নিরীহ মুসলমানদের অবর্ণনীয় কষ্ট দিয়ে দিয়ে হত্যা করে ফেলে। ইতিহাসের পাতা ওল্টালে দেখা যায়, কেবল এই একটি শহরে সেদিন ক্রুসেডাররা ৬০ হাজার মুসলমানকে একসাথে হত্যা করেছিল। এটা ছিল সুলতান নাসিরের যুদ্ধের ময়দানে মুজাহিদ-হত্যার দাম।

অন্যদিকে আরাগন এবং কাস্টের রাজারা তাদের রাজ্য বিস্তার শুরু করে দিয়েছে। ১২২৮-১২৩২ সালের ভেতর তারা বালিয়ার দখল করে নেয়; এরপর ১২৩৮ সালে হাতে তুলে নেয় বালানসিয়া নামক সমৃদ্ধ মুসলিম শহর।

পরাজয়ের কারণ: ইতিহাস কী বলে!

১৬ই জুলাই। মুসলমানদের এই পরাজয়ের দিনটিকে স্পেন ক্রুসেডারদের 'ঈদের দিন' হিসেবে আখ্যা দিয়ে আসছে। তারা দিনটিকে ঐতিহাসিক বিজয় দিবস হিসেবে অভিহিত করছে সেই ১২১২ খ্রিস্টাব্দ থেকে। এই পরাজয়ের একমাত্র দায় ছিল নির্বোধ সুলতান আন-নাসির মুহাম্মদের। লাস নাভাস ডি টলোসা যুদ্ধে তার ভুলগুলোকে মোটাদাগে একসাথে করে বলা যায়:

- সালবাতরা দুর্গের আট মাসের ফলাফলহীন দীর্ঘ অবরোধ।
- সবকাজে বদমাশ উজির আবু সাইদ জামের পরামর্শ মানা।
- আন্দালুসের প্রসিদ্ধ সেনাপতি আবুল হাজ্জাজ ইউসুফ ইবনু কাদিসকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা।
- যুদ্ধের ময়দানে সেনাদের ভুল বিন্যাস এবং ভুল বণ্টন করা।
- সবচে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সংখ্যা ও সরঞ্জামে অযাচিত বিশ্বাস পোষণ করা। এ যুদ্ধে সুলতান নাসিরের বিশ্বাস—সে নিশ্চিত জিতবে, কারণ তার বিরাট সেনাবহর আছে, বিপুল সরঞ্জামের জোগান আছে; তার বাহিনী ঠিকই ক্রুসেডবাহিনীর দ্বিগুণ ছিল, কিন্তু ময়দানে তার জন্য অপেক্ষা করছিল দ্বিতীয় হুনাইন।

আইয়ুবি যুগ

৫৬৯-৬৫০ হি.

১১৭৪-১২৫২ খ্রি.

হিত্তিনের যুদ্ধ
BATTLE OF HITTIN

তারিখ:	৫৮৩ হিজরি / ১১৮৭ খ্রি.
স্থান:	হিত্তিন, টাইবেরিয়া
ফলাফল:	মুসলিম বাহিনীর বিজয়

পক্ষ-বিপক্ষ:	আইয়ুবি সাম্রাজ্য	বাইতুল মাকদিস সাম্রাজ্য (খ্রিস্টান)
সেনাপ্রধান:	সালাহুদ্দিন আইয়ুবি	গাই অব লুসিগনান
সেনাসংখ্যা:	১২ হাজার	৫০ হাজার (মতান্তরে ৬৩ হাজার)
ক্ষয়ক্ষতি:	জানা যায়নি	৩০ হাজার নিহত, সমপরিমাণ বন্দি

৫৮৩ হিজরির ২৪শে রবিউল আউয়াল রোজ শনিবার, নাজারেথ এবং টাইবেরিয়ার মধ্যবর্তী হিত্তিন নামক স্থানে ক্রুসেডার জেরুজালেম রাজ্য ও আইয়ুবীয়দের মধ্যে সংঘটিত হয় এক ঐতিহাসিক যুদ্ধ। এ যুদ্ধে সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবির অধীন মুসলিম সেনাবাহিনী ব্যাপক সংখ্যক ক্রুসেডার সেনাকে পরাস্ত করে গুরুত্ববহ এক বিজয় ছিনিয়ে নেয়। এ জয় মুসলমানদের জন্য বাইতুল মাকদিস বিজয়ের পথ সুগম করে। ঐতিহাসিকদের মতে, হিত্তিনের বিজয়ের পর বাইতুল মাকদিস পুনরুদ্ধারে সালাহুদ্দিনের সামনে আর কোনো বাধা অবশিষ্ট ছিল না। এ-যুদ্ধের ফলাফল হিসেবে মুসলিমরা পবিত্র ভূমিতে প্রধান সামরিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। খ্রিস্টানদের এই পরাজয়ের মাধ্যমেই তৃতীয় ক্রুসেডের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়।

আঁধার রাতের হাসনাহেনা

৫৩২ হিজরির এক অন্ধকার রাত। হাড়-কাঁপানো শীত, ঘন আঁধারে ছেয়ে গেছে চারপাশ। জনমানবহীন শীতল মরুভূমিতে হাঁটছেন দু-জন দীর্ঘদেহী মানুষ। পেছনে ক্লান্ত একদল নারী-শিশু। সাথে কয়েকটি দুর্বল উট, আসবাবের ভার ও সফরের দুর্গম দূরত্ব তাদের শ্রান্ত করে ফেলেছে। কিন্তু মালিকের সবর, সন্তুষ্টি আর বিশ্বাসের পরাকাষ্ঠা তখনো উটগুলোর আধ্যাত্মিক রসদ জুগিয়ে যাচ্ছে।

দলপতি দুজনের একজন নাজমুদ্দিন আইয়ুব—যুগশ্রেষ্ঠ বীরপুরুষ সুলতান সালাহুদ্দিনের পিতা। আরেকজন সালাহুদ্দিনের চাচা, আসাদুদ্দিন শেরকোহ। তারা আজারবাইজানের সীমান্তবর্তী অঞ্চল দুবেনের (Düben) এক কুর্দি নেতা শাদি ইবনু মারওয়ানের সন্তান। ভাগ্যের পরিহাস এই নেতাকে টেনে আনে বাগদাদে। পূর্ব-বন্ধুত্বের জেরে বাগদাদের শাসক বাহরুজ তাকে সাদরে বরণ করে নেন।

বাগদাদ ও মসুলের মধ্যবর্তী শহর তিকরিতের একটি দুর্গের শাসনভার দিয়ে তার উত্তম আবাসের বন্দোবস্ত করেন। শাদির মৃত্যুর পর এই দুর্গের দায়িত্ব পান তার ছেলে, সুলতানের বাবা নাজমুদ্দিন আইয়ুব। দীর্ঘদিন তিনি এ-দুর্গের সফল নেতৃত্ব দিতে থাকেন। কিন্তু হঠাৎ বাহরোজ তার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠে। সামান্য ব্যাপার নিয়ে তার বিরুদ্ধাচরণ করতে শুরু করে। একদিন তার কাছে খবর আসে তার ভাই আসাদুদ্দিন শেরকোহ রাষ্ট্রীয় এক কর্মচারীকে বীরত্বের প্রতিযোগিতায় পরাহত করতে গিয়ে মেরে ফেলেছে। এ-ঘটনায় পুরো শহর নিয়ে বাহরোজ তিকরিতে হামলে পড়ে। নানারকম কথাবার্তার পর বাহরোজ নাজমুদ্দিনকে দুর্গ হস্তান্তরের নির্দেশ দিয়ে তিকরিত ছেড়ে চলে যেতে বলে।

দীর্ঘদিন বসবাসের ফলে দুর্গের সাথে জড়িয়ে ছিল নাজমুদ্দিনের সুখ-দুঃখের হাজারও স্মৃতি। এই প্রেমময় দুর্গ ছেড়ে যেতে তার বুক ফেটে যাচ্ছিল। তাছাড়া এমন লাঞ্ছনার দিন তার জীবনে কখনো আসেনি। বাহরোজের এহেন নির্দেশে তিনি যারপরনাই ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েন। তিনি বসে বসে ভাবছিলেন, কী করা যায়। বাহরোজের দূত তখনো দুর্গে অবস্থান করছে। হঠাৎ নাজমুদ্দিনের ঘর থেকে একজন বের হয়ে বলল, 'মান্যবর আমির, আপনার স্ত্রী একজন পুত্রসন্তান প্রসব করেছে। মা তার সন্তানের নাম দিয়েছেন ইউসুফ সালাহুদ্দিন।'

এমন দুর্ভাগ্যের রাতে সন্তানের জন্ম তিনি ভালোভাবে নিলেন না। ছেলেটিকে কুলক্ষুণে ভেবে বসলেন। সন্তানের আগমন তাকে আরও বিমর্ষ করে তুলল। সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে তিনি তার ভাই শেরকোহকে বললেন, 'আমাদের রাতের আঁধারেই বেরোনো উচিত। ভোরের আলোয় লোকেরা আমাদের ভর্ৎসনা করার সুযোগ যেন না পায়।' মুহূর্তেই তারা তিকরিত ত্যাগ করে নারী-শিশুসহ অজানার পথ ধরলেন। তাদের চোখে খেলা করছে শহরত্যাগের তিয়াস, কোথায় যাবেন সেটা আপাতত ধোঁয়াশাই থাক। তাদের রাহবরিতে ছিল বাগদাদের এক খ্রিস্টান পাদরি। রাতের আঁধার কেটে তিনি এই পুণ্যের কাফেলা সামনে এগিয়ে নিচ্ছিলেন।

রাতভর চলতে চলতে কাফেলার সবাই ক্লান্ত হয়ে পড়ল।এলোমেলো কয়েকটি গাছ ছাড়া শূন্য মরুতে আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তারা সেখানে যাত্রাবিরতি করল। ধীরে ধীরে রাতের আঁধার সরিয়ে ভোরের আলো ফুটে উঠছে। এমন আধো আলো আধো আঁধারিতে সালাহুদ্দিন মায়ের কোলে কেঁদে উঠল। কয়েক হাত ঘুরে সুবহে সাদিকের মতো শুভ্র সফেদ তিলক হয়ে নাজমুদ্দিনের কোলে উঠে এল সুলতান সালাহুদ্দিন; কিন্তু নাজমুদ্দিন পরিস্থিতির নাজুকতায় এতই বিষণ্ণ ছিলেন

যে, সালাহুদ্দিনকে তিনি যেন ছুড়ে ফেলতে চাইলেন। যার শুরুটা এত বিপদজ্জনক হয়, তার শেষ না-জানি কোথায় নিয়ে ফেলে—ভাবছিল নাজমুদ্দিন। সালাহুদ্দিনের মা দ্রুত সোনামানিককে নিজের বুকে টেনে নেন। চাচা শেরকোহ এগিয়ে এসে ভাইকে সান্ত্বনা দেন। পাদরি এসে বলেন, 'উতলা হয়ো না, নাজমুদ্দিন। এতটুকু বাচ্চার কোনো অপরাধ নেই, তার প্রতি গোস্বা করো না। হয়তো এই আঁধারের চাদর সরিয়ে সে আলোয় ভরবে পৃথিবীর আদ্যোপান্ত, হয়তো তার হাত ধরেই তোমার দুঃখের পরিসমাপ্তি হবে।'

হতাশা ও বিরক্তির সুরে নাজমুদ্দিন বলল, 'কী বলছেন আপনি? আপনি কি দেখছেন না, কী বিপদ মাথায় নিয়ে সে জন্মেছে? কেমন আঁধার বয়ে এনেছে আমার পুরো গোষ্ঠীতে? আর কোন কল্যাণের অপেক্ষায় থাকবো আমি তাকে নিয়ে?' পাদরি বলল, 'নাজমুদ্দিন, শান্ত হও। সন্তানের প্রতি রহম করো। হয়তো সে তারকা হয়ে আলো বিলাবে, তুমি তা জানো না। কলিতেই সম্ভাবনা থেকে বিমুখ হয়ো না; ফুল হয়ে ফোটার অপেক্ষা তোমাকে করতেই হবে।'

সকাল হয়ে গেছে, নাজমুদ্দিন জানে না, সে ডানে যাবে না বামে। দুশ্চিন্তার অমানিষা কেটে তার মাথায় উদিত হলো আশার আলো—ইমাদুদ্দিন জেনকির কাছে কেন যাচ্ছি না! যা ভাবা, তাই কাজ। সামনে না বেড়ে দক্ষিণের পথ ধরে কাফেলা ছুটল জেনকির বাড়ির দিকে। ইমাদুদ্দিন তাদেরকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানালেন। কিছুদিন আগে ১১৩২ সালে মসুলের শাসক ইমাদউদ্দিন জেনকির পরাজিত সেনাবাহিনী পিছু হটার সময় টাইগ্রিসের দিকে বাধাপ্রাপ্ত হয়। এসময় সালাহুদ্দিনের পিতা নাজমুদ্দিন আইয়ুব এখানকার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। তিনি সেনাদের জন্য ফেরির ব্যবস্থা করেন এবং তিকরিতে তাদের আশ্রয় দেন। মুজাহিদুদ্দিন বাহরোজ নামক এক প্রাক্তন গ্রিক দাস এসময় উত্তর মেসোপটেমিয়ায় সেলজুক পক্ষের সামরিক গভর্নর ছিলেন। তিনি জেনকিদের সাহায্য করার জন্য নাজমুদ্দিন আইয়ুবের বিরোধী হন এবং ১১৩৭ সালে নাজমুদ্দিনকে তিকরিত থেকে বিতাড়িত করেন। বিপদগ্রস্ত হয়ে ১১৩৯ সালে আইয়ুব ও তার পরিবার মসুলে চলে আসলে ইমাদউদ্দিন জেনকি তাদের পূর্ব-অবদান স্বীকার করে আইয়ুবকে বালবিক দুর্গের কমান্ডার হিসেবে নিয়োগ দেন। ১১৪৬ সালে ইমাদউদ্দিনের মৃত্যুর পর তার পুত্র নুরুদ্দিন জেনকি আলেপ্পোর অভিভাবক এবং জেনকি রাজবংশের নেতা হন।

এদিকে তখন চাচা আসাদুদ্দিন শেরকোহের কোলে-পিঠে কাটছে সালাহুদ্দিনের বর্ণিল শৈশব। ঢাল-তলোয়ার আর সংগ্রামের চেতনাকে সঙ্গী করে বালক সালাহুদ্দিনের

সকালগুলো তখন সন্ধ্যে হয়ে যায়। ছোটবেলাতেই তিনি যুদ্ধের প্রেমে পড়েছিলেন; তরবারির বাঁট, ঘোড়ার খুর আর সৈনিকের বর্ম তাকে মোহিত করত। চোখে-মুখে আচারে-উচ্চারণে বীরত্বের আভা ছড়িয়ে ফুল-পাখিদের কলরবে জন্তু-জানোয়ার শিকার করে করে তিনি শানিয়ে তুলতেন কলবের ধার। বাল্যকাল তার 'সুলতান সালাহুদ্দিন' হয়ে ওঠার অন্যতম উৎস। ইতিহাস বলে, মাত্র দশ বছর বয়স থেকে তিনি ধারাবাহিক অবতীর্ণ হয়েছেন সশস্ত্র সংগ্রামে।

সেদিনের সেই পাহাড়-বেয়ে-বেড়ানো বালকের চোখে হয়তো কোনো ক্রুসেডসেনা দুর্দমনীয় স্বপ্ন দেখেছিল; দেখেছিল, প্রায় শতাব্দীকাল জবরদখল করে রাখা পুণ্যভূমি বাইতুল মাকদিস পুনরুদ্ধারের নেশা। তাই তো শতবর্ষ ধরে চলমান ক্রুসেডবিরোধী সংগ্রামের স্বপ্নপুরুষ ইমাদুদ্দিন জেনকি, মওদুদ বিন তুনতেকিন আর নুরুদ্দিন মাহমুদের স্বপ্নের পূর্ণতা দিয়েছিলেন সুলতান ইউসুফ সালাহুদ্দিন। ঐতিহাসিক নানা বিজয় ও অবদানের পাশাপাশি তার হাতে ধরা দিয়েছিল হারানো সুরুজ—মুসলিমদের দ্বিতীয় কিবলা বাইতুল মাকদিস।

সুলতানের প্রসিদ্ধ জীবনীকার আল ওয়াহরানির মতে, তিনি ইউক্লিড, আলমাজেস্ট, পাটিগণিত ও আইন সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দিতে পারতেন। কিছু সূত্রমতে, ছাত্রাবস্থায় তিনি সমরজ্ঞানের চেয়ে ধর্মীয় বিষয়ে অধিক আগ্রহী ছিলেন। ধর্মীয় বিষয়ে তার আগ্রহের প্রমাণ মেলে প্রথম ক্রুসেডের সময় খ্রিস্টানকর্তৃক জেরুজালেম অধিকার করার ঘটনায়; ঐতিহাসিকদের মতে, বাইতুল মাকদিস পুনরুদ্ধারে উতলা হবার পেছনে তার ধর্মীয় চেতনা কার্যকর ছিল। তিনি প্রবলভাবে ধর্মীয় ভাবাবেগ ধারণ করতেন। ইসলামি ধর্মীয় জ্ঞান ছাড়াও বংশবৃত্তান্ত, জীবনী, আরবের অতীত-ইতিহাসের পাশাপাশি আরব ঘোড়ার রক্তধারা সম্পর্কে তার যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। এছাড়া তিনি একাধারে কুর্দি, তুর্কি এবং আরবি ভাষায় কথা বলতে পারতেন।

সালাহুদ্দিনের সামরিক কর্মজীবন শুরু হয় চাচা আসাদউদ্দিন শেরকোহের তত্ত্বাবধানে। শেরকোহ এসময় দামেশক ও আলেপ্পোর আমির নুরুদ্দিন জেনকির একজন গুরুত্বপূর্ণ সামরিক কমান্ডার ছিলেন। ১১৬৩ সালে ফাতেমি খলিফা আল-আদিদের উজির শাওয়ার বনু রুজাইক গোত্রের দিরগাম নামী এক ব্যক্তি দ্বারা মিশর থেকে বিতাড়িত হন। নুরুদ্দিন ১১৬৪ সালে দিরগামের বিরুদ্ধে শাওয়ারের অভিযানে সহায়তার জন্য শেরকোহকে পাঠান। ২৬ বছরের সালাহুদ্দিন এসময় তার সাথে যান। এ যুদ্ধে শেরকোহ জয়লাভ করলে শাওয়ার তার কর্তৃত্ব ফিরে পান। পুনরায় উজির হওয়ার পর শাওয়ার শেরকোহকে মিশর থেকে তার সেনা সরিয়ে

নিতে বললে শেরকোহ তা প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলেন, নুরুদ্দিনের ইচ্ছা যে, তারা মিশরেই অবস্থান করবেন। এ অভিযানে সালাহুদ্দিনের ভূমিকা নিয়ে খুব বেশি কিছু জানা যায় না।

এ-ঘটনার পর মিশরীয় ক্রুসেডার বাহিনী এবং শেরকোহের সেনাদল গাজার পশ্চিমে নীল নদের সন্নিকটে মরুসীমান্তে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়। এ যুদ্ধে সালাহুদ্দিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। এতে তিনি জেনকির সেনাবহরের দক্ষিণভাগের নেতৃত্ব দেন। কুর্দিদের একটি দল এসময় বাম পাশের দায়িত্বে ছিল। শেরকোহ ছিলেন মধ্যভাগের অবস্থানে। প্রথমদিকে ক্রুসেডাররা সাফল্য লাভ করলেও অঞ্চলটি তাদের ঘোড়ার জন্য উপযুক্ত ছিল না। কায়সারিয়ার কমান্ডার হিউ সালাহুদ্দিনের দলকে আক্রমণ করতে এসে গ্রেফতার হন। মূল নেতাদের গ্রেফতারের পর সাধারণ সেনারা আগ্রাসী অবস্থানে চলে আসে। সালাহুদ্দিন পেছন থেকে তাদেরকে ধাওয়া করলে শেষ পর্যন্ত এ যুদ্ধে জেনকিরা বিজয় লাভ করে।

১১৬৩ সালে নুরুদ্দিন জেনকি তাকে ফাতেমি মিশরে প্রেরণ করেন। ক্রুসেডারদের আক্রমণের বিরুদ্ধে সামরিক সাফল্যের মাধ্যমে সালাহুদ্দিন ফাতেমি সরকারের উচ্চপদে পৌঁছান। ফাতেমি খলিফা আল-আদিদের সাথে তার সম্পর্ক ক্রমে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। ১১৬৯ সালে সুলতানের চাচা শেরকোহ মৃত্যুবরণ করলে আল-আদিদ সালাহুদ্দিনকে তার উজির নিয়োগ দেন। শিয়া নেতৃত্বাধীন খিলাফতে সুন্নি কোনো মুসলিমের এমন পদপ্রাপ্তি ছিল ইতিহাসে বিরল। উজির থাকাকালে তিনি ফাতেমি শাসনের প্রতি বিরূপভাবাপন্ন ছিলেন। আল-আদিদের মৃত্যুর পর তিনি মিসরের সর্বময় ক্ষমতা গ্রহণ করেন এবং বাগদাদের আব্বাসি খিলাফতের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেন। পরবর্তী বছরগুলোতে তিনি ফিলিস্তিনে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালান, ইয়েমেনে সফল বিজয়-অভিযানের আদেশ দেন এবং উচ্চ মিশরে ফাতেমিপন্থি আন্তঃরাষ্ট্রীয় বিদ্রোহ উৎখাত করেন।

নুরুদ্দিনের মৃত্যু ও সালাহুদ্দিনের আত্মপ্রকাশ

১১৭৪ হিজরিতে হঠাৎ করে সুলতান নুরুদ্দিন মাহমুদ মারা যান। এমন একজন বীরশ্রেষ্ঠ প্রধানের মৃত্যুতে সবখানে শোক নেমে আসলেও এ মৃত্যু হয়ে দাঁড়ায় সালাহুদ্দিনের জীবনের অন্যতম পটবদলের কারণ। কারণ, নুরুদ্দিনের মৃত্যুর সাথেসাথে তাঁর সারাজীবনের মেহনতে গড়া বৃহত্তর মুসলিম ঐক্য ভাঙনের

দোরগোড়ায় চলে যায়। এমন কেউ সেখানে ছিল না, যার দ্বারা এই পুরোধা ব্যক্তির বিয়োগকালীন অভাব দূর করা যায়। এগিয়ে আসেন সুলতান সালাহুদ্দিন। তিনি নড়বড়ে হতে থাকা ভিত মজবুত করেন, ঐক্যের শরীর দাঁড় করান এবং নুরুদ্দিনের চিন্তা ও চেষ্টার পূর্ণতা সাধনে আত্মনিয়োগ করেন। তবে তাঁর চোখের কোণে লটকে থাকে মুসলমানদের প্রথম কেবলা বাইতুল মাকদিস পুনরুদ্ধারের অতৃপ্ত তিয়াস। সালাহুদ্দিনের জন্য পরিস্থিতির লাগাম তুলে নেয়া এতটা সহজও ছিল না। কারণ, নুরুদ্দিন মাহমুদ তার এগারো বছর বয়সের একটি পুত্র সন্তান ছেড়ে যান। ফলে কেউ এই কিশোর উত্তরাধিকারীর সর্বাধিকার হাতে নেবে, তা নিয়ে আমির-উজিরদের মধ্যে দেখা দেয় উত্তপ্ত দ্বন্দ্ব। এদিকে ধীরেধীরে ক্ষয়ে যেতে থাকে নুরুদ্দিনের স্বপ্ন; তিলে তিলে গড়ে তোলা তার সাম্রাজ্যের পিলার।

মিশরে বসে সালাহুদ্দিন সব পর্যবেক্ষণ করছিলেন। তিনি তাকিয়ে ছিলেন, ক্ষমতার দ্বন্দ্বে বিবাদে জড়ানো সাম্রাজ্যপতিদের দিকে। আর অপেক্ষা করছিলেন মুসলিমদের বৃহৎ ঐক্যের হাল ধরার কোন সুবর্ণ সুযোগের। অবশ্য তাঁর এ প্রতীক্ষা দীর্ঘ করতে হয়নি। দামেশক থেকে উড়ে এল কিছু সুসংবাদবাহী পায়রা। জানাল, নুরুদ্দিনের কুরসি গ্রহণের প্রতীক্ষিত আবেদন। সালাহুদ্দিন এক মুহূর্ত দেরি করলেন না। সূর্য ডোবার অপেক্ষা না করে তখনই রওনা করলেন দূতদের সাথে। দামেশকের জনগণ তাঁকে ফুলেল সংবর্ধনা জানাল। শহরের দায়িত্ব বুঝে নিয়েই তিনি কাজে নেমে পড়লেন। আন্তঃরাষ্ট্রীয় উষ্ণ বিরোধে মন না দিয়ে সেনা পাঠালেন হিমসে। অনায়াসে হিমস তার হাতে চলে এল। এরপর এগোলেন হামার দিকে, সেটাও পদানত হয়ে গেলে তিনি আলেপ্পোর উপকণ্ঠে এসে ঘোড়া থামালেন। আলেপ্পোর ফটক খোলার হেন চেষ্টা নেই, তিনি করলেন না; কিন্তু ক্রুসেডারদের সামরিক সহযোগিতা নিয়ে সেবারের মতো আলেপ্পো তার হাতছাড়া হয়ে গেল। কিন্তু সুলতান হার মানলেন না। দীর্ঘ আটটি বছর তিনি আলেপ্পোর জন্য এন্তেজার করলেন। অবশেষে ১১৮৩ সালে তিনি শহরটি হাতে তুলে নিলেন। বাইতুল মাকদিস বিজয়ের লক্ষ্যে বৃহত্তর মুসলিম ঐক্যের জন্য আলেপ্পো দখলের প্রভাব ছিল অনস্বীকার্য। কারণ, বিস্তীর্ণ এ শহরটি তখন উত্তরে তাউরুস পাহাড় আর দক্ষিণে সুদানের নুবিয়া শহর পর্যন্ত সমতলভূমি ধারণ করে রেখেছিল।

হিত্তিনের পথ সুগম করল যে যুদ্ধ

আলেপ্পো দখলের এই আগপর দুই অভিযানের মাঝে ১১৭৯ সালে সুলতান আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। হিত্তিনের যুদ্ধ বা পরবর্তী বাইতুল মাকদিস দখলের পথে এই যুদ্ধের বিজয় ও নিয়ন্ত্রণের প্রভাব আলেপ্পো দখলের চেয়ে একটুও কম নয়। হঠাৎ করেই ১১৭৮ সালে শামের উত্তর ও দক্ষিণের শহরগুলোতে ক্রুসেডনেতা ও সুলতান সালাহুদ্দিনের মধ্যে উত্তেজনা চরমে পৌঁছে যায়। দুই দলের ঘটি-বাটি কুড়ানো প্রস্তুতি দেখে মনে হচ্ছিল, এবারের যুদ্ধ কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের দিকে যাবে—হয় সুলতান সালাহুদ্দিন জেরুসালেমে ক্রুসেডারদের সরিয়ে একচ্ছত্র আধিপত্য পাবেন, নতুবা তিনি হারিয়ে যাবেন কালের গর্ভে। তার সাম্রাজ্য ডুবে যাবে কোনো অজানা চোরাবালিতে। ফরাসিরা তাদের সাম্রাজ্যসীমা বিস্তার করবে, যতটা তাদের ক্ষুধা নিবারণে যথেষ্ট হয়—ততটা।

ক্রুসেড সম্রাট চতুর্থ বল্ডউইন একটি ফন্দি আঁটলেন। ফিলিস্তিনের উত্তর, আমেল (Amel) পাহাড়ের দক্ষিণ এবং লেবাননের উপকূলের ক্রুসেড রাজ্যের সীমান্তবর্তী দুর্গ ও কেল্লাগুলোকে এক সুতোয় বেঁধে ফেললেন। সীমানায় দাঁড়ানো এ-সকল দুর্গের ঐক্য আসন্ন যুদ্ধের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এ-পাশের কৌশলগত প্রস্তুতি শেষে তিনি ফিরলেন দুর্গম গিরি পথ ধরে, যেন পাহাড়ের ঢালু হয়ে নেমে আসা ঝরনা ও নালার পানিগুলো দিয়ে কৌশলে জর্ডান নদীর পানিসমৃদ্ধি ঘটানো যায়। যুদ্ধনীতি অনুসারে নদী ছোট ছোট নালায় পানির গতি সম্ভাব্য যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে ঘুরিয়ে দেয়, যেন যুদ্ধকালে সেনারা তৃপ্ত হতে পারে, বিরতির সময় সেরে নিতে পারে প্রস্তুতির প্রয়োজন।

সে-সময় সিডনের (Sidon) উপকূলীয় এলাকা, সিরিয়ার অন্তর্বর্তী বানিয়াস নগরসহ দক্ষিণ সিরিয়ার শক্তিশালী জনপদগুলো খ্রিস্টানদের হাতে ছিল। এতদাঞ্চলগুলোকে বেষ্টন করে ছিল দুর্দমনীয় কিছু দুর্গ: মারজায়ুন (Marjaayoun), তাইবে (Tayibe) হাউনাইন, তিবনাইন (Tebnine) এবং ইয়াকুব দুর্গ। এইসব গুরুত্বপূর্ণ কেল্লাগুলোতে ঐক্য গঠনের জোরদার চেষ্টা করেছিল সম্রাট বল্ডউইন।

এদিকে তেলকাদি (Tell el-Qadi) এবং বানিয়াস শহরকে ঘিরে সুলতান সালাহুদ্দিন তার বাহিনীর জন্য একটি গোপন সরু পথ খুঁজে বের করেন। এই সুপ্ত পথ ধরে তার সেনারা ছোট ছোট গ্রুপে গুপ্ত হামলা চালাতে থাকে। কিছু সেনা ঢুকে যায় দুর্বৃত্তের মতন তাদের নাড়ির খবর তুলে আনতে, যাতে তাদের প্রস্তুতির

পরিমাণ অনুমান করে তাদের কৌশলে তাদেরকে ধরাশায়ী করা যায়।

সে-মতে সুলতানের বাহিনী দক্ষিণে তাদের কৌশলী আক্রমণ চালাতে থাকে। হামলার পর গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদির সাথে সাথে পর্যাপ্ত গনিমতের মালও হস্তগত করতে পেরেছে তারা। জেনেছে, তাদের আক্রমণের স্থান, যুদ্ধকৌশল এবং যুদ্ধকে সামনে রেখে নিজেদের মধ্যকার ঐক্যচেষ্টার কথাও। তবে সুলতানের বাহিনী যে নীতিতে এগোচ্ছিল, তাদের পদাঙ্ক ধরে এগোচ্ছিল বল্ডউইনের চিন্তাও। দক্ষিণে যে আক্রমণে পড়ছিল তারা, একই হামলা উত্তরে বা পশ্চিমে পুনরায় হানছিল বল্ডউইনের সেনারা। ছোট ছোট যুদ্ধ জয়ের এ পর্যায়ক্রম একটি বড় যুদ্ধের ইঙ্গিত দিচ্ছিল। কখনো লাগাম যাচ্ছিল তাদের হাতে, কখনো সেটা চলে আসছিল আমাদের নিয়ন্ত্রণে। জর্ডান নদীর অববাহিকা স্রোত কখনো এদের হাতে ছিল, কখনো ওদের হাতে।

অবস্থাদৃষ্টে সুলতান সালাহুদ্দিন নতুন পদক্ষেপ নিলেন। দামেশকে তার সভাকক্ষে জরুরি বৈঠক ডাকলেন। বাহিনীর নেতৃবর্গ ও রাজ্যের সভাসদের উপস্থিতিতে সুলতান যুদ্ধের বিস্তারিত নকশা উপস্থাপন করলেন। যুদ্ধকৌশলের বিবরণ শুনে সকলে সুলতানের সাথে একাত্মতা পোষণ করলেন। সুলতানের কথা মানার ও রাজ্যের প্রয়োজনে অভীষ্ট লক্ষ্য পূরণের এ-আয়োজনে জীবন দেওয়ার ওয়াদাবদ্ধ হলেন।

সুলতান তার সর্বশক্তি নিয়ে বেরোলেন। জয়ের লক্ষ্যে তাকবিরধ্বনি তুলে সেনারা শহর ছাড়ল। একদল এগোল সমুদ্রের তট ধরে, আরেকদল গেল উত্তর সিরিয়ার দিকে; তৃতীয় ও প্রধান দল এগোল ক্রুসেডারদের প্রধান সেনাংশ এবং দুর্গম পাহাড়ি দুর্গাঞ্চলগুলোর দিকে। জেরুসালেমে ক্রুসেড শক্তির মূলোৎটনের লক্ষ্যে সুলতান নিজে এ-বাহিনীর নেতৃত্বে নামলেন। মুসলিমদের প্রথম কিবলা বাইতুল মাকদিস পুনরুদ্ধারের স্বপ্ন তখন তাকে তাড়াচ্ছিল অহর্নিশ।

১১৭৯ ঈসাব্দের জুন মাসের দশ তারিখে দুই বাহিনী তুমুল যুদ্ধে জড়িয়ে গেল। ইতিহাসে এ-যুদ্ধ 'মারজায়ুনের যুদ্ধ' নামে পরিচিত। যুদ্ধের শুরুতেই বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল বল্ডউইনের বাহিনী। পাহাড়ের চোরাগলিতে লুকিয়ে থাকা ক্রুসেডারদের টেনে হেঁচড়ে পশ্চাদ্ধাবন করে বের করে আনল সুলতানের সেনারা। দিগ্বিদিক শূন্য হয়ে ক্রুসেড সেনারা পাহাড়ে কন্দরে হারিয়ে গেল। কেউ আমেল দুর্গে আশ্রয় নিল, কেউবা সিডন ও বৈরুতের পথে দৌড়ে পালাল। আবার কেউ এই প্রাথমিক

পরাজয়ের সংবাদ বয়ে ছুটে গেল জেরুসালেমের দিকে। যুদ্ধ অপরিহার্য ভেবে উভয়পাশ থেকে অবশিষ্ট সেনারা ছুটে গেলে বাড়তে থাকল হতাহতের সংখ্যা।

চিরাচরিত স্বভাবমতো সুলতান সালাহুদ্দিন শত্রুর তির-বল্লমের তোয়াক্কা না করেই বিপক্ষের ব্যূহ চিরে বীর বিক্রমে ঢুকে গেলেন ভেতরে। হিতৈষী একদল সেনাও তার কায়ানুসারে ভেতরে ঢুকে যায়। সুলতানের আত্মরক্ষার জন্য সুলতানের যে-কোনো আদেশে মাথা পেতে দিতে—এরা বদ্ধপরিকর।

যুদ্ধে সুলতান বল্ডউইনকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। বিজিত নগরে বসে তিনি এঁকে ফেলেন আরও কিছু গৌরবদ্বীপ্ত বিজয়ের ছক। যে গৌরবের ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ যুক্ত হয় হিত্তিন—৫৮৩ হিজরিতে।

এ বিজয়ের রূপরেখা একদিনে আঁকা হয়নি; সুলতানের দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা, জানাশোনার সাথে এখানে যুক্ত হয়েছিল জ্ঞানীগুণী রাজ-সভাসদদের সুচিন্তিত মতামত। রাজ্যের চিন্তাশীল উপদেষ্টামণ্ডলির গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনায় সুদূরপ্রসারী এই বিজয়ের নকশা টানা হয়। এ-নকশায় ছিল সে-সব পানির কূপ, ঝরনা এবং নালাসমূহের নিয়ন্ত্রণ—যেগুলোতে সিঞ্চিত হতো নগরের সবকিছু। পাহাড়ের পেট ফুঁড়ে যেগুলো খালে খালে বয়ে যেত কৃষকের ক্ষেতে, রাখালের গোয়ালে আর কিষানির কাঁখে। এ-নকশায় আরও ছিল সে-সব সুড়ঙ্গ এবং ছিদ্রপথগুলো বন্ধ করে দেওয়া, যেগুলো হয়ে খ্রিস্টানদের ফিলিস্তিনে ঢুকে পড়ার সম্ভাবনা ছিল।

বানিয়াসে সুলতান এক সুকৌশলী কাজ করেছিলেন। তিনি শহরের সীমান্তসংলগ্ন করে দুটি দুর্গ তৈরি করেন। পাথরের তৈরি দুর্গ দুটির চারপাশে প্রাচীর তুলে দেন তিনি। গুরুত্বপূর্ণ এ-ঘাঁটির সংরক্ষণে কিছু মানুষকে তিনি দুর্গনগরে জনবাস গড়ে তুলতে উৎসাহ জোগান। তারা সেখানে বসতি গড়ে তোলে। ফল-ফসলে ভরিয়ে তোলে দুর্গের আশপাশ। তাদের গবাদি পশুগুলোকে দুর্গপ্রাচীর ঘেঁষে ঘাস চিবুতে দেখা যায়। তারা এ-দুর্গ-দুটির সীমান্তরক্ষায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে ওঠে, যেন ঘৃণ্য ক্রুসেডাররা এপারের সবুজে চোখ মেলে তাকানোর সাহসও না করে। সীমান্তে নিরাপদ ঘাঁটি বসানোর পর সুলতানের মনে হলো, মসুল দখল করা ছাড়া এতদাঞ্চলের মুসলমানদের এক করা সম্ভবপর নয়। তাই তিনি মসুলের কর্তৃত্ব হাতে নেয়ার জন্য বেশ কয়েকবার শহরটি অবরোধ করেন। পরিশেষে ইযযুদ্দিন মাসউদের প্রচেষ্টায় ৫৮২ হিজরির সফর মাসে (১১৮৬ খ্রিস্টাব্দে) মসুলের সাথে সুলতানের দীর্ঘমেয়াদি সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হয়।

ক্রুসেড শিবিরে গোলযোগ

১১৮৬ সালে গাই অব লুসিগনান জেরুজালেমের রাজা হন। তার স্ত্রী সিবিলার সন্তান পঞ্চম বল্ডউইনের মৃত্যুর পর স্ত্রীর পদাধিকার বলে তিনি ক্ষমতা পান। এসময় জেরুজালেম রাজ্য গাই, সিবিলা, রেইনল্ড অব শাটিলন, গেরার্ড অব রিডফোর্ট ও নাইটস টেম্পলারদের মতো নতুন আগতদের মধ্যকার বিরোধে শতধা বিভক্ত ছিল। ত্রিপলির তৃতীয় রেইমন্ড, যিনি শিশু রাজা পঞ্চম বল্ডউইনের অভিভাবক ছিলেন, তিনি ও তার নেতৃত্বাধীন অভিজাতরা গাইয়ের রাজা হওয়ার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। কিন্তু রেইমন্ড দিনদিন নিজের লোকদের ব্যাপারেও বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন। তিনি দেখতে পান যে, তার অনুসারী ব্যারনরা গাই ও সিবিলার প্রতি অনুগত হয়ে যাচ্ছে। কোনো উপায় না দেখে তিনি জর্ডান নদী হয়ে টাইবেরিয়াসের দিকে চলে যান। অবস্থা এতটাই খারাপ হয়ে দাঁড়ায় যে, রেইমন্ড ও গাইয়ের মধ্যে প্রায় যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে যাবে করছিল। কারণ, নারীলোভী গাই রেইমন্ডের স্ত্রী এসিভার সাথে উষ্ণতা বিনিময়ের মাধ্যমে টাইবেরিয়াস দুর্গ জয় করার গোপন ফাঁদ করছিল, রেইমন্ড সেটা জেনে যায়। শেষমেশ রেইমন্ডের সমর্থক বেলিয়ান অব ইবেলিনের মধ্যস্ততায় দুই ক্রুসেডনেতার মধ্যকার যুদ্ধ এড়ানো সম্ভব হয়।

ইতিমধ্যে জেরুজালেমকে ঘিরে থাকা মুসলিম রাষ্ট্রগুলো ১১৭০ ও ১১৮০-এর দশকে সালাহুদ্দিন কর্তৃক ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেছে। ১১৬৯ সালে সালাহুদ্দিন মিশরের উজির নিযুক্ত হবার পর ক্রমশই তিনি সবগুলো রাজ্যে ক্ষমতার হাত প্রসারিত করেন। ফলে প্রথমবারের মত জেরুজালেম রাজ্য মুসলিমশাসিত অঞ্চল দ্বারা চারপাশ থেকে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। ১১৭৭-১১৮০ এই সময়টাতে ক্রুসেডাররা সীমান্তের মুসলমানদের সাথে ছোট ছোট কিছু সংঘাতে জড়িয়ে যায়। বাইতুল মাকদিস বিজয়ের লক্ষ্যে নির্মিত সুলতানের সীমান্তের কেল্লাগুলোতেও ক্রুসেডাররা ঝামেলা করতে শুরু করে। কিন্তু বিচক্ষণ সুলতান সালাহুদ্দিন সেগুলো ধর্তব্যে না নিয়ে ক্রুসেড খেদানোর চূড়ান্ত যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসেবে বৃহত্তর মুসলিম ঐক্যগঠন এবং সামরিক শক্তি সংহত করার লক্ষ্যে কৌশলে ক্রুসেডারদের সাথে চার বছরের জন্য একটি শান্তিচুক্তি স্থাপন করে নেন। এতে সীমান্তগুলো শান্ত হয়ে আসে এবং শত্রুর দেশে গোয়েন্দা প্রেরণের পথ সুগম হয়। সুলতান চাচ্ছিলেন, এই সময়টায় নিজের রাজ্যকে আরও খানিক শক্তিশালী করে আভ্যন্তরীণ ঝামেলা পুরোপুরি মিটিয়ে ফেলবেন।

কিন্তু হুট করে টাইবেরিয়ার কির্কে থাকা রেনল্ড বোকার মতো এক কাজ করে বসে। সুলতানের শান্তিচুক্তির সময়ে ক্রুসেডশক্তির প্রবৃদ্ধির সুযোগ না দিয়ে সে এমন এক কাজ করে বসে, যা চুক্তি ভঙ্গের দিকে পৌঁছে দেয় এবং নতুন করে যুদ্ধের দাবানল জ্বেলে দেয়। মিশর থেকে দামেশকের পথে যাত্রা করা মুসলমানদের এক ক্যারাভ্যানে আক্রমণ করে বসে সে। মালামাল লুট করে এবং রক্ষীদের আটক করে নিয়ে যায় কির্কের দুর্গে। এই খবর সুলতানের কানে গেলে তিনি নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করেন। একদল দূত প্রেরণ করে রেনল্ডকে বলেন, কাফেলার মাল ও লোকজন ফিরিয়ে দিতে, নতুবা পরিস্থিতি খারাপের দিকে গড়াবে। কিন্তু রেনল্ড সুলতানের কথায় কান না দিয়ে দূতদের সাথে খারাপ আচরণ করে। নিজের শক্তি নিয়ে গর্ব দেখিয়ে মক্কায় আক্রমণ করবে বলেও হুমকি দেয় সে এবং বলে, 'তোমাদের নবী মুহাম্মদকে বল, এসে যেন বন্দিদের মুক্ত করে নিয়ে যায়।'

এদিকে বাইতুল মাকদিসের সম্রাট গাই অব লুসিগনানকে এ সংবাদ জানানো হলে তিনিও রেনল্ডের পক্ষে কথা বলেন এবং কাফেলার সম্পদ ও জনবল ফিরিয়ে দেয়ার আবেদন না-মঞ্জুর করে দেন। এতে পরিস্থিতি আরও ঘোলাটে হয়ে যায়। সালাহুদ্দিন বুঝতে পারেন, যুদ্ধ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো পথ আর খোলা নেই।

হিত্তিনের পূর্বে সামরিক কার্যক্রম

১১৮৭ হিজরির মার্চ মাস। সুলতানকে খানিক সিদ্ধান্তহীন দেখাচ্ছে, যেন-বা তিনি এখনই যুদ্ধটা চাননি। কিন্তু পরিস্থিতি এতটা প্রতিকূল চলে যাচ্ছে যে, যুদ্ধ না করে এর কোনো সুরাহা করা সম্ভব নয়। কিন্তু সুলতান সব দ্বিধা ঝেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। ভেবে নিলেন, বিগত দশটি বছর ধরে আমি তো এই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিলাম। ক্রুসেডারদের ফিলিস্তিনের পুণ্যভূমি থেকে বিতাড়নের এটাই মোক্ষম সময়। এই ভেবে তিনি মিশর, আলেপ্পো, দিয়ারে বকর, জাযিরাতুল আরব এবং দামেশকের সকল সেনাকে একত্র করার হুকুম দেন। তাদেরকে নিয়ে কির্ক দুর্গ অবরোধ করেন। সেটাকে পায়ে দলে হেঁটে যান শোবাক অভিমুখে। সেখানেও তিনি একই পরিণতি টেনে টাইবেরিয়ার অদূরে বানিয়াস দুর্গের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েন।

এদিকে একই সময়ে সেনা জমায়েত ঘটায় ক্রুসেডাররা। সম্রাট গাই অব লুসিগনানের নেতৃত্বে জড়ো হয় খ্রিস্টানদের সকল শক্তি। সাফুরিয়া শহরের কাছে ঝরনার কোলে তারা সেনা সমাবেশ করে। এতে যোগ দেয় গাইয়ের দীর্ঘ দিনের শত্রু ত্রিপোলির

রাজা রেমন্ড। ধর্মযুদ্ধের প্রয়োজনে সে ভুলে যায় পুরনো বিভেদ, ভেঙে ফেলে সালাহুদ্দিনের সাথে করা সকল শান্তিচুক্তি। ঐতিহাসিক ইবনু সারির বলেন: 'এ যুদ্ধে সালাহুদ্দিনের সেনাসংখ্যা ছিল সাকুল্যে ১২ হাজার। ক্রুসেডাররা সুলতানের যুদ্ধপ্রস্তুতির কথা শুনে পরস্পর বিভেদ ভুলে এক হয়ে যায়। ত্রিপোলির রাজা ও কির্কের শাসক, কয়েক দশকের শত্রুতা ভুলে হাতে হাত মেলায়। গির্জা থেকে ক্ষেত আর প্রাসাদ থেকে কুঁড়েঘর—ধর্মীয় যুদ্ধের আহ্বানে সকলে মাঠে নেমে আসে। ফলে সেবার তাদের ঠিক কত হাজার সেনা যুদ্ধের জন্য এসেছিল, তার সঠিক সংখ্যা কেবল আল্লাহ তাআলাই জানেন। কেউ বলেন, পঞ্চাশ হাজার; আবার কারও মতে, ছেষট্টি হাজার।'

জর্ডান নদী অতিক্রম করার পূর্বে ৩০ জুন তেল-আশতারায় সালাহুদ্দিন তাঁর বাহিনীকে পর্যবেক্ষণ করেন। প্রতিপক্ষ ক্রুসেডাররা জিপরিতে একত্রিত হয়। ইউরোপীয় সূত্রগুলোর মতে, নাইটদের পাশাপাশি সেখানে বড় ধরনের হালকা অশ্বারোহী বাহিনী ও ১০,০০০-এর মতো পদাতিক সেনা অতিরিক্ত যোগ দিয়েছিল। সম্পূরক হিসেবে ক্রসবোম্যানরাও উপস্থিত হয় এবং বেশ বড় সংখ্যক ভাড়াটে সৈনিকও হাজির করে তারা। এমনকি, এক্রের বিশপ ও পাদরিদের সেনাবাহিনীর সাথে থেকে ক্রস বহন করতে দেখা যায়।

জুলাইয়ের ২ তারিখ সালাহুদ্দিন টাইবেরিয়ায় রেইমন্ডের দুর্গ অবরোধে নেতৃত্ব দেন। এসময় মূল মুসলিম সেনারা একটু দূরে টাইবেরিয়ার পথে অবস্থান করছিল। সালাহুদ্দিন গাইকে সাফুরিয়ার ঝরনা থেকে সরিয়ে নিজের সুবিধামতো কোথাও একত্র করতে চাচ্ছিলেন। টাইবেরিয়ার ভারপ্রাপ্ত দুর্গপতি গেরসন পরিস্থিতি প্রতিকূল দেখে সালাহুদ্দিনকে অর্থ পরিশোধ করতে চেয়েছিল, কিন্তু সালাহুদ্দিন তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। ফলে ঐদিনই দুর্গের পতন হয়। রেমন্ডের সেনারা ফটকে প্রতিরোধ গড়লেও সুলতানের সেনারা দুর্গের একটি টাওয়ার খুঁড়ে ফেলে। এতে টাওয়ারটি মাটিতে ধসে পড়লে মুসলিম সেনারা ভেতরে ঢুকে পড়ে। সেখানে যারা তাদের বাধা দিতে অস্ত্র হাতে নেয়, সালাহুদ্দিনের সেনারা তাদেরকে হত্যা ও বন্দি করে ফেলে।

রেইমন্ডের স্ত্রী এসিভা দুর্গের ভেতর আবদ্ধ হয়ে পড়েন। এই সংবাদ ক্রুসেড সেনাবাহিনীর কানে গেলে তারা একটি জরুরি সভার আহ্বান করে। জুলাই ২ তারিখ ক্রুসেডারদের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে একদল টাইবেরিয়াকে সালাহুদ্দিনের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য দ্রুত সেদিকে যাত্রা করার পক্ষে মত দেয়। কিন্তু অপর পক্ষ

বলে, এই মুহূর্তে টাইবেরিয়ার দিকে অগ্রসর হওয়া আমাদের জন্য উচিত হবে না। কারণ, রাস্তা অনেক দীর্ঘ এবং আমাদের কাছে পর্যাপ্ত রসদ নেই; তদুপরি দীর্ঘ এ মরুযাত্রায় আমরা চাইলেই সহজে পানির উৎস খুঁজে পাব না। ত্রিপোলির অধিপতি তৃতীয় রেমন্ডও দ্বিতীয় পক্ষের সাথে সহমত পোষণ করেন। এতে পূর্ববিরোধের জেরে অনেকেই তাকে ভীরু-কাপুরুষ বলে গালাগাল দিতে শুরু করে। নিজেকে সাহসী এবং বীর প্রমাণ করার জন্য দ্বিতীয় পক্ষের কথায় কান না দিয়ে গাই সেনাবাহিনীকে সালাহুদ্দিনের বিরুদ্ধে টাইবেরিয়াসের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য আদেশ দেন। এটিই সালাহুদ্দিনের পরিকল্পনা ছিল, যা তারা ধরতে পারেনি। এর মাধ্যমে ক্রুসেডারদেরকে তাদের দুর্গ অবরোধ না করে সরাসরি যুদ্ধক্ষেত্রেই পরাজিত করা সম্ভব ছিল।

এছাড়াও সালাহুদ্দিন অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে দ্রুজদের কাছ থেকে মিত্রতা লাভ করেন। জামাল আদ-দিন হাজির মাধ্যমে শারাহমুলে এই মিত্রতা স্থাপিত হয়। জামালের পিতা কারামা নূরুদ্দিন জেনকির পুরনো মিত্র ছিলেন। তাছাড়া শারাহমুল শহর ক্রুসেডারদের দ্বারা ইতিপূর্বে বেশ কয়েকবার হামলার স্বীকার হয়েছিল। জামাল আদ-দিন হাজির মতে, তার বড় তিন ভাইকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছিল খ্রিস্টানরা। সে-জন্য তিনি স্বেচ্ছায় তার গোত্রসহ সালাহুদ্দিনের বাহিনীতে যোগদান করেন।

যুদ্ধের সূচনা

ক্রুসেডাররা সাফুরিয়া থেকে ১ জুলাই তাদের যাত্রা শুরু করে। গাই সেনাদের মধ্যভাগ, রেইমন্ড অগ্রভাগ এবং বেলিয়ান ও রেইনল্ড পেছনের দিক নিয়ন্ত্রণ করে এগোতে থাকে। দীর্ঘ সাতাশ কিলোমিটার পাড়ি দিতে হবে তাদের। সূর্য ক্রমেই প্রখর হয়ে উঠছে। মরু অঞ্চলে কিছুদূর এগোতেই সেনাদের গলা-বুক পিপাসায় শুকিয়ে আসে। দুর্গম পথ ও পনিশূন্য যাত্রা, খ্রিস্টান সেনাদেরকে পথেই অর্ধেক পরাজিত করে ফেলে। এদিকে সুলতান তাদের যাত্রার কথা শুনতে পেরেই টাইবেরিয়া থেকে নয় কিলোমিটার সামনে এগিয়ে আসার জন্য বের হয়ে যান। দুর্গের পশ্চিম দিক ধরে সচেতন চোখে এগোতে থাকেন তিনি।

দুপুর নাগাদ খ্রিস্টান সেনাবাহিনী সাফুরিয়া থেকে ছয় মাইল (১০ কি.মি.) দূরের গ্রাম তুরানের একটি জলধারায় এসে পৌঁছায়। ইবনু শাদ্দাদের মতে, 'এখানে তাদের পদাতিকদের বাজপাখি ও অশ্বারোহীদের ঈগলগুলো পানির পাশে উড়ছিল।'

টাইবেরিয়াস পর্যন্ত আরও ৯ মাইল (১৪ কিমি) পথ বাকি ছিল। সময় বাকি আছে অর্ধ দিন। ১১৮২ সালে খ্রিস্টান সেনাবাহিনী সাধারণত শত্রুদের বিরুদ্ধে এক দিনে ৮ মাইল (১৩ কিমি) অগ্রসর হতে পারত। সে-মতে ভরদুপুরে পানির উৎস ছেড়ে গন্তব্যে পৌঁছার অনিশ্চয়তা নিয়ে তুরান গ্রাম ছেড়ে রওনা করাটা ছিল নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়ার নামান্তর। কিন্তু ঐতিহাসিকদের বর্ণনা অনুযায়ী, 'বাহিনীর স্বার্থবিপরীত কাজ করার জন্য শয়তান সেনাপ্রধান গাই অব লুসিগনানকে প্রলুব্ধ করে।' অর্থাৎ, অজ্ঞাত কারণে গাই এমন অসময়ে টাইবেরিয়ার উদ্দেশে এগিয়ে যেতে শুরু করেন।

সালাহুদ্দিন পদে পদে তাদের খোঁজখবর রাখছিলেন। যখনই তিনি জানতে পারলেন, খ্রিস্টবাহিনী তুরান ত্যাগ করে সামনে অগ্রসর হচ্ছে, অমনি তিনি মুসলিম সেনাবাহিনীকে দুই ভাগ করে ফেলেন। এক অংশ নিয়ে নিজে মূল বাহিনীর প্রতিরোধে থেকে যান, অপর অংশকে বিকল্প পথে রওনা করিয়ে দেন তুরানের পথে। তারা সেখানে গিয়ে পানির উৎসগুলো দখল করে ফেলে। এতে খ্রিস্টানদের পিছু হটার পথ একেবারেই রুদ্ধ হয়ে যায়। বিশ্লেষকদের মতে, এই দক্ষ পরিকল্পনাই সালাহুদ্দিনকে হিত্তিনের ময়দানে ঐতিহাসিক বিজয় দান করে।

সুলতান সালাহুদ্দিনের এমন তৎপরতার কথা জানতে পেরে ক্রুসেডারদের পরিকল্পনায় বড় ধরনের পরিবর্তন আসে। এখনই তৃষ্ণার্ত সেনারা সালাহুদ্দিনের সাথে সরাসরি লড়তে পারবে না, এমন বিশ্বাস নিয়ে রেইমন্ড সেনাবাহিনীকে ৬ মাইল (৯.৭ কিমি) দূরের হিত্তিনের জলধারার দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য সেনাপতি গাইকে পরামর্শ দেয়। বলে, সেখান থেকে পরেরদিনই টাইবেরিয়ার দিকে যাত্রা করতে পারব। তাদের ধারণাও ছিল না যে, সুলতান আগে থেকেই মুসলিম বাহিনীর অপর অংশ নিয়ে হিত্তিনের কাছাকাছি অবস্থান করছেন।

হিত্তিন নামক জায়গাটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে তিনশো মিটার উঁচুতে অবস্থিত। এখানে দুই চূড়াবিশিষ্ট একটি পাহাড় রয়েছে। জায়গাটি টাইবেরিয়াস ও পশ্চিমে এক্রের যাতায়াতমধ্যবর্তী বিস্তৃত পর্বতমালার গিরিপথের পাশে অবস্থিত। সে-সময়ে এটি জর্ডান নদী, গেলিলি ও ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলের মধ্যে যাতায়াতের প্রধান বাইপাস সড়ক হিসেবে কাজ করত। ৩ জুলাই খ্রিস্টান বাহিনীরা হিত্তিনের কাছাকাছি চলে এলে সুলতান দ্রুত তার সেনাবাহিনীর অপর অংশকে তুরান থেকে চলে আসতে বলেন। তাছাড়া বিগত কয়েকদিন হিত্তিনের ঝরনাধারার পাশে বসবাস করে মুসলিম সেনারা যথেষ্ট শক্তিমান হয়ে উঠেছিল। তাই সহজেই তিনি সামনের

দিকে খ্রিস্টবাহিনীর পথ আগলে দাঁড়ান। পেছন দিকে সরতে গেলে সুলতানের অপরাংশের সেনারা সেদিকে তাকবির দিয়ে তাদেরকে সামনের দিকে হাঁকিয়ে দেয়। এতে পিপাসার্ত, ক্লান্ত ও শ্রান্ত সেনাদের নিয়ে খ্রিস্টান সেনাপতিরা বিপাকে পড়ে যায়। কী করা যেতে পারে, তা নিয়ে রেমন্ড ও গাইয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। গাই বলছিল, কৌশলগত কারণে আমাদের নিচে টিলার আশেপাশে থাকা উচিত। কিন্তু রেমন্ডের কথা ছিল, সালাহুদ্দিনের বাহিনীর হাতে মারা পড়তে না চাইলে আমাদের উচিত এখান থেকে সটকে পড়া। সেক্ষেত্রে পাহাড়ের উপর দিকে উঠে সেনাদেরকে পানি ও খাবার খাইয়ে রাতে বিশ্রাম নেয়ার ব্যবস্থা করে সকালে সালাহুদ্দিনের মোকাবেলা করা ভালো হবে।

একরোখা রেমন্ড এবারও গাইয়ের কথা মানল না। ফলে সমগ্র বাহিনী মেসকানা গ্রামের নিকট উচ্চভূমিতে আবদ্ধ হয়ে পড়ল। পাহাড়ের দুই পাশ থেকে মুসলিম বাহিনীর পরিবেষ্টনে ক্যাম্প করতে বাধ্য হলো তারা। তাদের কাছে না কোনো পানি ছিল, না রসদ ছিল; আর না নতুন সৈন্য আগমনের কোনো সুযোগ খোলা ছিল। গাইয়ের আশা ছিল যে, তার লোকেরা পরেরদিন সকালে হাত্তিনের জলধারায় পৌঁছতে পারবে।

সুলতান এই সুযোগটাকে কাজে লাগান। তিনি তার সেনাপতিদের একত্র করে পরবর্তী নির্দেশনা বুঝিয়ে দেন। সুলতানের পরিকল্পনার মূলকথা ছিল, খ্রিস্টবাহিনীকে কোনোভাবেই পানির কাছে আসতে না দেয়া, যাতে তারা প্রচণ্ড পিপাসার্ত হয়ে উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ ছাড়াই পরাজিত হয়ে যায়। সে-মতে মুসলিম বাহিনী রাতে ক্রুসেডারদের ঘেরাও করে রাখল। পাহাড়ের উপর পানিহীন, খাবারবিহীন দুর্বিসহ রাত কাটল গাইয়ের বাহিনীর। সুলতানের নির্দেশে মুসলিম সেনারা জোরে জোরে তাকবির এবং তাহলিল উচ্চারণ করছিল, যার ফলে খ্রিস্টানরা দুর্বলতা ভুলে থাকতে শান্তিমতো খানিক ঘুমাতেও পারছিল না।

যুদ্ধ

৪ঠা জুলাই ১১৮৭ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শনিবার। সূর্যের আলো ফুটতেই ক্রুসেড বাহিনী দেখল, রাতের আঁধারে সালাহুদ্দিন তাদেরকে চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলেছে এবং পানির উৎসগুলো সব নিয়ন্ত্রণে নিয়ে গেছে। হঠাৎ একযোগে তাকবিরধ্বনি দিয়ে মুসলিম বাহিনী তাদের উপর হামলে পড়লে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত খ্রিস্টান সেনারা

হতবিহ্বল হয়ে পড়ে। সেনাপতির পরিকল্পনামতে তারা সালাহুদ্দিনের মোকাবেলা বাদ দিয়ে তখন যে-কোনোভাবে টাইবেরিয়ার দিকে বেরোনোর পথ খুঁজতে থাকে। সুলতান সালাহুদ্দিন তাদের মনস্তত্ত্ব ধরে ফেলেন। চারদিকে অবরোধ আরও জোরদার করে দিয়ে তিনি সেনাদেরকে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। বলেন, সর্বক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে এবং বাহিনীর স্বার্থবিরোধী যেকোনো কাজ থেকে বিরত থাকতে। সেনারা তার সব কথা মেনে নেয়।

সুলতান সালাহুদ্দিন মুসলিম সেনাদের জানিয়ে দেন, আমরা জর্ডান নদীর তীরে দাঁড়িয়ে আছি। আমাদের চারপাশের শহরগুলো রোমানদের নিয়ন্ত্রণে। আজকের যুদ্ধে যদি আমরা হেরে যাই, তাহলে এরা আমাদের রক্ত-মাংস কিচ্ছু গায়ে রাখবে না। অতএব, জীবন বাঁচাতে চাইলে, সম্মানের পথে হাঁটতে চাইলে তোমাদেরকে সর্বশক্তি দিয়ে সচেতনতার সাথে আক্রমণ করতেই হবে। মুসলিম সেনারা সুলতানের কথায় সাহস দ্বিগুণ করে খ্রিস্টানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। চারপাশ থেকে উপর্যুপরি আক্রমণে ক্রুসেড বাহিনী বুঝে ফেলে, তাদের লাঞ্ছনা ও পরাজয়ের সময় ঘনিয়ে এসেছে। তারা বুঝতে পারে, সালাহুদ্দিনের হাত থেকে বাঁচতে হলে হয় পালাতে হবে, নতুবা হাত জোড় করে আত্মসমর্পণ করতে হবে। কিন্তু পালানোর চিন্তা করাও অতটা সহজ না তখন, মুসলমানরা সীসাঢালা প্রাচীর হয়ে চতুর্দিকে বেষ্টনি গড়ে রেখেছে। তবে ত্রিপোলির রাজা রেমন্ড তার সঙ্গী-সেনাদের সাথে এক গোপন পরামর্শ করল। এরপর সর্বশক্তি দিয়ে মুসলিম বাহিনীর একাংশকে লক্ষ করে এগিয়ে গেল। মূলত তাদের উদ্দেশ্য ছিল, মুসলিম রুদ্ধপ্রাচীর ভেদ করে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে বাঁচা। সুলতান সেটা বুঝতে পেরে সেদিকের সেনাদের ইঙ্গিতে রেমন্ডকে ছেড়ে দিতে বলেন। সেনারা সরে গেলে চোখের পলকে সটকে পড়ে রেমন্ড ও তার অনুগামী সেনারা।

রেমন্ড বের হয়ে গেলে অবশিষ্ট সেনাদেরকে আরও জোরদারভাবে ঘেরাও করে ফেলে মুসলিম বাহিনী। সালাহুদ্দিন চিন্তা করেন, বাহিনীর একাংশ পলায়ন করায় এমনিতেই খ্রিস্টানরা ভীত হয়ে পড়েছে, তাদের ভয় বরং আরও খানিক বাড়িয়ে দেয়া যায়। অনেক খ্রিস্টান সেনারা নিজেদের প্রাণের মায়ায় এ-সময় অস্ত্র ফেলে মুসলমানদের কাছে নিজেদের সঁপে দিচ্ছিল। তিনি একদল মুসলিম সেনাকে নির্দেশ দেন, খ্রিস্টান বাহিনীর পেছন দিকের ঘাস ও শুকনো গাছগুলোতে আগুন ধরিয়ে দিতে। সেনারা সেদিকে গিয়ে কাঠ, গাছের ডাল ইত্যাদি জড়ো করে আগুন ধরিয়ে দেয়। সেই আগুন ক্রমেই সামনের দিকে ধেয়ে আসে। সেনারা তাদের ঢালের

সাহায্যে বাতাস দিয়ে সেগুলোর উত্তাপ পৌঁছে দেন খ্রিস্টানদের তাঁবুতে। পূর্ব থেকেই খ্রিস্টানরা পিপাসার্ত ছিল, এখন নতুন করে যোগ হয় অসহনীয় ধোঁয়া ও আগুনের উত্তাপ। এতে তারা নিরুপায় হয়ে পাহাড়ের আরও উপরে উঠতে থাকে। তাঁবুগুলো গুটিয়ে নিয়ে আরেকটু উপর দিকে স্থাপনের চিন্তা করে তারা। কিন্তু সালাহুদ্দিন তাদের সেই সুযোগ দেন না। সেনাদের নিয়ে চারপাশ থেকে আরেকবার আক্রমণ করে তাদেরকে অতিষ্ঠ করে তোলেন। শেষপর্যন্ত সম্রাট গাই অব লুসিগনানের একটি তাঁবু ছাড়া সেখানে দ্বিতীয় কোনো তাঁবু স্থাপন করতে সক্ষম হয় না ক্রুসেড সেনারা।

এ যুদ্ধে সুলতান সালাহুদ্দিন প্রতিপক্ষের সামরিক শক্তির পাশাপাশি তাদের মানসিক এবং আধ্যাত্মিক শক্তিও ধ্বংস করে দেন। শুরু থেকেই তিনি এ ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্ক ছিলেন। ক্রুসেড বাহিনীকে পাহাড়ের চূড়ায় তুলে অবরোধ করেই তিনি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন তাদের ট্রু ক্রসের দিকে। তাদের বিশ্বাসমতে, সেখানে এমন একটি কাষ্ঠখণ্ড আছে, যাতে সাইয়িদুনা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে শূলবিদ্ধ করা হয়েছিল (নাউযুবিল্লাহ)। তিনি চাচ্ছিলেন, ট্রি ক্রসটি ছিনিয়ে নিতে। কারণ তিনি জানতেন, এটা হাত করে নিতে পারলে শত্রুপক্ষের মানসিক এবং আত্মিক শক্তি পুরোপরি ধ্বংস হয়ে যাবে। তারা এটাকে স্বর্ণ-রৌপ্য এবং মূল্যবান হিরে-জহরতের গিলাফে পেঁচিয়ে এনেছিল। সুলতান একদল সেনা পাঠান ট্রু ক্রসটি ছিনিয়ে আনতে। অ্যাক্রের বিশপ বাধা দিয়ে ধস্তাধস্তিতে মারা যায় এবং মুসলিম সেনারা থ্রি ক্রসটি সুলতানের কাছে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়। ট্রু ক্রস বেদখল হতেই খ্রিস্টান সেনারা তাদের ধ্বংসের বিশ্বাস করে নেয়। জীবনের মায়া ছেড়ে দিয়ে তারা নিচের দিকে নামতে শুরু করে। মুসলিম বাহিনী তাদেরকে হত্যা ও বন্দি করতে থাকেন। মাত্র কয়েক ঘণ্টায় রাজা গাই অব লুসিগনানের সাথে পাহাড়ের একেবারে চূড়ায় খ্রিস্টানদের মাত্র এক থেকে দেড়শো সেনা অবশিষ্ট থাকে, বাকিরা পালিয়ে যায়।

মুসলিম সেনারা রাজা গাইয়ের রাজকীয় তাঁবু দখল করে নেয়। তিরিশ হাজার খ্রিস্টান সেনা নিহত হয় এবং তিরিশ হাজার বন্দি হয়। কেবল ত্রিপোলির আমির রেমন্ড ছাড়া অন্যসব ক্রুসেড নেতারা এ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর হাতে বন্দি হয়।

যুদ্ধের পর

৪ জুলাই, ১১৮৭ খ্রি.। হিত্তিনের যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। বিজয়ী মুসলিম বাহিনী দখল করে নিয়েছে গাই অব লুসিগনানের সবকিছু। বন্দি হয়েছে গাই অব লুসিগনান, শ্যাটিলনের রেনল্ড, পঞ্চম উইলিয়াম, গেরার্ড ডি রাইডফোর্ট, চতুর্থ হামফ্রি, ব্রাইটনের প্লিভেইনসহ উল্লেখযোগ্য ক্রুসেডার নেতারা। তাদেরকে নিয়ে আসা হয়েছে সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবির সামনে। ক্রুসেডারদের চেহারা ক্লান্ত, বিধ্বস্ত। গাই অব লুসিগনান পিপাসায় ছটফট করছেন। সুলতানের নির্দেশে বরফমিশ্রিত পানি এনে দেয়া হল তাকে। নিজে পানি পান করে রেনল্ডের দিকে পাত্র এগিয়ে দিলেন গাই। এ দৃশ্য দেখে সুলতান রেগে গেলেন। তিনি দোভাষীকে বললেন, 'গাইকে বলো, রেনল্ডকে সে পানি দিয়েছে, আমি দেইনি।' সুলতানের ইঙ্গিত ছিল পরিষ্কার। আরবরা কোনো বন্দিকে পানি পান করানোর অর্থ ছিল, তাকে জীবনের নিরাপত্তা দেয়া। সুলতান রেনল্ডকে পানি পান করতে না দেয়ার সোজা অর্থ হলো, তিনি রেনল্ডকে জীবনের নিরাপত্তা দিচ্ছেন না।

রেনল্ডকে জীবনের নিরাপত্তা না দেয়ায় নানা কারণ ছিল। ৫৭৭ হিজরিতে সে মদিনায় হামলা করতে চেয়েছিল। কিন্তু সুলতান আইয়ুবি একটি বাহিনী প্রেরণ করে তাকে আটকে দেন। ৫৮২ হিজরিতে সন্ধি থাকা অবস্থায় সে একটি মুসলিম কাফেলাকে আক্রমণ করে। অনেক মুসলমানকে হত্যা করে। তখন সুলতানের দূতকে সে বিদ্রুপের সাথে বলেছিল, 'মুহাম্মদ কেন তোমাদের উদ্ধার করছে না?' তার এই উক্তি সুলতান সালাহুদ্দিনের কানে পৌঁছেছিল। সেদিন থেকেই তিনি রেনল্ডকে উচিত শিক্ষা দেয়ার অপেক্ষায় ছিলেন।

'তুমি অনেকবার শপথ ভেঙেছ। কোনো চুক্তির প্রতি তুমি সম্মান দেখাওনি। কেন এমন করলে?' রেনল্ডকে জিজ্ঞেস করলেন সুলতান।

'এটা রাজাদের অভ্যাস। আমি শুধু তাদের পথই অনুসরণ করেছি'—জবাব দিল রেনল্ড।

'তুমি বলেছিলে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেন মুসলমানদের উদ্ধার করতে আসছেন না। এখন দ্যাখো, আমি নবীজির পক্ষ থেকে এসেছি'—গম্ভীর কণ্ঠে বললেন সুলতান।

রেনল্ড চুপ রইল। সুলতান তাঁকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানালেন। রেনল্ড

অসম্মতি জানাল। সুলতান তরবারিটা এগিয়ে এসে তার ঘাড় ও কাঁধের মাঝখানে তরবারি বসিয়ে দেন।

ছিটকে আসা রক্ত হাত থেকে মুছতে মুছতে সুলতান বলেন, 'আমি দুইবার তোকে হত্যা করার শপথ করেছি। যখন তুই মক্কা-মদিনা আক্রমণের দুঃসাহস করেছিলি আর যখন অন্যায়ভাবে আমাদের বাণিজ্য-কাফেলা আটকে দিয়েছিলি।'

সম্রাট গাই অব লুসিগনান এ অবস্থা দেখে ঘাড় নামিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়েন। তিনি ভেবেছিলেন, সুলতান বুঝি তারও শিরশ্ছেদ করে ফেলবেন। রেনল্ডের মৃত্যুর দৃশ্য দেখে তিনি একটু আগে পান করা বরফকুচির কথা ভুলে গেলেন। কিন্তু সুলতান তাকে টেনে তুললেন। আশ্বস্ত করে বললেন: 'কোনো রাজা কখনো অন্য রাজাকে হত্যা করে না; কিন্তু ঐ লোকটা সব সীমা অতিক্রম করেছিল, তাই আমি তার সাথে এই আচরণ করেছি। লোকটিকে তার অপরাধপ্রবণতা ও বিশ্বাসঘাতকতার জন্যই মরতে হয়েছে।'

ফলাফল

হিত্তিনের পরাজয় কোনো স্বাবাভিক পরাজয় ছিল না। বরং এ পরাজয় খ্রিস্টানদের কোমর ভেঙে দেয়; তাদের মন-মগজে গেঁথে দেয় মুসলমানদের ভয়। এ বিপর্যয় প্রতিটা খ্রিস্টানের কাঁধে প্রেতাত্মা হয়ে তাড়িয়ে বেড়ায়। এ যুদ্ধে তারা তাদের সিংহভাগ সেনার মৃত্যু দেখে। ইতিহাসবিদদের মতে, এত অধিক পরিমাণ সেনা হিত্তিনে মারা পড়েছিল, যা অসংখ্য এবং অগনিত। প্রত্যক্ষদর্শী যারা নিহতদের সারি দেখেছ, তারা ভেবেছে, সবাই বুঝি মারা গেছে, কেউই বন্দি হয়নি; আবার যারা বন্দিদের দেখতে পেরেছে, তারা ভেবেছে সবগুলোই তো কারাগারে, তাহলে বুঝি কেউ মারা পড়েনি।

মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত সকলকে শিরশ্ছেদ করে হত্যা করা হয়। গাই অব লুসিগনানকে বন্দি করে দামেশকে নিয়ে রাখা হয় এবং পরবর্তীতে মুক্তিপণ আদায়ের মাধ্যমে তাকে মুক্তি দেয়া হয়। রেইমন্ড অব ত্রিপলি যুদ্ধ থেকে পালানোর পর ১১৮৭ সালে দূরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করে।

হিত্তিনের পরাজয় সালাহুদ্দিনের সামনে ক্রুসেডারদের সবগুলো শহর দখলের পথ উন্মুক্ত করে দেয়। তিনি ও তাঁর ভাই আল-মালিকুল আদিল মিলে একে একে

দখল করে নেন খ্রিস্টানশাসিত প্রায় সবগুলো রাজ্য। যুদ্ধের পরপর ৫ জুলাই রোববার, সালাহুদ্দিন টাইবেরিয়ার ভেতরের দিকে ছয় মাইল (১০ কিমি) যাত্রা করেন এবং সেখানে কাউন্টেস এসিভা দুর্গের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেন। পরবর্তী কয়েক মাসেই মুসলমানরা এক্রে, নাবলুস, জাফা, টোরন, সিডন, বৈরুত ও আসকেলান দখল করে নেয়। সৌভাগ্যবশত কনরাড অব মন্টফেরাটের আগমনের কারণে টায়ার রক্ষা পায়। এদিকে রানি সিবিলা, পেট্রিয়ার্ক হেরাক্লিয়াস ও বেলিয়ান জেরুজালেম প্রতিরক্ষার কাজে নিয়োজিত থাকেন।

বাইতুল মাকদিস বিজয়

হিত্তিনের প্রান্তরে ক্রুসেড বাহিনীর শোচনীয় পরাজয়ের পর সুলতান সালাহুদ্দিনের হাত থেকে বাইতুল মাকদিস, ত্রিপোলি বা এন্টিয়ক—কোনোটাই রক্ষা করার সাধ্যি ক্রুসেডারদের ছিল না। সম্রাট গাই অব লুসিগনানের সামনে সুলতানের অভিবাদনে ফটক খুলে দেয়া ছাড়া প্রতিরোধ আরোপের না সামরিক শক্তি ছিল, না ছিল মানসিক সাহস। কিন্তু একটা ব্যাপার তখনো সুলতানকে ভাবাচ্ছে, তা হলো ইউরোপ। ১১৮৭ সালে হিত্তিনের ভরাডুবির আগে তারা বাইতুল মাকদিসের ক্রুসেড শক্তির দিকে চোখ মেলে তাকায়নি। কিন্তু এবার তাদের টনক নড়েছে। যে-কোনো সময় তারা পশ্চিম থেকে পঙ্গপালের মতো ছুটে আসতে পারে কুদসে, সে-জন্য সুলতান বাইতুল মাকদিসে প্রবেশের আগে একের পর এক সবগুলো ক্রুসেড রাজ্য নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিচ্ছিলেন।

কার্যতভাবে বাইতুল মাকদিসের বিজয়ের ঘটনাকে শাব্দিক বিচারে কোনো যুদ্ধ বলা চলে না। বরং বড়জোর 'সেনা মহড়া' বলা যেতে পারে। কারণ, এখানে তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো প্রতিরোধ খ্রিস্টানরা গড়তে পারেনি। বরং হিত্তিনের পর থেকেই বাইতুল মাকদিস সুলতানের আগমনের অপেক্ষা করছিল। এ-জন্য তিনি স্বপ্নের সাথে আলিঙ্গনের পূর্বে হিত্তিনপরবর্তী এক বছরের ভেতর অ্যাক্রে, দক্ষিণ ত্রিপোলি, সুর, আসকেলান, গাজাসহ উপকূলীয় সবগুলো শহর দখল করে নেন। এরপর নির্বিঘ্নে রওনা করেন বাইতুল মাকদিসের দিকে।

স্বপ্নের সাথে দেখা

আসকেলান শহর জয়ের পর সুলতান তার আজীবন লালিত স্বপ্নের দিকে ছুটলেন। বাইতুল মাকদিসে যাবার আগে তিনি প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সেরে নিলেন। তার মনে হলো, কুদসে তার অবরোধকালে শামের সমুদ্রবন্দর ব্যবহার করে ক্রুসেডাররা

তার বাহিনীকে পেছন থেকে আক্রমণ করতে পারে, তাই তিনি মিশর থেকে নৌ-সেনাপতি হিসামুদ্দিন লুলুকে অনতিবিলম্বে শামের উপকূলীয় অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের জন্য পাঠিয়ে দিলেন এবং বলে দিলেন, ক্রুসেডারদের সাহায্য আসার সকল পথ যেন বন্ধ করে দেয়া হয়। এবার সুলতান একদল প্রতিনিধি পাঠালেন বাইতুল মাকদিসে। বার্তা দিলেন, যেন তারা সুলতানের প্রদত্ত শর্ত মেনে বিনে রক্তপাতে বাইতুল মাকদিস সুলতানের হাতে অর্পণ করে দেয়। আসকেলান শহরের সামনে বাইতুল মাকদিসের একদল প্রতিনিধির সাথে সুলতানের পাঠানো দূতদলের মোলাকাত হয়। সুলতানের প্রস্তাব পেশ করলে তারা তা মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়। এতে সালাহুদ্দিন বুঝতে পারেন, তরবারি ছাড়া এ সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান হবে না।

তিনি বারবার সেখানকার অধিবাসীদের কাছে তার প্রস্তাবনা পেশ করেন। বস্তুত তিনি চাচ্ছিলেন, পবিত্র এ শহরে কোনো রক্তপাত বা যুদ্ধ-বিগ্রহ না হোক; কিন্তু শহরবাসী বরাবরই সুলতানের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে থাকে। এতে সালাহুদ্দিন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন, জোর করেই তবে মুসলমানদের প্রথম কেবলা পুনরুদ্ধার করতে হবে।

১৫ই রজব, ৫৮৩ হিজরি মোতাবেক ১১৮৭ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর সুলতান সালাহুদ্দিন কুদস শহরের উত্তর এবং উত্তর-পশ্চিম কোণে সেনা জমায়েত করেন। কিন্তু সময় বয়ে চলে, অবরোধ তেমন কোনো ফল বয়ে আনে না। এদিকে যোহর পর্যন্ত সেখানটায় সূর্যের তাপ প্রখর হয়ে তাতিয়ে থাকে, সেনারা গরমে যেমন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে, তেমনি সামনের দিকে তাকাতে পারে না স্বস্তিতে। এভাবে পরবর্তী পাঁচদিন পর্যন্ত সুলতান শহরের চারপাশে ঘুরে কোনো যথাযথ জায়গা খুঁজতে থাকেন। শেষপর্যন্ত উত্তর দিকের সাইহুন গির্জার পাশে একটি উপযোগী জায়গা খুঁজে পান। সেখানকার শহরপ্রাচীর তুলনামূলক নরম দেখে ২০শে রজব সুলতান সেখানে সেনাদের একত্র করেন। রাত হয়ে এলে সারি সারি বসান মিনজানিকের গোলা।

দুপাশ থেকে সমানতালে গোলা নিক্ষেপ চলতে থাকে। শহরবাসীরা তাদের ধর্মীয় আবেগ থেকে লড়ছিল, তেমনি মুসলিম সেনারাও দায়িত্ব মনে করে গুরুত্বের সাথে যুদ্ধ করছিল। ফলে সুলতানের পক্ষ থেকে তাদেরকে সামান্য উৎসাহ দেয়ার প্রয়োজন পড়ছিল না। কিন্তু ক্রুসেডাররা যখন দেখল, পরিস্থিতি ক্রমশ তাদের হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে; ধীরেধীরে তারা ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে চলে যাচ্ছে, তখন তারা

অনন্যোপায় হয়ে সুলতানের পূর্বনিরাপত্তা চুক্তির সাথে একমত হয়ে একদল প্রতিনিধি পাঠাল। কিন্তু সুলতান এবার তাদের আবদার রক্ষা করলেন না। তিনি বললেন, 'ভয়ের কারণ নেই; ৪৯১ বছর পূর্বে তোমরা কুদস দখলের পর যে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছিলে, আমি তা চালাব না।'

শহরের ভেতর ভয় ছড়িয়ে পড়ে। তারা সুলতানের হাতে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। তাদের মনে হয়, এবার আর রক্ষে নেই। যে কষ্ট আমরা সুলতানকে দিয়েছি, তার প্রস্তাবনা যে অহংকারের সাথে আমরা পরিত্যাগ করেছি—আজকে তার যথাযোগ্য প্রতিশোধ তিনি নিয়ে ছাড়বেন। অবশেষে ২৭শে রজব ৫৮৩ হিজরি মোতাবেক ১১৮৭ হিজরির ২রা অক্টোবর সুলতান বাইতুল মাকদিসে প্রবেশ করলেন। দিনটি ছিল সেই দিন, যেদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা থেকে বাইতুল মাকদিস হয়ে মেরাজে গিয়েছিলেন।

মহানুভব সেনাপতি তিনি

দশ লক্ষ সৈন্যবহর বীর বিক্রমে শহরে প্রবেশ করছে। চারদিকে 'আল্লাহু আকবার' রব পড়ে গেছে। সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবিকে আল্লাহ যে সম্মান ও বিজয় দান করেছেন—তা অনন্য। বাতাসের মতো তার সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে। সুদীর্ঘকাল ধরে মুসলিমবিশ্ব যে স্বপ্ন জিইয়ে রেখেছিল বুকের ভেতর, আজ তা ফুল হয়ে ফুটে উঠল যেন। ৫৮৩ হিজরি সনের সেই দিন আজ, যেদিন বাইতুল মাকদিস হস্তান্তর করে ক্রুসেডাররা শহর ছেড়ে চলে গেছে। বাবুল খলিল হয়ে সৈন্যরা কেল্লায় প্রবেশ করল। সপ্তাহ যেতে-না-যেতেই সুলতান বাইতুল মাকদিসের মিনারে মিনারে ইসলামের পতাকা তুলে দিলেন। মাসজিদুল আকসা ও কুব্বাতুস সাখরার সংস্কার করলেন। গোলাপের পানি ছিটিয়ে কুফরের নাপাকি ধুয়ে নিলেন। এরপর সেই জায়গা দাঁড়িয়ে নামায আদায় করলেন—যেখানে নামায পড়েছিলেন খলিফাতুল মুসলিমিন হযরত উমর রাজিয়াল্লাহু আনহু।

শহর দখলের সপ্তম দিন। সুলতান তার সাথিবর্গ নিয়ে বেরোলেন শহরের অবস্থা দেখার জন্য, যাতে নিজের চোখে তিনি দেখতে পারেন থেকে যাওয়া খ্রিস্টানরা শর্তপালনে কতটা তৎপর। সুলতান তাদের অধিকাংশকেই মুক্তিপণের বিনিময়ে মুক্ত করেছেন। পুরুষ প্রতি দশ দিনার, নারীদের জন্য পাঁচ ও শিশুদের জন্য এক দিনার নির্ধারণ করেছেন। যারা নিঃস্ব, তাদের পণ আদায় করবে বিত্তবানরা। অসুস্থ

ও প্রতিবন্ধীরা বিনাপয়সায় মুক্ত হবে আর বাকিরা হয় জিযিয়া দেবে নতুবা বন্দিত্ব বরণ করে নেবে। সুলতানের সামনে দিয়ে কিছু অশ্বারোহী শহর ত্যাগ করল। পূর্ণ মুক্তিপণ না দেওয়ায় বিপাকে পড়ল কিছু দরিদ্র খ্রিস্টান। এক দিকে তাদেরকে বিলাপ করতে দেখা গেল মুক্তির আকুতি নিয়ে।

সুলতান তার ভাই মালিকুল আদিলকে বললেন, 'আমরা কী করতে পারি বলে তুমি মনে করো? ধনীরা তাদের দরিদ্র বন্ধুদের বিপদে ফেলে চলে গেল। আমরা কি আমাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে এদের জমানো সম্পদ ছিনিয়ে নেব?' সুলতানের ভাই বললেন, 'সুলতান, এমন সময় আমাদেরও গিয়েছে। আমাদের ধনীরাও আমাদের ফেলে গিয়েছিল, অথচ আল্লাহর বিধান ছিল ভিন্ন। তখন এই খ্রিস্টানরা আমাদের ওপর কৃপা করেনি। আজ এদের ধনীরা সেই একই কাজ করছে। সুলতান যদি ওদের সম্রাটদের মতো আচরণই পুনরাবৃত্তি করেন, সেটা কি সুলতানের শোভা পায়?'

সুলতান বললেন, 'অবশ্যই না, ভাই। যাও, পাঁচশো ফকিরকে মুক্তিপণ ছাড়াই মুক্ত করে দাও। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য।' তখন মালিকুল আদিল বললেন, 'আপনি আল্লাহভীরু মুত্তাকি সুলতান, সাওয়াবের আশায় পাঁচশো বন্দি মুক্ত করে দিলেন। আমি তো গুনাহগার, সাওয়াবের আশায় আমি কি এক হাজার বন্দিমুক্তির অনুমতি পেতে পারি?' সুলতান বললেন, 'এক হাজার বন্দি আমার ভাইয়ের নামে মুক্ত হোক!'

সুলতানের সামনে দিয়ে পনেরো শত বন্দি হেঁটে চলে গেল মুক্ত জীবনের দিকে। উপস্থিত সকলে উচ্চস্বরে আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে কাঁপিয়ে তুলল পরিবেশ। ইতিহাস এমন ঘটনার নজির দেখাতে পারেনি; না এর পূর্বে, না পরে। পনেরো শত খ্রিস্টান সুলতানের রাজত্ব স্থায়ী হোক বলে বুকফাটা আর্তি পেশ করল খোদার দুয়ারে। সুলতান আদেশ করলেন, কয়েকশো সেনা পাঠিয়ে দেওয়া হোক এদের পাহারা দেওয়ার জন্য। কোথাও কোনো চোরাকীর্তি, কোনো দস্যুদলের অতর্কিত হামলা যেন এদের কোনো ক্ষতি না করে। লেবাননের সীমান্তে পৌঁছে দিয়ে তবেই সেনারা ফিরে আসবে।

সুলতান আদেশ করলেন, সকল সেনারা যেন এই জায়গাটায় বিনয়ের সাথে দাঁড়ায়, যে জায়গাটা ইসা আলাইহিস সালামের স্মরণে তৈরি করা ছিল। সেনারা সুলতানকে ঘিরে তার আদেশ পালন করল। উপস্থিত জনতার দিকে ফিরে তিনি

বললেন, কালই হয়তো কোনো দল এসে বলবে, এই জায়গাটি ভেঙে এর স্মরণ মিটিয়ে দিতে, কিন্তু আমরা সে ভুল করব না। আমরা এখানে উৎখাত, উৎপাটন বা ধ্বংসের জন্য আসিনি। এটা ভেঙে ফেললে খোদা আমাদের ওপর সন্তুষ্ট হবেন না। আর আমরা নাসারাদের প্রতি বছর বাইতুল মাকদিসে ধর্মীয় ভ্রমণে আসতে বাধাও দেব না। এই জায়গাটি তার নিজ অবস্থায় বহাল থাকবে, যেমনটা ছিল হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর যুগে।

আরও একবার বাইতুল মাকদিস আল্লাহু আকবারের ধ্বনিতে নড়ে উঠল। সুলতানের ভাই তার হাত ধরে চুম্বন করলেন। সুলতান তার কানে বললেন, 'এটা একধরনের পররাষ্ট্রনীতি। এই ভ্রমণে আমাদের পর্যটনখাত অর্থনৈতিক সাফল্য পাবে। রাষ্ট্রীয় উন্নয়নের স্বার্থে আমরা এটা হাতছাড়া করতে পারি না। এই সিদ্ধান্ত বিধর্মীদের মনে যে প্রভাব ফেলবে—তা হাজার তরবারির আঘাতের চেয়ে ঢের। অদূর ভবিষ্যতে এই সিদ্ধান্ত মুসলিমদের জন্য সুফল বয়ে আনবে।'

এই সময় ভিড় ঠেলে এক অশ্বারোহী এগিয়ে এল। হন্তদন্ত হয়ে সুলতানকে লক্ষ করে বলল, 'মহান সুলতান, ফাদার ফ্রেডরিক তার সাথে মূল্যবান ক্রুশ এবং অন্যান্য সম্পদ নিয়ে শহর ছাড়ছে। সেখানে উপস্থিত আমাদের সেনারা তার পথরোধ করেছে। তারা এসব সম্পদকে আমাদের সেনাদের অধিকার মনে করছে।' সুলতান তার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বললেন, 'সুফি-ফাদার, সন্যাসীদের পথরোধ করো না। তাদেরকে যেতে দাও। আমরা তাদের ইবাদতখানাই গুঁড়িয়ে দিচ্ছি না, তাহলে তাদের এসব ধর্মীয় জিনিসপত্রে আমাদের কোনো অধিকার থাকতে পারে না।'

এসময় চারজন সন্যাসী এগিয়ে এল। একজন বলল, 'সুলতান, তাহলে আমাদের এই গির্জায় থেকে ধর্মীয় উপাসনার সুযোগ দিন।' সুলতান বললেন, 'তোমরা অবশ্যই তোমাদের ধর্মপালনের সুযোগ পাবে। আমাকে রাষ্ট্রের কাজগুলো গোছাতে দাও।' তারা সুলতানকে কুর্ণিশ করে কৃতজ্ঞচিত্তে ফিরে গেল।

সুলতান রাজ্যে তার তদারকি অব্যাহত রাখলেন। প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে তিনি নগরভ্রমণে বের হন। সকলে তার কাছে নিজেদের প্রয়োজন খুলে বলে। কারও পয়সার প্রয়োজন হলে সুলতানকে বলে। কারও দুর্দশা থাকলে সেটা সুলতানকে জানায়। মুসলিমরা যেমন জানাতে দ্বিধা করে না, রাজ্যের অন্য খ্রিস্টান বা উপজাতিরাও তাদের প্রয়োজনের কথা বলতে দ্বিধা রাখে না।

এমনই একদিন বিকেলবেলা সুলতান তার অভ্যাসমতো শহরভ্রমণে বেরোলেন।

চারজন ব্যক্তি এগিয়ে এল তাদের প্রয়োজনের কথা জানাতে। একজন খ্রিস্টান বৃদ্ধকে দেখা গেল এক যুবকের আস্তিন ধরে এগোচ্ছে। দুর্বল স্বরে বলছে, 'তোমাদের বাদশা নীতিবান হলে বুঝবেন, তুমি আমার সাথে কী অন্যায় করেছ।' সুলতান দাঁড়িয়ে বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ব্যাপার?' 'সুলতান, আমি একজন ফরাসি নাগরিক। বিশ বছর ধরে আমি এ শহরে বাস করি। গত দুবছর এই যুবক আমার বাড়িতে মেহমান হিসেবে আছে। সে আসকালান থেকে পালিয়ে গোপনে কুদস শহরে প্রবেশ করে। প্রশাসনের ভয়ে সে আশ্রয় চাইলে আমি বিস্তারিত জানতে না চেয়েই তাকে বিশ্বাস করে থাকতে দিই। তার মুসলিম সঙ্গীরা তাকে পালাতে বাধ্য করেছে এইটুকুতেই আমি সন্তুষ্ট ছিলাম। তার কথা আমি এই দু-বছরে কাউকে জানাইনি। সে এতদিন আমার ঘরে থেকেছে, খেয়েছে। আমি কেবল একজন মেহবান হিসেবে যতটা সমাদর পাওয়া উচিত তার, সেটা করেছি। এই মেহমানদারির শিক্ষা আমি আরবদের থেকেই পেয়েছি; কিন্তু যখনই আপনারা কুদসে ক্ষমতা পোক্ত করলেন, খ্রিস্টানরা তাদের সর্বস্ব হারিয়ে কুদস ছেড়ে চলে গে আর এই ছেলে বুঝতে পারল আমার ভিত দুর্বল হয়ে গেছে—অমনি যে ভোল পাল্টে দ্বিচারিতা শুরু করল। সে আমার ও আমার সম্পদ দখল করে নিল। তার এই চুরি, লুটপাট কি আপনি সমর্থন করবেন? মেজবানের প্রতি মেহমানের এই অন্যায় আপনি মেনে নেবেন?'—বৃদ্ধ নাগারে বলে থামল।

সুলতান অনতিবিলম্বে আদেশ করলেন, বৃদ্ধকে তার সহায় সম্পদ ফিরিয়ে দিয়ে যুবককে কারারুদ্ধ করা হোক। তার ব্যাপারে আমি পরবর্তী সময়ে ফায়সালা নেব।

নগর তদারকির পর ক্লান্ত দেহে সুলতান তার সভাকক্ষে এসে বসলেন। সুলতান তার ভাইকে জিজ্ঞেস করলেন, 'খ্রিস্টান নারীদের সাথে কী করেছ তুমি?' বলা হলো, 'আপনার আদেশমতো তাদের সাথে দয়ার্দ্র আচরণ করা হয়েছে।' সুলতান বললেন, 'যা বলি, শোনো। সেনাপতি বালিয়ানের স্ত্রী মেরি এবং ফরাসি নেতার স্ত্রী সিবিলাকে মুক্ত করে দেবে। তারা সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান। কারাগারের রুক্ষ ধারে তাদের মানায় না। সাথে তাদের পরিবারের অন্যান্য স্বজনদেরও ছেড়ে দাও। শুনেছি, আমাদের অধিকৃত কেল্লাগুলোতে পূর্বের কিছু অসহায় নারী ও খাদেমাদের আটকে রাখা হয়েছে। তাদের সকলকে মুক্ত করে দিতে আদেশ পাঠাও। যদি মুক্তিপণ দাবি করে, বাইতুল মাল থেকে স্বর্ণমুদ্রা পাঠাও।' সুলতানের কথা মতো এদেরকে মুক্ত করে দেওয়া হলো।

সুলতানের কারাগার থেকে বেরিয়ে গেল মেরি, সিবিলা, বালিয়ানসহ তাদের

একশত বিশজন স্বজন। আরও বেরিয়ে গেল তিনশত খাদেমা ও অন্যান্য সাধারণ ও অসহায় নারী পুরুষ। বাইতুল মাকদিস ছেড়ে যেতে যেতে তাদের মুখে ছিল আনন্দের হাসি। তাদের চোখে শোভা পাচ্ছিল সুলতানের প্রতি কৃতজ্ঞতার অশ্রু।

মামলুক যুগ

৬৪৮-৯২৩ হি.

১২৫০-১৫১৭ খ্রি.

আইন জালুতের যুদ্ধ

BATTLE OF AIN JALUT

তারিখ:	৬৫৮ হিজরি / ১২৬০ খ্রি.
স্থান:	আইন জালুত, নাবলুস, ফিলিস্তিন
ফলাফল:	মুসলিম বাহিনীর বিজয়

পক্ষ-বিপক্ষ:	মামলুক সাম্রাজ্য	মোঙ্গল সাম্রাজ্য
সেনাপ্রধান:	সাইফুদ্দিন কুতুয	কিতবুগা নয়ান নাসতুরি
সেনাসংখ্যা:	২০ হাজার	২০ হাজার
ক্ষয়ক্ষতি:	সামান্য	পুরো বাহিনী ধ্বংস

৬৫৮ হিজরির রমাদান মাসে সংঘটিত আইন জালুত যুদ্ধকে ইসলামি ইতিহাসে অন্যতম নজিরবিহীন ঘটনা বলে উল্লেখ করা হয়। এ যুদ্ধে মুসলমানদের পায়ের কাছে আনত হয়ে এসেছিল পৃথিবীর ইতিহাসে ভয়ংকর হিংস্র জাতি হিসেবে পরিচিত মোঙ্গলরা। সে-সময় ইতিহাসের সবচেয়ে বড় সাম্রাজ্যের মালিক ছিল এরা। চেঙ্গিসখানের সময় থেকে শুরু হওয়া মোঙ্গলদের জয়যাত্রা অব্যাহত ছিল পরবর্তী গ্রেট খানদের সময়ও। বাগদাদ, সমরখন্দ, বেইজিং, বুখারা, আলেপ্পোর মত বড় বড় শহর তাতারিদের হামলায় মাটির সাথে মিশে গিয়েছিল। কি পূর্ব কি পশ্চিম, এমন একটিও রাজ্য ছিল না, যারা মোঙ্গলদের গতিপথে বিন্দুমাত্র বাধা সৃষ্টি করতে পেরেছিল। বিশ্বজয়ের যে আকাঙ্খা অপূর্ণ রেখে মারা গিয়েছিলেন চেঙ্গিস খান, তার পুত্র ও পৌত্ররা সেটাকেই যেন সত্যে পরিণত করতে যাচ্ছিল। তাদের বর্বরতায় ইউরোপ ও এশিয়ার কোটি কোটি নিরীহ মানুষ প্রাণ দিয়েছে অনেকটা বিনা-প্রতিরোধে। তাই সারা দুনিয়ার মানুষ ভেবেই নিয়েছিল, মোঙ্গলদের থামানো বোধ হয় পৃথিবীবাসীর জন্য অসম্ভব। কিন্তু ১২৬০ সালে হঠাৎই থেমে যায় অপ্রতিরোধ্য মোঙ্গলদের জয়রথ। এক অসাধ্য সাধন হয়ে যায় ফিলিস্তিনের গাজার অদূরে, নাবলুস শহরের পাশে আইন জালুত প্রান্তরে। রক্তক্ষয়ী এক শক্ত মোকাবেলায় মুসলিম বাহিনীর সামনে মুখ থুবড়ে পড়ে বিশ্ব-পরাশক্তি হালাকু খানের বাহিনী। এ পরাজয় শামে তাদের ধ্বংসাত্মক অনুপ্রবেশ বাধাগ্রস্ত করে এবং ৬৫৬ হিজরিতে (১২৫৮ খ্রিস্টাব্দে) খেলাফতের রাজধানী বাগদাদকে ধুলোয় মিশিয়ে দেয়া তাতারদের অগ্রযাত্রা একেবারে রুদ্ধ করে দেয়। পাশাপাশি এই হিংস্র জাতি দমনের মধ্য দিয়ে উসমানি খেলাফত প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত প্রায় দুইশো বছরের জন্য, তৎসময়ের প্রধান মুসলিম শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে মামলুক সাম্রাজ্য।

চেঙ্গিস খান এবং মোঙ্গল জাতির উত্থান

ইতিহাস সম্পর্কে সামান্যতম ধারণা রাখেন, অথচ চেঙ্গিস খানের নাম শোনেনি এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া দায়। পৃথিবীর ইতিহাসে অন্যতম অপরাজিত জেনারেল সে। তার সমকক্ষ সেনাপতির সংখ্যা মাত্র হাতেগোনা কয়েকজন, যে এককভাবে জয় করেছিল পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি অঞ্চল এবং যে কি-না একই সাথে ৪ কোটি নিরাপরাধ মানুষের মৃত্যুর জন্য দায়ী। ধ্বংস, হত্যা, চাতুর্য, ক্ষমতা, লিপ্সা এবং রণকুশলতার এক অভূতপূর্ব মিশেলে গড়া চেঙ্গিস খানের জীবনকাহিনি যেন একটি জীবন্ত সিনেমার মতো। তার ঘটনাবহুল জীবনের রোমাঞ্চকর উত্থান-পতন এবং অচিন্তনীয় ধ্বংসলীলা সম্পর্কে না জানলে ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হয়তো আমাদের অজানাই থেকে যাবে। তাই আইন জালুতের মূল অধ্যায় শুরু করার আগে মোঙ্গল জাতি ও তার জনকের ব্যাপারে সামান্য আলোকপাত করা জরুরি মনে করছি।

মঙ্গোলিয়ার স্তেপ বা তৃণ-চারণভূমিতে জন্ম হয়েছিল ইতিহাস সৃষ্টিকারী দাপুটে এই বিজেতার। ধারণা করা হয়, চেঙ্গিসের জন্মস্থান ছিল উত্তর মঙ্গোলিয়ার খেনতি পর্বতমালার অন্তর্ভুক্ত বুরখান পর্বতের খুব কাছে দেলুন বলদাখ নামের এক জায়গায়। তার জন্ম খুব সম্ভবত ১১৬২ সালে। ওনন নদীর পাড়ে তৃণচারণ ভূমিতেই কেটেছে এই খুনপিয়াসী নেতার শৈশব।

যদিও সারা পৃথিবীর কাছে তিনি পরিচিত চেঙ্গিস খান নামে, তবে তার আসল নাম 'তেমুজিন'। অনেক যুদ্ধ এবং রক্তপাতের পর ১২০৬ সালে তেমুজিন যখন সমগ্র মঙ্গোলিয়ান স্তেপের একক অধিপতি হিসাবে আবির্ভূত হন, তখন তাকে 'চেঙ্গিস খান' উপাধি দেওয়া হয়; যার বাংলা অর্থ 'সমগ্র পৃথিবীর অধিপতি' বা এ-জাতীয় কিছু। হয়তো নামের এমন অর্থের কারণেই তার পিতৃদত্ত নাম তেমুজিন কালের অতলে হারিয়ে গেছে চেঙ্গিস নামের পরাক্রমের কাছে।

তেমুজিনের চেঙ্গিস হয়ে ওঠার গল্প

চেঙ্গিস খানের ছেলেবেলা ছিল খুবই ঘটনাবহুল। তার পিতা ছিলেন স্থানীয় গোত্রপতি। তাই আভিজাত্য ছিল চেঙ্গিস খানের জন্মগত। মঙ্গোল রীতি অনুসারে বারো বছর বয়সে তার সাথে বিয়ে দেওয়া হয় তাকে বোর্তে নামের এক ফুটফুটে মেয়েকে। তবে ছোট্ট তেমুজিনের কপালে সুখ বেশি দিন সইল না। সে সময়ের ইউরেশিয়ান স্তেপ

অঞ্চলে এখনকার দিনের আধুনিক জাতি রাষ্ট্রের মত একক কোনো জাতি বসবাস করত না। বরং লক্ষ লক্ষ বর্গমাইল জুড়ে বিস্তৃত এই তৃণচারণ ভূমি বিভক্ত ছিল বিভিন্ন গোত্রে গোত্রে, দলে ও উপদলে। ছিল না তাদের কোনো সরকার কিংবা কেন্দ্রীয় আইন কানুন। গোত্র বা কবিলাতান্ত্রিক সমাজে গোত্রের রীতিনীতিই ছিল চূড়ান্ত কথা। চেঙ্গিসের জন্মের সময় স্তেপ ভূমিতে ছিল তাতারদের বড্ড আধিপত্য। তার পিতা ছিলেন তাতারদের ঘোর শত্রু। মোঙ্গল জনশ্রুতি অনুসারে, তাতারদের দেওয়া বিষমিশ্রিত ঘোড়ার দুধ পানেই মৃত্য হয়েছিল চেঙ্গিসের পিতার।

পিতার মৃত্যুর পর অপ্রাপ্ত বয়স্ক তেমুজিনের নেতৃত্ব মেনে নিতে চাইল না তার গোত্রের লোকজন। তাই একে একে গোত্রের সব মানুষ তার পরিবারকে রেখে চলে যেতে শুরু করল বিভিন্ন জায়গায়। এই সময়টা ছিল চেঙ্গিস খানের জীবনের সবেচেয়ে কঠিন সময়। বালক চেঙ্গিস পরবর্তী জীবনের বিপদসঙ্কুল পথ চলার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন ঠিক এই সময়টা থেকেই। শৈশবের প্রতিকূলতা তাকে তিলে তিলে মজবুত করে গড়ে তুলছিল অনাগত ভবিষ্যতের জন্য। বিভিন্ন ঘটনার কারণে চেঙ্গিসের চরিত্রের কঠোরতা সেই বাল্যকাল থেকেই বোঝা যাচ্ছিল। মাত্র তেরো বছর বয়সে নিজের সৎ ভাইকে হত্যা করেছিল নিখুঁত তিরন্দাজ বালক তেমুজিন। হত্যার কারণ খুব সামান্য। খাবারের ভাগাভাগি নিয়ে দুই ভাইয়ের ঝগড়া।

১৭ বছর বয়সে তেমুজিন ঘরে তুলে আনে তার বাল্যবধূ বোর্তেকে। বহুগামী চেঙ্গিসের জীবনের হাজার হাজার নারীর সঙ্গ এলেও বোর্তে ছিল তার প্রথম এবং শেষ ভালবাসা। অসংখ্য সন্তানের পিতা হওয়া সত্ত্বেও শুধু বোর্তের গর্ভে জন্ম নেওয়া চার ছেলেকেই উত্তরাধিকারী হিসাবে মনোনীত করেছিল চেঙ্গিস। বোর্তে আর তেমুজিনের এই ভালবাসা ইতিহাসে বেঁচে আছে অনন্য হয়ে। বেঁচে আছে বোর্তের গর্ভে জন্ম নেওয়া চেঙ্গিসের চার ছেলের নাম জোচি, তুলুই, ওগেদাই এবং চুঘতাই খানের মাধ্যমে।

সে যাই হোক। বোর্তেকে নিয়ে খুব বেশি দিন একসাথে থাকা হল না তেমুজিনের। প্রতিপক্ষ অতর্কিত হামলা চালিয়ে তার গোত্রের সকলকে হত্যা করল এবং বোর্তেকে তুলে নিয়ে গেল অজানায়। এই ঘোর বিপদে তেমুজিন পিতৃবন্ধু তুঘরুল খান[১] এবং আপন ভাই জমুখার সাহায্যের শরণাপন্ন হল। তাদের সহযোগিতায়

[১] তুঘরুল খান ছিলেন এক শক্তিশালী গোত্রপ্রধান এবং চেঙ্গিসের পিতার রক্তের ভাই। সেকালে মোঙ্গলরা ছোটবেলায় ব্লাড ব্রাদার বা রক্তের ভাই সম্পর্কে আবদ্ধ হতেন হাত কেটে রক্ত বিনিময় করে। ব্লাড ব্রাদাররা আজীবন একে অপরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতেন।

উদ্ধার করা হলো বোর্তেকে। শক্তিশালী দুই ব্যক্তির এই মহানুভবতাই তেমুজিনের মনে নেতা হবার লোভ জাগিয়ে তোলে। ধীরে ধীরে তাদের মাধ্যমে সে নিজেকে শক্ত এবং পাকাপোক্ত করে তোলে।

তবে উচ্চাভিলাষী তেমুজিন প্রস্তুত হচ্ছিল আরও বড় কোনো সাম্রাজ্যের মালিক হওয়ার জন্য। একসময় তেমুজিনের বেশকিছু স্বভাব ও নীতি তৎকালীন মোঙ্গল সামাজিক নীতিবিরুদ্ধ হওয়ায় জমুখার সাথে তার দূরত্ব বাড়তে থাকে। তাছাড়া তারা দুজনই ছিল প্রচণ্ড ক্ষমতালোভী; দুজনেরই চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল নিজের একাধিকপত্য কায়েম করা। তাই কালের আবর্তে দুজনের সংঘাত অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। সেই সূত্র ধরে তাদের গোত্র দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। তেমুজিনের অংশের সাথে জমুখার বেশকিছু যুদ্ধও সংঘটিত হয়। দুঃখজনকভাবে সবগুলোতেই জমুখা পরাজিত হয়। ফলে তার গোত্রের লোকেরাই তাকে চেঙ্গিসের হাতে তুলে দিয়ে যায়।

চেঙ্গিস খানের কাছে সবচেয়ে মারাত্মক অপরাধ ছিল বিশ্বাসঘাতকতা। জমুখার যে জেনারেলরা চেঙ্গিসের কাছে পুরস্কৃত হওয়ার আশায় নিজেদের নেতাকে তুলে দিয়েছিল শত্রুর হাতে, তাদের বিশ্বাসঘাতকতার পরিণতি হয়েছিল খুবই ভয়ঙ্কর। চেঙ্গিস তাদের সবাইকে বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে ফুটন্ত পানিতে সেদ্ধ করে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিল। জমুখাকে তার নিজের ইচ্ছা অনুসারেই মোঙ্গল রীতি অনুপাতে পিঠ ভেঙে হত্যা করা হয়েছিল। যদিও চেঙ্গিস জমুখাকে হত্যা করতে চায়নি বলে বেশ কিছু সূত্রে উঠে এসেছে; কিন্তু জমুখা নিজেই পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে বেঁচে থাকতে চায়নি। জমুখাকে পরাজিত করার পর মঙ্গোলিয়ার বাকি গোত্রগুলোও একে একে চেঙ্গিসের বশ্যতা মেনে নিতে থাকে এবং সে বছরই তাকে 'চেঙ্গিস খান' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

চেঙ্গিসের অজেয় বাহিনী

চেঙ্গিস খান হওয়ার পর তেমুজিন আরও ২১ বছর বেঁচে ছিলেন, আর সেটাই ছিল তার জীবনের স্বর্ণযুগ। সেই সময়ের মধ্যে তিনি জয় করেছিলেন চিন, ইউরোপ এবং এশিয়ার প্রায় ১ কোটি বর্গ কিলোমিটার বিস্তৃত অঞ্চল। ১২১১ সালে পশ্চিম জিন (Jin) সাম্রাজ্য, ১২১৫ সালের ঐশ্বর্যমণ্ডিত জিয়া (xia) সাম্রাজ্য, ১২২০ সালে প্রবল প্রতাপশালী খোয়ারেজেম সাম্রাজ্য তার পদানত হয়। এছাড়া আফগানিস্তান হয়ে ভারতের পাঞ্জাব পর্যন্ত চলে এসেছিল চেঙ্গিসের বাহিনী। ককেশাস ও

কৃষ্ণসাগরের আশেপাশের অঞ্চলগুলোও একে একে অন্তর্ভুক্ত থাকে চেঙ্গিসের সাম্রাজ্যে। ইউরোপে চেঙ্গিসের জয়রথ পৌঁছেছিল বুলগেরিয়া হয়ে ইউক্রেন পর্যন্ত। অবাক করা ব্যাপার, চিরকাল অজেয় রাশিয়া জয় করতে চেঙ্গিস খানের বাহিনীর একটুও বেগ পেতে হয়নি।

বর্বরতার বর্বর চিত্র

চেঙ্গিস খানের রাজ্য জয় করার পদ্ধতি ছিল ভয়াবহ রকমের বীভৎস। কোনো শহর জয়ের আগে সে শহরের মানুষদের নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের আদেশ করা হতো। সেটা না মেনে নিলে শুরু হত অবরোধ, তারপর একসময় অনাহারক্লিষ্ট নগরবাসীর উপর চালানো হত অতর্কিত হামলা। নারী, পুরুষ, শিশু কেউই মোঙ্গল বাহিনীর বর্বরতা থেকে বাঁচতে পারেনি। মারভ, বেইজিং, সমরখন্দের মত মধ্যযুগের জনবহুল শহরগুলো মোঙ্গল বাহিনীর পাশবিকতায় একদম মাটির সাথে মিশে গিয়েছিল। বর্তমান তুর্কমেনিস্তানের উরগেঞ্জ ছিল মধ্যযুগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোর একটি। সেটিও মোঙ্গল বাহিনী পুরোপুরি ধ্বংস করে ফেলে। প্রায় ১২ লক্ষ মানুষের এই শহর জয় করার সময় চেঙ্গিসের বাহিনীর ৫০ হাজার সৈনিকের প্রত্যককে গড়ে ২৪ জন করে নিরীহ মানুষ হত্যার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল।

মোঙ্গল বাহিনী যেসব এলাকায় হামলা চালাত, সেগুলো হয়ে পড়ত জনশূন্য। হাজার হাজার বর্গমাইল জুড়ে বিস্তৃত সভ্যতা পরিণত হত রূপকথার কোনো ভূতুড়ে নগরীতে। আজও সেন্ট্রাল এশিয়ার বেশ কিছু শহরের ধ্বংসাবশেষ টিকে আছে মোঙ্গল আক্রমণের ভয়াবহতার সাক্ষী হিসাবে। ধারণা করা হয়, চেঙ্গিস খানের বিভিন্ন অভিযানে মারা পড়েছিল প্রায় ৪ কোটির মতো সাধারণ মানুষ, যা তৎকালীন পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার প্রায় ১১ শতাংশ।[১]

---

[১] এতগুলো মানুষের নির্মম মৃত্যুর দায় নিয়ে অবশেষে ১২২৭ সালে মৃত্যু হয় পৃথিবীর বুকে মানবতার সবচে বড় শত্রুদের কাতারে জায়গা করে নেয়া এই দুর্ধর্ষ সাম্রাজ্য বিজেতার। তবে চেঙ্গিসের সমাধি কোথায় সেটা কেউই জানেনা। কারণ, তার শেষকৃত্যে উপস্থিত সবাইকে হত্যা করে ফেলা হয়। আর চেঙ্গিসের উত্তরাধিকারীরাও পরবর্তী সময়ে সেটা গোপন রেখে দেয়। ফলে আজও পর্যন্ত চেঙ্গিসের সমাধি পৃথিবীবাসীর জন্য এক অজানা রহস্য হয়ে আছে।

মুসলিম শহরগুলোতে মোঙ্গলদের ধ্বংসতাণ্ডব

মোঙ্গলদের উপদ্রবের যুগে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলো বেশ কয়েকটি ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন রাজ্যে বিভক্ত ছিল, যেটি ইসলামের উত্থানের শুরু থেকে তখন পর্যন্ত ৬০০ বছরের ইতিহাসে আগে কখনো ঘটেনি। ইসলামি খিলাফত তখন আব্বাসীয়দের হাতে। নামমাত্র আব্বাসীয় খলিফাদের রাজধানী ছিল বাগদাদে। খলিফা হারুন উর রশিদ, খলিফা মুতাসিম বিল্লাহ কিংবা খলিফা মামুন, মনসুর ও মুন্তাসিরদের পরাক্রম তখন কেবলই কিংবদন্তি। বাস্তবের আব্বাসীয় শাসকরা আধ্যাত্মিক কিংবা সামরিক, কোনো ক্ষেত্রেই পূর্বসূরিদের কাছেপিঠে ছিলেন না। বরং খিলাফতের কর্ণধাররা ততদিনে পারস্পরিক অন্তরকোন্দল এবং ভোগবিলাসে মত্ত হয়ে গেছে। এদিকে মোঙ্গলদের গ্রেট খান হিসেবে তখন আসনে ছিল মঙ্গে খান। তারই ভাই হালাকু তখন মধ্যপ্রাচ্যে মোঙ্গল বাহিনীর দায়িত্বে নিয়োজিত। বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হালাকু খান ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির কারণে সুনজরে দেখতেন না মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে। তার উপর মুসলিম শহরগুলোর সঞ্চিত রাশি রাশি ধনভাণ্ডার হালাকু খানকে ভেতর থেকে প্ররোচিত করেছিল মুসলমানদের আবাসভূমিগুলো বিরান করে দিতে।

মুসলিম রাজ্য হিসেবে মোঙ্গলদের প্রথম ভয়াবহতার শিকার হয় পারস্য ও মা-ওয়ারাউন-নাহারের[১] খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের শহরগুলো। স্বভাবসুলভ হিংস্রতায় তারা সেখানকার বসতভিটা জ্বালিয়ে দেয় এবং নির্মমভাবে লোকদের হত্যা করে। একইভাবে তাদের নির্মমতার নজরে পড়ে আব্বাসি খেলাফত। তাদেরকেও বরণ করে নিতে হয় খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের ভয়াবহ পরিণতি।

ইসলামি স্বর্ণযুগের প্রাণকেন্দ্র, জ্ঞান ও বিজ্ঞান নগরী, খলিফা হারুন উর রশিদের শহর বাগদাদকে হাজারও অভিধায় অভিহিত করলেও এর পরিচয় শেষ হবে না। অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত সুদীর্ঘ পাঁচশ বছর বাগদাদ ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে সমৃদ্ধ নগর। এই অর্ধ সহস্রাব্দে সম্পদ, প্রাচুর্য কিংবা জ্ঞান-গরিমায় বাগদাদের সমকক্ষ আর একটি শহরও খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু ১২৫৮ সালের দিকে স্বপ্নের এই শহরে আচমকা নেমে আসে ভয়ানক দুঃস্বপ্ন—মোঙ্গল। হালাকু খানের সেই মরুঝড়ে হঠাৎ করেই ধ্বংস হয়ে যায় প্রায় ১০ লক্ষ লোকের

[১] দরিয়ায়ে সাইহুন (সাইর নদী) ও দরিয়ায়ে যাইহুন (আমু দরিয়া)-এর মধ্যবর্তী অঞ্চলকে বলা হয় মা-ওয়ারাউন নাহার। এর শাব্দিক অর্থ নদীর ওপার। এই অঞ্চলের আধুনিক নাম ট্রান্স অক্সিয়ানা। ফারগানা, আশিজান, শাশ, সমরকন্দ, বুখারা, ফারাব, তিরমিয, নাসাফ, কাশগর ইত্যাদি শহর এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত।

আবাসভূমি তৎকালীন মেগাসিটি বাগদাদ। কী ঘটেছিল বাগদাদবাসীর ভাগ্যে? আসুন, ইতিহাসে ফিরে দেখি।

মোঙ্গলদের হাতে ধ্বংস হওয়া মুসলিম শহরগুলোর অন্যতম প্রধান শহর ছিল বাগদাদ। আইন জালুতের যুদ্ধের সূচনায় মোঙ্গলদের বর্বরতার এই অধ্যায়ে সুদীর্ঘকালের ইতিহাসবিজড়িত বাগদাদের নির্মম পরিণতি তুলনামূলক খানিকটা খুলে বলার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছি।

বাগদাদ ধ্বংসের পটভূমি

চেঙ্গিস খানের নাতি হালাকু খান তখন মধ্যপ্রাচ্যে মোঙ্গলদের নেতা। সেখানে তার শাসনাধীন মোঙ্গল সাম্রাজ্যের সাথেই ছিল আব্বাসি খিলাফতের সীমানা। পূর্বসূরিদের ঐতিহ্য হারিয়ে জৌলুসহীন আব্বাসীয় খিলাফত তখন নখদন্তবিহীন খলিফা মুস্তাসিম বিল্লাহর হাতে। খিলাফতের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও খলিফার দুর্বলতার এই সময়ে খুব স্বাভাবিকভাবেই ধুরন্ধর হালাকুর লোলুপ দৃষ্টি নিপতিত হল সম্পদশালী বাগদাদের দিকে। তবে সবকিছুর পরও বাগদাদের প্রতি হালাকুর এতটা তীব্র আক্রোশের মূল কারণ ছিল তার ধর্মীয় বিশ্বাস। বাগদাদ ম্যাসাকারের সময় বেছে বেছে মুসলমানদের হত্যা করার ঘটনা আমাদের এই দাবিকে আরও জোরালো করে; যদিও এটা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে, নিষ্ঠুর মোঙ্গলবাহিনীর বিভিন্ন হত্যাযজ্ঞ থেকে কোনো ধর্মীয় গোষ্ঠীই আসলে রক্ষা পায়নি। তবে হালাকুর বিষয়টি অন্যদের চেয়ে একটু ভিন্ন। কারণ যুগটা ছিল ক্রুসেডের যুগ। হালাকুর মা এবং তার একজন প্রভাবশালী স্ত্রী ছিল খ্রিস্টান; যদিও হালাকু নিজে বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী ছিল বলে অনেক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তবে সবচেয়ে বড় কথা, সেই সময়ে মুসলিমবিশ্বের কেন্দ্র বাগদাদকে ধূলিস্যাৎ করে দেয়ার অর্থ ছিল, রাজনৈতিকভাবে ইসলামকে পুরোপুরি পঙ্গু করে ফেলা।

হালাকুর বাগদাদ আক্রমণের গুঞ্জন ছুটল বাগদাদে। কাপুরুষ মুস্তাসিম বিল্লাহর কানে খবর যেতেই ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে তিনি তার সভাসদদের কাছে পরামর্শ চাইলেন। সেই সময় মুস্তাসিমের প্রধান উজির ছিল ইবনুল আলকেমি। সে পরামর্শ দিল, সেনাবাহিনীর সংখ্যা কমিয়ে ফেলার। কারণ হিসাবে সে দেখাল, যেহেতু যুদ্ধ করে হালাকুকে পরাজিত করা অসম্ভব, তাই অযথা এত বড় বাহিনী পুষে হালাকুর কুদৃষ্টিতে পড়ার কোনো মানেই হয়না। তারচেয়ে বরং খলিফার উচিত হবে, সৈন্য

সংখ্যা কমিয়ে হালাকুর আস্থা অর্জন করা এবং যে-কোনো মূল্যে তার সাথে সন্ধির চেষ্টা করা। ভয়ানক ব্যাপার হলো, এই আলকেমি মূলত ছিল মোঙ্গলদের গুপ্তচর। তৎকালীন মোঙ্গলদের কূটনীতির একটি জঘন্য দিক ছিল, কোনো সাম্রাজ্য আক্রমণ করার আগে সেই সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ কিছু মানুষকে ক্ষমতার লোভ দেখিয়ে হাত করে ফেলা। বাগদাদেও তারা সেটাই করেছিল ইবনুল আলকেমিকে দিয়ে। খলিফা হওয়ার স্বপ্নে বিভোর আলকেমির কুমন্ত্রণায় নির্বোধ মুস্তাসিম বোকার মতো সেই চপলবুদ্ধির কাজটি করে বসলেন।

বাগদাদে ধ্বংসযজ্ঞ

নগরবাসী কিছু বুঝে ওঠার আগেই হঠাৎ একদিন সাইমুম ঝড়ের মতো উড়ে এসে বাগদাদকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল হালাকুর সৈন্যরা। আরোপ করার হল দুর্দমনীয় আবরোধ। 'হয় আত্মসমর্পণ, নয়তো না খেয়ে মৃত্যু' এমন পরিস্থিতিতে সৈন্যসামন্তবিহীন মুস্তাসিম নগরের বাইরে গেলেন হালাকুর সাথে দেখা করতে। ঢাল তলোয়ারবিহীন মুস্তাসিমের সাথে কোনো সন্ধি করতেই রাজি হল না কুটিল হালাকু খান; বরং সে তাকে নির্দেশ দিল, অবিলম্বে নগরফটক খুলে দিতে। নির্বোধ খলিফা ফটক খুলে দেওয়ার পর বানের জলের মতো বাগদাদের ভেতর প্রবেশ করতে লাগল হালাকুর সৈন্যরা।

শুরু হল নির্বিচার হত্যাযজ্ঞ। সেই হত্যাযজ্ঞের নারকীয়তা বোধ হয় কারও পক্ষেই লিখে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। ঘরে, বাইরে, মসজিদে—যেখানে যাকে পাওয়া গেল— নারী, শিশু, বৃদ্ধ—নির্বিশেষে সবাইকে নির্মমভাবে হত্যা করল মোঙ্গলরা। শুধু মানুষ হত্যা করেই ক্ষান্ত হয়নি তারা, ধ্বংস করে ফেলল বাগদাদের বিখ্যাত ইলম-সাধনালয় দারুল হিকমাহও; যেখানে সঞ্চিত ছিল বিগত ৫০০ বছরে মানব-ইতিহাসের অর্জিত প্রায় সকল জ্ঞান। ধারণা করা হয়, বাগদাদের দারুল হিকমাহ লাইব্রেরিতে পায় ১০ লক্ষ বই সংগৃহীত ছিল। সবগুলো বইই নির্দয়ভাবে দজলা নদীতে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল জালিম হালাকু বাহিনী। সেই অমূল্য বইগুলো টিকে থাকলে মানব সভ্যতা এগিয়ে যাওয়ার জন্য হয়তো পরবর্তী আরও ৪০০ বছর অপেক্ষা করতে হত না।

একসময় লাশের বোটকা গন্ধে ভারী হয়ে এল বাগদাদের বাতাস। সেই বিশ্রী গন্ধে টিকতে না পেরে শহরের বাইরে চলে গেল হালাকু খান। তারপরও একাধারে ৪০

দিন চলল হত্যাযজ্ঞ। প্রায় পুরো জনসংখ্যা নির্মুল করে তবেই হালাকু খান তার অভিযানের সমাপ্তি ঘোষণা করল। ততদিনে আরব্য রজনীর স্বপ্নের বাগদাদ পরিণত হয়ে গেছে দুঃস্বপ্নের কোনো ভূতুড়ে নগরীতে।

বাতাসে লাখো মানুষের ছাই

ধারণা করা হয়, বাগদাদে প্রায় ২ থেকে ১০ লক্ষ মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল। পরিস্থিতির নারকীয়তা এতই ভয়াবহ ছিল যে, সেই ইতিহাস যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করার মতো কোনো মানুষ সেখানে জীবিত ছিল না। বিপুল পরিমাণ মানুষের রক্ত ও বইয়ের কালির দরুন কিছুদিনের জন্য বদলে গিয়েছিল দজলা ও ফোরাতে পানির রঙ।

বাগদাদের পতনকে শুধু ইসলাম কিংবা মুসলিম বিশ্বের দুর্ভাগ্যের ইতিহাস বলে বেঁধে রাখা মোটেও সমীচীন হবে না। বাগদাদে বিজ্ঞান ও দর্শনসহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর বিস্তারিত গবেষণা হতো, যেগুলো ছাড়িয়ে গিয়েছিল কোনো ধর্মীয় সীমারেখা। তাই বাগদাদ ধ্বংসের এই ঘটনা, গোটা মানবসভ্যতার জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। যে ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে মানব সভ্যতাকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল অটোম্যানদের উত্থান এবং ইউরোপের রেনেসাঁ পর্যন্ত।

বাগদাদের ধ্বংস কি শুধুই একটি নগরের পতন? নাকি আরও বেশি কিছু? অথচ বাগদাদ ধ্বংসের ঠিক ৪০ বছর আগে যখন চেঙ্গিস খান আব্বাসীয়দের প্রতিবেশী খোয়ারেজেম সাম্রাজ্য ধ্বংস করেছিল, ইতিহাস ঘাঁটলে বলতে হয়, তাতে আব্বাসীয়দের প্রচ্ছন্ন সমর্থন ছিল। কেননা তারা মনে করত, খোয়ারেজেম সাম্রাজ্যের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা তাদের আঞ্চলিক আধিপত্যের জন্য হুমকি। অথচ তারা একটিবারও ভাবেনি, এমন পরিণতি হতে পারে খোদ আমাদেরও। বরং ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে খোয়ারেজেমে সংঘটিত গণহত্যার চেয়েও ভয়ংকর ছিল বাগদাদের গণহত্যা। যেকোনো সভ্যতাই একসময় ধ্বংস হয়ে যায়; তবে সেই ধ্বংসের ইতিহাস থেকে শেখার আছে অনেক কিছু। অনাগত প্রজন্মের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায় সেই শিক্ষা। ধ্বংসের সময় বাগদাদে জ্ঞানীর অভাব ছিল না, মানুষের অভাব ছিল না, এমনকি অভাব ছিলনা সম্পদেরও। এত কিছু সত্ত্বেও কেন বাগদাদ এড়াতে পারল না তার করুণ পরিণতি? এই প্রশ্নের উত্তর আমাদের ভাবতে শিখিয়েছে অনেক কিছু।

পিপাসা মেটে না জালিমের

৬৫৬ হিজরিতে বাগদাদকে ধুলোয় মিশিয়েও ক্ষান্ত হয়নি হালাকু খান। জর্জীয় এবং আর্মেনীয় মিত্রদের নিয়ে প্রায় এক লাখ বিশ হাজার সেনা নিয়ে সে এগিয়ে চলে দিয়ারে বকরের সিলভান শহরের দিকে। শহরের শাসক আল-কামিল মুহাম্মদ আইয়ুবির নেতৃত্বে সিলভানের সেনারা প্রায় দুই বছর পর্যন্ত মোঙ্গলদের শক্ত অবরোধ মোকাবেলা করে। কিন্তু এর মধ্যে তার শহরের খাবার শেষ হয়ে যায়, ক্ষুধার তাড়নায় মারা পড়ে অধিকাংশ অধিবাসী। একসময় উপায় না পেয়ে হার মেনে নেয় তারা। বাহিরের কোনো সাহায্য না পেয়ে নিজেদের জন্য ডেকে আনে মৃত্যুর পরোয়ানা। শহর খুলে দিতেই হালাকু খান তার চিরাচরিত নিয়মে নির্মমতার চূড়ান্ত প্রদর্শন করে। এতটা নির্দয়ভাবে হত্যা করে শহরবাসীকে, যা ভাবতে গেলেও গায়ের পশম দাঁড়িয়ে যায়। শহরপতি আল-কামিল মুহাম্মদকে ধরে আনা হয় হালাকু খানের সামনে। সে তার শরীরের চামড়া কেটে তার হাতে তুলে দেয়। বলে, 'মৃত্যু পর্যন্ত এটা খেতে থাকবি।' আহত শরীরে শহরপতি হালাকুর নির্দেশ মানতে অপারগ হলে রাগে তরবারির এক কোপে হালাকু তার গর্দান ফেলে দেয়। এরপর অন্তরপ্রশান্তির জন্য শহরপতি আল-কামিলের কর্তিত মস্তক তরবারির আগায় তুলে ঘোরাতে থাকে।

ধ্বংসের এই ফেরিকারক এরপর হেঁটে যায় ঐতিহ্যের শহর আলেপ্পোর দিকে। টানা সাতদিন সেখানে পৈশাচিক কাণ্ড ঘটিয়ে ৬৫৮ হিজরির রবিউল আউয়াল মাসে সে দামেশকে প্রবেশ করে। এ সময় হঠাৎ কারাকোরামে মোঙ্গল সম্রাট মঙ্গো খানের মৃত্যুর সংবাদ আসে তার কাছে। পত্রে বলা হয়, সাম্রাজ্যের নতুন খান নির্বাচনের তাগিদে কুরিলতাইয়ে মোঙ্গলদের পরামর্শসভায় চেঙ্গিস খানের সকল উত্তরাধিকারদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। হালাকু যেহেতু মঙ্গোর ভাই এবং কুরসির অন্যতম একজন দাবিদার, তাই সে অনতিবিলম্বে তার বাহিনী নিয়ে কুরিলতাইয়ের দিকে যাত্রা করে। যাবার সময় শামে তার অন্যতম সেনাপতি কিতবুগা নয়ান নাসতুরির নেতৃত্বে বিশ হাজার সৈন্যের একটি সেনাদল ছেড়ে যায়।

৬৫৮ হিজরির ১৫ই রবিউল আউয়াল নয়ান দামেশকের শহরবাসীকে নিরাপত্তা প্রদানের চুক্তি দিয়ে শহরে প্রবেশ করে। কিন্তু শহরে ঢুকেই সে বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং ধ্বংসযজ্ঞ শুরু করে দেয়। সে-সময় শহরটির শাসক ছিলেন আন-নাসির ইউসুফ আল-আইয়ুবি। দামেশক দখলের পর মোঙ্গলরা শামের দক্ষিণ দিকের

শহরগুলোকে টার্গেট করে এগিয়ে যায়। দখল করে নেয় গাজা, বাইতুল মাকদিস, কির্ক এবং শোবাক নগরী।

মিশর আক্রমণ এবং ইতিহাসের সূচনা

মোঙ্গলদের ভয়ে সিরিয়া থেকে পালিয়ে তখন আক্রান্ত জনপদগুলি থেকে দলে দলে মানুষ আশ্রয় নিচ্ছিল মিশরে। এদিকে হালাকু খানের পরবর্তী পরিকল্পনা ছিল মিশর দখল করা। কেননা তখনকার সময়ে মিশর জয় করার অর্থ ছিল সমগ্র উত্তর আফ্রিকা জয় করে ফেলা। আর উত্তর আফ্রিকা থেকে জিব্রাল্টার হয়ে একবার স্পেনে ঢুকতে পারলে নিমিষেই ইউরোপকে পদানত করা যাবে। সেটি করতে পারলেই পূর্ণ হবে পিতামহ চেঙ্গিসের বিশ্বজয়ের স্বপ্ন। তাই মোঙ্গলদের পিতামহের স্বপ্নপূরণে তখন একমাত্র বাধা মিশর।

মিশরে তখন শাসন চলছে মামলুক সাম্রাজ্যের। মসনদে বসে আছেন ১৫ বছর বয়সী তরুণ শাসক মানসুর নুরুদ্দিন আলি। বাহরি মামালিকের শাসক সাইফুদ্দিন কুতুয তরুণ অনভিজ্ঞ মানসুরকে সরিয়ে আমির-অমাত্যদের পরামর্শে মিশরের ক্ষমতা হাতে নিয়ে নিলেন। মোঙ্গলদের অব্যাহত আক্রমণ এবং ক্রমশ মামলুকদের দিকে ধেয়ে আসা বিপদ ঠেকাতে এ সিদ্ধান্তের কোনো বিকল্প ছিল না। মিশরে তখন মুসলমানদের মানসিক অবস্থা একেবারে নড়বড়ে। সাইফুদ্দিন বুঝতে পারছিলেন, এমনটা বহাল থাকলে অপরাজেয় মোঙ্গলদের মোকাবেলা করা কিছুতেই সম্ভব হবে না। তাই ক্ষমতায় বসেই তিনি সকলের মনোবল ফিরিয়ে আনার সর্বোচ্চ চেষ্টা করলেন। বিলাদ-আশ-শামের সকল প্রতিপক্ষকে বিভিন্ন কায়দায় এক মঞ্চে এনে বসালেন। এসময় তার মতের পক্ষে একমত হয়ে তার সঙ্গে জোট করলেন ইসলামি ইতিহাসের আরেক নক্ষত্র রুকনুদ্দিন বাইবার্স আল-বান্দুকদারি। পরবর্তী সময়ে তাতারদের মোকাবেলায় যার রয়েছে নানান বীরত্বের গল্পকথা।

কুতুযের প্রতি হালাকুর চিঠি

সিরিয়া থেকে মিশর আক্রমণের পূর্বে হালাকু খান মোঙ্গলদের স্বভাবসুলভ 'হয় আত্মসমর্পণ, নয় ভয়াবহ মৃত্যু'—এই হুমকি দিয়ে চিঠি পাঠাল মিশর-সুলতানের কাছে। সেই চিঠিটির চুম্বকাংশ পাঠকের জন্য তুলে ধরছি, যাতে বোঝা যায়,

মোঙ্গলদের হুমকি আসলে কতটা 'পিলে চমকানো' হতো।

আমাদের তরবারির ভয়ে পালিয়ে যাওয়া মিশরের মামলুক সুলতান কুতুযের প্রতি পূর্ব ও পশ্চিমের সকল রাজার রাজাধিরাজ বিশ্বাধিপতি হালাকু খানের ফরমান—

'অন্যদেশগুলোর ভাগ্যে কী ঘটেছিল, তোমার সেটা চিন্তা করে আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করা উচিত। তুমি শুনেছ, কীভাবে আমরা বিশাল বিশাল সাম্রাজ্য জয় করেছি এবং বিশৃঙ্খলাময় দূষিত পৃথিবীকে পরিশুদ্ধ করেছি। আমরা বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড জয় করে সেখানকার সব মানুষকে হত্যা করেছি। তাই আমাদের আতংকের হাত থেকে তুমিও পালিয়ে বাঁচতে পারবে না, মনে রেখো।

তুমি কোথায় লুকাবে? কোন রাস্তা দিয়ে পালিয়ে যাবে? আমাদের ঘোড়াগুলো যেমন তেজি, আমাদের শরগুলোও তেমন তীক্ষ্ণ। আমাদের তরবারিগুলো বজ্রের মতো আর আমাদের হৃদয় পর্বতের মতো শক্ত। মরুবালুকার মতো আমাদের সৈন্যসংখ্যাও গুনে শেষ করার উপায় নেই। না কোনো দুর্গ আমাদের আটকাতে পারবে, না কোনো সৈন্যদল পারবে আমাদের রুখতে। তোমার আল্লাহর কাছে তোমাদের ফরিয়াদ আমাদের বিরুদ্ধে কোনো কাজেই আসবে না—লিখে নাও। কোনো শোকের মাতম আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করতে পারবে না, না কারও অশ্রু গলাতে পারবে আমাদের মন। শুধু যারা প্রাণভিক্ষা চাইবে, তারাই আমাদের হাত থেকে বাঁচতে পারবে।

যুদ্ধের দাবানল ছড়িয়ে পড়ার আগেই তোমার উত্তর পাঠিয়ে দিয়ো। কোনো প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করলে তার ফল হবে ভয়ঙ্করতম। আমরা তোমাদের মসজিদগুলো ভেঙে চুরমার করে ফেলব আর তোমাদের রবের দুর্বলতা সবার সমানে প্রকাশ করে দেব। তারপর তোমাদের শিশু-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সবাইকে হত্যা করব। মনে রেখো, এই মুহূর্তে তোমরাই আমাদের একমাত্র শত্রু।'

সাইফুদ্দিন কুতুয ভালভাবেই জানতেন, ইতিপূর্বে যারা বিনা যুদ্ধে মোঙ্গলদের ভয়ে আত্মসমর্পণ করেছিল, তাদের কী করুণ পরিণতি হয়েছিল। তাই কাপুরুষের মতো বিনা যুদ্ধে অপমানের সাথে মারা পড়ার চেয়ে তিনি চাইলেন এই বর্বর বাহিনীকে মোকাবেলা করতে। তাই হালাকু খানকে ক্রোধে অন্ধ করে দিতে সাইফুদ্দিন কুতুয তার চিঠির দারুণ জবাব দিলেন। তিনি হালাকুর দূতের শিরশ্ছেদ করে সেটাকে কাপড়ে মুড়িয়ে হালাকুর কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

পরবর্তী পদক্ষেপ

যুদ্ধ অবধারিত জেনে সাইফুদ্দিন কুতুয সাম্রাজ্যের নেতাদের ডেকে একত্র করলেন। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন মিশরের প্রধান ইসলামিক স্কলার শেখ ইজ্জউদ্দিন আব্দুস সালাম। তিনি তার বক্তব্যে সুস্পষ্টভাবে সুলতান কুতুযের এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানালেন এবং নেতাদের সকলকে কুতুযের সাথে যোগ দেওয়ার আহ্বান করলেন। কিন্তু নেতারা কুতুযের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে সম্মত হলো না। তারা উল্টো মোঙ্গলদের মোকাবেলার এই দুঃসাহসকে আত্মহত্যা হিসেবে ধরে নিয়ে একবাক্যে এর বিরোধিতা করল।

সুলতান সাইফুদ্দিন কুতুয তাদের এমন কাপুরুষতা দেখে দুঃখ পেলেন। তিনি দাঁড়িয়ে তাদের উদ্দেশ্যে বললেন: 'হে মুসলমানদের আমির-উমারাগণ, একটা দীর্ঘসময় তোমরা বাইতুল মালের সম্পদ ভক্ষণ করে এসেছ। আর আজকে সেই সাম্রাজ্য বাঁচানোর যুদ্ধে যেতে তোমাদের এত অনীহা? আমি যাচ্ছি যুদ্ধে। কেউ চাইলে এ জিহাদে আমার সঙ্গী হতে পারো, আর কেউ চাইলে তার বাসগৃহে ফিরে যেতে পারো। তবে সে যেন মনে রাখে, আল্লাহ তার ব্যাপারে সম্যক জানেন। অগ্রগামী মুসলমানদের কোনো ভুল, পেছনে বসে থাকা ভীতুদের ঘাড়ে গিয়েও বর্তাবে।'

সুলতান তার বক্তৃতা শেষ করতেই সেখানে হাজির হলেন সারিমুদ্দিন আযবেক ইবনু আবদুল্লাহ আল-আশরাফি। শামে মোঙ্গলদের সাথে যুদ্ধ করতে গিয়ে তিনি হালাকুর বাহিনীর হাতে বন্দি হয়েছিলেন। এরপর মুক্ত হয়েই তার সামান্য যা সেনা-সম্পদ, তা নিয়ে মিশরে মুসলমানদের যুদ্ধের কাতারে শরিক হতে চলে এসেছেন এখানে। তাকে দেকে সাইফুদ্দিন কুতুযের প্রেরণা বেড়ে গেল। রুকনুদ্দিন বাইবার্স এবং সারিমুদ্দিন আযবেককে সাথে পেয়ে তিনি বিজয়ের ব্যাপারে আরও খানিকটা আশাবাদী হয়ে উঠলেন।

ক্রুসেডারদের অবস্থান

নিজেদের শক্তির ভার আরও ভারী করে তুলতে মোঙ্গলদের ভারপ্রাপ্ত সেনাপতি কিতবুগা 'নয়ান নাসতুরি বাইতুল মাকদিসের ক্রুসেড সাম্রাজ্যে মৈত্রী-আহ্বান জানিয়ে একটি পত্র পাঠায়। কিন্তু খ্রিস্টান সাম্রাজ্যের প্রধান পোপ সাফ জানিয়ে

দেয়, মোঙ্গলদের সঙ্গ দেয়া এবং তাদের সাথে কোন মৈত্রী চুক্তি করা আমাদের জন্য ধর্মীয়ভাবে অবৈধ। এদিকে সিডনে ঘটে গেছে আরেক দুর্ঘটনা। কিতবুগার এক চাচাতো ভাইকে ক্রুসেড ফোর্সের অশ্বারোহীরা হত্যা করে ফেলেছে। ফলে মৈত্রীর চিন্তা পশ্চাতে ফেলে কিতবুগা চলে গেছে সিডনে। চাচাতো ভাইয়ের মৃত্যুর প্রতিশোধে অন্ধ হয়ে সে সিডনে ধ্বংসযজ্ঞের অবতারণা করেছে।

মোঙ্গলরা যখন সিডনে খ্রিস্টান নিধনে ব্যস্ত, তখন মিশরের সুলতান সাইফুদ্দিন কুতুয একরের ক্রুসেডারদের সাথে শান্তিচুক্তি সেরে নিয়েছে। মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে মিশরীয়দের এ যুদ্ধ শতভাগ সফল করতে তিনি তাদের অধিকৃত ভূমি ব্যবহারের অনুমতি চাইলে তারা তার দাবি-দাওয়া মেনে নিয়েছে। তিনি দাবি করেছেন, মোঙ্গলদের সাথে মিশরীয়দের এ যুদ্ধে তারা যেন নিরপেক্ষ থাকে। যদি পেছন থেকে তাদের কোনো ঘোড়া বা কোনো সেনা মুসলিম বাহিনীর কাউকে কষ্ট দেয়ার সামান্য চেষ্টা বা চিন্তা করে, তাহলে মোঙ্গলদের সাক্ষাত করার আগে মিশরের সেনারা খ্রিস্টানদের সাথে যুদ্ধ করবে আগে—এমন হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন সুলতান সাইফুদ্দিন কুতুয। খ্রিস্টানরাও বুঝতে পারে, এটা সময়ের দাবি। মুসলমানরা যদি তাদের কোনো সহযোগিতায় সর্বগ্রাসী মোঙ্গলদের নখর উপড়ে দিতে পারে, তাহলে তা দিনশেষে সকলের জন্যই উপকারী বটে। তাই তারা কুতুযের পথ আগলে না দাঁড়িয়ে পরোক্ষভাবে তাকে সমর্থন জোগাল। পরবর্তীতে তারা তাদের প্রতিশ্রুতিও রক্ষা করেছিল। মুসলিম বাহিনীর পেছনে স্বভাবসুলভ কোন কূটচাল সেবার তারা করার চেষ্টা করেনি।

মোঙ্গলদের যুদ্ধকৌশলে কুতুযের কৌশল

দুর্ধর্ষ মোঙ্গল বাহিনীর মূল শক্তি ছিল তাদের সেনাদের ক্ষিপ্রতা এবং দ্রুতগামী ঘোড়াগুলো। এছাড়া চলন্ত ঘোড়ার উপর থেকে তির ছুড়ে মারার বিশেষ দক্ষতা ছিল তাদের, যা তৎসময়ে ইউরোপ ও এশিয়ার অন্য সেনাবাহিনীগুলোর ছিল না। মোঙ্গলদের ধনুকগুলো হতো হালকা কিন্তু অসম্ভব শক্তিশালী। ফলে ঘোড়ার উপর চড়েও সহজেই সেগুলো নাড়ানো, বহন করা এবং ব্যবহার করা সম্ভব হতো।

মোঙ্গলরাদের আরেকটি স্ট্র্যাটেজি ছিল—পরপর অনেকগুলো সারিতে বিন্যস্ত না হয়ে ময়দানের ব্যাপ্তি হিসেবে যতটা সম্ভব পাশাপাশি দাঁড়িয়ে হামলা চালানো, যাতে সুযোগ বুঝে শত্রু বাহিনীকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলা যায়।

সুলতান সাইফুদ্দিন কুতুয মিশরের সমরবিদদের সাথে মোঙ্গলদের স্ট্রাটেজিক মাইন্ডের উপর গবেষণা করে বুঝতে পারলেন, চওড়া প্রান্তরে মোঙ্গলদের মুখোমুখি হওয়া মানে সাক্ষাৎ ধ্বংস ডেকে আনা। তাই তিনি মোঙ্গলদের আগে যুদ্ধ ক্ষেত্র পছন্দ করার সুযোগই দিতে চাইলেন না, বরং সিদ্ধান্ত নিলেন, নিজেই সৈন্য নিয়ে এগিয়ে যাবেন তাদের মোকাবেলা করার জন্য এবং যুদ্ধক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিলেন ফিলিস্তিনের তাবারিয়ার ঐতিহাসিক আইন জালুত প্রান্তর।

আইন জালুত প্রান্তরটি এর আগে থেকেই ঐতিহাসিকভাবে বিখ্যাত ছিল। কারণ, ওল্ড টেস্টামেন্টে ডেভিড ও গোলিয়াথের যে যুদ্ধের কথা বলা আছে, সেটাও অনুষ্ঠিত হয়েছিল এই আইন জালুত প্রান্তরেই।

যুদ্ধের জন্য যাত্রা

১৫ই শাবান ৬৫৮ হিজরি। মিশরের সুলতান সাইফুদ্দিন কুতুয কায়রোর আল-জাবাল দুর্গ থেকে বের হয়ে ফিলিস্তিনের গাজা অভিমুখে চলছেন। তার সামনে আছেন কিংবদন্তি সেনাপতি রুকনুদ্দিন বাইবার্স। সাথে আছে মিশর, শাম, আরব এবং তুর্কমানের সম্মিলিত সেনাদল। গাজায় তখন অবস্থান করছে কিতবুগার ভাই বাইদার। কিতবুগা তাকে পত্র পাঠিয়ে জানিয়ে দিয়েছে, মিশরের বাহিনী আসছে। বাইবার্স সেখানে পৌঁছে গাজার কাছেই একটি উপত্যকায় বাইদারের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। তাদেরকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে মুসলিম বাহিনী গাজা হয়ে সমুদ্রবর্তী পথ ধরে উত্তর ফিলিস্তিনের দিকে চলতে শুরু করে।

এ সময় কিতবুগা ছিল বালবেক শহরে। সে হিমসসহ আশপাশের নেতাদেরকে একত্র করে কী করা যায় মর্মে পরামর্শ চাইল। তাদের কেউ কেউ বলল, হালাকু খান আসা পর্যন্ত আমরা আপনার সামরিক কোনো সফলতা দেখছি না। আবার কেউ বলল, আপনার সেনাদল অপরাজেয় এবং অসংখ্য; আমাদের মনে হয়, আপনার যুদ্ধে নেমে যাওয়া উচিত, বিজয় আপনার সুনিশ্চিত। দ্বিতীয় পক্ষের কথায় কিতবুগা সম্মতি জানিয়ে বাহিনী নিয়ে মুসলিম বাহিনীর মোকাবেলার জন্য বের হয়ে গেল। কিতবুগার গোয়েন্দাদের দিকভ্রান্ত করে সাইফুদ্দিন পূর্বপরিকল্পনা মতো মোঙ্গলদের নিয়ে এলেন আইন জালুতের ময়দানে।

আক্রমণ

২৫শে রমাদান, ৬৫৮ হিজরি সন। ফিলিস্তিনের আইন জালুতে উভয় বাহিনী তখন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। সুলতান সাইফুদ্দিন কুতুয তাঁর বাহিনীকে সাজাতে লাগলেন। বাইবার্সের নেতৃত্বে একদল সিরীয় সেনা রাখলেন সম্মুখভাগে। বাকি সেনাদের পার্শ্ববর্তী টিলার পেছনে লুকিয়ে রাখলেন এবং নিজে একাংশ সেনা নিয়ে পেছনের উপত্যকার ওপাশে অবস্থান নিলেন। এরপর সেনাপতিদের সামনে ডেকে এনে তিনি তাদেরকে মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মনোবল ধরে রাখার উপদেশ দিলেন। অন্যান্য অধিকৃত অঞ্চলে মোঙ্গলদের চালানো তাণ্ডবের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাদেরকে কাপুরুষতার পরিণতি বোঝালেন। বললেন, আগুনে জ্বলে, শূলিতে চড়ে বা লাঞ্ছিত হয়ে মরতে না চাইলে মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে আজকে তোমাদের বিজয় ছাড়া উপায় নেই। শাম, ফিলিস্তিন এবং মিশরকে হালাকুর হাত থেকে বাঁচানোর গুরুত্বের কথা জানালেন। সকলে তার কথায় কান্নায় ভেঙে পড়ল। পরস্পরে চুক্তি ও একতাবদ্ধ হয়ে মোঙ্গলদের পরাজিত করে নিজেদের ভূমি থেকে চিরতরে তাড়ানোর প্রতিশ্রুতি নিল।

কুতুয শুরুতেই তার সব সৈন্যদের দিয়ে শক্ত আক্রমণ করালেন না, বরং প্রথমে ছোট একটি দল পাঠিয়ে মোঙ্গল বাহিনীকে প্ররোচিত করলেন। তাছাড়া তিনি জানতেন, তার সিরীয় সৈন্যরা আগেও একবার মোঙ্গলদের কাছে হেরে পালিয়ে এসেছে। তাই বিপদে পড়লে এরা আবারও পালাতে পারে এটা মাথায় রেখে পরিস্থিতি যত খারাপ হোক, যেন তারা পালাতে না পারে সেজন্য এদেরকে রাখলেন সবার সামনে।

শুরুতে মোঙ্গলদের প্রবল আক্রমণের মুখে কুতুযের সৈন্যদের অবস্থা ছিল টালমাটাল। বাইবার্সের সম্মুখ দল অনেকটা পেছনের দিকে সরে আসতে বাধ্য হলো। এ-সময় পূর্বপরিকল্পিত ফাঁদে মোঙ্গলরা আটকে গেল ধীরে ধীরে। উপত্যকার ওপাশে আক্রমণের জন্য ওঁৎ পেতে ছিলেন সাইফুদ্দিন কুতুযের বাহিনী। ওদিকে টিলার পেছনে বসে আছে আরেকদল এলিট ফোর্স। বাইবার্স ইচ্ছে করে পেছন দিকে সরতে সরতে মোঙ্গলদেরকে ফাঁদে এনে ফেললেন। অমনি কুতুয তার বাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসলেন। মোঙ্গলরা সিরীয় সৈন্যদের ভেদ করে ভেতরে প্রবেশ করার সাথেসাথে মুখোমুখি হল কুতুযের এলিট বাহিনীর। এদিকে সামনের সারির সিরীয় সৈন্যদের জন্য তাঁরা পিছিয়েও আসতে পারছিল না। তখনই টিলার দুই পাশ থেকে মোঙ্গলদের উপর নেমে আসল তিরবৃষ্টি। কিন্তু মোঙ্গলরা মুসলমানদের

আক্রমণ সামলে নিয়ে পাল্টা শক্ত হামলা করল মুসলিম বাহিনীর সম্মুখভাগে। কিতবুগার স্পেশাল ফোর্সের ভয়াবহ আক্রমণে মুসলমানদের বাম অংশ ভেঙে পড়ল। কিন্তু কেন্দ্র এবং ডান অংশ তখনো ময়দানে আছে। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে সুলতান কুতুয নিজের শিরস্ত্রাণ খুলে উঁচু জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে 'ওয়া ইসলামাহ!' বা 'হায় ইসলাম! হায় ইসলাম!'—বলে সৈন্যদের সাহস জোগালেন এবং সকলকে দেখিয়ে নিজেও ঝাঁপিয়ে পড়লেন, যাতে সুলতানের দেখাদেখি অন্যরাও আক্রমণের মনোবল ফিরে পায়।

এদিকে আইন জালুতের প্রান্তরটি সরু হওয়ায় মোঙ্গলরা তাদের পুরনো এবং চিরাচরিত কোনো কৌশল অবলম্বন করতে পারল না। ফলে মুসলমানদের সম্মিলিত আক্রমণে তাদের সেনারা বিক্ষিপ্ত হয়ে পালাতে শুরু করল। সামান্য সময়ের মধ্যেই ময়দান থেকে অধিকাংশ সেনারা পালিয়ে যেতে শুরু করলে কোনো কোনো মোঙ্গল সেনাপতি কিতবুগাকেও পালানোর পরামর্শ দেয়। কিন্তু সে বলে, 'আমি পরাজয়ের লাঞ্ছনা নিয়ে পালানোর লোক নই।' অল্প কিছু সেনা নিয়ে সে সামনে এগিয়ে যায়। ঐতিহাসিকদের মতে, আরিনান নামক এক মুসলিম সেনার সাথে এ-সময় কিতবুগার মোকাবেলা হয় এবং অল্প সময় পরেই পরাজিত হয়ে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। এরপর আরিনান কিতবুগার ধড় থেকে শির তুলে নেয়। সেনাপতির পরিণতি দেখেই ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে মোঙ্গল সেনাবাহিনী। পালিয়ে যেতে থাকে দিগ্বিদিক বিক্ষিপ্ত হয়ে। কুতুযের সৈন্যরা প্রায় ৬০০ কিলোমিটার তাড়িয়ে শেষ মোঙ্গল সৈন্যটিকেও হত্যা করে আসে। এভাবেই মামলুক সৈন্যদের কাছে পরাজয় ঘটে অহংকারী, বর্বর ও জালিম হালাকু বাহিনীর। নিমিষেই চূর্ণ হয়ে যায় তাঁদের আকাশছোঁয়া দম্ভ এবং ইতিহাসে মুসলমানদের নামে অঙ্কিত হয় এক যুগান্তকারী বিজয়।

কেন আইন জালুতের যুদ্ধ গুরুত্বপূর্ণ

পরাজয়ের খবর ছড়িয়ে পড়তেই শাম ছেড়ে পালায় মোঙ্গলদের সকল সেনা। সুলতান রুকনুদ্দিন বাইবার্সকে তাদের পেছনে পাঠান। আলেপ্পোর ভূমি পর্যন্ত তিনি দাবড়ে বেড়ান মোঙ্গলদের। এদিকে ২৭শে রমাদান সাইফুদ্দিন কুতুয দামেশকে প্রবেশ করেন। সেখানকার যাবতীয় অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে প্রয়োজনীয় সংশোধন করেন। প্রশাসনিক অবকাঠামো মজবুত করে যোগ্য লোকদের নেতৃত্বের আসনে

বসান। হিমসের অধিপতি আশরাফ নিরাপত্তা চাইলে তিনি তাকে হিমস ফিরিয়ে দেন। ইতিপূর্বে হালাকু খান তাকে হিমসের দায়িত্বে বহাল রেখেছিল। মানসুরকে তিনি হামা নগরী বুঝিয়ে দেন, সাথে মাআররা ও তার আশপাশের এলাকাগুলোও তার অধিকারে যোগ করে দেন।

মোটকথা, আইন জালুতে মোঙ্গলদের পরাজয়ে শামের রাজ্যগুলো সংহত হয়ে ওঠে এবং সাম্রাজ্যের গ্রোথগুলো মামলুকদের অধীনে একত্র হয়ে যায়, যা উসমানি সাম্রাজ্যের উত্থানের আগ পর্যন্ত পরবর্তী প্রায় ২৭০ বছর টিকে ছিল।

ওদিকে ঐতিহাসিকরা বলেন, মোঙ্গলরা তাদের অসুস্থ উত্থানের পর থেকে আইন জালুতের আগে কোনো যুদ্ধেই পরাজিত হয়নি। তবে এ ঘটনার পর শাম পুনরুদ্ধারে একবার সে তার ছেলে ইয়াশমুতকে প্রেরণ করেছিল। কিন্তু সেবার তার চিন্তা ও চেষ্টা পুরোপুরি নিষ্ফল হয়ে যায়। তারা শামের কোথাও গোপনে আনন্দভোজ করছিল, এমন সময় বাইবার্সের বাহিনী তাদের খোঁজ পেয়ে সেখানে পৌঁছে দেখে, সবকটা মাতাল হয়ে পড়ে আছে। দেরি না করে আলগোছে সবগুলোর মাথা কেটে ফেলে তারা; তবে মাত্র কয়েকজনকে বাঁচিয়ে রাখে হালাকুর কাছে সংবাদ পৌঁছে দেবার জন্য। এরপর হালাকুর ছেলের মাথা কেটে সেটা তার জন্য হাদিয়া হিসেবে প্রেরণ করে। এই পরাজয়ের সংবাদ এবং নিজের ছেলের কর্তিত মস্তক হালাকুর সামনে হাজির করা হলে বেঁচে ফেরা সেনাদের সবকটাকে হালাকু জবাই করে দেয়।

আইনজালুতের ঐতিহাসিক প্রান্তরে অবসান হয় মোঙ্গলদের অপরাজেয় মিথের। তাদের ভয়ে স্বদেশ থেকে পালাতে থাকা হাজার হাজার মানুষ একে একে আবার স্বদেশে ফিরে আসতে শুরু করে। এই পরাজয়ের পরও মোঙ্গলরা যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল; কিন্তু আর কখনোই আগের মতো দুর্জেয় মনোবল ফিরে পায়নি। শুধু মধ্যপ্রাচ্যের বিবেচনায় নয়, বরং পুরো পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধগুলোর মধ্যে একটি এই আইন জালুতের যুদ্ধ। কেননা এই যুদ্ধে সুলতান কুতুয হেরে গেলে উত্তর আফ্রিকা, স্পেন ও ইউরোপ পরিণত হত বাগদাদ, সমরখন্দ ও বেইজিং এর মত বধ্যভূমিতে। আদৌ মানব সভ্যতার ঐ ক্ষত সেরে উঠত কি না, সেই প্রশ্নের উত্তর কারও জানা নেই। তবে বর্বর মোঙ্গল বাহিনীকে রুখে দেওয়ার অনন্য কীর্তির প্রতিদান হিসাবে যে বিশ্ববাসী চিরকাল সুলতান সাইফুদ্দিন কুতুযকে মনে রাখবে, সেটা বলে দেওয়া যায় নিঃসন্দেহে।

অ্যাক্রে বিজয়

SIEGE OF ACRE

(1289-1291)

সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি রহিমাহুল্লাহ ক্রুসেডারদের সবগুলো রাজ্য দখলে নিলেও অ্যাক্রে বিজয়ের পূর্বেই তার মৃত্যু এসে যায়। এরপর এই অ্যাক্রে হয়ে ওঠে এতদাঞ্চলে ক্রুসেডারদের একমাত্র ষড়যন্ত্র-ঘাঁটি। বেশ কয়েক বছর ধরে তারা এখানে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে নানারকম চক্রান্ত করে চলেছে। কালপরিক্রমায় এ অঞ্চলের ক্ষমতায় আসেন মামলুক সুলতান সাইফুদ্দিন কালাউন।[১]

সাম্রাজ্যের মসনদে বসেই তিনি বুঝতে পারেন, অ্যাক্রে নগরী দখল না করলে তারা একসময় মামলুক সাম্রাজ্যের জন্য বিরাট হুমকি হয়ে উঠবে। তাই দেরি না করে তিনি ১২৮৯ সালের শুরুর দিকে ক্রুসেডশাসিত ত্রিপোলির দিকে অভিযান চালিয়ে সেটা দখল করে নেন। পরের বছরই সেনাবাহিনী নিয়ে অ্যাক্রের দিকে এগিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু যাত্রা শুরু করার পূর্বেই অকস্মাৎ তার মৃত্যু এসে যায়। বাবার মৃত্যুর পরপর ক্ষমতায় আসেন ছেলে আল-আশরাফ খলিল।[২] তিনি পূর্ব

[১] আল-মানসুর সাইফুদ্দিন কালাউন আল-আলফি আস-সালিহি (১২২২-১২৯০ খ্রি.)। মামলুক সাম্রাজ্যের উপকূলীয় অঞ্চলের প্রসিদ্ধ সুলতান। তিনি সুলতান সালিহ আইয়ুবের (প্রসিদ্ধ শাজারাতুদ দুরের স্বামী, সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবির পিতা নন) বংশধর ছিলেন। ৬৭৮ হিজরির (১২৭৯ খ্রি.) রজবের ১১ তারিখে তিনি বদরুদ্দিন সুলামিশের স্থলাভিষিক্ত হয়ে সালতানাতের ক্ষমতায় আসে। শাসক হিসেবে তিনি ছিলেন যথেষ্ট যোগ্য এবং সামরিক নেতা হিসেবে খুবই দক্ষ। তার আমলে মামলুক সাম্রাজ্য অনেকখানিই বিস্তার লাভ করে। তার শাসনকাল ১২৯০ পর্যন্ত মোট ১১ বছর স্থায়ী হয়। তার নামের সাথে আলফি শব্দ যোগের কারণ হলো, তার উসতাদ আল-আমিন আলাউদ্দিন তার যোগ্যতা ও গুণ দেখে এক হাজার দিনার (আলফ দিনার) দ্বারা তাকে ক্রয় করেছিলেন। সেই থেকে তাকে আলফি নামেও স্মরণ করা হয়।

[২] আল-আশরাফ সালাহুদ্দিন খলিল (১২৬৭-১২৯৩ খ্রি.)। বাবা সাইফুদ্দিন কালাউনের মৃত্যুর পর মাত্র তিন বছরের জন্য সালতানাতের মসনদে আসীন হন। সুলতান হিসেবে যথেষ্ট যোগ্য হলেও অল্প সময়ের ব্যবধানে ইস্কান্দারিয়ার কাছাকাছি একটি অঞ্চলে তার মৃত্যু হয়ে যায়। তিনি মামুলক সালতানাতের উপকূলীয় এলাকার অষ্টম সুলতান ছিলেন। তার উল্লেখযোগ্য কর্মের প্রথমেই বিবেচিত হয় অ্যাক্রে নগরীর বিজয়। এছাড়াও তিনি শামের বেশকিছু ক্রুসেড কেল্লা মুসলিম সাম্রাজ্যের অন্তর্গত করতে সক্ষম হন।

থেকেই সবকিছু জানতেন। মসনদে বসেই তিনি বাবার সিদ্ধান্তের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে অ্যাক্রে জয়ের যাত্রা অব্যাহত রাখার হুকুম দেন। প্রথমে তিনি অ্যাক্রের নাইটনেতা উইলিয়াম অব বুজিকে পত্র লিখে জানান, 'আমরা অ্যাক্রে আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিয়েছি; ভালো হবে, যদি আপনি কোনো হাদিয়া-উপঢৌকন পাঠিয়ে কুচক্রের চেষ্টা না করেন। কারণ, মনে হয় না আপনার এমন প্রচেষ্টা আমাদেরকে হামলা থেকে বিরত রাখতে পারবে।'

এর আগেও একবার নাইটরা কায়রোতে বিভিন্ন উপহারসামগ্রী পাঠিয়ে মামুলকি সুলতানকে আক্রমণ না করার অনুরোধ করেছে, তাই আল-আশরাফ খলিল আগ থেকেই তাদের জানিয়ে রাখলেন, এ-জাতীয় কোনো চেষ্টা সফল হবে না এবার। তিনি বরং হামলার জন্য সেনা ও সরঞ্জাম গোছানো শুরু করলেন। মিশর এবং শাম থেকে নিয়মিত সেনাদের একত্র করা হলো। সেখানে যোগ দিল বহু স্বতঃস্ফূর্ত জনগণ। দুর্গ ভাঙার প্রয়োজনে নেয়া হলো ছোট বড় প্রায় ৯২টি মিনজানিক। পাথর নিক্ষেপের বড় বড় বেশকিছু যন্ত্র, যার কোনোটা মানসুরি, আবার কোনোটা গাযিবা নামে তৎকালে প্রসিদ্ধ ছিল। দেয়াল ধ্বসানোর জন্য নিয়েছিলেন আরও কিছু বিশালদেহী মেশিনারি।

সিরিয়ার সেনারা বের হয়ে প্রথমে উপকূলীয় একটি দুর্গের পাশে যাত্রাবিরতি করেন। সেখানে তাদের সাথে মিশরীয় বাহিনী নিয়ে যোগ দেন সুলতান আল-আশরাফ খলিল। তার সাথে ছিল মোট চারটি বাহিনী, যার নেতৃত্বে ছিলেন চারজন বিশিষ্ট সেনাপতি। দামেশকের বাহিনীর দায়িত্বে ছিলেন হিসামুদ্দিন লাজিন, হামার বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন মুজাফফর তকিউদ্দিন, ত্রিপোলির সেনাদের প্রধান ছিলেন সাইফুদ্দিন বলবন এবং কির্কের সেনাদলের নেতা হিসেবে ছিলেন বাইবার্স আদ-দাওয়াদার। এ বাহিনীতে আবুল ফিদা নামের আরও একজন ইতিহাসখ্যাত সেনাপতি ছিলেন।

অ্যাক্রেয় থাকা ক্রুসেডাররা আগে থেকেই বুঝতে পেরেছিল, পরিস্থিতি সুবিধার না। তারা বেশ কিছুদিন ধরেই ইউরোপের রাজাদের কাছে সাহায্যের জন্য ধর্ণা দিয়ে বেড়াচ্ছিল, কিন্তু ইংল্যান্ডের রাজা এডওয়ার্ডের কজন অশ্বারোহী ছাড়া তাদের কাছ থেকে উল্লেখযোগ্য কোনো সহায়তা লাভ করেনি এরা। এ-ছাড়া বলার মতো একমাত্র সহযোগিতা ছিল সাইপ্রাসের রাজা দ্বিতীয় হেনরির কাছ থেকে। তিনি অ্যাক্রের দুর্গের দেয়াল শক্তকরণের খরচ এবং আপন ভাই আমালরিকের নেতৃত্বে একটি সেনাদলও প্রেরণ করেছিল। এদিকে অ্যাক্রেয় প্রবেশের পথটি ছিল দুটি

সরু প্রাচীরে ঘেরা। ইউরোপিয়ান রাজাদের সহযোগিতায় ইতিপূর্বে সেখানে নির্মিত হয়েছিল প্রায় বারোটি উঁচু মিনার। প্রতিটি মিনারের জন্য আলাদা আলাদা সুরক্ষা বাহিনী নির্ধারিত থাকত।

অবরোধ

সুলতান আল-আশরাফ খলিল কায়রো ছাড়েন ১২৯১ সালের মার্চের ৬ তারিখ। পূর্ণ এক মাস পর এপ্রিলের পাঁচ তারিখে তার বাহিনী অ্যাক্রের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। সুলতানের জন্য টানানো হয় লাল রঙের তাঁবু। উপকূলমুখী অ্যাক্রের মিনার বরাবর সেনারা তাদের শৃঙ্খলামতো সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। প্রাচীরের পাশ থেকে বাহিনীর বিস্তৃতি সমুদ্রের তীরে গিয়ে ঠেকে। হামার সেনারা সাগরতীরে নিরাপত্তার জন্য বণ্টিত হয়। পরদিন সকাল থেকে মিনজানিক, গোলা এবং পাথর নিক্ষেপের যন্ত্রগুলো লক্ষ্য বরাবর স্থাপন করা হয়। শুরু হয় আগুনের গোলা আর বিশালকায় পাথর নিক্ষেপ। তিরন্দাজরা অনবরত বৃষ্টির মতো দুর্গের রক্ষীবাহিনীর উপর তির ছুড়তে শুরু করে।

এভাবে কেটে যায় দীর্ঘ আটটি দিন। এরপর মুসলিম সেনারা সারিবদ্ধভাবে আপাদমস্তক বিশেষ বর্ম গায়ে জড়িয়ে কেল্লার ভেতরে ঢুকতে শুরু করে। ক্রুসেডাররা নানাভাবে বাধা দেয়ার চেষ্টা করলেও মুসলিম সেনারা অধিক হওয়ায় এবং তাদের বর্মগুলো দুর্ভেদ্য হওয়ায়—খুব একটা সুবিধে করতে পারে না। নিরবচ্ছিন্নভাবে সুলতানের সেনারা এগোতে থাকে। তাদের সবার হাতে দেখা যায় এক ধরনের বিশেষ অস্ত্র, যা দ্বারা তৎক্ষণাৎ আগুন জ্বালানো যেত। যেতে যেতে তারা বিভিন্ন জায়গায় তা দিয়ে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছিল। ক্রুসেডাররা এটাকে কারাবোহা বলে নাম দিয়েছিল পরে। তাদের ভাষ্যমতে, মুসলমানদের মিনজানিকের চেয়ে এই ক্ষুদ্র অস্ত্র তাদের জন্য ভারী হয়ে উঠেছিল। এটা তাদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধন করেছে বলে তারা মনে করে। আশ্চর্য এই অস্ত্রের উপস্থিতি ক্রুসেডারদের মনে মুসলমানদের প্রতিরোধে এগোতে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে। এই ফাঁকে মুসলমানরা তাদের দুর্গপ্রাচীরের দুর্বল জায়গাগুলোতে আগুন জ্বালিয়ে ছিদ্র করে ফেলে।

এদিকে সাইপ্রাস থেকে অ্যাক্রের ক্রুসেডারদের কাছে যে সাহায্য আসার কথা ছিল, তা সমুদ্রপথে আসা ছাড়া দ্বিতীয় কোনো রুট ছিল না। আটকে পড়া ক্রুসেডাররা ততদিনে নিশ্চিত হয়ে গেছে, তাদের দ্বারা মুসলিম বাহিনীর গতিরোধ করা সম্ভবপর

নয়। তাই পনেরো এপ্রিল, নাইটদের একটি দল হিম্মত করে গোপনে পৌঁছে চাঁদের আলোয় গেল বন্দরের কাছে। সেখানে মুসলিম বাহিনীর হামার সেনাদলের উপর অতর্কিত হামলে পড়ল তারা। একটি পাথর নিক্ষেপের যন্ত্রে আগুন জ্বালিয়ে দিল। কিন্তু ভাগ্যের অসঙ্গতি তাদেরকে পালাতে দিল না। ঘোড়ার পায়ে তাঁবুর কাপড় জড়িয়ে গেলে মুসলিম সেনাদের ঘুম ভেঙে গেল। উঠেই তারা আগন্তুকদের টুটি চেপে ধরল। কতক জায়গায় মারা পড়ল, কতক ধরা পড়ল এবং বাকি কজন পালিয়ে যেতে সক্ষম হলো। এর কিছুদিন পর আবারও কিছু নাইট রাতের অন্ধকারে মুসলিম বাহিনীকে ঝটিকা আক্রমণ করেছিল, কিন্তু সেবারও তারা পুরোপুরি ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে। সেনারা ব্যাপারটা ধরে ফেলে, পরস্পরে মশাল জ্বেলে তাদেরকে ধাওয়া করলেই তারা পড়ি-মরি করে পালিয়ে চলে আসে।

৪ঠা মে সাইপ্রাস থেকে সরাসরি রাজা দ্বিতীয় হেনরি বন্দরে এসে হাজির হলো। এতে অবরুদ্ধ ক্রুসেডাররা যেন খানিক আশা ও সাহস ফিরে পেল। হেনরি সাথে করে চল্লিশটি জাহাজ বোঝাই সেনা ও রসদ নিয়ে এসেছিল। মুসলিম বাহিনী তার প্রতিরোধে দাঁড়ালে দীর্ঘক্ষণ উভয় বাহিনীতে সংঘাত চলতে থাকে। একপর্যায়ে হেনরি বোধ করে, সুলতান আল-আশরাফ খলিলের তুলনায় তার সরঞ্জামে ঘাটতি আছে। ফলে সে দুর্গে খবর পাঠায়, সুলতানের সাথে কোনোভাবে সন্ধি করে যেন তাদেরকে ভেতরে যাবার ব্যবস্থা করা হয়। সে-মতে দুর্গ থেকে দুজন লোক সুলতানের তাঁবুতে আসে। তার কাছে শান্তি ও সন্ধির আবেদন করে। কিন্তু সুলতান বলেন, 'শহরের চাবিগুলো আমার হাতে এনে দাও, আমি কোনো ঝামেলা করব না।' তারা এতে রাজি হয় না। বলে, 'আমরা তো আত্মসমর্পণ করতে আসিনি; আমরা এসেছি যুদ্ধবিরতি বা শান্তিচুক্তি করতে।' সুলতান বলেন: 'এখানে শহরবাসী দুজন লোক কোনো গুরুত্ব রাখে না, গুরুত্ব রাখে কেবলই শহর এবং শহরের চাবিগুলো।' তারা নানা কথায় সুলতানের মন গলাতে চেষ্টা করছিল, এমন সময় দুর্গ থেকে একটি প্রকাণ্ড পাথর সুলতানের তাঁবুর পাশে এসে পতিত হয়। সুলতান বুঝে ফেলেন, তাদেরকে অমনোযোগী করে মারার ফন্দি করেছে এরা। তিনি তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠেন। দূতদ্বয়কে মেরে ফেলার নির্দেশ দিবেন, তখনই সানজার নামের সম্ভ্রান্ত এক আমির সুলতানকে নিবৃত্ত করেন এবং সুপারিশ করে দূতদেরকে জীবিত ফেরার সুযোগ করে দেন।

বিজয়ের ক্ষণ

৮ই মে সকাল বেলা। দুর্গের মিনারগুলো বরাবর একের পর এক গোলা উড়ে আসতে লাগল মুসলিম বাহিনীর মিনজানিকগুলো থেকে। বিভিন্ন নামে প্রসিদ্ধ মিনারগুলো মিনজানিকের আঘাতে ধসে ধসে পড়তে থাকল। ১৭ তারিখ পর্যন্ত দুর্গের প্রাচীর, মিনার এবং অন্যান্য শক্ত অংশগুলো গুঁড়িয়ে দিলে মুসলিম বাহিনী এবার চূড়ান্ত আক্রমণের চিন্তা করে এগোতে থাকলেন। ওদিকে প্রধান ফটকে তাদের প্রতিরোধের জন্য দাঁড়িয়ে গেল ক্রুসেড সেনারাও। ১৮ই মে, শুক্রবার। ফজরের পরপর দুর্গে ভেসে এল মুসলমানদের রণদামামার আওয়াজ। এদিকে মুসলিম সেনারা দলে দলে পালাবদলে দুর্গের প্রাচীরের পাশে মার্চ করতে লাগল। ওদিকে প্রায় তিনশোটি উটে তিনশোটি দামামা একত্রে গুঞ্জরিত করে তুলল পুরো পরিবেশ। সুলতানের উদ্দেশ্য ছিল, এভাবে ক্রুসেডারদের মনে যুদ্ধের আতঙ্ক তৈরি করা।

দ্বিপ্রহরের দিকে সুলতানের নির্দেশে মুসলমানদের কয়েক সেনাদল একযোগে তাকবির দিতে দিতে দুর্গের প্রধান ফটকের দিকে এগিয়ে যায়। সেনপাতিরা শুভ্র সফেদ পাগড়ি পরে নিলেন, সেনারা যার যার অস্ত্র হাতে নিয়ে দুর্গে প্রবেশ করতে গেলে রক্ষীবাহিনীর সাথে তাদের কয়েক দফা সংঘর্ষ হলো। তারা খানিক পেছনে সরে এলেন। কিন্তু মুসলিম সেনাদের তরবারিতে যেন আগুন ঝলকে উঠল, তারা চূড়ান্ত এক আঘাতে রক্ষীদলকে পরাস্ত করে শহরের রাস্তাগুলো নিজেদের দখলে নিয়ে নিলেন। সেখানে বিক্ষিপ্তভাবে ক্রুসেড সেনাদের সাথে তাদের রক্তক্ষয়ী লড়াই হলো। দুর্গপতি উইলিয়াম নিহত হলো। ক্রুসেডদলের অন্যান্য সেনাপতিরাও গুরুতর আহত হয়ে কেউ ভেতরে, কেউ-বা বের হয়ে হেনরির জাহাজে উঠে গেল। অ্যাক্রের মিনারগুলোতে উঠে এল মুসলমানদের পতাকা। দূর থেকে হেনরি সেগুলো দেখেই জাহাজের নোঙর তুলে নিল। ততক্ষণে তার বিশ্বাস হয়ে গেছে, সুলতানের সাথে ক্রুসেডারদের পেরে ওঠার কোন সম্ভাবনা আর নেই। তার জাহাজগুলো মুখ ফিরিয়ে সাইপ্রাসের দিকে ঢেউ ঠেলে এগোতে থাকল; যদিও পরবর্তীতে ক্রুসেড রাজ্যে হেনরিকে কাপুরুষ, ভীরু ইত্যাদি অপমানসূচক শব্দ শুনতে হয়েছিল।

পুরো শহরে ছড়িয়ে গেল মুসলমানদের ভয়। সুলতানের সেনারা টহলে দাঁড়াল শহরের সড়কগুলোতে। সাধারণ জনতা ও কতিপয় ক্রুসেডার কোনোমতে দৌড়ে গেল সমুদ্রের পাড়ে, কোনো জাহাজ যদি তাদের পার করে দেয় এবারের মতো।

কিন্তু সেখানে যেন রক্ষা করার মতো কেউ নেই। জীবন বাঁচাতে কেউ সাঁতরে, কেউ দৌড়ে এদিক ওদিক ছুটতে লাগল। বিশাল সমুদ্র কাউকে চিরতরে খেয়ে নিল, কেউ-বা একটু পরেই ভেসে ওঠল নিষ্প্রাণ দেহের ভার খুইয়ে। এদিকে যারা কিছু সম্পদ ও স্বর্ণকড়ি নিয়ে বেরোতে পেরেছিল, তাদেরকে ফকির বানাতে দূর থেকে লক্ষ করে বন্দরে নোঙর করে ইতালিয়ান এডভেঞ্চার রজার দি ফ্লোরের জাহাজ। চড়া মূল্যে সম্পদশালী কিছু লোককে তারা প্রাণে বাঁচিয়ে নেয়; সুযোগে হাতিয়ে নেয় যার কাছে যা ছিল—সব।

রাত নেমে আসার আগেই, শহরের পুরোটা মুসলমানদের হাতে চলে এল। তবে তখনো উপকূলের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে টেম্পলারদের একটি ছোট্ট দুর্গ তাদের হাতে আসা বাকি রয়ে যায়। খ্রিস্টানদের হাতে বিগত ১০০ বছরের শাসনের পর ৪৪ দিনের ধারাবাহিক যুদ্ধ শেষে, অ্যাক্রে মুসলমানদের হস্তগত হয়।

বিজয়ের এক সপ্তাহ পর উপকূলের সেই দুর্গপতি পিটারের সাথে দেখা করেন। তাকে দুর্গ ছেড়ে দিতে বললে সে শর্ত দেয়, তার সেনাদেরকে নিরাপদে সমুদ্র পার হয়ে সাইপ্রাসে যেতে দিতে হবে। কিন্তু সুলতানের সেনারা দুর্গের অভ্যন্তরে পৌঁছলে পিটারের সেনাদের সাথে তাদের কথা কাটাকাটি হয় এবং এক পর্যায়ে তারা সুলতানের সেনাদেরকে হত্যা করে ফেলে। তে নতুন করে যুদ্ধের সূচনা হয়।

রাত নেমে এলে টেম্পলারদের একদল কিছু সম্পদ সাথে করে সিডনের পথে পালিয়ে যায়। এদিকে পিটার পালানোর সুযোগ না পেয়ে বাধ্য হয়ে সন্ধির জন্য সুলতানের কাছে এলে সুলতান তাকে আটকে ফেলেন এবং তার সেনাদের কেন হত্যা করা হলো, সে ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন। দুর্গে পিটারের সেনারা তার জন্য অপেক্ষায় ছিল। সময় বয়ে যায়, কিন্তু পিটারের কোনো খোঁজ না পেয়ে তারা বিচলিত হয়ে ওঠে।

২৮শে মে সুলতানের দক্ষ একদল সেনা দুর্গের একপাশ খুঁড়ে গর্ত করে ফেলে। সেখান দিয়ে সুলতান তার শক্তিশালী দুই হাজার সেনা দুর্গে ঢুকিয়ে দেন। তারা ভেতরে ঢুকেই টেম্পলারদের একনাগাড়ে হত্যা করতে থাকেন। ওদিকে নির্মাণদক্ষ মুসলিম সেনারা দুর্গের দুর্বল জায়গাগুলোতে কুঠারাঘাতের কাজ চালিয়ে যেতে থাকে। ভেতরে সব সেনাদের হত্যা করা হয়ে গেলে সুলতানের সৈন্যরা বাইরে বের হয়ে যায়। এর অল্প কিছুক্ষণ পরেই দুর্গটি একেবারে খুঁটির উপর ধসে পড়ে যায়।

বিজয়ানন্দ

কায়রো থেকে দামেশক, প্রত্যেকটা ঘরে সুলতানের বাহিনীর বিজয়সংবাদ পৌঁছে যায়। শহরগুলো সেনাদের অভিবাদনের সেজে ওঠে। সুলতান খলিল বন্দি ক্রুসেডারদের শেকলে বেঁধে টানতে টানতে শহরে প্রবেশ করেন। পুরো মুসলিম বাহিনীতে বিজয়ের পতাকা পতপত করে উড়তে থাকে। লোকেদের ঘরে ঘরে আনন্দের জোয়ার নেমে আসে। তাদের ঘোড়ার খুরগুলোর নিচে রেশমের চাদর বিছিয়ে দেয়া হয়। সুলতান শহরে এসেই তার সম্মানিত বাবার কবরের পাশে গিয়ে দাঁড়ান। সেখানে দাঁড়িয়ে অশ্রুসিক্ত নয়নে বাবার স্মৃতিচারণ করেন। এরপর তিনি শহরের সবচে বড় দুর্গের মিনারে দাঁড়িয়ে শহরবাসীর উদ্দেশ্যে কথা বলেন। বন্দিদের বাঁধন খুলে তাদেরকে ছেড়ে দিতে নির্দেশ দেন এবং অ্যাক্রে থেকে সেন্ট এন্ড্রে পেট্রাস ক্যাথেড্রালের প্রধান ফটকটি তুলে কায়রোতে নিয়ে আসার হুকুম জারি করেন। তিনি সেটাকে মসজিদে রূপান্তর করবেন বলে ভেবে রেখেছিলেন।

উসমানি যুগ

৬৯৮-১৩৪১ হি.

১২৯৯-১৯২৩ খ্রি.

কসোভো যুদ্ধ
BATTLE OF KOSOVO

তারিখ:	৭৯১ হিজরি / ১৩৮৯ খ্রি.
স্থান:	কসোভো
ফলাফল:	মুসলিম বাহিনীর বিজয়

পক্ষ-বিপক্ষ:	উসমানি সাম্রাজ্য	সার্বিয়া, বসনিয়া এবং বুলগেরিয়ার সম্মিলিত বাহিনী
সেনাপ্রধান:	সুলতান ১ম মুরাদ	সার্বিয়ার সম্রাট লাজার রেবেলয়ানোভিচ
সেনাসংখ্যা:	২৭ হাজার (মতান্তরে ৪০ হাজার)	১২ হাজার (মতান্তরে ৩০ হাজার)
ক্ষয়ক্ষতি:	নির্দিষ্ট করে জানা যায় না	ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি

৭৯১ হিজরি মোতাবেক ১৩৮৯ খ্রিস্টাব্দে সুলতান প্রথম মুরাদের[১] আমলে সংঘটিত উসমানি সাম্রাজ্যের অন্যতম প্রধান যুদ্ধ হিসেবে পরিচিত কসোভো যুদ্ধ। সার্বিয়ান শাসক লাজারের নেতৃত্বে আসা বসনিয়া, সার্বিয়া এবং বুলগেরিয়ার ক্রুসেড জোট শক্তির বিরুদ্ধে উসমানীয়দের গুরুত্বপূর্ণ এ যুদ্ধে উভয়পক্ষের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়।

পটভূমি

সিংহাসনে বসে আছেন উসমানি সাম্রাজ্যের তৃতীয় সম্রাট সুলতান প্রথম মুরাদ। তাকে চিন্তিত দেখে এগিয়ে এলেন তার রাজ্যের প্রধান উজির। শোনা যায়, এই উজির মহোদয়ের সাথে সবসময় একটি কুরআন শরিফ দেখা যেত। কর্মে ও গুণে

---

[১] প্রথম মুরাদ (২৯ জুন ১৩২৬, আমাসিয়া–১৫ জুন ১৩৮৯, কসোভো যুদ্ধক্ষেত্র)। তুর্কি ভাষায় তার পূর্ণ নাম ছিল: I. Murat Hüdavendigâr। ডাকনাম: خداوندگار (খোদাওয়ান্দিগার) অর্থ: খোদাভক্ত। ছিলেন উসমানীয় সুলতান। ১৩৬২ থেকে ১৩৮৯ সাল পর্যন্ত বিশাল উসমানি সাম্রাজ্য শাসন করেছেন। তিনি পূর্ববর্তী শাসক প্রথম ওরহানের পুত্র হিসেবে উত্তরাধিকারসূত্রে ক্ষমতা লাভ করেছিলেন। শাসনকালে তিনি এড্রিনোপল জয় করেন। জয়ের পর তিনি শহরটির নাম রাখেন এদির্ন। ১৩৬৩ সালে এই শহরে তিনি উসমানীয় সালতানাতের নতুন রাজধানী স্থাপন করেন।

এরপর বলকান অঞ্চলের অধিকাংশ জয় করে তিনি দক্ষিণপূর্ব ইউরোপে উসমানীয় সীমানা বৃদ্ধি করেন। তার আমলে উত্তর সার্বিয়া ও বুলগেরিয়ার রাজা এবং সেই সাথে বাইজেন্টাইন সম্রাট পঞ্চম জন পেলাইওলোগোস উসমানি সাম্রাজ্যকে কর দিতে বাধ্য হয়। প্রশাসনিক কারণে মুরাদ সালতানাতকে দুইটি প্রদেশে ভাগ করেছিলেন। একটি হল আনাতোলিয়া (এশিয়া মাইনর) এবং অন্যটি হল রুমেলিয়া (বলকান)। সার্বীয়দের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সময় ১৫ই জুন, ১৩৮৯ সালে ৬৫ বছর বয়সে মুরাদের মৃত্যু হয়। তার মৃত্যুর ফলে উসমানীয়রা সামরিকভাবে তাদের রাজ্যবিস্তার স্থগিত করে দেয় এবং তুলনামূলক দুর্বল বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের দিকে মনোযোগ প্রদান করে। সূত্র: Runciman, Steven *The Fall of Constantinople.* Cambridge: Cambridge University Press, p. 36

সুলতানের খুব কাছের মানুষ হওয়ায় সুলতান তাকে দশ্চিন্তার কথাগুলো খুলে বললেন।

ততদিনে বুলগেরিয়ার অধিকাংশ শহর উসমানিদের পদানত হয়ে গেছে। অবশিষ্ট রাজ্যগুলো বাঁচার তাগিদে মৈত্রী গড়েছে সার্বিয়া ও বসনিয়ার ক্রুসেডারদের সাথে। পরপর দুটি যুদ্ধে সুলতানের সেনারা এদের জোটবাহিনীর কাছে পরাজিত হয়ে ফিরেছে। নিহত সেনাপতিদের শিরস্ত্রাণে ঢুকিয়ে পত্র পাঠিয়েছে তারা, 'ইউরোপের ভূমি থেকে উসমানিদের সর্বশেষ সেনাকে ধ্বংস না করে আমরা থামব না।' অভিজ্ঞ সেনাপতিদের হারিয়ে সুলতান তখন দুঃখ- ভারাক্রান্ত। এদিকে যে-কোনো মূল্যে এই ক্রুসেড জোটকে দমাতে না পারলে ইউরোপে উসমানিদের ভবিষ্যৎ নিয়েও তিনি শঙ্কিত।

কসোভোর যুদ্ধ নিয়ে আলাপ করতে গেলে আমাদেরকে যুদ্ধেরও বেশ কয়েক বছর পেছনের ঘটনাগুলো বুঝতে হবে। ১৩৩১-১৩৫৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সার্বিয়ার রাজা ছিলেন চতুর্থ স্টিফান উরশ দুশান। তার মৃত্যুর পর সিংহাসনে আসেন তারই ছেলে পঞ্চম স্টিফান উরশ। কিন্তু বাবা আর ছেলের মাঝে ছিল আকাশ-পাতাল পার্থক্য।

চতুর্থ স্টিফান যেখানে রাজ্য পরিচালনায় অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিয়েছিলেন, তার ছেলে পঞ্চম স্টিফান সেই জায়গায় ছিলেন একেবারেই ব্যর্থ। ১৩৫৫-১৩৭১ সাল পর্যন্ত তার শাসনামলে কেন্দ্রের ক্ষমতা বিপুল পরিমাণে হ্রাস পায় এবং অনেকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যের জন্ম হয়। ১৩৭১ সালে নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান পঞ্চম স্টিফান। একই বছরে মারিতসার যুদ্ধে উসমানীয় বাহিনী অসাধারণ রণনৈপুণ্য প্রদর্শন করে বিজয় ছিনিয়ে নেয়। উসমানীয়দের ক্রমশ অগ্রসরমান এ সামরিক অভিযান সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিল সার্বিয়ান শাসক লাজার রেবেলয়ানোভিচ। তাই নিজের রাজ্য উসমানীয়দের বিজয়চক্ষু থেকে বাঁচাতে সামরিক ও কূটনৈতিক তৎপরতা চালাতে লাগল সে। এ-সময় বুলগেরিয়ার কিছু লোক তার কাছে এসে সাহায্যের আবেদন জানালে সে তাদের প্রস্তাবে সহজেই সম্মতি জানায়। বসনিয়ার শাসকের সাথে তার পূর্ব থেকেই জোট গঠন করা ছিল; এবার সেখানে যোগ হয় উসমানি সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের নেশায় ফুঁসতে থাকা বুলগেরিয়ানরা।

সম্মিলিত জোটবাহিনী সার্বিয়ান শাসক লাজারের নেতৃত্বে প্লচনিক ও বিলেচার যুদ্ধে

পরাজিত করে সুলতান মুরাদের উসমানীয় সেনাদলকে। গুরুত্বপূর্ণ সেনানায়কদের হত্যা করে এরা সুলতান মুরাদকে ক্রমাগত হুমকি দিতে থাকে। পরিস্থিতি প্রতিকূল দেখে সুলতান তার অবশিষ্ট বাহিনীকে ফিলিপ্পোপলিস থেকে দ্রুত ইহতিমানে সরিয়ে নেন।

প্রধান উজিরের দিকে তাকালেন সুলতান। বললেন, 'আমি বুঝতে পারছি না, এ মুহূর্তে আমার কী করা উচিত। যুদ্ধের জন্য আমার হাতের মুঠি পুরে আসছে। আমার সেনাপতিদের মৃত্যু আমাকে কাঁদিয়ে ফিরছে। উসমানি সাম্রাজ্যের গৌরব লুট হয়ে যাচ্ছে, আমি সহ্য করতে পারছি না। শাহাদাতের তামান্না আমাকে শান্ত হতে দিচ্ছে না। কিন্তু সেনাবাহিনীর এমন অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যাবার পর রক্তখেকো এই ভয়ংকর ক্রুসেড জোটের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামতেও আমি সাহস পাচ্ছি না।' সুলতানের উদ্বিগ্ন মনোভাব দেখে উজির তাঁর হাতের কুরআন শরিফটি খুললেন। কাকতালীয়ভাবে প্রথম যে আয়াতটি তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল, সেটা ছিল সুরা আনফালের ৬৫ নম্বর আয়াত। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সেখানে ইরশাদ করেছেন:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَٰبِرُونَ يَغْلِبُوا۟ مِا۟ئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّا۟ئَةٌ يَغْلِبُوٓا۟ أَلْفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ

> *'হে নবী, আপনি মুসলমানগণকে উৎসাহিত করুন জিহাদের জন্য। আপনাদের মধ্যে যদি বিশ জন দৃঢ়পদ ব্যক্তি থাকে, তবে তারা জয়ী হবে দুশোর মোকাবেলায়। আর যদি আপনাদের মধ্যে থাকে একশো লোক, তবে জয়ী হবে হাজার কাফেরের উপর। কারণ, ওরা জ্ঞানহীন।'*

অকস্মাৎ এমন আয়াত উঠে আসাকে উজির আল্লাহর পক্ষ থেকে সুসংবাদ হিসেবে নিলেন। সুলতানকে জানাতেই, তিনি যুদ্ধের জন্য তৈরি হয়ে গেলেন। তার বুকের ভেতর থেকে মুহূর্তেই উবে গেল সকল দোটানা ও দুঃশ্চিন্তা। বিজয়ের আশায় তিনি সহসা উঠে দাঁড়িয়ে মাথায় পেঁচালেন জিহাদের পাগড়ি।

কসোভোয় বেরোবার আগে সুলতানের দুআ

বাহিনী তৈরি হলো। ঘোড়াগুলো খেয়ে-দেয়ে তাগড়া হয়ে নিল। সুলতান এবার খোদার দুয়ারে হাত পাতলেন। তিনি জানতেন, এ জিহাদ, এ বিজয়—কেবলই রবের জন্য। কেবল তিনি চাইলেই মুজাহিদরা জয়ীর বেশে ফিরতে পারবে; আবার তিনি চাইলেই তারা শাহাদাতে ধন্য হবে। তাই তিনি তাঁর কাছেই চাইলেন। সেনাদের জন্য বিজয় চাইলেন, নিজের জন্য শাহাদাত কামনা করলেন। কান্নাজড়িত কণ্ঠে তিনি বললেন:

'...হে প্রভু, হে দুআ কবুলের মালিক, আমাকে আপনি লাঞ্ছিত করবেন না। এবারের জন্য আপনার এই ফকির বান্দার দুআ কবুল করুন। হে খোদা, আসমান থেকে রহমতের বারি বর্ষান। সমস্ত কালো মেঘ সরিয়ে দিন, যেন আমরা শত্রুদের দেখতে পারি। আমরা আপনার পাপী বান্দা বৈ কিছুই নই। আপনিই দাতা, আর আমরা সকলে আপনার কল্যাণের ভিখারি।'

'...আপনি জানেন, হে পরওয়ারদিগার, আমাদের ভেতর পার্থিব কোনো স্বার্থ নেই; আমরা গনিমতের লোভেও ময়দানে যাচ্ছি না। আমরা কেবল আপনার সন্তুষ্টির তালাশ করছি। আমি মুরাদ, এই ফকিরদের নেতা; আমার প্রাণ আপনার সন্তোষের জন্য উৎসর্গ করছি। হে রব, আমাকে শহিদ হিসেবে কবুল করুন।'

'...হে জ্ঞানীদের জ্ঞানী, আপনার দ্বীনের শত্রুদের সামনে আমাদের লজ্জিত করবেন না। আমাকে এই সাধারণ বান্দাদের মৃত্যুর কারণ বানাবেন না, হে প্রভু। আপনি প্রথমে আমাকে ইসলামের একজন সেনা হিসেবে শহিদের মর্যাদা দিন। আমার প্রাণের বিনিময়ে আমার সেনাদের আপনি বিজয় দান করুন। দয়া করু্ হে মহামহিম!'

যুদ্ধের জন্য

কসোভোর যুদ্ধে সুলতান মুরাদের বাহিনীতে ছিল প্রায় ৪০০০০-এর মতো সেনা। এদের মাঝে ছিল ২০০০ জেনিসারি[১], ২৫০০ অশ্বারোহী, ৬০০০ সিপাহী,

[১] জেনিসারি (উসমানীয় তুর্কি: يڭيچرى yeñiçeri [jeniˈtʃeɾi], অর্থ 'নতুন সেনা') অটোমান সাম্রাজ্যের অভিজাত পদাতিক সেনাবাহিনী। জেনিসারি বাহিনী অটোমান সম্রাটের দেহরক্ষী এবং ইউরোপের প্রথম আধুনিক সেনাবাহিনী। ঐতিহাসিকদের মতে, এই বাহিনী প্রথম মুরাদের শাসনামলে (১৩৬২-৮৯) সালে গঠিত হয়েছিল। প্রথমদিকে ক্রীতদাসদের সমন্বয়ে এই অভিজাত বাহিনী গড়ে তোলা

২০০০০ আজাপ (হালকা অস্ত্রে সজ্জিত অনিয়মিত পদাতিক বাহিনী) ও আকিঞ্জি (অনিয়মিত হালকা অস্ত্রসজ্জিত অশ্বারোহী বাহিনী)। অবশিষ্ট প্রায় ৮০০০ সেনা এসেছিল অধীনস্ত সামন্ত রাজ্যগুলো থেকে। তিন ভাগে বিভক্ত এ বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন সুলতান মুরাদ এবং তার দুই ছেলে বায়েজিদ[১] ও ইয়াকুব সেলেবি।

প্রতিপক্ষের জোট বাহিনীর নেতৃত্বে ছিল সার্বিয়ান শাসক লাজার রেবেলয়ানোভিচ, সেনাপতি ভাক ব্রাঙ্কোভিচ ও ভ্লাতকো ভুকোভিচ। এ বাহিনীতে ছিল প্রায় ২৬০০০-এর মতো সেনা। এদের মাঝে ১২০০০ ছিল লাজারের নেতৃত্বাধীন, যাদের ১০০০০ ছিল পদাতিক ও ২০০০ অশ্বারোহী। অপরদিকে ভাক ব্রাঙ্কোভিচ ও ভ্লাৎকো ভুকোভিচ প্রত্যেকেই প্রায় ৭০০০ জন করে সেনা নিয়ে এসেছিল। এদের ভেতর ৫০০০ ছিল পদাতিক এবং ২০০০ অশ্বারোহী। এছাড়া ক্রোয়েশিয়ান নাইট জন অফ পালিসনার নেতৃত্বে কয়েক হাজার নাইটও সেই মিত্রপক্ষে যোগ দিয়েছিল বলে জানা যায়।

হয়। এসকল দাসদের খুব অল্প বয়সে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে নিয়ে আসা হতো। কঠোর প্রশিক্ষণ এবং নিয়মানুবর্তিতার জন্য এই বাহিনীর পৃথিবীব্যাপী সুখ্যাতি ছিল। এই বাহিনীর সদস্যরা ক্রীতদাস হলেও সরকারের পক্ষ থেকে তাদেরকে উচ্চ হারে বেতন প্রদান করা হতো। তাদের জন্য বিবাহ করা, ব্যবসা বা অন্য কোনো পেশায় সম্পৃক্ত হওয়া ছিল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এই বাহিনী অটোমান সম্রাটের প্রতি অত্যন্ত অনুগত ছিল। সপ্তদশ শতকে অটোমান সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ বিস্তারের কারণে এই বাহিনীর নিয়োগ প্রক্রিয়ার কঠোর নিয়ম কিছুটা শিথিল করা হয়। বেসামরিক নাগরিকরাও তাদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নতির অভিপ্রায়ে এই বাহিনীতে যোগ দিতে থাকে। ফলে ধীরে ধীরে এই বাহিনী তার সামরিক বৈশিষ্ট্য হারায় এবং এক পর্যায়ে বেসামরিকীকরণের মুখোমুখি হয়। সবশেষে ১৮২৬ সালে সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদ এই বাহিনীর অবলুপ্তি ঘোষণা করেন। সূত্র: The New Encyclopedia of Islam, ed. Cyril Glassé, Rowman & Littlefield, ২০০৮, p.১২৯

[১] প্রথম বায়েজিদ (১৩৬০ – ৮ মার্চ ১৪০৩)। ডাকনাম: ইলদিরিম, যার অর্থ: 'বজ্রপাত বা বজ্রকঠিন'। ছিলেন উসমানীয় সুলতান। বাবার মৃত্যুর পর ১৩৮৯ থেকে ১৪০২ সাল পর্যন্ত উসমানি সাম্রাজ্য শাসন করেছেন। তিনি সুলতান প্রথম মুরাদ ও গুলচিচেক খাতুনের পুত্র ছিলেন। শাসনকালে তিনি একটি সুবিশাল সেনাবাহিনী গড়ে তোলেন। সেই বাহিনী নিয়ে তিনি একবার কনস্টান্টিনোপলও আক্রমণ করেছিলেন, তবে তাতে সফল হতে পারেননি। ১৪০২ সালে আঙ্কারার যুদ্ধে তিনি তৈমুর লঙের কাছে পরাজিত ও বন্দি হন। ১৪০৩ সালের মার্চে বন্দি অবস্থাতেই তার মৃত্যু হয়। সূত্র: Lowry, Heath W. (২০০৩) The Nature of the Early Ottoman State. Albany, NY: State University of New York Press, p. ১৫৩

সৈন্য সমাবেশ

তিন ভাগে বিভক্ত মুরাদের বাহিনীর মাঝেখানে ছিলেন মুরাদ নিজে। তার ডান ও বামের বাহিনীর দায়িত্বে ছিলেন যথাক্রমে বায়েজিদ ও ইয়াকুব সেলেবি। বায়েজিদ ও ইয়াকুবের বাহিনীতে শুরুতেই ছিল ১০০০ জন করে তিরন্দাজ। এদের পরে ছিল ৮০০০ জন করে পদাতিক সেনা। আর সবার শেষে ছিল ৩০০০ জন করে অশ্বারোহী সেনার অবস্থান। মাঝখানে থাকা মুরাদের বাহিনীর শুরুতেই ছিল জেনিসারি দল। এদের পেছনেই অশ্বারোহী দলের সাথে ছিলেন সুলতান মুরাদ নিজে।

সার্বিয়ান বাহিনীও তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। মাঝখানের অংশের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন লাজার। তার ডান ও বামে ছিলেন যথাক্রমে ভাক ও ভ্লাৎকো। তাদের সৈন্য সমাবেশ ছিল উসমানীয়দের উল্টো। সম্মুখভাগে ছিল ভারী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত অশ্বারোহী বাহিনী। অশ্বারোহী তিরন্দাজ বাহিনীর অবস্থান ছিল দুই পাশে। আর পেছনে অবস্থান নিয়েছিল পদাতিক বাহিনী।

যুদ্ধ

শুরুটা করেছিলেন লাজার রেবেল্য়ানোভিচ। ভারী অস্ত্রে সজ্জিত অশ্বারোহী বাহিনীকে তিনি সামনে এগিয়ে যেতে নির্দেশ দেন। সাথে সাথেই ঘোড়ার পিঠে চড়ে ধুলোর ঝড় তুলে এগিয়ে যেতে থাকে হাজার হাজার যোদ্ধা। উসমানীয় সেনারাও সাথে সাথে নিজেদের প্রস্তুত করে নেয়। সামনের দিকে থাকা প্রায় ২০০০ তিরন্দাজের হাত থেকে যেন তিরের বৃষ্টি বর্ষণ শুরু হয়ে যায়। তিরের আঘাতে সার্বিয়ানদের ক্ষতি হলেও তারা পিছু না হটে সামনে এগোতে থাকে।

সার্বিয়ান ও উসমানীয় বাহিনীর মধ্যকার দূরত্ব যখন মাত্র ১০০০ গজের কাছাকাছি, তখনই হঠাৎ করে বিন্যাস পরিবর্তন করে ফেলে সার্বিয়ানরা। ইংরেজি 'V' অক্ষরের মতো হয়ে গিয়ে তারা উসমানিদের উপর শক্ত আক্রমণ করে বসে।

ভাক ব্রাঙ্কোভিচের বাহিনী গিয়ে আঘাত হানে ইয়াকুব সেলেবির বাহিনীর উপর। শুরুতে ভারী অস্ত্রে সজ্জিত অশ্বারোহী বাহিনীর সামনে দাঁড়াতে পারেনি হালকা অস্ত্রবাহী সেলেবির বাহিনী। এরপর লাজার ব্রাঙ্কোভিচের অশ্বারোহী বাহিনীকে নির্দেশ দেন উসমানীয়দের মধ্যভাগে আঘাত হানতে, কারণ সেখানেই রয়েছেন

সুলতান মুরাদ। তার নির্দেশে অশ্বারোহী সেনারা নিজেদের দিক পরিবর্তন করতে শুরু করে। ঠিক এমন সময়ই ইয়াকুব সেলেবি নিজের খেল দেখিয়ে দেন। প্রতিপক্ষের এমন অবস্থায় নিজের অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে ঝড়ের বেগে তাদের উপর চড়াও হন ইয়াকুব। এমন প্রতি-আক্রমণের জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিল না ব্রাঙ্কোভিচের বাহিনী। অন্যদিকে ভারী অস্ত্রশস্ত্র তাদের চলাফেরাতেও সমস্যা করছিল। ফলস্বরূপ মারাত্মক ক্ষতির শিকার হতে হয় তাদের।

শুরুতে সার্বিয়ানদের আক্রমণের তীব্রতায় সুলতানের নেতৃত্বাধীন বাহিনীও পিছু হটতে বাধ্য হয়। ডান পাশে থাকা বায়েজিদের বাহিনী অবশ্য ভ্লাৎকো ভুকোভিচের বাহিনীকে ঠেকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছিল। এরপরই সুলতানের নির্দেশে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া শুরু করে বায়েজিদের বাহিনী। ততক্ষণে বাম দিকে ইয়াকুব সেলেবির বাহিনী সার্বিয়ানদের বেশ ক্ষতি সাধন করেছিল। এদিকে এবার বায়েজিদের বাহিনীও ভুকোভিচের বাহিনীকে চেপে ধরল। উসমানীয়দের আক্রমণের মুখে টিকে থাকতে না পেরে ভুকোভিচ তখন ক্ষতি পোষাতে মধ্যভাগে থাকা সার্বিয়ান বাহিনীর সাথে যোগ দিলেন।

নিজের বাহিনীর এমন অবস্থা দেখে প্রতিশোধস্পৃহা দাউদাউ করে জ্বলে উঠল লাজারের মনে। তাই অবশিষ্ট বাহিনী নিয়েই মরণপণ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন মুরাদের বাহিনীর সাথে। এমন বেপরোয়া আক্রমণে উসমানীয় বাহিনী বেশ ক্ষতির সম্মুখীন হয়। আক্রমণ চলাকালেই আহত হয়ে ঘোড়া থেকে পড়ে যান লাজার। উসমানীয় সেনারা সাথে সাথেই তাকে বন্দি করে সুলতানের সামনে নিয়ে আসে। মুহূর্তের মাঝেই শিরশ্ছেদ করার হয় লাজারের।

সার্বিয়ান বাহিনীর ডান প্রান্তে থাকা ব্রাঙ্কোভিচ লাজারকে বন্দি হতে দেখেছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রের সামগ্রিক অবস্থা বিবেচনা করে জয়ের আশা তিনি ছেড়ে দেন। তাই সাথে থাকা প্রায় ৫০০০ সেনা নিয়ে তিনি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যান। অল্প সময়ের মাঝেই লাজারের মৃত্যু ও ব্রাঙ্কোভিচের পলায়নের খবর ছড়িয়ে পড়ে সবদিকে। সার্বিয়ান সেনারা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে তখন যে যেভাবে পারে পালাতে শুরু করে।

সুলতান মুরাদের শাহাদাতবরণ

যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল। মুরাদের সামনে দিয়েই নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো যুদ্ধবন্দিদের। এদের মাঝে ছিলেন সার্বিয়ান এক অভিজাত বংশীয় লোক, নাম তার মিলোস ওবিলিচ। হঠাৎ করেই হাতের বাঁধন ছুটিয়ে সাথে থাকা গোপন ছোরাটি বের করে সুলতানের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ওবিলিচ। উপর্যুপরি আঘাত করে সেখানেই সুলতানকে খুন করেন তিনি। এরপর অবশ্য ওবিলিচকেও হত্যা করেন সুলতানের দেহরক্ষীরা। কিন্তু ক্ষতি যা হবার তা তো ঠিকই হয়ে গেছে, মারা গেছেন উসমানি সাম্রাজ্যের তৃতীয় সুলতান প্রথম মুরাদ।

কোনো বর্ণনায় বলা আছে, সে মূলত মৃতের ভান করে পড়ে ছিল ময়দানে। সুলতানের সেনারা যখন নিহতদের সরিয়ে নিচ্ছিল, সে তখন অপেক্ষায় ছিল, সুলতান মুরাদ কখন তার পাশ হয়ে যায়। আড়চোখে তাকিয়ে যেই দেখল সুলতান তার পাশঘেঁষে যাচ্ছেন, অমনি গোপন ছোরাটা বের করে সে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তাকে হত্যা করে ফেলে। কেউ বলেন, ওবিলিচ যুদ্ধ চলাকালেই সুলতানকে টার্গেট করে সুযোগে এগিয়ে যায় এবং কোমর থেকে খঞ্জর বের করে সুলতানের বুকে সেঁধিয়ে দিয়ে তাকে হত্যা করে।

চতুর্থ এক বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, ১২ জন সার্বিয়ান অভিজাত বংশীয় লোক সুলতান মুরাদকে হত্যার বিরত করেছিল। যুদ্ধ চলাকালে তারা উসমানীয়দের উদাসীনতার সুযোগে সুলতানের তাঁবুতে ঢুকে পড়ে। সুলতান তখন বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। এ-সময় আগন্তুকরা সুলতানের গলা ও পেটে তলোয়ার ঢুকিয়ে দিয়ে তাকে হত্যা করে ফেলে। সুলতান মুরাদ মৃত্যুর আগে তার সেনাদের জন্য আল্লাহর রহমত কামনা করেন। বিজয়ের তামান্না করেন এবং উসমানি সালতানাতের স্থায়িত্বের দুআ করে কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করতে করতে ইহধাম ত্যাগ করেন। সুলতান মুরাদের মৃত্যুর পর তার ছেলে বায়েজিদ উসমানি বাহিনীর নেতৃত্ব হাতে তুলে যুদ্ধ এগিয়ে নেয়। উসমানিরা হঠাৎ প্রচণ্ড চাপে পড়ে গেলে খোদায়ি মদদে বিরাট এক সাহায্য পেয়ে যায় তারা। সার্বিয়ান বাহিনীর এক কমান্ডার ভাক ব্রাঙ্কোভিচ তার সেনাদের নিয়ে পক্ষ বদল করে ফেলে। তার সাথে ছিল প্রায় ১০ হাজার সেনা। তারা মুসলিম বাহিনীর পক্ষ নিলে ক্রুসেডাররা একেবারে দুর্বল হয়ে পড়ে। তাদের শৃঙ্খলা ভেঙে যায় এবং সেনাদের চোখে নৈরাশ্য ভেসে ওঠে। লাজারের নির্দেশে কান না দিয়ে অনেক সেনারা পালাতে থাকলে মুসলিম বাহিনী বিজয় তাদের পক্ষে পুরে নেয়। বহু

সার্বিয়ান সেনার সাথে বন্দি হয় সম্রাট লাজার এবং অন্যান্য নেতৃস্থানীয় ক্রুসেডার। সুলতান বায়েজিদ তাদেরকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করে ফেলেন।

যুদ্ধের ফলাফল

যুদ্ধে উভয় পক্ষই মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। সার্বিয়ানদের প্রায় ৬০০০ অশ্বারোহী ও ১০০০ পদাতিক সেনা নিহত হয়। যুদ্ধবন্দির সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ১০০০। ওদিকে উসমানীয় বাহিনীর ক্ষতিও ছিল ব্যাপক। তাদের প্রায় ৫০০০ অশ্বারোহী ও ২০০০০ পদাতিক সেনা এদিন প্রাণ হারায়। এ যুদ্ধে সার্বিয়ানরা তাদের অধিকাংশ সেনা হারিয়ে ফেলেছিল। ফলে কিছুদিনের মাঝেই সার্বিয়ার বিভিন্ন ক্ষুদ্র রাজ্য একে একে উসমানীয়দের সামন্ত রাজ্যের তালিকায় নাম লেখাতে শুরু করে। উসমানিদের শক্তিমত্তা দেখে তাদের আক্রোশ থেকে বাঁচতে কেউ কর দিয়ে, কেউ-বা মিত্র হয়ে তাদের তোয়াজ করে চলতে শুরু করে। কসোভোর জয় উসমানিদের দাপট পৌঁছে দেয় রোমানিয়া, আলবানিয়া থেকে অদ্রিয়াটিক সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত ইউরোপের আরও বেশকিছু ক্রুসেড রাষ্ট্রে।

সুলতান প্রথম মুরাদের মতো বিচক্ষণ এবং খোদাভীরু সুলতানের মৃত্যুর পর উসমানীয় বাহিনীর অগ্রযাত্রা কিছুদিনের জন্য হলেও থমকে যায়। এরপর সিংহাসনে আসেন তার ছেলে বায়েজিদ। শুরুতে কিছুদিন স্তিমিত থাকলেও সুলতান বায়েজিদের চাতুরতায় উসমানীয়রা আবার বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য দখলে নতুন করে মনোযোগ নিবদ্ধ করে।

নিকোপলিসের যুদ্ধ
BATTLE OF NICOPOLIS

তারিখ:	৮০০ হিজরি / ১৩৯৬ খ্রি.
স্থান:	নিকোপলিস, বলকান
ফলাফল:	মুসলিম বাহিনীর বিজয়

পক্ষ-বিপক্ষ:	উসমানি সাম্রাজ্য	খ্রিস্টান জোট (হাঙ্গেরি, আলমানিয়া, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড এবং ইতালির সম্মিলিত বাহিনী)
সেনাপ্রধান:	সুলতান ১ম বায়েজিদ	রাজা সিগিসমন্ড
সেনাসংখ্যা:	১ লাখ	১ লাখ ২০ হাজার
ক্ষয়ক্ষতি:	৩০ হাজার শহিদ	নির্দিষ্ট করে জানা যায় না, তবে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়

৮০০

হিজরি মোতাবেক ১৩৯৬ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত উসমানি সম্রাট প্রথম বায়েজিদ এবং হাঙ্গেরির রাজা সিগিসমুন্ডের মধ্যে বলকানের উত্তরে অবস্থিত নিকোপলিসের ঐতিহাসিক যুদ্ধ। এ যুদ্ধে উভয়পক্ষের বহু ক্ষয়ক্ষতির পর সর্বশেষ বিজয়ের গৌরব মুসলিম বাহিনীর পদ চুম্বন করে।

পূর্বকথন

১৩৮৯ সালে (৭৯১ হিজরিতে) সংঘটিত কসোভোর যুদ্ধে জয় পেয়েছিল উসমানীয় বাহিনী। এ জয় আশপাশে তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়। এর ফলে একদিকে যেমন বলকান অঞ্চলের অধিকাংশই এসে গিয়েছিল তাদের অধীনে, তেমনি বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যও সংকুচিত হতে হতে কনস্টান্টিনোপলের কাছাকাছি এলাকায় গিয়ে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল।

১৩৯৩ সালে বুলগেরিয়ার শাসক ইভান শিশমানের অস্থায়ী রাজধানী নিকোপলিস চলে যায় উসমানীয়দের হাতে। উত্তর-পশ্চিম বুলগেরিয়ায় দানিয়ুব নদীর দক্ষিণ তীরের বন্দরনগরী ভিদিনের শাসক হিসেবে তখনো ছিল শিশমানের ভাই ইভান স্ত্রাটসিমির; তবে ততদিনে সে হয়ে গেছে উসমানীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্গত এক সামন্তরাজ। এভাবে রাজ্য সম্প্রসারণের প্রায় সকল সমীকরণই একে একে চলে যাচ্ছিল উসমানীয়দের পক্ষে।

নড়েচড়ে বসতে শুরু করে উসমানীয় সাম্রাজ্যের প্রতিপক্ষরা। তারা বুঝতে পারে যে, একমাত্র ক্রুসেড তথা ধর্মযুদ্ধের মাধ্যমেই উসমানীয়দের এ অগ্রযাত্রা রোধ করা সম্ভব। নতুবা বলকানের অঞ্চলগুলোকে ইসলামি শাসন থেকে মুক্ত করা দিন দিন অসম্ভব হয়ে পড়বে।

বিপদে পড়ে গিয়েছিল হাঙ্গেরি। ভৌগলিক হিসেবে তারাই ছিল মুসলিম ও খ্রিস্টানদের পরবর্তী লক্ষ্যস্থল; অন্তত দ্বিপাক্ষিক অগ্রগামিতার হিসেব সেটাই বলছিল। আতঙ্কে ছিল ভেনিসবাসীও। কারণ, বলকান পেনিনসুলায় উসমানীয় বাহিনীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অর্থ ছিল, মোরিয়া ও ডালমেশিয়ার মতো অঞ্চলগুলো তাদের হাতে চলে যাওয়া। ফলে অ্যাড্রিয়াটিক সাগর, আয়োনীয় সাগর ও এজিয়ান সাগরে কমে যেত ভেনিসের প্রভাব। জেনোয়াকেই বা বাদ দিই কীভাবে? ভয় তাদের মনেও জেঁকে বসেছিল। যদি উসমানীয় সাম্রাজ্য দানিয়ুব নদী এবং দার্দানেলিস, মারমারা সাগর ও বসফরাস প্রণালিতে তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে পারে, তাহলে এতদাঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্যেও নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে ফেলবে তারা। জেনোয়ার ভয়ের কারণ হলো, সেই অঞ্চলে কাফফা, সাইনোপ ও আমাস্ত্রার মতো তাদের গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক কলোনিগুলোর অবস্থান ছিল।

সব মিলিয়ে নিজেদের ক্রমশ বিকশিত করতে গিয়ে আশেপাশে ভালোই শত্রু জুটিয়ে ফেলেছিল উসমানীয় সাম্রাজ্য। ১৩৯৪ সালে তাই বাইজান্টাইন সম্রাট ম্যানুয়েল দ্বিতীয় পালাইয়োলগোস এবং হাঙ্গেরির রাজা সিগিসমুন্ড সুলতান ১ম বায়েজিদের বিরুদ্ধে সাহায্য চেয়ে পাঠান পশ্চিমা দেশগুলোর কাছে। সেই সাথে তারা এটাও জানান যে, উসমানীয় সুলতান নাকি দম্ভোক্তি করে বলেছেন: তার সেনাবাহিনীকে ফ্রান্সের উদ্দেশ্যে নেতৃত্ব দেবেন তিনি। রোমে যাত্রাবিরতি দিয়ে সেইন্ট পিটারের চিত্রকর্মের পেছনে তিনি তার ঘোড়াগুলোকে ঘাস-পানি খাওয়াবেন! এদিকে সে-বছরই পোপ নবম বোনাফিস ডাক দিয়ে বসেন আরেকটি ধর্মযুদ্ধের।

ইংল্যান্ডের রাজা দ্বিতীয় রিচার্ড ও ফ্রান্সের রাজা ষষ্ঠ চার্লসের মেয়ে ইসাবেলার মাঝে বৈবাহিক সম্পর্ক তখন ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের মধ্যকার শতবর্ষী যুদ্ধে খণ্ডকালীন শান্তির পতাকা ওড়াচ্ছিলো। সিগিসমুন্ডের কাছ থেকে সাহায্যের আবেদন পেয়ে তাই তিনিও আর বসে থাকতে পারলেন না। যুদ্ধ করে উসমানীয় সাম্রাজ্যের একটা হেস্তনেস্ত করার শপথ করে বেরিয়ে পড়লেন দ্রুত। নতুন এ ধর্মীয় ক্রুসেডের ডাকে স্বতস্ফূর্ত সাড়া পাওয়া গেল ফ্রান্সের অভিজাত সমাজেরও।

সৈন্য সমাবেশ

উসমানীয় কিংবা খ্রিস্টান—উভয় পক্ষের ঐতিহাসিকেরাই এ যুদ্ধে সৈন্য সংখ্যা অতিরঞ্জিত করে দেখিয়েছেন। এর পেছনে কারণটাও বেশ মজার। নিকোপলিসের এ ক্রুসেডে শেষ পর্যন্ত জয় পেয়েছিল উসমানীয় বাহিনী। উসমানীয় পক্ষের

ঐতিহাসিকদের বেলায় দেখা যায়, খ্রিস্টান বাহিনীর সৈন্য সংখ্যাকে মুসলিমদের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ করে দেখাতে, যাতে করে এ জয়ে তাদের মাহাত্ম্য বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে পরাজিত খ্রিস্টান বাহিনীর কিছু ঐতিহাসিক মুসলিম বাহিনীর সৈন্য সংখ্যাকে তাদের তুলনায় দ্বিগুণ দেখিয়েছেন, যাতে এটাকে পরাজয়ের একটা অজুহাত হিসেবে দাঁড় করানো যায়!

এই যেমন উসমানীয় পক্ষের হাতে যুদ্ধবন্দি জোহান শ্লিটবার্গারের কথাই ধরা যাক। নিকোপলিসের এ-যুদ্ধের সময় যার বয়স ছিল ১৬ বছর। তার মতে, খ্রিস্টান বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল মাত্র ১৬০০০ এর মতো। পক্ষান্তরে তুর্কিদের ছিল প্রায় ২০০০০০-এরও অধিক সৈন্য!

পনেরো শতকের তুর্কি ঐতিহাসিক শুকরুল্লাহ্‌র মতে উসমানীয় ও তাদের প্রতিপক্ষের ছিল, যথাক্রমে ৬০০০০ ও ১৩০০০০-এর মতো সেনা। উনিশ শতকের জার্মান ঐতিহাসিকদের মতে খ্রিস্টানদের পক্ষে ৭৫০০-৯০০০ ও উসমানীয়দের পক্ষে ১২০০০-২০০০০ সেনা যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। ব্রিটিশ ঐতিহাসিক ডেভিড নিকোলের মতে উসমানীয় বাহিনীতে ১৫০০০ ও খ্রিস্টান বাহিনীতে ১৬০০০-এর মতো সেনাসদস্য যুদ্ধে এসেছিল। উসমানীয় বাহিনীতে ১৫০০-এর মতো ভারী অস্ত্রে সজ্জিত সার্বিয়ান নাইটও যোগ দিয়েছিল, যাদের নেতৃত্বে ছিল উসমানি সাম্রাজ্যের মিত্র প্রিন্স স্টেফান লাজারেভিচ।

ফরাসি বাহিনী এ যুদ্ধে ২০০০ নাইট ও স্কয়ার (নাইটের অনুচর) নিয়ে এসেছিল। সেই সাথে ছিল ৬০০০ ভাড়াটে তিরন্দাজ ও পদাতিক সেনা। সব মিলিয়ে তাদের সৈন্য সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ১০০০০ এর মতো। ভেনিসের পক্ষ থেকে এসেছিল নৌবাহিনী। হাঙ্গেরীয়দের উদ্যোগে জার্মানির রাইনল্যান্ড, বাভারিয়া, স্যাক্সনি ও অন্যান্য অঞ্চলের প্রিন্সরা এতে যোগদান করে। এছাড়া ফরাসি রাজদূতের ঘোষণায় পোল্যান্ড, বোহেমিয়া, নাভারে ও স্পেন থেকেও সৈন্য এসেছিল ঝাঁকে ঝাঁকে।

এর বাইরে ৬০০০-৮০০০ হাঙ্গেরীয়, প্রায় ১০০০০ ফরাসি, ইংরেজ ও বারগান্ডিয়ান, মির্চা দ্য এল্ডারের নেতৃত্বাধীন প্রায় ১০০০০ ওয়ালাশীয়, ৬০০০ জার্মান এবং প্রায় ১৫০০০ ডাচ, বোহেমিয়ান, স্প্যানিশ, ইতালীয়, পোলিশ, বুলগেরীয়, স্কটিশ ও সুইস সেনার কথাও জানা যায়। আবার ভেনিস, জেনোয়া ও সেইন্ট জনের নাইটদের কাছ থেকে নৌ সাহায্যও এসেছিল কিছু। এভাবে সৈন্য সংখ্যা ৪৭০০০-৪৯০০০-এ গিয়ে ঠেকে। আবার কোনো কোনো বর্ণনানুযায়ী

তা ১২০০০০-১৩০০০০! অর্থাৎ খ্রিস্টান বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা সম্পর্কে বিভিন্ন ঐতিহাসিকের বিভিন্নরকম বর্ণনা পাওয়ায় কোনটি যে সঠিক বা কাছাকাছি, তা ছয়শ বছর পর সমাধা করাটা বেশ কষ্টসাধ্য।

যাত্রা শুরু

পূর্ব ফ্রান্সের শহর দিজন থেকে ১৩৯৬ সালের ৩০ এপ্রিল যাত্রা শুরু হয় খ্রিস্টান বাহিনীর। তাদের লক্ষ্য ছিল, স্ট্রাসবুর্গের রাস্তা ধরে বাভারিয়া হয়ে দানিয়ুবের উত্তর দিকে যাত্রা করা। সেখান থেকে নদীপথে সিগিসমুন্ডের সাথে বুদায় মিলিত হওয়াই ছিল আপাতত তাদের প্রাথমিক লক্ষ্য। এরপর কী হবে, তা নিয়ে অবশ্য তারা নিজেরাও নিশ্চিত ছিল না। শুধু পরিকল্পনায় ছিল, বলকান অঞ্চল থেকে তুর্কিদের বিতাড়িত করে কনস্টান্টিনোপলের সাহায্যার্থে এগিয়ে যাওয়া। এরপর ফিলিস্তিন ও সেপালক্রে চার্চকে স্বাধীন করার পরিকল্পনাও তাদের মাথায় ঘুরছিল। সবশেষে বিজয়ীর বেশে ইউরোপে প্রত্যাবর্তনের লক্ষ্যও তাদের ছিল, শুধু ছিল না যথোপযোগী কোনো বিন্যস্ত কর্মপরিকল্পনা।

ফরাসি বাহিনী বেরিয়েছিল বেশ উৎসবমুখর সাজে সজ্জিত হয়েই। তাদের সাথে চব্বিশটি গাড়ি জুড়ে শুধু তাঁবু আর প্যাভিলিয়নই ছিল। সাথে থাকা সবুজ মখমলের তৈরি চাদরগুলোতে ছিল বাহারি নকশা। ১৩৯৬ সালের জুলাই মাসে যখন এই বিশাল বাহিনী বুদায় গিয়ে পৌঁছে, তখন খুশিতে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিল রাজা সিগিসমুন্ড। আনন্দের আতিশায্যে তিনি এক পর্যায়ে বলেই ফেলেন যে, এখন তিনি যে কেবল উসমানীয় বাহিনীকে ইউরোপ থেকে বিদায় করতে পারবেন, তা নয়, বরং যদি আকাশটাও ভেঙে পড়ে তাহলে নিজের বর্শার সাহায্যে সেটাকে ঠেস দিয়ে দাঁড় করিয়েও রাখতে পারবেন তিনি! হয়তো এমন অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসই পরবর্তীতে কাল হয়েছিল তাদের জন্য।

ওদিকে বুদায় খ্রিস্টান বাহিনীর যুদ্ধ পরিষদে বেঁধে যায় গণ্ডগোল। সুলতান বায়েজিদ ১৩৯৫ সালে ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, ১৩৯৬-এর মে-তে তিনি আসবেন হাঙ্গেরি দখল করতে। কিন্তু জুলাইয়ের শেষ হয়ে এলেও তার দেখা না পাওয়ায় ফরাসিরা তাকে কাপুরুষ ভাবতে শুরু করে। সিগিসমুন্ড অবশ্য তার মিত্রদের শান্ত থেকে ক্রুসেডের পরিকল্পনায় অটল থাকার অনুরোধ করে। সে চেয়েছিল, যেন দীর্ঘ যাত্রাপথের ক্লান্তি নিয়ে বায়েজিদই আসেন এখানে। কিন্তু এতে আঁতে ঘা লেগেছিল

ফরাসি বাহিনী ও তাদের মিত্রদের। তারা নিজেরাই বরং সুলতান বায়েজিদের সাথে লড়াইয়ের জন্য এগিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়।

সিগিসমুন্ডের কথায় কান না দিয়ে যাত্রা শুরু করে সম্মিলিত খ্রিস্টান বাহিনী। তারা চলতে লাগল দানিয়ুব নদীর পশ্চিম তীর ধরে। এদিকে হাঙ্গেরির কিছু সেনা অবশ্য রওনা দেয় উত্তর দিকে, ট্রানসিলভানিয়া ও ওয়ালাশীয় সৈন্যদের একত্রিত করার উদ্দেশ্যে। যেতে যেতে একসময় তারা প্রবেশ করল মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে। শুরু হল তাদের ধ্বংসযজ্ঞ ও লুটতরাজ। এক্ষেত্রে সবচে আগ্রাসী দেখা গিয়েছিল ফরাসি বাহিনীকে। এরপর তারা পৌঁছান ভিদিনে, যার শাসক ছিল ইভান স্ট্রাটসিমির। উসমানীয়দের সামন্তরাজ হয়ে থাকার কোনো ইচ্ছে তার ছিল না; তাই বিনা প্রতিরোধে আত্মসমর্পন করে নেয় সে। এ সময় পেছনে থাকা সিগিসমুন্ডও মতানৈক্য ভুলে তাদের সাথে এসে মিলিত হয়। ভিদিন দখলের সময় সামান্য সংঘর্ষ হয়েছিল উসমানীয়দের থেকে নিয়োজিত সেনা-ছাউনিতে। তবে সেখানে অল্পতেই জয় পায় খ্রিস্টান বাহিনী। এই সামান্য রক্ষীদের বিপক্ষে বিজয় অবশ্য হিতে বিপরীত হয়েছিল তাদের জন্য। ফরাসি সৈন্যরা এ খণ্ডযুদ্ধে বিজয়ের পর ভাবতে শুরু করেছিল যে, উসমানীয় বাহিনী হয়তো ক্রুসেডের ময়দানে তাদের সামনে টিকতেই পারবে না!

পরবর্তীতে এ বাহিনী যাত্রা করে ভিদিনের ৭৫ মাইল দূরবর্তী ওরয়াহোভো দুর্গ দখল করতে। প্রথম রাতে দুর্গের সেনারা প্রতিরোধ করলেও পরদিন সকালে তারা সিগিসমুন্ডের কাছে আত্মসমর্পণ করে। তবে তারা শর্ত দেয়, তাদের জীবন ও সম্পদের কোনো ক্ষতি করা হবে না। সিগিসমুন্ড সেটা মেনেও নিয়েছিলেন। তবে বাগড়া বাধায় ফরাসি বাহিনী। গেট খোলার সাথে সাথে তারা শহরে প্রবেশ করে এবং হত্যা ও ধ্বংসের লীলাখেলায় মেতে ওঠে। বন্দি করা হয় হাজার খানেক নগরবাসীকে, এরপর পুরো নগরীতে আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হয়। হাঙ্গেরীয়রা ফরাসিদের এ আচরণকে একদমই স্বাভাবিকভাবে নিতে পারেনি। তারা বরং একে ফরাসিদের পক্ষ থেকে তাদের রাজার অপমান হিসেবেই দেখেছিল।

এরপর ওরয়াহোভোতে সেনাছাউনি স্থাপন করে খ্রিস্টান বাহিনী এগোতে শুরু করে নিকোপলিসের দিকে। পথিমধ্যে আরও কিছু দুর্গ তাদের বশ্যতা মেনে নেয়। কিন্তু সৌভাগ্য বলতে হবে উসমানীয় বাহিনীর। যাত্রাপথে থাকা একটি নগরদুর্গ কোনোভাবে খ্রিস্টান বাহিনীর নজর এড়িয়ে যায়। ফলে সুযোগ বুঝে সেখানকার দূতেরা ঝড়ের বেগে রওনা দেয় তাদের সুলতানকে সাম্প্রতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে

খবর জানাতে। এদিকে ১২ সেপ্টেম্বর নাগাদ ক্রুসেড বাহিনী নিকোপলিস দুর্গের একেবারে কাছাকাছি চলে আসে।

অবরোধের কবলে নিকোপলিস

নিকোপলিস দুর্গটি ছিল প্রকৃতপক্ষে দ্বি-স্তর প্রাচীরবেষ্টিত একটি শহর। এটি একটি উঁচু পাহাড়ের গা ঘেঁষে অবস্থিত ছিল। দুটি দেয়ালের মাঝে তুলনামূলক উঁচু দেয়ালটি ছিল পাহাড়ের চূড়ার দিকে। আর অপেক্ষাকৃত নিচু দেয়ালটির অবস্থান ছিল পাহাড়ের পাদদেশে। ক্রুসেডের উদ্দেশ্যে আগত বহুজাতিক খ্রিস্টান বাহিনী দুর্গটি চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলে। তখন নিকোপলিসের শাসক ছিলেন দোয়ান বে। তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, সুলতান বায়েজিদ তার বাহিনী নিয়ে অবশ্যই নিকোপলিসবাসীর সাহায্যার্থে ছুটে আসবেন। ফলে তিনিও বড় রকমের অবরোধের শিকার হবার মতো মানসিক এবং পারিপার্শ্বিক প্রস্তুতি নিতে থাকেন।

ওদিকে পরিকল্পনাগত একটি ভুল করে ফেলেছিল অবরোধকারী বাহিনী। তারা শহরের দেয়াল ভাঙার মতো কোনো মেশিন, সামরিক অভিধানে Siege Engine নামে পরিচিত, তা নিয়ে আসেনি। সিজ ইঞ্জিনের অনুপস্থিতি, পাহাড়ের খাড়া ঢাল আর দুর্গের শক্তিশালী প্রতিরক্ষাব্যবস্থার কারণে শেষ পর্যন্ত খ্রিস্টান বাহিনী শুধুমাত্র অবরোধ করেই সন্তুষ্ট থাকতে বাধ্য হলো। তারা জল ও স্থলে দুর্গের জন্য সাহায্য আসার সকল পথই বন্ধ করে দিল।

এভাবে চলে গেল দু-সপ্তাহের মতো সময়। খাওয়া-দাওয়া, আমোদ-ফূর্তি, গল্প-গুজব, খেলাধুলা আর উসমানীয় বাহিনীর শক্তি-সামর্থ্য নিয়ে কটূক্তি করেই দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল অবরোধকারীদের। এদিকে খ্রিস্টান বাহিনীর ভুলে কিংবা উসমানীয় বাহিনীর আশীর্বাদস্বরূপ যে দূতেরা ছুটে গিয়েছিল সুলতান প্রথম বায়েজিদের কাছে, তারা তাদের কাজ যথার্থভাবে শেষ করল। ক্রুসেডের এমন সংবাদ পেয়ে এক মূহুর্তও দেরি করেননি সুলতান বায়েজিদ। সাথেসাথেই কনস্টান্টিনোপল থেকে অবরোধ তুলে নিয়ে উত্তরে নিকোপলিসের উদ্দেশে যাত্রা করেন তিনি। পথিমধ্যে তার সাথে যোগ দেয় সার্বিয়ার সামন্তরাজ স্টেফান লাজারেভিচ।

হাঙ্গেরির রাজা সিগিসমুন্ড তার ৫০০ অশ্বারোহী সেনাকে পাঠিয়েছিলেন উসমানীয় বাহিনীর আগমনের ব্যাপারে খোঁজখবর রাখতে। অবরোধের তিন সপ্তাহ পর

ক্রুসেড বাহিনীতে হঠাৎ করেই ছুটে এল এক দূত। হাঁপাতে হাঁপাতে বিশাল উসমানীয় বাহিনীর আগমনের খবর জানাল সে। মাত্র তিন সপ্তাহের মাথায় এভাবে উসমানীয়দের আগমন প্রত্যাশা করেনি কেউই। ঘটনার আকস্মিকতায় সবার চোখ উঠে গেল কপালে। ওদিকে অবরুদ্ধ নিকোপলিসবাসীও কোনোভাবে জেনে গিয়েছিল উসমানীয় বাহিনীর আগমনের বার্তা। আনন্দের আতিশায্যে তারাও হৈ-হুল্লোড় শুরু করে দেয়; সুলতানের বাহিনীকে স্বাগত জানাতে নিকোপলিসে বাজতে থাকে নানা বাদ্য। এমন পরিস্থিতিতে উসমানীয়দের অগ্রযাত্রা বিলম্বিত করতে ৫০০ অশ্বারোহী ও ৫০০ তিরন্দাজ নিয়ে এগিয়ে যান কাউচির লর্ড এঙ্গেরান্ড। তার বাহিনীর অতর্কিত আক্রমণে উসমানীয়দের বেশ কিছু সেনা হতাহত হয়।

যুদ্ধ

৮০০ হিজরি; ১৩৯৬ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর। খ্রিস্টান বাহিনীর পেছনে ছিল নিকোপলিসের দুর্গ এবং দানিয়ুব নদী। যুদ্ধক্ষেত্রের পূর্বের দিকটা ঢালু থাকায় সেখান দিয়ে অশ্বারোহী বাহিনীর চলাচল ছিল কষ্টসাধ্য। অন্যদিকে পশ্চিমে ছিল বনাঞ্চল। তাদের নৌবাহিনীও ছিল দানিয়ুব নদীতে। তাদের সম্মুখভাগে ছিল কাউন্ট অফ নাভার্সের নেতৃত্বাধীন নাইট বাহিনী। এর পেছনে ছিল সিগিসমুন্ডের নেতৃত্বাধীন পদাতিক ও অশ্বারোহী সেনারা। ডানে ও বামে ছিল ট্রানসিলভানিয়ান ও ওয়ালাশীয় সেনাদের সমাবেশ।

উসমানীয় বাহিনীর প্রথমে ছিল হালকা অস্ত্রে সজ্জিত অনিয়মিত অশ্বারোহী বাহিনী, তুর্কি ভাষায় যাদের বলা হয় আকিঞ্চি। আকিঞ্চিদের পেছনেই পোঁতা ছিল অনেকগুলো সূক্ষ্মাগ্র লাঠি, যাতে করে সেগুলো প্রতিপক্ষের ঘোড়ার পেটে ঢুকে থমকে দেয় তাদের অগ্রযাত্রা। এর পেছনে ছিল আজাপ বাহিনী, যারা হালকা অস্ত্রে সজ্জিত অনিয়মিত পদাতিক সেনা। আজাপদের পরেই ছিল জেনিসারি দল বা যারা ভারী অস্ত্রে সজ্জিত বেশ চৌকশ একদল পদাতিক সেনা। বাহিনীর দুই পাশে ছিল আনাতোলীয় ও রুমেলীয় সিপাহীদের সমাবেশ। আর পেছনে স্পেশাল সেনাদের নিয়ে রিজার্ভ ফোর্সে ছিলেন সুলতান বায়েজিদ নিজে। তার সাথে সার্বিয়ান নাইটদের নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল স্টেফান লাজারেভিচ।

প্রথমেই ফরাসি নাইটরা হামলা চালায় আকিঞ্চিদের উপর। আকিঞ্চি বাহিনী শুরুতে কিছুটা প্রতিরোধ গড়তে পারলেও পরে সেটা ভেঙে যায়, সৃষ্ট ফাটল দিয়ে স্রোতের

মতো প্রবেশ করতে থাকে ফরাসিরা। অবশ্য আকিঞ্চিদের মূল কাজ ছিল প্রতিপক্ষের শুরুর দিকের যাত্রায় বিঘ্ন ঘটানো। তাই বলা চলে, তাদের কাজটা তারা ঠিকভাবেই শেষ করতে পেরেছিল। ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে এরপরও যারা জীবিত ফিরেছিল, তারা গিয়ে আশ্রয় নেয় দুই পাশে পদাতিক বাহিনীর সাথে।

আকিঞ্চিদের পেছনে থাকা সূক্ষ্মাগ্র লাঠিগুলো এরপর মূল বাধা হয়ে দাঁড়াল ফরাসিদের জন্য। অনেকের ঘোড়াই মারাত্মক আহত হলো এতে। নাইটদের বহু সেনা তখন মাটিতে নেমে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সেই লাঠিগুলো সরাতে। সেই সময় উসমানীয় তিরন্দাজ বাহিনীর প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় প্রতিপক্ষের ঘোড়াগুলো; কারণ, নাইটদের বর্ম ভেদ করে তির পৌঁছানোর চেয়ে ঘোড়াকে আহত করা অনেকাংশে সহজ ছিল তাদের জন্য। একই সময় চৌকশ জেনিসারি বাহিনীও শক্তভাবে হামলে পড়ে প্রতিপক্ষের উপর। নাইটদের ভারী বর্মগুলো তাদের বাড়তি প্রতিরক্ষা দিচ্ছিল। ফলে তারা শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে পাল্টা আক্রমণ শুরু করে দেয়। এতে বিজয়ের পাল্লা হেলে পড়তে শুরু করে খ্রিস্টান বাহিনীর দিকেই।

পরিস্থিতি বুঝে আনাতোলীয় ও রুমেলীয় সেনারা দেরি না করে ঝাঁপিয়ে পড়ে নাইটদের উপর। যুদ্ধের এ পর্যায়ে সুলতান বায়েজিদ নিজেও কম আশ্চর্য হননি। কারণ, ভারী অস্ত্র ও বর্মে সজ্জিত নাইটদের সামনে উসমানীয় বাহিনীকে বেশ বিপর্যস্ত দেখতে পাচ্ছিলেন তিনি। তবে তিনি দমে যাবার বা ভেঙে পড়ার লোক নন; দৃঢ়তার সাথে যুদ্ধ পরিচালনায় মন দিলেন তিনি।

যুদ্ধ তখন সমানে সমান। কিন্তু এ পর্যায়ে এসে বেশ বড়সড় ভুল করে ফেলে ফরাসি নাইটরা, যার খেসারত তাদের দেয়া লেগেছিল অগণিত মৃত্যু, পরাজয় আর সর্বশেষ মুক্তিপণ দেয়ার মাধ্যমে। নাইটদের এ দলের অধিকাংশ সদস্যই ছিল তরুণ। তাদের রক্ত ছিল টগবগে, কিন্তু বুদ্ধি ছিল হাঁটুর গোড়ায়। আগপাছ না ভেবে তারা বিজয়ের নেশায় সামনের দিকে এগোতে শুরু করে। সেই সময় যদি তারা সিগিসমুন্ডের বাহিনীর সাথে একত্রিত হয়ে এগোনোর চিন্তা করত, তাহলে যুদ্ধের শেষ ফলাফল হয়তো তাদের পক্ষেও চলে যেতে পারত। কিন্তু সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছা ছিল অন্যরকম।

নাইটেরা ভাবল যে, সামনে পাহাড়ের উপরেই আছে উসমানীয় বাহিনীর শিবির। তাই তারা সেগুলো ধ্বংস করতে পাহাড় বেয়ে উঠতে শুরু করল। এ সময় তাদের অর্ধেকের বেশিই ছিল অশ্বহীন পদচারী। পাহাড়ে উঠে তারা আশা করেছিল পলায়নরত উসমানীয় সেনাদের দেখতে পাবে। কিন্তু এখানেই লুকোনো ছিল

সুলতানের মূল কৌশল। পাহাড়ের উপরে নিজের শক্তিশালী সিপাহীদের রিজার্ভ ফোর্স নিয়ে অপেক্ষারত ছিলেন সুলতান প্রথম বায়েজিদ। ফরাসি নাইটদের দেখেই যুদ্ধের দামামা বাজিয়ে 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনিতে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল অশ্বহীন নাইটদের উপর। ততক্ষণে ভারী অস্ত্র নিয়ে পাহাড়ের উপর উঠে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল ফরাসি নাইটরা। সুলতানের বাহিনীর এমন শক্ত আক্রমণের ধকল, তাই আর সইতে পারল না তারা। যারা পারল, তারা অন্যদের চিন্তা ফেলে পালিয়ে নিজেদের প্রাণ রক্ষা করল। আর অন্যরা সবাই কচুকাটা হতে থাকল উসমানীয় বাহিনীর তরবারির তলে। অবশেষে কাউন্ট অফ নাভার্স উসমানীয় বাহিনীর হাতে বন্দি হলে যুদ্ধের প্রথম পরাজয় হিসেবে পুরো নাইট বাহিনী আত্মসমর্পণ করে বসে।

হাঙ্গেরির রাজা সিগিসমুন্ড ততক্ষণে বুঝতে পেরেছেন যে, যুদ্ধের নিয়ন্ত্রণ তাদের হাতছাড়া হতে শুরু করেছে। তাই এবার তিনি নিজের বাহিনী নিয়ে আক্রমণে ফিল্ডে চলে আসেন। কাপুরুষের মতো কাজ করেছিল সেদিন ওয়ালাশীয় ও ট্রানসিলভানিয়ান বাহিনী। যুদ্ধের ফলাফল তাদের বিপক্ষে যাচ্ছে দেখে তারা তাদের সেনাবাহিনী ভবিষ্যতে নিজেদের দেশ রক্ষার্থে রেখে দেয়া বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করে এবং সুযোগ বুঝে তাই ময়দান ছেড়ে সটকে পড়ে।

সুলতান বায়েজিদের বাহিনীর হাতে আটকে পড়া নাইট ও অন্যান্যদের ততক্ষণে নিয়ে যাওয়া হয়েছে উসমানীয় বাহিনীর শিবিরে। তবে এবার ময়দানে হাঙ্গেরীয়দের হাতে আবারও পর্যুদস্ত হতে থাকল আকিঞ্চি ও আজাপরা। এ সময় অগ্রসরমান হাঙ্গেরীয়দের রুখতে এগিয়ে গেল রুমেলীয় ও আনাতোলীয় সিপাহীরা। আবারও শুরু হলো তুমুল লড়াই। অন্যদিকে আকিঞ্চিরা কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আবারও আক্রমণে ফিরে এল। এবার তারা বুদ্ধি করে পেছন থেকে চেপে ধরল হাঙ্গেরীয়দের। সবার শেষে সুলতানের নির্দেশে স্টেফান লাজারেভিচ তার নাইট বাহিনী নিয়ে আক্রমণ করল হাঙ্গেরীয়দের ডান পাশ বরাবর। চারদিক থেকে এত আঘাত সইতে না পেরে এবার জীবন বাঁচাতে দিগ্বিদিক ছুটে পালাতে লাগল হাঙ্গেরীয় সেনারা।

খ্রিস্টান বাহিনীর অবশিষ্টরা উসমানীয় অশ্বারোহী বাহিনীর তাড়া খেয়ে এবার দানিয়ুব নদীর দিকে দৌড় লাগাল। বিশৃঙ্খলভাবে অতিরিক্ত সৈন্য উঠে পড়ায় ডুবে গেল বেশ কিছু নৌকা। কিছু কিছু নৌকায় আগে থেকেই চড়ে থাকা সেনারা অন্যরা উঠতে গেলে বাঁচার তাগিদে তাদের ধাক্কা মেরে ফেলে দিচ্ছিল। কেউ কেউ উপায় না পেয়ে সাঁতার কাটতে শুরু করে এবং ক্লান্ত হয়ে নদীর মাঝখানেই ডুবে মরে যায়। সাধারণ সেনারা এভাবে পালিয়ে গেলে প্রতিপক্ষের যুদ্ধ শিবির পুরোটা এসে যায়

উসমানীয়দের নিয়ন্ত্রণে। কাউন্ট অফ নাভার্সসহ আরও অনেক অভিজাত ফরাসি যোদ্ধা সুলতানের হাতে বন্দি হয়। সহযোদ্ধাদের সহায়তায় ভেনিসের এক জাহাজে চড়ে সেবারের মতো পালিয়ে যায় রাজা সিগিসমুন্ড। পরবর্তীতে সে আক্ষেপ করে বলে বেড়াত, 'এই ফরাসিদের গর্ব আর অহংকারের জন্যই আজ আমরা হেরে গেলাম। যদি তারা আমার উপদেশ শুনত, তাহলে শত্রুদের সাথে মোকাবেলা করার জন্য পর্যাপ্ত সেনা আমাদের ছিল!'

ফলাফল

যুদ্ধে বিজয়ী হয়েছিল উসমানীয় বাহিনীই। তবে উভয় পক্ষেরই ক্ষয়ক্ষতি ছিল যথেষ্ট। যুদ্ধ শেষে সুলতান ওরয়াহোভোতে গণহত্যার কথা জানতে পেরে মারাত্মক রেগে যান এবং যুদ্ধবন্দি প্রায় ৩০০০ জনকে হয় শিরোচ্ছেদ কিংবা শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে হত্যা করার নির্দেশ প্রদান করেন। এই হারের পর থেকে ১৪৪০ সালের আগ পর্যন্ত পশ্চিম ইউরোপের পক্ষ থেকে উসমানীয়দের রুখতে আর কোনো পদক্ষেপ নেয়ার কথা জানা যায়নি। নিকোপলিসের এ যুদ্ধে খ্রিস্টান জোটশক্তির এমন ভরাডুবি, ক্রুসেডের ব্যাপারে তাদেরকে বেশ হতোদ্যম করে দেয়। এদিকে অল্প কিছুদিন পর ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের মাঝে আবারও শুরু হয় মাঝখানে স্তিমিত হয়ে পড়া শতবর্ষের যুদ্ধ।

এ জয়ের ফলে উসমানীয় সাম্রাজ্যের প্রতিপক্ষ শক্তিগুলো সেভাবে মাথা তুলে আর দাঁড়াবার সাহস করতে পারেনি। বলকান অঞ্চলে কঠোর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে উসমানীয় বাহিনী আবারও ফিরে গেল কনস্টান্টিনোপলে। সুলতান বায়েজিদ বিজয়ের সংবাদসমেত হাদিয়া তোহফা প্রেরণ করেন আশপাশের সকল মুসলিম নেতাদের কাছে। নিজের জন্য গ্রহণ করে 'সুলতানুর-রুম' উপাধি। এরপর কায়রোতে আব্বাসি খলিফার কাছে এ উপাধির স্বীকারোক্তি চেয়ে পত্র পাঠান তিনি, যাতে এতদাঞ্চলে তার প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ সপ্রতিষ্ঠ হয়। এদিকে মামলুক সুলতান এ উপাধির স্বীকারোক্তিদানে আব্বাসি খলিফার সাথে সহমত জ্ঞাপন করে। কারণ, উসমানি সুলতান বায়েজিদই ছিল তৈমুর লংয়ের বিরুদ্ধে তার একমাত্র সহযোগী।

সর্বোপরি, ক্রুসেডারদের সহায়তায় থাকা বা তাদের এ আক্রমণের পক্ষে নমনীয়

ইউরোপের জন্য ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন হয়ে ওঠেন। কিন্তু ইতিমধ্যে উসমানি সাম্রাজ্য তৈমুর লংয়ের হাত পড়ে যাওয়ায় পতনের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যাওয়া বাইজান্টাইন ছেড়ে তিনি সাম্রাজ্য বাঁচাতে তৈমুর লংয়ের মোকাবেলায় চলে যান।

আঙ্কারার যুদ্ধ ও তৈমুর লং

BATTLE OF ANKARA & TIMUR LANG

তারিখ:	৮০৪ হিজরি / ১৪০২ খ্রি.
স্থান:	আঙ্কারা
ফলাফল:	মুসলিম বাহিনীর পরাজয়

পক্ষ-বিপক্ষ:	উসমানি সাম্রাজ্য	তিমুরীয় সাম্রাজ্য
সেনাপ্রধান:	সুলতান ১ম বায়েজিদ	তৈমুর লং
সেনাসংখ্যা:	৮৫ হাজার	১ লক্ষ ৪০ হাজার
ক্ষয়ক্ষতি:	প্রায় ৫০ হাজার শহিদ	মুসলিম বাহিনীর তুলনায় খুব সামান্য (৮/১০ হাজারের মতো)

১৪০২ সালের শীতকালের কথা। তৈমুর বাহিনীর তৎপরতা দেখেই বোঝা যেতে থাকল যে, তিনি বোধহয় উসমানীয় বাহিনীর বিপক্ষে বড়রকমের কোনো অভিযানে নামতে যাচ্ছেন। এ ব্যাপারে অবশ্য আপত্তি তুলেছিল তিমুরীয় সাম্রাজ্যের কিছু আমির। তাদের দাবি ছিল, জ্যোতিষীর ভাগ্য গণনায় দেখা গেছে, এখন যুদ্ধযাত্রা করা অশুভ। এর জবাবে তৈমুর নিজে একজন জ্যোতিষী নিয়োগ দেন, যার কাছ থেকে যুদ্ধের পক্ষেই ভবিষ্যদ্বাণী আদায় করে নিয়েছিলেন। এরপর আর তৈমুর দেরি করলেন না, বেরিয়ে পড়লেন আঙ্কারার উদ্দেশে।

তুর্কি-মোঙ্গল সেনাধ্যক্ষ তৈমুর লং ছিলেন তিমুরীয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। ১৩৭০ থেকে ১৪০৫ সাল পর্যন্ত পঁয়ত্রিশ বছর ছিল তার রাজত্ব। আজকের দিনের তুরস্ক, সিরিয়া, ইরাক, কুয়েত, ইরান থেকে মধ্য এশিয়ার অধিকাংশ অংশ তথা কাজাখস্তান, আফগানিস্তান, রাশিয়া, তুর্কমেনিস্তান, উজবেকিস্তান, কিরগিজস্তান, পাকিস্তান, ভারত, এমনকি চিনের কাশগড় পর্যন্ত তার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৪০২ সালের ২০ জুলাই আঙ্কারার নিকটে চুবুকের যুদ্ধক্ষেত্রে উসমানীয় সাম্রাজ্য ও তৈমুরি সাম্রাজ্যের মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়। ইতিহাস সেই যুদ্ধকেই 'আঙ্কারার যুদ্ধ' বলে চেনে। তৈমুরিদের কাছে এ যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয় উসমানি সুলতান প্রথম বায়েজিদ। ফলশ্রুতিতে উসমানীয় সাম্রাজ্যে দেখা দেয় ভয়ঙ্কর গৃহযুদ্ধ। ধীরে ধীরে উসমানীয়রা তাদের জৌলুস হারাতে থাকে। কিন্তু আঙ্কারার যুদ্ধের তিন বছরের মাথায় তৈমুর লং মারা যান। তার মৃত্যুর পর তৈমুরি সাম্রাজ্যের অবনতি হতে থাকে এবং পুনরায় উসমানীয় সাম্রাজ্য ক্রমান্বয়ে শক্তিশালী হতে থাকে। ইতিহাসের এই দিক-বদলে-দেয়া যুদ্ধের বিবরণে যাওয়ার আগে দ্বিতীয় চেঙ্গিস হবার স্বপ্ন নিয়ে জন্মানো খোঁড়া তৈমুরের জীবনে আমরা খানিক আলোকপাত করার প্রয়াস পাব, ইনশাআল্লাহ!

মানবখেকো মানবের জন্ম

১৩৩৬ সালের কথা। নিশুতি রাত। উজবেকিস্তানের প্রতিটি ঘরের বাতি নিভে গেছে। গভীর ঘুমে বিভোর উজবেকবাসী। কিন্তু ঘুম নেই শুধু একটি ঘরে। সমরকন্দ থেকে প্রায় ৫০ মাইল দূরে অবস্থিত কেশ নগরীর স্কারদু শহরের সবচেয়ে বড় বাড়িতে এখনো নিভু নিভু অবস্থায় প্রদীপ জ্বলছে। ঘরের বাইরে উঠানে অস্থির পায়চারি করছেন বাড়ির মালিক তারাগে। তিনি এই অঞ্চলের ভূস্বামী। হঠাৎ তার স্ত্রীর প্রসববেদনা ওঠায় তিনি চিন্তিত। শহরে লোক পাঠানো হয়েছে ধাত্রীর খোঁজে, কিন্তু তারা এখনো ফিরে আসেনি। মনে মনে সৃষ্টিকর্তার নিকট প্রার্থনা করছেন তিনি। শেষপর্যন্ত তার ডাকে সাড়া দিলেন সৃষ্টিকর্তা। ভোরের প্রথম আলোর সাথে ভূমিষ্ঠ হলো এক পুত্রসন্তান। পুত্রের নাম রাখা হলো 'তৈমুর', যার সরল অর্থ দাঁড়ায়—'লৌহ'। ইউরোপে তিনি 'তিমুর' (Timur) বা 'তিমুরলেন' (Timurlane) নামে পরিচিত।

হয়তো তার নামকরণের সার্থকতা প্রমাণের জন্যই তৈমুর বেশ দুরন্ত এবং সাহসী কিশোর হিসেবে বেড়ে ওঠেন। এমনকি ঐ বয়সেই ছোটখাট ডাকাত বাহিনীও গড়ে তুলেছিলেন তিনি। এলাকা ঘুরে ঘুরে ছোটখাটো জিনিস লুট করে বেড়াত তারা। দেখতে দেখতে তৈমুর যৌবনে পদার্পণ করেন। বয়সের সাথে সাথে তার শক্তি এবং সাহস, দুটোই বৃদ্ধি পেয়েছে। এবার সত্যিকারের দস্যুদল গঠন করেন তিনি। তৈমুরের দাপটে এলাকার ধনীরা আতংকিত হয়ে থাকত। যুবক তৈমুরের ডান পা এক দুর্ঘটনায় পঙ্গু হয়ে যায়। কিন্তু ঠিক কীভাবে তিনি খোঁড়া হয়েছিলেন, ইতিহাস তা আমাদের অতটা নিশ্চিত করে বলে না।

একদল ইতিহাসবিদের মতে, একবার তৈমুর তার দলবল নিয়ে এক বণিকের ভেড়ার পাল লুট করতে যান। কিন্তু ফেরার পথে রাখালদের তিরের আঘাতে মারাত্মকভাবে জখম হন তৈমুর। তার ডান হাত এবং ডান পা চিরতরে অকেজো হয়ে যায়। এরপর থেকে তিনি 'খোঁড়া তৈমুর' বা 'তৈমুর-ই-লং' নামে পরিচিত হন।

অদম্য হিংস্র হয়ে ওঠা

এক পা খোঁড়া হয়ে গেলেও তৈমুর দমে যাননি। আহত বাঘের মতো আরও হিংস্র হয়ে ওঠেন তিনি। তৈমুরের সময়ের প্রায় একশত বছর পূর্বে চেঙ্গিস খান পুরো পৃথিবীর শাসন করেছিলেন। তৈমুর মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন, তিনিও একসময়

চেঙ্গিসের মতো পৃথিবী শাসন করবেন। তাই খোঁড়া পা নিয়ে সমরবিদ্যার প্রশিক্ষণ নিয়ে নেন। কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে তিনি অস্ত্র চালনা ও যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে ওঠেন।

তৈমুর যখন টগবগে যুবক, তখন সমগ্র মধ্য এশিয়া (আমু দরিয়া এবং সির দরিয়ার নদীবিধৌত অঞ্চল) জুড়ে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা তৈরি হয়। বিভিন্ন যাযাবর দল এবং স্থানীয় নেতাদের মধ্যে যুদ্ধ তখন পায়ে পায়ে। অপরদিকে স্থানীয় নেতারা অনেকটা পশ্চিমা মতাদর্শে শাসন করতেন। তারা চেঙ্গিস খান, কুবলাই খানের শাসনব্যবস্থা পরিত্যাগ করেছিলেন আগেই। এই কারণে স্থানীয় জনগণ তাদের উপর অসন্তুষ্ট ছিল। ১৩৪৭ সালে আমির কাজগান স্থানীয় নেতা চাগতাইদের সর্দার বরলদেকে হটিয়ে নিজে ক্ষমতা দখল করেন। কিন্তু ১৩৫৮ সালে তিনি অকস্মাৎ এক ঘাতকের হাতে নিহত হন।

এবার ক্ষমতায় আসেন তুঘলক তিমুর। তিনি রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের উদ্দেশ্যে বারলাস অঞ্চলের শাসক হিসেবে তৈমুর লংকে নিযুক্ত করেন। কিন্তু তৈমুর ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকেই তুঘলককে অপসারণ করার নীলনকশা তৈরি করতে থাকেন। তবে দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি তুঘলকের হাতে ধরা পড়ে যান। তুঘলক তিমুর তৈমুরকে ক্ষমতাচ্যুত করেন। এবার তৈমুর লং স্বয়ং আমির কাজগানের নাতি আমির হুসেইনের সাথে হাত মিলিয়ে নেন।

তৈমুর হুসেইনের বোনকে বিয়ে করেন। তারা দুজন মিলে ১৩৬৪ সালে তুঘলক তিমুরের পুত্র আমির খোজাকে পরাজিত করে মধ্য এশিয়ার সিংহাসন দখল করেন। তৈমুর এবং হুসেইন যৌথভাবে শাসন করতে থাকেন অধিকৃত এলাকায়। কিন্তু তৈমুর তাতেও সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি হুসেইনকে হটিয়ে দেয়ার সুযোগ খুঁজতে থাকেন। এদিকে ১৩৭০ সালে হঠাৎ তৈমুরের স্ত্রী মৃত্যুবরণ করেন। এই মৃত্যু তৈমুরের জন্য শাপে বর হয়ে আসে। এবার আর হুসেইনের সাথে তার কোনো পারিবারিক বন্ধন অবশিষ্ট থাকল না। কৌশলের পথ বন্ধ দেখে তৈমুর হিংস্র হয়ে ওঠেন। তিনি আমির হুসেইনকে হত্যা করে নিজেকে মধ্য এশিয়ার একচ্ছত্র অধিপতি হিসেবে ঘোষণা করেন। শুরু হয় তৈমুর লংয়ের স্বৈরাচারী শাসন।

সাম্রাজ্যের লোভ

তৈমুর মঙ্গোল সাম্রাজ্যের খান হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু চেঙ্গিস খানের সাথে পারিবারিক সম্পর্ক না থাকায় তিনি মঙ্গোলদের আমির হিসেবেই শাসন করেন। তিনি রণকৌশলে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। তাই ক্ষমতা লাভের কয়েক বছরের মাথায় অনায়াসেই পুরো মধ্য এশিয়ার অধিপতি হয়ে যান। কিন্তু তৈমুরের লোভ যেন থামে না। তিনি আরও চান। তিনি চেঙ্গিসের মতো পুরো পৃথিবী শাসন করতে চান। তৈমুর তার সামনে চেঙ্গিস খানের মানচিত্র মেলে ধরেন। পুরো মানচিত্রে একবার চোখ বুলিয়ে নেন তিনি। এতে তার বিশ্বজয়ের আকাঙ্ক্ষা আরও বেড়ে যায়। আর তা এতটাই যে, পরদিনই তিনি বিশাল সেনাবহর নিয়ে বিশ্বজয়ের উদ্দেশ্যে বের হয়ে যান। তৈমুরের অভিযানের খবর পেয়ে ক্ষমতাচ্যুত মঙ্গোল খান তোকতামিশ তৈমুরের সাহায্য প্রার্থনা করেন। তোকতামিশ খান শত্রুদের হাতে আক্রান্ত হয়ে রাশিয়ার মসনদ হারিয়েছিলেন। তৈমুর লং বিশাল সেনাবহর নিয়ে রাশিয়া আক্রমণ করেন এবং তোকতামিশ খানকে রাশিয়ার হৃত সিংহাসন ফিরিয়ে দেন। এরপরই তৈমুর কোনো বিরতি না নিয়ে পারস্যের দিকে রওনা হন। সেখানে তার অভিযান শুরু হয় হেরাত নগরী দখলের মাধ্যমে।

প্রথমদিকে কার্তিদ সাম্রাজ্যের রাজধানী হেরাত তৈমুরের নিকট আত্মসমর্পণ করতে অপারগতা প্রকাশ করে। তৈমুর যেন এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। তিনি হেরাতের সকল নাগরিককে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করার আদেশ দেন। আদেশ পাওয়া মাত্র তৈমুরবাহিনী হেরাতবাসীর উপর চড়াও হয়ে ওঠে। তৈমুর বাহিনীর আগ্রাসনে ভয়াল মৃত্যু-নগরীতে পরিণত হয় হেরাত। শেষপর্যন্ত ১৩৮৩ সালে হেরাত তৈমুরের পায়ে লুটিয়ে পড়ে পরাজয় স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়। এরপর তৈমুর তার বাহিনী নিয়ে আরও পশ্চিমে অগ্রসর হতে থাকেন। ততদিনে তৈমুরের নৃশংসতার খবর পারস্যের ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছে।

তৈমুর তেহরানের মাটিতে পা দিলেন। তেহরান নির্দ্বিধায় তৈমুরের নিকট আত্মসমর্পণ করে। ধীরে ধীরে এশিয়া মাইনর, সিরিয়া, আফগানিস্তান এবং ইরাকের কিছু অংশ তৈমুরের দখলে চলে আসে। তৈমুর যখন দেশ দখলে ব্যস্ত, তখন তার কানে খবর পৌঁছে, বিভিন্ন অঞ্চলের নেতারা তৈমুরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। ক্রুদ্ধ তৈমুর অভিযান ক্ষান্ত দিয়ে কঠোর হাতে বিদ্রোহ দমন করেন। আফগানিস্তানে বিদ্রোহীদের হত্যা করার পর তিনি একটি মিনার নির্মাণ করেন। মিনার নির্মাণের

সরঞ্জাম ছিল বিদ্রোহীদের মস্তক। ইস্পাহান শহরের ৭০ হাজার বিদ্রোহীর মাথার খুলি একটি অপরটির উপর জুড়ে দিয়ে মিনার তৈরি করা হয়। এভাবে ভয়ঙ্কর হত্যা ও নৃশংসতার মধ্য দিয়ে ১৩৮৫ সালে পুরো পারস্য তৈমুরের দখলে চলে আসে।

১৩৮৭ সালে তৈমুরের মিত্র তোকতামিশ মধ্য এশিয়া আক্রমণ করে বসেন। নিজের ঘর বাঁচাতে তৈমুর সব ফেলে নিজ অঞ্চলে ফিরে আসেন। তৈমুরের বিশাল বাহিনীর হাতে পরাজয় ঘটে তোকতামিশ খানের। তোকতামিশ খান কোনোমতে প্রাণ নিয়ে রাশিয়ায় ফেরত যান। তৈমুর ১৩৯২ সালে পুনরায় পশ্চিমে অভিযান চালান এবং ইরাক দখল করে নেন। মঙ্গোল খানদের গৌরব 'গোল্ডেন হোর্ড' বা 'ইলখানাত' তৈমুরের নিকট অসহায় পরাজয় বরণ করে। তৈমুরের পূর্বে কেউ ইলখানাত ধ্বংস করতে পারেনি। এবার তিনি রাশিয়ার দিকে অগ্রসর হন। তেরেক নদীর তীরে তোকতামিশ খান এবং তৈমুর ফের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। এবারও তৈমুরের কাছে পরাজিত হন তিনি। এরপর ১৩৯৫ সালে তৈমুর মস্কো দখল করেন। অগ্নিস্নাত মস্কোর সামনে দাঁড়িয়ে তৈমুর তৃপ্তির হাসি দেন। তবে তার ক্ষুধা তখনো মিটেনি। সেদিনই মনে মনে ছক কষতে থাকেন তৈমুর—এবার চেঙ্গিসের চোখ ফসকে যাওয়া ভারতবর্ষ অধিকারের পালা।

ভারতবর্ষে হত্যাযজ্ঞ

ভারতবর্ষ আজীবন তৈমুরকে মনে রাখবে তার অমানুষিক নৃশংসতার জন্য। এখানকার তৎসময়ের অধিপতি ফিরোজ শাহের মৃত্যুর পর ক্ষমতার দ্বন্দ্বে বিভিন্ন নেতারা বিবাদে জড়িয়ে পড়েন। চতুর তৈমুর এই সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইলেন না। ১৩৯৮ সালের শেষের দিকে প্রায় ৯০ হাজার সৈন্য নিয়ে সিন্ধু নদের পাড়ে হাজির হন তৈমুর লং। দূর থেকে তাকে ও তার বাহিনীকে দেখে ভয় পেয়ে যায় ভারতবাসী। যেন তৈমুর নয়, সাক্ষাৎ যমদূত তার দলবল নিয়ে তাদের সামনে হাজির হয়েছেন।

সিন্ধু নদ পাড়ি দিয়েই তৈমুর হত্যাযজ্ঞে মেতে ওঠেন। নির্বিচারে সাধারণ মানুষ হত্যা করতে করতে দিল্লীর দিকে অগ্রসর হতে থাকেন তিনি। প্রায় এক লাখ মানুষ হত্যার পরে তিনি দিল্লী গিয়ে পৌঁছান। দিল্লীর সুলতান নাসিরুদ্দিন শাহ তুঘলক হস্তিবাহিনী নিয়ে তৈমুরের প্রতিরোধে এগিয়ে যান। বুদ্ধিমান তৈমুর এবার নতুন কৌশল অবলম্বন করলেন। হাজার হাজার উটের পিঠ খড়ের গাদা দিয়ে বোঝাই

করে ফেললেন। এরপর খড়ের গাদায় আগুন লাগিয়ে উটগুলোকে হস্তিবাহিনীর দিকে হাঁকিয়ে দিলেন। সুলতানের হস্তিবাহিনী জ্বলন্ত উটের আগ্রাসনে ভয় পেয়ে পালাতে শুরু করল। তৈমুরকে ঠেকাতে তার কৌশল হিতে বিপরীত কাজ করল। হাতিগুলো উল্টো ঘুরে সুলতান ও তার পক্ষীয় বাহিনীকেই আক্রমণ করে বসল।

নিজেদের বাহিনীর হাতেই পরাজিত হন সুলতান। দিল্লী দখলের আনন্দে তৈমুরের সেনারা শহরজুড়ে রক্তের বন্যা বসিয়ে দেয়। তৈমুর ভারতবর্ষ শাসন করেননি। তিনি ভারতবর্ষ থেকে বহু মূল্যবান সম্পদ লুট করে সমরকন্দে ফিরে যান। ভারত অভিযানরত অবস্থায় তৈমুর বাগদাদের দখল হারানোর দুঃসংবাদ পান। ১৩৯৯ সালে তৈমুর পুনরায় বাগদাদ আক্রমণ করেন। বরাবরের মতোই তিনি অনায়াসে বাগদাদ পুনর্দখল করে নেন। এবার তৈমুরের নিষ্ঠুরতা যেন আরও বেড়ে যায়। তার আদেশে বাগদাদের ২০ হাজার বিদ্রোহীর শিরশ্ছেদ করা হয়।

উসমানি সাম্রাজ্যে তৈমুরঃ আঙ্কারার নাকাড়া

তৈমুরের উসমানীয় সাম্রাজ্য দখলের পূর্বপরিকল্পনা থাকলেও শুরুতে পরিস্থিতি অতটা উত্তপ্ত ছিল না। কিন্তু তৈমুরের এক চিঠির জবাবে উসমানি সুলতান প্রথম বায়েজিদের রাগান্বিত প্রত্যুত্তর আস্তে আস্তে ঘোলাটে করে ফেলে পুরো ব্যাপারটিকে। মূল ঘটনা হলো, আনাতোলিয়া অঞ্চলে নিজের প্রভাব বিস্তৃত করে চলছিলেন উসমানীয় সাম্রাজ্যের চতুর্থ সুলতান প্রথম বায়েজিদ। একে একে বিভিন্ন অঞ্চলই মেনে নিচ্ছিল তাদের আনুগত্য। এ সময়ে কিছু সাম্রাজ্যবিরোধী কতিপয় আমির পালিয়ে চলে যান সীমান্তবর্তী তিমুরীয় সাম্রাজ্যে। তারা গিয়ে তৈমুর লংয়ের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলে তিনি তা মঞ্জুর করে নেন। অন্যদিকে জালায়িরিদ শাসক সুলতান আহমেদ এবং কারা কয়োনলু নামক এক শিয়া এবং অঘুজ তুর্কি গোত্রের প্রধান কারা ইউসুফকে আশ্রয় দিয়েছিলেন সুলতান বায়েজিদ। এ দুজনই আবার ছিলেন তৈমুরের ঘোর প্রতিপক্ষ।

নিজের শত্রুদেরকে পার্শ্ববর্তী সাম্রাজ্যে এভাবে সমাদৃত হতে দেখাটা মোটেই সুখকর ছিল না তৈমুরের জন্য। তাই তিনি চিঠি লিখলেন বায়েজিদের কাছে, ফেরত চাইলেন বিদ্রোহীদের। এ চিঠিতে তিনি ইউরোপীয়দের বিরুদ্ধে উসমানীয় বাহিনীর যুদ্ধজয়ের প্রশংসা করেছিলেন বলে জানা যায়। তবে সেই সাথে যারা তার বিরুদ্ধে যায়, তাদের পরিণতিও যে সুখকর হয় না, সেই কথাও তিনি স্মরণ করিয়ে

দিয়েছিলেন সুলতান বায়েজিদকে।

মাত্র কিছুদিন আগেই নিকোপলিসের যুদ্ধে জয় পেয়েছিলেন সুলতান বায়েজিদ। বিজয়ের গৌরব তখনো তার গা-ছাড়া হয়নি। তৈমুর লংয়ের চিঠিকে তাই আমলেই নিলেন না তিনি। বরং এমন চিঠি পেয়ে ক্রোধান্বিত হয়ে তিনি অপমানসূচক ভাষায় কিছু কড়া কথা লিখে দেন তৈমুরকে। এ আগুনে ঘিও ঢেলেছিলেন সুলতান নিজেই। ১৩৯৯-১৪০০ সালের শীতে নিজের ছেলে এবং একইসাথে উসমানীয়দের অনুমিত ভবিষ্যৎ সুলতান সুলায়মান সেলেবিকে আর্মেনিয়ায় পাঠান। সেখানে তৈমুরের মিত্র এর্জিনকানের তাহার্তেনকে আক্রমণ করে কামাখ শহর দখল করে নেবার জন্য। এমন কিছু মোটেই প্রত্যাশা করেনতনি তৈমুর। তবে জবাব দিতেও তিনি বিন্দুমাত্র কার্পন্য করেননি। ১৪০০ সালের গ্রীষ্মের সময় সিভাসে ঝড়ের বেগে গিয়ে এক তাণ্ডবলীলা চালিয়ে আসেন তিনি। উসমানীয় সাম্রাজ্যের অধীনে থাকা সেই এলাকার মুসলিমদের অধিকাংশকে মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দেয়া হলেও আর্মেনীয় খ্রিস্টানদের অনেককেই হত্যা করে ফেলা হয়েছিল বলে জানা যায়। এরপর তৈমুর যাত্রা শুরু করেন মিশরের উদ্দেশে। তবে ততক্ষণে ইতিহাসবিখ্যাত দুই সমরনায়কের মাঝে যুদ্ধের পথ উন্মুক্ত হয়ে গেছে।

ওদিকে সুযোগের অপেক্ষায় ছিল কনস্টান্টিনোপলও। সুলতান বায়েজিদ তখন নিকোপলিসের যুদ্ধের পর আবারও অবরোধ শুরু করেছেন সেখানে। ফলে অভাব-অনটন আস্তে আস্তে জাপটে ধরছে নগরবাসীকে। তখন বাইজান্টাইনদের সম্রাট ছিলেন ম্যানুয়েল দ্বিতীয় পালাইয়োলগোস। তিনি তার আত্মীয় জনকে কিছুদিনের জন্য রাজপ্রতিভূ হিসেবে নিযুক্ত করে গোপনে গোপনে ১৩৯৯ সালে পাড়ি জমান ইউরোপে। সেখানে বিভিন্ন রাজদরবারে সাহায্যের আশায় ঘুরতে থাকেন তিনি।

রোম, মিলান, প্যারিসে রাজা ষষ্ঠ চার্লস, এমনকি ইংল্যান্ডে রাজা চতুর্থ হেনরির সাথেও দেখা করে আসেন তিনি। ফ্রান্সের রাজা তাকে কনস্টান্টিনোপল থেকে উদ্ধারের জন্য আগেই নাইটদের দিয়ে সহায়তা করেছিলেন। তাই নতুন করে সাহায্য পাঠাতে নিজের অপারগতা প্রকাশ করেন তিনি। অন্যদিকে নিকোপলিসে পরাজয়ের পর, ইউরোপের অন্যান্য পরাশক্তিও নতুন করে উসমানীয় বাহিনীর সাথে ক্রুসেডে জড়ানোর মতো অবস্থায় ছিল না। আবার রাজপ্রতিভূর দায়িত্বে থাকা জনও বায়েজিদ বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পনের জন্য মানসিক প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলে গুজব শোনা যাচ্ছিল। ফলে সব মিলিয়ে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের অবস্থা তখন পুরোপুরি টালমাটাল।

ওদিকে তৈমুর আর বায়েজিদের মাঝে উত্তপ্ত চিঠি বিনিময় তখনো চলছিল। তৈমুর অবশ্য আরেকটি কাজ করেছিলেন। তিনি 'শত্রুর শত্রু বন্ধু'-নীতি অবলম্বন করে বায়েজিদের প্রতিপক্ষদের সাথে সম্পর্কোন্নয়নে জোর দেন। কৃষ্ণ সাগরের উপকূলে অবস্থিত রাজ্য ট্রেবিজন্ডের কথাই বলা যায়, যার রাজা ছিলেন ম্যানুয়েল তৃতীয় কমনেনস। উসমানীয় বাহিনীকে পর্যুদস্ত করতে যারা শুরুর দিকে তিমুরীয় বাহিনীর সাথে হাত মিলিয়েছিল, তিনি ছিলেন তাদের একজন।

এবার তৈমুর সরাসরি মাঠে নেমে এলেন। ১৪০২ সালের শীতকালে তিনি উসমানীয় বাহিনীর সাথে যুদ্ধের জন্য বের হয়ে এলেন। তৈমুর অবশ্য একেবারে কোমর বেঁধেই মাঠে নেমেছিলেন। উসমানীয় বাহিনীর শক্তি-সামর্থ্য ও পূর্ব ইতিহাস নিয়ে ভালোভাবে জানাশোনা ছিল বলেই তিনি সমরকন্দে সৈন্য সাহায্য চেয়ে দূত পাঠিয়েছিলেন। পরবর্তীতে এ বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তৈমুরের নাতি মুহাম্মদ সুলতান। উত্তর-পূর্ব প্রান্ত দিয়ে সসৈন্যে আনাতোলিয়ায় প্রবেশ করেন তৈমুর লং। এ বাহিনীরই আরেকটি অংশ এগিয়ে গিয়েছিল কামাখ শহরে তৈমুরের মিত্র তাহার্তেনের সাহায্যার্থে এবং তারা সেখানে সফলতার মুখও দেখে।

এরপর আর্জুরুম হয়ে সিভাস নগরীর দিকে অগ্রসর হয় তৈমুরের বাহিনী। পথে সুলতান বায়েজিদের কূটনীতিকদের সাথে দেখা হয়ে যায় তার। তাদের সাদরে গ্রহণ করলেও তৈমুর ফিরিয়ে দিয়েছিলেন তাদের আনা উপহারগুলো। উভয়পক্ষই তাদের পূর্বের দাবিতে অটল থাকে। তৈমুরও তাই আর যুদ্ধের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসার চিন্তা করেন না। বরং নিজের বাহিনী সম্পর্কে ধারণা দিতে তিনি সেনা শিবিরে নিয়ে যান সেই কূটনীতিকদের। চাগাতাই, পারস্য, জর্জিয়া, ভারত এবং আরও অনেক এলাকা থেকে আসা সৈন্যরা একে একে প্যারেড করে যায় তাদের সামনে দিয়ে, বাহিনীর নেতারা আনুগত্য প্রদর্শন করেন তৈমুরের প্রতি। সেখানে অশ্বারোহী তিরন্দাজের সংখ্যাই ছিল বেশি। এছাড়া ভারী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত যোদ্ধা যেমন ছিল, তেমনি ছিল ভারত থেকে আনা যুদ্ধ-হাতিও!

বসে ছিলেন না সুলতান প্রথম বায়েজিদও। নিজের এলাকার পাশাপাশি মিত্র রাজ্যগুলো থেকে সৈন্য সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন তিনি। এদের মাঝে অবশ্য আগের মতোই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল জেনিসারি বাহিনী ও সিপাহীরা। সার্বিয়া থেকে ভারী অস্ত্রে সজ্জিত বিশাল অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে এসেছিলেন সার্বিয়ার সামন্তরাজ স্টেফান লাজারেভিচ। ক্রিমিয়া থেকে এসেছিল একদল কিপচ্যাক তাতার। আবার কারামান ও ইরেৎনা থেকেও এসেছিল বড় সংখ্যক অশ্বারোহী

সেনারা।

তৈমুর লং কিংবা সুলতান বায়েজিদ—কার বাহিনীতে ঠিক কত সংখ্যক সেনা ছিল, সেই বিষয়ে বিস্তর দ্বিমত রয়েছে ঐতিহাসিকদের মাঝে। তৈমুর যে বাহিনী নিয়ে যুদ্ধ করতে এসেছিলেন বায়েজিদের সাথে, তাদের সাথে পরবর্তীতে বায়েজিদ বাহিনীর বিশ্বাঘাতকরাও যোগ দিয়েছিল। একদল ঐতিহাসিকের মতে, উভয় পক্ষেই ছিল প্রায় দশ লক্ষের মতো সেনা। তবে কেউ কেউ অবশ্য তৈমুর ও বায়েজিদ বাহিনীর বেলায় এ সংখ্যা যথাক্রমে ৮০০০০০ ও ৪০০০০০ বলেই উল্লেখ করেছেন। কারও মতে, তৈমুর বাহিনীতে ৬০০০০০ এবং বায়েজিদ বাহিনীতে মাত্র ১২০০০০-এর মতো সেনা উপস্থিত ছিল। আধুনিক যুগের ঐতিহাসিকেরা অবশ্য সৈন্য সংখ্যা এত বিশাল বলে মানতে নারাজ। তাদের মতে তৈমুর লং ও সুলতান বায়েজিদের বাহিনীতে যথাক্রমে ১৪০০০০ ও ৮৫০০০-এর মতো সৈন্য হাজির ছিল।

সুলতান বায়েজিদ যখন তার কূটনীতিকদের সাথে তৈমুরের আচরণের কথা জানতে পারলেন, তখন তিনি খুব একটা আশ্চর্য হননি। বরং কনস্টান্টিনোপলের অবরোধ পরিত্যাগ করে তিনি বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হয়ে যান আনাতোলিয়ার পথে। তৈমুরের সাথে হিসাব-নিকাশ এবার পাকাপাকিভাবেই মিটিয়ে নেয়ার পণ করেছিলেন তিনি। বিচক্ষণ বায়েজিদ বুঝতে পেরেছিলেন যে, যুদ্ধের জন্য তৈমুরের অশ্বারোহী বাহিনী আঙ্কারার সমতল ভূমিকেই বেছে নিবে। তাই তিনি তার বাহিনী নিয়ে সোজা সেদিকেই রওনা হয়েছিলেন। দ্রুতবেগে সেখানে পৌঁছে অবশ্য হতাশ হতে হয়েছিল তাদের। কারণ সেখানে পৌঁছানোর পর তারা জানতে পারে যে, সিভাসের উত্তরে টোকাত অঞ্চলে ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছে তিমুরীয় বাহিনী। যখন তারা বায়েজিদ বাহিনীর এখানে আসার কথা শুনতে পেল, সাথে সাথেই তৈমুর তার বাহিনীকে ঝড়ের বেগে সিভাস থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে যেতে নির্দেশ দিলেন। কিজিলির্মাক নদীর তীর ধরে তারা কায়সেরিতে পৌঁছে। সেখানে অল্প বিশ্রাম ও ঘোড়াগুলোকে খাওয়ানোর পর তারা আবার রওনা হয়ে পড়ে; উদ্দেশ্য—তখন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আঙ্কারায় পৌঁছা। আসলে এটা ছিল তৈমুর লংয়ের চমৎকার এক কৌশল। একদিকে তিনি যেমন উসমানীয় বাহিনীকে অতিরিক্ত ঘুরিয়ে ভ্রমণক্লান্তিতে জর্জরিত করতে চাচ্ছিলেন, তেমনি যুদ্ধক্ষেত্র নির্বাচনের স্বাধীনতাও নিয়ে নিচ্ছিলেন নিজের দিকে। এর ফলে সকল সমীকরণই যে একসময় তার পক্ষে যাওয়া শুরু করে, তা যুদ্ধের ফলাফল দেখলে যে-কেউ টের পাবে।

টানা আটদিন বিরামহীন যাত্রার পর অবশেষে আঙ্কারায় এসে পৌঁছে উসমানীয়

বাহিনী। একটানা এ ভ্রমণের ফলে পিপাসা ও ক্লান্তিতে কাবু হয়ে পড়েছিল তাদের অধিকাংশ সেনাই। ওদিকে তৈমুর ঠিকই চুবুক শহরের উত্তর-পূর্বদিকে প্রয়োজনীয় প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের যথেষ্ট সময় হাতে পেয়েছিলেন। বায়েজিদ সেখানে এসে পৌঁছান ২৭ জুলাই। তার জেনারেলদের অনেকেই তাকে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দিচ্ছিল। তবে সেই পরামর্শ আমলে না নিয়ে বরং আক্রমণাত্মক রণকৌশলই বেছে নিয়েছিলেন সুলতান।

আঙ্কারার ময়দানে

অনেকটা অর্ধচন্দ্রাকারে সাজানো উসমানীয় বাহিনীর ডান ভাগের নেতৃত্বে ছিলেন সুলতান বায়েজিদের ছেলে সুলায়মান সেলেবি। রুমেলীয় বাহিনী এবং আনাতোলিয়া থেকে আগত তুর্কি যোদ্ধাদের সমন্বয়ে গঠন করা হয়েছিল এ বাহিনী। বাম দিকের বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন সার্বিয়ার সামন্তরাজ স্টেফান লাজারেভিচ। এ বাহিনীতে সার্বিয়া থেকে আগত ভারী অস্ত্রে সজ্জিত নাইটদের পাশাপাশি আনাতোলীয়ার যোদ্ধারাও ছিল। মাঝখানের বাহিনীটি সাজানো হয়েছিল জেনিসারি ও আজাপদের দিয়ে যার নেতৃত্বে ছিলেন সুলতান নিজেই। সেই সাথে ছিল তার তিন ছেলে—ইসা, মুসা ও মুস্তফা।

তিমুরীয় বাহিনীর ডান ও বাম দিকের নেতৃত্বে ছিলেন যথাক্রমে তৈমুরের দুই পুত্র শাহরুখ ও মিরান শাহ। সবচেয়ে শক্তিশালী ছিল তাদের বাহিনীর মধ্যভাগ যার নেতৃত্বে ছিলেন মুহাম্মদ সুলতান। এখানে সমরকন্দ থেকে আসা ভারী অস্ত্র ও বর্মে সজ্জিত অশ্বারোহী বাহিনীর পাশাপাশি ভারত থাকা আনা যুদ্ধ-হাতির পালও ছিল। মধ্যভাগের পেছনে থাকা রিজার্ভ বাহিনীর নেতৃত্বে ছিল তৈমুর নিজে।

যুদ্ধ শুরু হয়েছিল ১৪০২ সালের ২৮ জুলাই সকাল নয়টা কি দশটায়। যুদ্ধের বর্ণনা দেয়ার আগে আঙ্কারার যুদ্ধক্ষেত্র সম্পর্কেও আমাদের খানিক জানা থাকা দরকার। কারণ এ যুদ্ধে তৈমুর লং যুদ্ধক্ষেত্র নিয়ে যে কৌশলের পরিচয় দিয়েছিলেন, নিঃসন্দেহে তা তার পরবর্তী বিজয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিল।

আঙ্কারার যুদ্ধক্ষেত্রটি ছিল দুপাশে পাহাড় দিয়ে ঘেরা বিশাল এক সমতল ভূমি। পশ্চিম দিকের পর্বতমালা থেকে নেমে এসেছিল চুবুকের খাঁড়ি। এর পানি এসে প্রথমে জমা হচ্ছিল একটি জলাশয়ে। পরে সেখান থেকে উত্তর ও দক্ষিণের বিভিন্ন

অংশে প্রবাহিত হচ্ছিল তা। অর্থাৎ যুদ্ধক্ষেত্রের একমাত্র সুপেয় পানির উৎস ছিল এ পশ্চিমের পর্বত বেয়ে আসা এ খাঁড়ির পানি। যে দল জলাশয়ের নিয়ন্ত্রণ নিতে পারবে, পুরো এলাকার পানির নিয়ন্ত্রণও থাকবে সেই দলের হাতে। যুদ্ধ করতে গিয়ে ক্লান্ত ও পিপাসার্ত উসমানীয় বাহিনী খুব বেশি পানি পান করতে পারেনি। কারণ, তিমুরীয় বাহিনী একদিকে যেমন আশেপাশের এলাকার সব কুয়া ধ্বংস করে দিয়েছিল, তেমনি বাঁধ দিয়ে বদলে দিয়েছিল উপরে উল্লেখ করা সেই পানির উৎসের গতিপথও। শুধুমাত্র পানি নিয়ে খাটানো এ কৌশলই বলা যায় যুদ্ধে তৈমুরের বাহিনীকে বিজয়ের দিকে অনেকখানি এগিয়ে দিয়েছিল, মানসিকভাবে করে তুলেছিল অধিক বলীয়ান।

সুলতান বায়েজিদের নির্দেশে তৈমুরের বাহিনীর উদ্দেশ্যে এগিয়ে যায় উসমানীয় বাহিনীর দুই পাশের সেনারা। কিন্তু তিমুরীয় বাহিনীর বৃষ্টির মতো ছোড়া তির আর ফায়ারবলের কাছে টিকতে পারেনি ডানদিকের বাহিনীটি। বাম দিকে থাকা স্টেফানের নাইট বাহিনী অবশ্য বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিল। শুরুতে একমাত্র তাদের তুমুল আক্রমণের ফলে কিছুটা পিছু হটতে বাধ্য হয় তৈমুরের সেনাদল।

অল্প সময়ের মাঝেই বিশ্বাসঘাতকেরা তাদের মুখোশ উন্মোচন করতে শুরু করে। কারামান, আয়দিন ও মেন্তেশ থেকে আগত তুর্কিরা সুযোগ বুঝে যোগ দেয় তিমুরীয় বাহিনীর সাথে। এর পেছনে অবশ্য তৈমুরের সুদূরপ্রসারী চিন্তাকেও কৃতিত্ব দিতে হবে। কারণ যুদ্ধ শুরুর আগে বছরখানেক তিনি আসলে একনিষ্ঠভাবে ঠিক এ কাজগুলোই করে যাচ্ছিলেন, যার সুফল অবশেষে পেলেন যুদ্ধের ময়দানে। হঠাৎ করে এভাবে লোকবল কমে যাওয়ায় বিপদে পড়ে যায় শুরুতে ত্রাসের সঞ্চার করা স্টেফানের বাহিনী। তিমুরীয় বাহিনীর ডানদিকের সাথে কুলিয়ে উঠতে না পেরে পিছু হটতে বাধ্য হয় তারা। অপরদিকে উসমানীয়দের ডানদিকের বাহিনীর উপর হঠাৎ করে একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ে তিমুরীয় সেনারা। আগের তির আর আগুন বৃষ্টির পর এবার সৈন্যদের হামলা আর সামলাতে পারেনি তারা। তাই ঠিকমতো যুদ্ধ শুরু করার আগেই যুদ্ধে হেরে গেছেন ভেবে স্বীয় বাহিনী নিয়ে পালিয়ে যান সুলায়মান সেলেবি।

ততক্ষণে বিশ্বাসঘাতকদের কারণে বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছিল উসমানীয় বাহিনী। তবুও যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে যাননি সুলতান বায়েজিদ, প্রাণপণে লড়ে যাচ্ছিলেন সাথে থাকা জেনিসারিদের নিয়ে। একসময় পালিয়ে যেতে শুরু করে পদাতিক বাহিনীও। তবে জেনিসারিদের সাহায্যার্থে তখনো রণাঙ্গন ছাড়েনি অশ্বারোহী বাহিনী। তখনই

তাদের দিকে বিশাল রিজার্ভ সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হন তৈমুর লং নিজেই। তিনদিক থেকে উসমানীয় বাহিনীকে চেপে ধরে তিমুরীয় বাহিনী।

একপর্যায়ে হার মানতে বাধ্য হয় উসমানীয়দের অশ্বারোহী বাহিনীও। তখন সুলতান তার জেনিসারি ও সিপাহীদের নিয়ে কাছেই এক পাহাড়ের পিছু হটতে শুরু করেন। মরণপণ যুদ্ধের শপথই যেন সেদিন নিয়েছিলেন তিনি। স্টেফান লাজারেভিচ অনেক অনুরোধ করেছিলেন সুলতানকে পালিয়ে যাবার জন্য। তবে সুলতান সেই কথায় কর্ণপাত না করে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য আর পারেনি উসমানীয় বাহিনী। তারা পরাজিত হয় তৈমুর লংয়ের বহুজাতিক সেই বাহিনীর কাছে, বন্দি হন সুলতান বায়েজিদ স্বয়ং। তার আরেক ছেলে মুস্তফা সেলেবিও সেদিন বন্দি হয়েছিলেন। তাকে ১৪০৫ সাল পর্যন্ত সমরকন্দে আটকে রাখা হয়েছিল।

কারাগারে সুলতান

উসমানীয় ও তিমুরীয় বাহিনীর মরণপণ এ যুদ্ধে শেষপর্যন্ত জয়ী হয় তৈমুর লংয়ের বাহিনীই। যুদ্ধে প্রায় ৫০০০০-এর মতো তুর্কি সেনা মৃত্যুবরণ করেছিলেন বলে জানা যায়। ওদিকে বন্দি সুলতান বায়েজিদকে নিজের সাথেই নিয়ে যান তৈমুর। অবশেষে বন্দি থাকাকালেই পরের বছরের মার্চ মাসে পরলোকগমন করেন তিনি।

উসমানীয় সাম্রাজ্যের ইতিহাসে আঙ্কারার এ যুদ্ধের ফলাফল ছিল অত্যন্ত সুদুরপ্রসারী। এর ফলে কিছুদিন আগেই পূর্ব আনাতোলিয়ায় জয় করা অঞ্চলগুলো উসমানীয়দের হাতছাড়া হয়ে যায়। তৈমুর সেগুলো তাদের পূর্বের শাসকদের হাতেই তুলে দিয়েছিলেন। অপরদিকে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব শুরু হয় সুলতানের ছেলেদের মাঝে, শুরু হয় অরাজকতা। প্রায় এক দশক ধরে চলা এ নৈরাজ্যকর সময়ে টলে উঠেছিল পুরো উসমানীয় সাম্রাজ্যই, হুমকির মুখে পড়ে গিয়েছিল তাদের অস্তিত্ব। অবশ্য একসময় তা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয় তারা, ক্ষমতায় আসেন উসমানীয় সাম্রাজ্যের পঞ্চম সুলতান প্রথম মুহাম্মদ। ধীরে ধীরে আবারও শক্তিশালী হতে শুরু করে উসমানীয় বাহিনী, ফিরে পেতে থাকে তাদের হারানো গৌরব, সম্প্রসারিত হতে শুরু করে তাদের সীমানা, বাড়তে শুরু করে তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি।

শান্ত পৃথিবী থেকে অশান্ত মানবের চিরবিদায়

১৪০৫ সালের জানুয়ারি মাস। কাজাখস্তান জুড়ে নেমে এসেছে অসহনীয় শীত। প্রবল তুষারপাতে সমস্ত পথঘাট চলাচলের অনুপযুক্ত হয়ে পড়েছে। শীতের তীব্রতায় পথের ধারে মরে পড়ে আছে পশুপাখির দল। এমন বৈরী পরিবেশে একদল অভিযাত্রীর দেখা মিলল চিনের দিকে অগ্রসররত অবস্থায়। সৈন্যসামন্ত, হাতি, ঘোড়া বোঝাই সেই দলটি তাদের অধিপতি তৈমুরের নেতৃত্বে এগিয়ে যাচ্ছে চিন দখলের উদ্দেশ্যে।

তৈমুর, যার নাম শুনলে পৃথিবীর যেকোনো রাজার সিংহাসন থরথর করে কাঁপে, তার পরিস্থিতিও বেশ সুবিধাজনক না। তার উপরে আজ সকাল থেকে তার শরীরের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি বেড়ে গেছে। দলের কবিরাজরা তৈমুরকে পরীক্ষা করেন। তাদের চোখে মুখে ফুটে উঠে শঙ্কার ছাপ। এই মুহূর্তে পিছু না হটলে তৈমুরকে বাঁচানো সম্ভব নয়। কিন্তু তৈমুর নাছোড়বান্দা। রাগে গজগজ করে ওঠেন তিনি। শেষপর্যন্ত কাজাখস্তানের শীতের কাছে পরাস্ত হবেন! তিনি তার সিদ্ধান্তে অটল, পিছু হটা চলবে না। তৈমুর কখনো পিছু হটতে পারে না। হাকিম নড়ে, তবু হুকুম নড়ে না। তাই শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও এগিয়ে চলল তৈমুর বাহিনী। কিন্তু পথিমধ্যে শত শত সৈনিক মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। তৈমুরের নিজের অবস্থারও দিন দিন অবনতি হতে থাকল।

শেষ পর্যন্ত তৈমুর হার মানলেন। কাজাখস্তানের ওতরার পর্যন্ত এসে ভেঙে পড়লেন তিনি। শীতের কারণে পিছু হটাও অসম্ভব হয়ে উঠলো। শেষপর্যন্ত ফেব্রুয়ারির ১৮ তারিখ সকালে কাজাখস্তানের শীতের থাবায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন এশিয়ার ত্রাস তৈমুর লং। পৃথিবীর রাজাধিরাজরা যা করতে পারেননি, তা করে দেখাল সামান্য শীত!

দাফনের উদ্দেশ্যে তৈমুরকে সমরকন্দে ফিরিয়ে আনা হলো। শেষ ইচ্ছানুযায়ী তার কবরে বড় বড় অক্ষরে লিখে দেয়া হলো, 'আমি যেদিন ফের জেগে উঠব, সেদিন সমগ্র পৃথিবী আমার ভয়ে কাঁপবে!'

পৃথিবী শাসন করা প্রতাপশালী অশান্ত অধিপতিদের নাম নিলে প্রথমেই উঠে আসবে আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট, চেঙ্গিস খান, কুবলাই খান, জুলিয়াস সিজার, তৈমুর লং সহ বহু শাসকের নাম। কিন্তু অন্যান্য শাসকদের ন্যায় তৈমুর কোনো

রাজপরিবারের সন্তান ছিলেন না। সামান্য ভূস্বামীর সন্তান তৈমুর ধীরে ধীরে ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ করেছিলেন, জয় করেছিলেন পৃথিবীর বিভিন্ন দিকপ্রান্ত। প্রায় অর্ধেক পৃথিবী তৈমুরের দখলে চলে আসে। চেঙ্গিস খানকে আদর্শ মানা তৈমুর বীরদর্পে তার সাম্রাজ্যে পদচারণ করতেন। দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়ে তৈমুরের দাপুটে আওয়াজ। স্বাধীন সম্রাটরা ভয়ে ভয়ে থাকেন। এই বুঝি তৈমুর তার বাহিনী নিয়ে তার রাজ্যে আক্রমণ করে বসেন! তৈমুর তার নিষ্ঠুরতার জন্য সমসময়ের অন্যান্য শাসকদের নিকট ছিলেন এক মূর্তমান আতংকের নাম। এমনকি মৃত্যুর পরেও তিনি পৃথিবীকে জানান দিয়ে যাচ্ছেন নতুন কোনো তৈমুরের ফিরে আসার কথা।

ভার্নার যুদ্ধ
BATTLE OF VARNA

তারিখ:	৮৪৮ হিজরি / ১৪৪৪ খ্রি.
স্থান:	ভার্না, বুলগেরিয়া
ফলাফল:	মুসলিম বাহিনীর বিজয়

পক্ষ-বিপক্ষ:	উসমানি সাম্রাজ্য	খ্রিস্টান জোট (হাঙ্গেরি, আলমানিয়া, বলোগনা, সিসিলি এবং নেপোলির সম্মিলিত বাহিনী)
সেনাপ্রধান:	সুলতান ২য় মুরাদ	হুনয়াদ
সেনাসংখ্যা:	৪০ হাজার	৫০/৬০ হাজার
ক্ষয়ক্ষতি:	অজ্ঞাত	১৫ হাজার

বুলগেরিয়ার ভার্না শহরের কাছাকাছি উসমানি সুলতান দ্বিতীয় মুরাদ এবং ক্রুসেড জোটশক্তির মধ্যকার এক যুগান্তকারী যুদ্ধের নাম 'ভার্নার যুদ্ধ'। ২৮শে রজব ৮৪৮ হিজরির এ যুদ্ধে মুসলমানরা বিজয় লাভ করে এবং প্রতিপক্ষের সেনাপতি হাঙ্গেরির সুলতান মারা পড়ে।

পটভূমি

বলকানের নগরগুলোতে খেলাফতে উসমানির বিরুদ্ধ শক্তিগুলোকে দমিয়ে দিতে সুলতান দ্বিতীয় মুরাদ বেশ কয়েক বছর ধরেই অভিযান পরিচালনা করে আসছেন। সেখানে উসমানিদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে নানামুখী কাজ করে যাচ্ছেন তিনি। সুলতান দ্বিতীয় মুরাদের শাসনামলের এই সময়টায় উসমানি সাম্রাজ্যের চতুর্পাশে ঘটা করেই শত্রুদের আনাগোনা বেড়েছে খুব। কিন্তু বিচক্ষণ সুলতানের সচেতনতায় ইতিমধ্যে সার্বিয়ার রাজা জর্জ ব্রনকোভিচ তাকে বাৎসরিক কর দিতে বাধ্য হয়েছে, উসমানিদের যুদ্ধে সহায়তার জন্য সেনা-প্রেরণে সম্মত হয়েছে এবং তার কন্যা মারা-কে সুলতানের সাথে বিবাহ দেয়ার দাবিও মেনে নিয়েছে। তেমনি সুলতানের চাপে পড়ে সে হাঙ্গেরির সাথে যাবতীয় সম্পর্কও ত্যাগ করেছে। পাশাপাশি পনেরো দিন অবরোধের পর সুলতান দখল করে নিয়েছেন গ্রিসের সালাফিক শহরটিও।

শুরুর দিকে খানিকটা শান্ত থাকলেও সুলতান দ্বিতীয় মুরাদের শাসনামলের পুরোটা সময়েই লেগে ছিল যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং শত্রুদের নানাবিধ চাতুরতা। তবে শীঘ্রই সাম্রাজ্যে গোলযোগ দেখা দেয়। বাইজান্টাইন সম্রাট দ্বিতীয় মানুয়েল মুস্তাফা চেলেবিকে সিংহাসনের বৈধ উত্তরসূরি হিসেবে গ্রহণ করে তাকে সহায়তা করেন। মুস্তাফা সফল হলে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ শহর দ্বিতীয় মানুয়েলকে হস্তান্তর করা

হবে, এমন চুক্তি হয়। মুস্তাফা বাইজান্টাইন জাহাজযোগে উসমানীয় সাম্রাজ্যের ইউরোপীয় অংশে আগমন করেন এবং দ্রুত অগ্রসর হন। অনেক তুর্কি সৈনিক তার সাথে যোগ দেয়। মুরাদ তার উজিরে আজম বায়েজিদ পাশাকে সেনাপতি হিসেবে প্রেরণ করেন কিন্তু বায়েজিদ মুস্তাফার কাছে পরাজিত ও নিহত হন। মুস্তাফা বায়েজিদের বাহিনীকে পরাজিত করে নিজেকে এড্রিনোপলের (বর্তমান এদির্ন) সুলতান ঘোষণা করেন। এরপর তিনি দারদানেলেস অতিক্রম করে এশিয়া আসেন। তবে মুরাদ তাকে পরাস্ত করেন। মুস্তাফা গেলিপলিতে আশ্রয় নেন। মুরাদ এখানে অবরোধ আরোপ করেন। মুস্তাফাকে বন্দি করা হয় এবং মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। মুরাদ এরপর রোমান সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন এবং কনস্টান্টিনোপল জয়ের মাধ্যমে তাকে শাস্তি প্রদানের ঘোষণা দেন।

দ্বিতীয় মুরাদ ১৪২১ সালে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের দিকে অগ্রসর হয়ে রাজধানী কনস্টান্টিনোপল অবরোধ করেন। মুরাদের অবরোধের সময় বাইজান্টাইনরা কিছু স্বাধীন তুর্কি আনাতোলীয় রাজ্যের সহায়তায় সুলতানের ছোট ভাই কুচুক মুস্তাফাকে দিয়ে সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সংঘটিত করে। বিদ্রোহের সময় বুরসা অবরোধ করা হয়। মুরাদকে তাই অবরোধ তুলে নিতে হয়। তিনি মুস্তাফাকে বন্দি করেন ও মৃত্যুদণ্ড দেন। তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী আনাতোলীয় আইদিনি, জেরমিয়ানি, মেনতেশে ও তেকে রাজ্যকে উসমানীয় সাম্রাজ্যের অধীনে নিয়ে আসা হয়।

দ্বিতীয় মুরাদ এরপর ভেনিস, কারামানি আমিরাত, সার্বিয়া ও হাঙ্গেরির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ১৪২৮ সালে কারামানিরা পরাজিত হয় এবং ১৪৩০ সালে সেলোনিকার দ্বিতীয় অবরোধ পরাজয়ের পর পিছু হটে। ১৪৩০-এর দশকে মুরাদ বলকানের বিশাল অঞ্চল জয় করেন এবং ১৪৩৫ সালে সার্বিয়াকে সাম্রাজ্যের অংশ করায় সফল হন।

১৪৩৮ সালে সুলতানের কানে আসে, হাঙ্গেরির রাজা হুনিয়াদ উসমানি সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য আশপাশের রাজ্যগুলোকে ক্ষেপাচ্ছে। তাদেরকে ধর্মযুদ্ধের উসকানি দিয়ে মুসলিম শহরগুলোতে সামরিক অভিযান পরিচালনার পাঁয়তারা করছে। ৮৪২ হিজরিতে সুলতান গোপন সূত্রে এমন সংবাদ পেয়েই উসমানীয় বাহিনী নিয়ে হাজির হলেন হাঙ্গেরিতে। ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সাধন করে বন্দি করে নিয়ে এলেন সত্তর হাজার হাঙ্গেরিয়ান সেনাকে।

পরের বছরই সার্বিয়ান রাজা জর্জ ব্রনকোভিচ উসমানি সাম্রাজ্যের সাথে চুক্তি

ভঙ্গ করে ফেলল। সুলতান দেরি না করে তাকে উচিত শিক্ষা দিতে এগিয়ে গেলেন সার্বিয়ার রাজধানী বেলগ্রেড ঘেরাও করতে। দীর্ঘ ছয় মাসের অবরোধ শেষে শহরপতন ছাড়াই সুলতানকে ফিরতে হলো অস্ট্রিয়ার উদ্দেশে। সেখানে ট্রান্সিলভানিয়ার আক্রমণ করলেন তিনি। মূল কাহিনি ছিল, ৮৪৩ হিজরিতে হঠাৎ করে পোপ চতুর্থ ইউজেনিয়ো উসমানি সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে এক ভয়ঙ্কর ক্রুসেড যুদ্ধের ডাক দিয়ে বসেন। পোপের আহ্বানে ঘটা করেই হাঙ্গেরি, সার্বিয়া, রোমানিয়া, ভেনিস এবং পোল্যান্ডের রাজারা ঐক্যবদ্ধ জোট গঠন করে নেয়। ক্রুসেডের এই সম্মিলিত জোটের নেতৃত্বের দায়িত্ব হাতে নেয় কট্টর ক্যাথলিকপন্থি হাঙ্গেরিয়ান সেনাপতি ইউহান্না হুনিয়াদ। এই লোক ছিল প্রচণ্ড মুসলিমবিদ্বেষী। তার জীবনের এক ও একমাত্র লক্ষ্য ছিল, বলকান এবং ইউরোপ থেকে উসমানি সাম্রাজ্যের নাম-নিশানা মিটিয়ে দেয়া।

এই জোটবাহিনী গঠনের পরই ৮৪৬ হিজরিতে উসমানি বাহিনীর শক্তিধর এক সেনাপতিসহ প্রায় বিশ হাজার তুর্কি সেনাকে হত্যা করে হুনিয়াদ। ভয়ঙ্কর সে হত্যাকাণ্ড থেকে বেঁচে যাওয়া উসমানি সাম্রাজ্যপন্থিদের ধাওয়া করে দানিয়ুব নদীর পেছনাংশ হয়ে ইউরোপের সীমানা থেকে বের করে দেয় তারা। সুলতান মুরাদ এই পরাজয়ের সংবাদ পেয়ে সাথেসাথে ৮০ হাজার উসমানি সেনাসহ সেনাপতি শিহাবুদ্দিন পাশাকে প্রতিশোধ নিতে রওনা করিয়ে দেন। কিন্তু বেলগ্রেড শহরের কাছাকাছি যেতেই রক্তক্ষয়ী মোকাবেলার পর হুনিয়াদের জোটবাহিনীর কাছে এবারও হেরে যায় উসমানীয়রা।

ধারাবাহিক উসমানি সাম্রাজ্যের পরাজয় সুলতান মুরাদকে বাধ্য করে হাঙ্গেরির সাথে দশ বছরের শান্তিচুক্তি করে নিতে। সে বছরের ২৬শে রবিউল আউয়াল তিনি এই শান্তিচুক্তিতে সাক্ষর করেন। মূলত সুলতান চাচ্ছিলেন, দশ বছরের যুদ্ধবিরতির আড়ালে তিনি উসমানীয় সামরিক বাহিনীতে হয়ে যাওয়া ক্ষতির পুনর্গঠন সেরে নিবেন। তেমনি তিনি শান্তিচুক্তি করে নেন সার্বিয়ার সাথেও। সেখানকার শাসক হিসেবে বৈধতা দেন জর্জ ব্রনকোভিচকে; তেমনি রোমানিয়ার রাজ্যগুলো লিখে দেন হাঙ্গেরির রাজা হুনিয়াদের নামে। জোর করে আদায় করে নেয়া এমন পরাজয়ে সুলতানের মানসিক অবস্থা তখন একেবারে নড়বড়ে। এমন সময় সুলতান নিজ শহরে এসে শুনতে পান, তার বড় ছেলে আলাউদ্দিন মারা গেছে। এতে তিনি খুব বেশি আঘাত পান এবং মানসিকভাবে একেবারেই ভেঙে পড়েন। সহসা তার কাছে রাজ্যের এই বিভীষিকা তিক্ত হয়ে ওঠে। তিনি চৌদ্দ বছরের ছেলে মুহাম্মদের হাতে

উসমানি সাম্রাজ্যের দায়িত্বভার ছেড়ে দিয়ে আনাতোলিয়ার 'ম্যাগনেসিয়া' শহরে চলে যান। সেখানে বাকি জীবন তিনি নির্জনে, ধ্যানে, ইবাদতে এবং প্রশান্ত মনে কাটিয়ে দিতে চান।

হাঙ্গেরির শান্তিচুক্তি ভঙ্গ করা

সুলতান দ্বিতীয় মুরাদ ক্ষমতা ছেড়ে চলে গেছেন শুনেই ইউরোপিয়ানদের চোখেমুখে উসমানি সাম্রাজ্য দখলের নেশা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। তারা বুঝতে পারে, চৌদ্দ বছরের কিশোর সুলতান মুহাম্মদের পক্ষে ইউরোপের শক্ত ক্রুসেড জোটের বিরুদ্ধে পেরে ওঠা সম্ভবপর নয়। এই ভেবে পোপের সম্মতিতে হাঙ্গেরির রাজা সুলতান মুরাদের সাথে কৃত দশ বছরের শান্তিচুক্তি ভঙ্গ করে ফেলে। অথচ চুক্তির সময় রাজা হুনিয়াদ ইঞ্জিল ছুঁয়ে এবং সুলতান মুরাদ কুরআন ছুঁয়ে শপথ করে বলেছিলেন, কোনোভাবেই এই চুক্তির সময়সীমা পূর্ণ হবার আগে আমরা চুক্তি ভঙ্গ করব না। জীবন চলে গেলেও চুক্তির কোন শর্তের বিপরীত কাজ করব না। কিন্তু রাজা হুনিয়াদ সাম্রাজ্য দখলের নেশায় সেই চুক্তি মানতে পারলেন না।

হাঙ্গেরির রাজা চুক্তি ভঙ্গ করতেই তার মিত্র রাজ্যগুলো তার সাথে এসে যোগ দেয়। বলোগনা, আলমানিয়া, ফ্রান্স, ভেনিস এবং বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যও তার সাথে উসমানি সাম্রাজ্য দখলের যুদ্ধে অংশ নেয়ার আগ্রহ জানায়। হাঙ্গেরির রাজা তৃতীয় ল্যাডিস্লাস এবং সেনাপতি হুনিয়াদের নেতৃত্বে নতুন করে গড়ে ওঠে বিশাল সেনাবাহিনী।

সুলতান মুরাদের দ্বিতীয়বার সাম্রাজ্যে অধিগ্রহণ

উসমানি সাম্রাজ্যের রাজধানী এদির্নে অস্থির পায়চারি করছেন কিছু লোক। গুরুত্বপূর্ণ কোনো পরামর্শের জন্য তাদের ডাকা হয়েছে। কৃষ্ণ সাগরের উপকূলে জড়ো হয়েছে খ্রিস্টানদের বিশাল বাহিনী। উসমানি সাম্রাজ্য দখলের জন্য তারা এগিয়ে আসছে বুলগেরিয়ার ভার্না অঞ্চল হয়ে। এদিকে মুসলমানদের সাম্রাজ্যের চেয়ারে বসা কিশোর সুলতান মুহাম্মদ। পরিস্থিতি বিবেচনায় কোনোভাবেই মনে হচ্ছে না, স্বল্পবয়সী এ সুলতানের পক্ষে এত বিশাল বাহিনী দমন করে সবকিছু স্বাভাবিক করে আনা সম্ভব। সাম্রাজ্যের মুরব্বিদেরকে তাই জরুরি ভিত্তিতে

আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। প্রাসাদের সভাকক্ষে সম্মিলিত পরামর্শের পর সিদ্ধান্ত নেয়া হলো, সুলতান মুহাম্মদকে পরিস্থিতি জানিয়ে তার বাবার কাছে সাম্রাজ্য অধিগ্রহণের আবদার জানাতে বলা হবে। সে মর্মে সভার সিদ্ধান্ত জানানো হলো কিশোর সুলতানকে। বলা হলো: 'মহামান্য সুলতান, আপনার বাবা ক্ষমতা পুনরায় হাতে তুলে না নিলে কোনোভাবেই এত বড় শত্রুর মোকাবেলা করা আমাদের জন্য সম্ভব নয়। আপনি দয়া করে আপনার বাবার কাছে পত্র পাঠান, যেন তিনি ক্রুসেডবাহিনীর মোকাবেলার জন্য হলেও ক্ষমতা গ্রহণ করেন। এই দায়িত্ব আদায় হয়ে গেলে পরিস্থিতি শান্ত হয়ে এলে মসনদ যেন আপনাকে ফিরিয়ে দেন।'

সুলতান মুহাম্মদ সাথেসাথে ম্যাগনেসিয়াতে তার বাবার কাছে পত্র পাঠিয়ে দেন। কিন্তু পুনরায় দায়িত্ব গ্রহণে অনাগ্রহের কথা জানিয়ে সুলতান দ্বিতীয় মুরাদ সন্তানের মনোবল বৃদ্ধির জন্য বলেন: 'নিজের সাম্রাজ্যের হেফাজত, একজন সুলতানের অবশ্য কর্তব্য। তোমাকে তা পালন করতে হবে।' পাল্টা জবাবে বিচক্ষণ ছেলে বাবাকে জানায়: 'যদি আমি সাম্রাজ্যের সুলতান হই, তাহলে আমি আপনাকে নির্দেশ করছি, সেনাবাহিনীর দায়িত্ব গ্রহণ করে শত্রুদের হাত থেকে সাম্রাজ্য রক্ষা করুন। আর যদি সাম্রাজ্যের অধিপতি আপনি হন, তাহলে আপনি আপনার সাম্রাজ্য রক্ষার্থে এগিয়ে আসুন।'

ভার্নায় প্রতীক্ষিত মোলাকাত

ইউরোপের নৌ সীমান্তে পাহারা বসিয়েছে ক্রুসেড বাহিনী। এশিয়া থেকে তাই হইহই করে সৈন্যজাহাজ নিয়ে সেখানে প্রবেশের কোনো সুযোগ নেই। এদিকে স্থলপথে এতবড় সেনাবহর নিয়ে বুলগেরিয়ায় প্রবেশ করাটাও নিরাপদ নয়। রাস্তায় যে-কোনো মোড় থেকে শত্রুদের পাতা ফাঁদে আটকে পড়ে সহসা বড়রকম বিপত্তি হতে পারে। সুলতান দ্বিতীয় মুরাদ তাই চমৎকার এক কৌশল করলেন। ভারী অস্ত্র, দক্ষ কজন সেনাপতি এবং প্রসিদ্ধ উসমানীয় জেনিসারি বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে তিনি স্থলপথে এগোনোর সিদ্ধান্ত নিলেন। আর হালকা অস্ত্র দিয়ে সাধারণ সেনাদের অধিকাংশকেই নদীপথে ইউরোপে প্রবেশ করানোর উপায় খুঁজতে লাগলেন। পরিশেষে কজন লাইসেন্সধারী জাহাজচালক পাওয়া গেল, যারা ব্যাবসায়িক কাজে মাঝেমধ্যেই ইউরোপ-এশিয়ার সীমান্তপথে চলাচল করেন। প্রতি সেনার বিনিময়ে এক দিনার ভাড়ার বদলে সুলতান তাদের হাত করে নিলেন। এরপর সেনাদেরকে

জাহাজে সাধারণ পোশাকে পাঠিয়ে দিলেন আল্লাহর নামে। কৃষ্ণ সাগরের পার হয়ে আসা ক্রুসেড বাহিনীর সাথে সময়পাল্লা করে সুলতান মুরাদ দ্রুতবেগে রওনা করলেন ভার্নার দিকে। ঘটনাক্রমে হুনিয়াদের বাহিনীর আগেই সুলতান যুদ্ধের ময়দানে হাজির হয়ে যান। এদিকে নৌপথে নিরাপদেই পৌঁছে যায় উসমানি বাহিনীর সাধারণ সেনাদের বহর।

ময়দানে সুলতান মুরাদকে দেখতে পেয়ে খ্রিস্টানদের চোখ কপালে উঠে যায়। চুক্তিভঙ্গের কারণে তাদের কপালে দেখা দেয় বিশ্বাসঘাতকতার অনুতাপ। কিন্তু ইতিপূর্বে দুটো যুদ্ধে পরপর বিজয় পাবার ফলে ক্রুসেড বাহিনী খানিক বিচলিত হয় না। বরং উভয়পক্ষের সেনাবাহিনী বিন্যস্ত হলে পরদিনই শুরু হয় যুদ্ধ। সুলতান একটি বর্শায় আগায় গেঁথে দেন পূর্বের সেই চুক্তিপত্র, যা ভঙ্গ করে আজকের এই যুদ্ধের অবতারণা করেছে নিকৃষ্ট সাম্রাজ্যলোভী খ্রিস্টানরা—যেন তারা নিজেরা এটা দেখে লজ্জায় কুঁকড়ে যায়, ভেঙে যায় তাদের মনোবল, বিশ্ব-ইতিহাসে লেখা হয়ে যায় শত্রুপক্ষের গাদ্দারি এবং মুসলিম বাহিনীও যেন নিজেদের উৎসাহ ঝালিয়ে নেয় এ-যুদ্ধের উৎপত্তিগত বৈধতার কথা ভেবে।

অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের দরুন প্রথমেই খ্রিস্টান সেনাপতি হামলার নির্দেশ দেয়। সে-মতে শত্রুরা মুসলিম বাহিনীর ডান এবং বাম বাহুতে একযোগে হামলে পড়ে। সুলতানের কৌশলমতো উসমানীয় সেনারা তাদেরকে ধীরে ধীরে ভেতরের দিকে নিয়ে আসে। তারা বোকার মতো মুসলিম বাহিনীর ভেতরে প্রবেশ করামাত্রই সুলতান তার কেন্দ্রীয় অংশের সেনাদের দুই ভাগ করে তাদের উপর শক্ত আক্রমণ করে বসেন। অল্প সময়ের মধ্যেই সুলতানের বর্শার সামনে পড়ে যায় হাঙ্গেরীয় রাজা তৃতীয় ল্যাডিস্লাস। সুলতান তাকে লক্ষ করে বর্শা ছুড়ে মারলে সে তার ঘোড়া থেকে ধপাস করে মাটিতে পড়ে যায়। অমনি সুলতানের ইশারায় এক মুজাহিদ তার কল্লা কেটে বর্শার মাথায় গেঁথে চিৎকার করে বলে ওঠে, 'হে কাফেরের দল, এই তোদের সম্রাটের মাথা দেখে নে।'

সেনাপ্রধানের মাথা বর্শায় ঝুলতে দেখে খ্রিস্টান বাহিনীর হিম্মত একেবারে মাটির সাথে মিশে যায়। তাদের হাতের বাহুগুলোতে ধরে যায় আলস্য ও ভীতি। সুলতান মুরাদ এই সুযোগে মুসলিম বাহিনীকে চূড়ান্ত আক্রমণের নির্দেশ দেন। উসমানীয়দের তাকবিরধ্বনিতে ভার্নার প্রান্তর গুঞ্জরিত হয়ে ওঠে। ক্ষুধার্ত ঈগলের মতো তারা শত্রুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এতে খ্রিস্ট বাহিনীর কাতার বিক্ষিপ্ত হয়ে তারা একেবারে বিশৃঙ্খল হয়ে যায়। দিশেহারা হয়ে তারা পালাতে শুরু করে। তাড়াহুড়ো

করতে গিয়ে পরস্পর হামলে পড়ে নিজেদের উপর। প্রাণ বাঁচাতে সামনের জনকে আঘাত করে দৌড়াতে শুরু করে তারা। সুলতান মুরাদ তার বাহিনীকে শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবন করতে নিষেধ করেন। পায়ে পড়ে যুদ্ধ করতে আসা শত্রুকে এমন শোচনীয় পরাজয়ের স্বাদ আস্বাদন করিয়েই ক্ষান্ত হন তিনি। হাঙ্গেরীয় সেনাপতি ময়দান ছেড়ে হুড়মুড়িয়ে পালিয়ে যায়; তার পেছনে ময়দানে পড়ে থাকে প্রায় পনেরো হাজার খ্রিস্টান সেনার ক্ষতবিক্ষত লাশ। ২৮ রজব ৮৪৮ হিজরি মোতাবেক ১৪৪৪ খ্রিস্টাব্দের ১০ই নভেম্বর উসমানীয় সেনারা এই মহান বিজয় লাভ করেন।

যুদ্ধের পর

বিজয়ের খবর ছড়িয়ে যায় পুরো উসমানি সাম্রাজ্যে। একসাথে সকলের ঘরে ঢুকে যায় আনন্দের খুশবু। এ বিজয়ের খুশি কেবল উসমানীয়দের নয়, বরং এ খুশি সমগ্র বিশ্বের। ভার্নার এ যুদ্ধ জয়ের ফলে হাঙ্গেরির শহরগুলো থেকে উসমানি সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অপতৎপরতা আগামী দশ বছরের জন্য স্থগিত হয়ে যায়। পাশাপাশি পরবর্তী নয় বছর পর সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহের হাত ধরে কন্সটান্টিনোপল বিজয়ের পথও পুরোপুরি সুগম করে এই ভার্নার যুদ্ধই।

এরপর ১৪৪৮ সালে মুরাদ কসোভোর দ্বিতীয় যুদ্ধে খ্রিস্টান জোট বাহিনীকে পরাজিত করেন। বলকান হস্তগত হওয়ার পর তিনি পূর্ব দিকে তৈমুরের পুত্র শাহরুখ, কারামানি এবং চোরুম-আমাসিয়া আমিরাতের মুখোমুখি হন। ১৪৫০ সালে দ্বিতীয় মুরাদ আলবেনিয়ায় অভিযান পরিচালনা করেন। সেখানে তিনি স্কান্ডেরবেগের নেতৃত্বাধীন প্রতিরোধ দমনের জন্য ক্রুজ দুর্গ অবরোধ করেন। তবে তিনি এতে সফল হননি। ১৪৫০-১৪৫১ সালের শীতকালে মুরাদ প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং কদিন পরেই এদির্নে মৃত্যুবরণ করেন। তার বিয়োগের পর তার পুত্র দ্বিতীয় মুহাম্মদ উসমানি সাম্রাজ্যের সিংহাসনে বসেন।

কন্সটান্টিনোপল বিজয়

FALL OF CONSTANTINOPLE

প্রায় আটশত বছর মুসলমানরা তাদের বুকের ভেতর একটা স্বপ্ন পুষে রেখেছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুসংবাদ দিয়ে যাওয়া অমূল্য মহান এ স্বপ্ন দেখেছেন প্রতি যুগে, প্রতিজন মুসলিম সেনাপতি ও বিজেতা। যুগের পর যুগ, কালের পর কাল অতিক্রান্ত হয়েছে—রাসূলের সেই ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতিফলন যেন অধরাই রয়ে গেছে। অবশেষে রাসূলের মুখে প্রশংসিত সেই সেনাপতি এবং সেই সেনাদল নেমে এল ধরার মাটিতে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে গেছেন:

> *'তোমরা (মুসলিমরা) অবশ্যই কন্সটান্টিনোপল বিজয় করবে। কতই না অপূর্ব হবে সেই বিজয়ী সেনাপতি, কতই না অপূর্ব হবে তার সেনাবাহিনী।'*[১]

পূর্বালাপ

৩৩০ খ্রিস্টাব্দে রোমান সম্রাট কনস্টান্টিন বসফরাস প্রণালির উপকূলে প্রতিষ্ঠা করেন কনস্টান্টিনোপল শহর। ৩৯৫ সালে রোমান সাম্রাজ্য দু'ভাগ হলে পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের নাম হয় বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য, যার রাজধানী নির্ধারণ হয় কনস্টান্টিনোপল। পশ্চিমে রোমের পতন হলেও পূর্বে রোমান সাম্রাজ্যের ধারক হিসেবে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের পতাকাতলে তখনো টিকে ছিল কনস্টান্টিনোপল। কনস্টান্টিনোপল অনেকবার অনেকের দ্বারা আক্রমণের শিকার হলেও এগারো শতাব্দীর ইতিহাসে মাত্র একবারই এ শহর জয় করা সম্ভব হয়েছিল, ১২০৪

[১] আহমাদ আল-মুসনাদ: ১৮৯৭৭, মুস্তাদরাকে হাকেম: ৮৩০০, আল-মুজামুল কাবির: ১২১৭, মাজমাউয যাওয়ায়েদ: ৬/২২৯; হাকেম নিশাপুরি বলেছেন, হাদিসটির সনদ সহিহ পর্যায়ের। ইমাম যাহাবি রহ. তাঁর এ-কথার সাথে একমত হয়েছেন। ইমাম হাইসামি রহ. বলেন, এ-হাদিসটির বর্ণনাকারীগণ সকলেই নির্ভরযোগ্য।

সালের চতুর্থ ক্রুসেডে।

প্রায় ত্রিকোণাকার এ শহরের উত্তরে গোল্ডেন হর্ন, পূর্বে বসফরাস প্রণালির মূল অংশ এবং দক্ষিণে মারমারা সাগর। এছাড়াও রয়েছে শহরকে ঘিরে রাখা অসংখ্য নগর-প্রতিরক্ষা দেয়াল। এগুলোর একটি থিওডেসিয়ান দেয়াল, যা প্রায় অজেয় এক নগর-প্রতিরক্ষা প্রাচীর। চারপাশবেষ্টিত এই সমুদ্র প্রণালিগুলোর ফলে প্রাকৃতিকভাবেই নিরাপত্তা পেয়ে যেত কনস্টান্টিনোপল। তদুপরি ঐতিহাসিকদের মতে, এ শহরটি রক্ষার জন্য সবসময় নিয়োজিত থাকত চার হাজার সশস্ত্র প্রশিক্ষিত সেনাবাহিনী। তাছাড়া কন্সটান্টিনোপল শহরের উসমানি সাম্রাজ্যের সাথে সংযুক্ত দিকটিও কম সুরক্ষিত ছিল না। সেখানে ১৪ মাইল দীর্ঘ ৪০ থেকে ৭০ ফুট উঁচু তিন স্তর বিশিষ্ট প্রাচীর দাঁড়িয়ে ছিল। বাইরের মসৃণ দেয়ালের সাথেই ছিল ৭০ ফুট চওড়া ও ৪০ ফুট গভীর পরিখা। বহিরাক্রমণের সময় পানি দিয়ে এটিকে ভরে ফেলা হতো। ফলে যেকোনো আক্রমণই ৭০ ফুট দূরে এসে থমকে যেত। নগরীর দেয়ালেও অনেক সময় শত্রুদের সামান্য আঁচড় লাগত না। তাই তৎকালীন দুনিয়ার সার্বিক বিবেচনায় বলা হতো, 'পুরো পৃথিবী যদি একটি রাষ্ট্র হয়, তাহলে বাইজান্টাইন তার রাজধানী হবার সবচে যোগ্য শহর।' মুসলিমরাও বেশ কয়েকবার চেষ্টা করেছে ঐশ্বর্যমণ্ডিত এ শহর বিজয়ের। শুরুটা হয়েছিল বেশ আগেই, ইয়াযিদের হাত ধরে। কিন্তু তার আক্রমণ থেমে গিয়েছিল শহরের প্রাচীরের কাছেই। উসমানীয় সুলতান বায়েজিদও চেষ্টা করেছিলেন এ শহর দখলের, কিন্তু ব্যর্থ হয়েছিলেন তিনিও।

বিজয়ী সে মহান সুলতান

এত ব্যর্থতার পরেও বাবার মৃত্যুর পর উসমানীয় (অটোমান) সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মদ (তুর্কি ভাষায় মেহমেদ) সিদ্ধান্ত নেন কনস্টান্টিনোপল দখলের। ১৪৫১ সালে মাত্র ১৯ বছরে সিংহাসনে বসা সুলতানকে শুরুতে তার দেশের লোকেরাই খুব একটা পাত্তা দেয়নি, সেখানে আশেপাশের অন্য সাম্রাজ্যরা তাকে কোনো হুমকি হিসেবেই গণ্য করেনি। তাকে অবহেলা করার কারণও আছে অবশ্য। এর আগেও একবার সিংহাসনে বসেছিলেন তিনি। মাত্র বারো বছর বয়সে তার বাবা তার জন্য সিংহাসন ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু বহিঃশত্রুর আক্রমণের কারণে তিনি তার বাবাকে নির্দেশ দেন সিংহাসন নিজের হাতে ফিরিয়ে নিতে। এ কারণে সাম্রাজ্যের অনেকেই হাকিকত না-জেনে তাকে দুর্বল ভাবত।

এ অবহেলার সুযোগটাই নেন সুলতান মুহাম্মদ। তিনি চান, রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগে বলকান ও কন্সটান্টিনোপলের পুরোটা জয় করে তার রাজ্যকে সুসংহত করে ফেলতে, যাতে কোনো শত্রু বা বিরোধীপক্ষের অবস্থান উসমানি সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে আর অবশিষ্ট না থাকে। তিনি বিপুল পরিমাণ সেনা সংগ্রহ করে, তাদেরকে বড় কোনো যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করতে থাকেন। সামরিক, শারীরিক এবং মানসিকভাবে তাদেরকে সর্বোচ্চ বলে বলীয়ান করার চেষ্টা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়ে তাদের আত্মশক্তি বৃদ্ধি করেন। সাম্রাজ্যের আলিমদের ডেকে এনে সেনাদের ক্যাম্পে ক্যাম্পে ছেড়ে দেন, যাতে তারা অনাগত যুদ্ধের জন্য সৈন্যদের মনোজাগতিক প্রবৃদ্ধি ঘটাতে থাকেন।

এছাড়া সে সময়কার ইউরোপীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতিও তাকে এ সিদ্ধান্ত নিতে উৎসাহ দিয়েছিল। ইউরোপের দুই পরাশক্তি ফ্রান্স আর ইংল্যান্ড নিজেদের মধ্যে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল প্রায় একশো বছরেরও বেশি। এ যুদ্ধ ইতিহাসের কিতাবে 'একশো বছরের যুদ্ধ' নামে পরিচিত। অধিকন্তু সে সময়ের অন্যান্য পরাশক্তি স্পেন, জার্মানি, পোল্যান্ড এবং হাঙ্গেরিও নিজেদের বিভিন্ন যুদ্ধে জড়িত ছিল। এসব যুদ্ধের কারণে ইউরোপের সেনাবাহিনী স্বাভাবিকভাবেই বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছিল। এর সুযোগ নিতে চেয়েছিলেন সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মদ।

এক সময়ের প্রতাপশালী বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যও তার জৌলুশ হারিয়ে ফেলেছে ততদিনে। ল্যাটিন, সার্বিয়া, বুলগেরিয়ার কাছে রাজ্যের অনেক জায়গাই হাতছাড়া হয়ে গেছে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের। তবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছিল উসমানীয় সাম্রাজ্যই। তারা প্রায় সবদিক থেকে ঘিরে ফেলেছিল কনস্টান্টিনোপলকে। এর সাথে চতুর্দশ শতকের প্লেগে শহরের প্রায় অর্ধেক মানুষ মারা যায়। ফলে অর্থনৈতিক এবং সামরিক উভয় দিক থেকেই দুর্বল হতে থাকে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য। সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মদ যখন সিংহাসনে বসেন, তখন বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য বলতে টিকে ছিল শুধুমাত্র কনস্টান্টিনোপল শহর, মারমারা সাগরে প্রিন্স আইল্যান্ড এবং পেলোপন্সে নগরী।

সুলতান মুহাম্মদ তাড়াহুড়ো করে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েননি। তিনি প্রতিটি পদক্ষেপ নিয়েছিলেন অল্প অল্প করে। এর মধ্যে ছিল ১৪৫২ সালে সুলতান মুহাম্মদ কর্তৃক বসফরাসের পশ্চিম দিকে একটি দুর্গ নির্মাণের নির্দেশ দেয়া। সুলতানের এমন সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেই রোমান সম্রাট তার কাছে দূত পাঠিয়ে বলে, 'আমরা আপনার নির্ধারিত পরিমাণ জিযিয়া কর দিতে সম্মত আছি; আপনি দয়া

করে এখানে কোনো দীর্ঘ নির্মাণ করবেন না।' কিন্তু সুলতান তাদের আবেদন নাকচ করে দেন এবং দুর্গ নির্মাণের সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। এর আগে তার প্রপিতামহ প্রথম বায়েজিদ বসফরাসে একটি দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন। তবে বায়েজিদের দুর্গ ছিল এশিয়ায় আর মুহাম্মদের দুর্গ ছিল ইউরোপে। নবনির্মিত কুর্দিরা উচ্চতা ছিল ৮২ মিটার এবং উভয় দুর্গের মধ্যকার দূরত্ব ছিল ৬৬০ মিটার মাত্র। দুর্গ দুটি উসমানীয় সাম্রাজ্যকে বসফরাস প্রণালির সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ এনে দেয়। কারণ, এই দুই দুর্গ এড়িয়ে বসফরাস প্রণালি পার করা সম্ভব ছিল না। ফলে সরাসরি যুদ্ধে জড়ানোর আগেই বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের অর্থনীতিতে আঘাত হানেন সুলতান। সে বছরের অক্টোবরেই সুলতান তুরাখান বেগকে পেলোপন্সে বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে যাবার নির্দেশ দেন, যাতে পেলোপন্সে কনস্টান্টিনোপল শহরে কোনো সাহায্য পাঠাতে না পারে।

কন্সটান্টিনোপল বিজয়ে অস্ত্র ও সরঞ্জাম জোগানোর ক্ষেত্রে সুলতান মুহাম্মদ দুটো বিষয়ে সবচে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি জানতেন, প্রতিপক্ষের দুর্গ কতটা শক্ত। তাই সেটাকে গুঁড়িয়ে দিতে প্রয়োজন শক্তিশালী গোলাবারুদের। এজন্য তিনি 'উরবান' নামের এক প্রসিদ্ধ তোপনির্মাতাকে এ কাজের জন্য নিয়োগ দেন। তাকে প্রয়োজনীয় অর্থ, জনবল, কাঁচামাল এবং পারিপার্শ্বিক সার্বিক সুবিধা প্রদান করেন। মাত্র কয়েকদিনেই. উরবান সুলতানের জন্য বেশকিছু গোলা তৈরি করে দেয়। এরমধ্যে সবচে বড় ও প্রসিদ্ধ ছিল 'সুলতানি গোলা'। সুলতান নিজে এটা নির্মাণের তদারকি করেছেন এবং এটার চালনাপদ্ধতি শিখে নিয়েছেন। কথিত আছে, এ গোলাটির ওজন ছিল ১০০ টন এবং এটা স্থানান্তর করতে প্রায় ১০০টি শক্তিশালী ষাঁড়ের প্রয়োজন হতো।

তেমনি সুলতান জানতেন, কন্সটান্টিনোপলের মতো সমুদ্রবর্তী শহর অবরোধ করতে নৌ-শক্তি বাড়ানোর বিকল্প নেই। তাই তিনি উসমানীয়দের নৌবহর সমৃদ্ধ করায় মনোযোগ দেন। বর্ণিত আছে, তিনি এজন্য প্রায় ৮৪টি—এবং কারও মতে ৪০০টি—শক্তিশালী জাহাজ নির্মাণ করেছিলেন, যেগুলো পানিতে দাঁড়িয়ে শহরে জোরদার আক্রমণ করতে সক্ষম।

যুদ্ধের আগে তিনি আরও একটি কৌশলী কাজ করে নেন। উসমানি সাম্রাজ্যের পরিচিত সকল শত্রুদের সাথে শান্তিচুক্তি করে ফেলেন, যাতে বাইজান্টাইন আক্রমণের সময় কেউ বাগড়া দিতে না পারে—যেন এ সময়টায় উসমানীয় সেনাদের টার্গেট থাকে কেবল একটি শহর, কন্সটান্টিনোপল। তিনি শত্রুদের পাশের রাজ্য গালাতার

সাথেও সন্ধি করে নেন; সন্ধি করে নেন জেনোয়া এবং বান্দুকিয়ার সাথেও। কিন্তু কার্যত যুদ্ধ শুরু হলে কন্সটান্টিনোপলের পার্শ্ববর্তী এ রাজ্যগুলো সুলতানের সন্ধির তোয়াক্কা না করে ধর্মীয় আবেগবশত সুলতানের বিরুদ্ধে কন্সটান্টিনোপল শহর বাঁচাতে সৈন্য ও সরঞ্জাম জুগিয়ে সাহায্য করেছে বলেই জানা যায়।

বাইজান্টাইনের প্রস্তুতি

সেসময় বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের সিংহাসনে ছিলেন একাদশ কন্সটানটিন। সে সহজেই মুহাম্মদের চাল বুঝতে পারে। ক্রমেই ছোট হয়ে আসা বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের কফিনে শেষ পেরেক পড়ার ভয়ে সম্রাট সাহায্য চায় পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোর কাছে। কিন্তু কয়েক শতাব্দী ধরে চলে আসা শত্রুতা এবং পূর্বের অর্থোডক্স চার্চ ও পশ্চিমের ক্যাথোলিক চার্চের দ্বন্দ্ব বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় ঐক্যবদ্ধ সাহায্য পাবার পথে। শেষ পর্যন্ত কোনো উপায় না পেয়ে পূর্ব অর্থোডক্স চার্চ রাজি হয় পশ্চিমের ক্যাথেলিক চার্চের সাথে একতাবদ্ধ হবার ব্যাপারে। পোপের কাছে প্রস্তাবও পাঠায় এ ব্যাপারে।

বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য ভেবেছিল ইউরোপের অন্যান্য দেশের উপরে পোপের ভালো নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। কিন্তু তাদের ধারণা ভুল ছিল। নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করে দুর্বল হয়ে যাওয়া দেশগুলো বাইরের কোনো দেশের জন্য যুদ্ধ করতে সহজে রাজি হয়নি। বরং তাদের কেউ কেউ অর্থডক্স পোপের এমন আহ্বানে বলে, 'আমরা বাইজান্টাইনে ল্যাটিন গম্বুজের চেয়ে তুর্কিদের পাগড়ি দেখতে পছন্দ করব।' শেষে পোপ পুরো ব্যাপারটিকে ধর্মযুদ্ধের মতো করে দেখানোয় মুসলিমদের থামাতে একতাবদ্ধ হয় খ্রিস্টান সেনাবাহিনী। ইউরোপের বিভিন্ন জায়গা থেকে কিছু সাহায্য পেতে থাকে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য, তবে তা একেবারেই নগণ্য। অনেকে নিজ উদ্যোগে ২০০-৪০০ জনের বাহিনী নিয়ে যোগ দেয় কন্সটান্টিপোল রক্ষার জন্য। এদের মধ্যে ছিলেন জেনোয়া থেকে আসা জিওভানি জিউসটিনিয়ানি। নগর রক্ষা দেয়াল প্রতিরক্ষার ব্যাপারে তিনি বেশ অভিজ্ঞ ছিলেন। ১৪৫৩ সালের জানুয়ারিতে তিনি শহরে পৌঁছানোর পরেই দেয়াল প্রতিরক্ষার মূল সেনাপতি হিসেবে নিয়োগ পান।

ভেনিস আনুষ্ঠানিকভাবে কন্সটান্টিনকে সাহায্য করার ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত না নিলেও গোল্ডেন হর্নে অবস্থান করা ভেনিসিয়ান নাবিকরা শহর রক্ষার জন্য সম্রাটের পক্ষে অবস্থান নেয়। মার্চের শেষের দিকে পোপের নির্দেশে তিনটি জাহাজ

যাত্রা করে কন্সটান্টিনোপল রক্ষার জন্য। ভেনিস শেষ পর্যন্ত কন্সটান্টিনোপলকে সাহায্যের সিদ্ধান্ত নেয়। ভেনিস ফেব্রুয়ারিতে নৌবাহিনী পাঠাতে চাইলেও বিভিন্ন কারণে দেরি হওয়াতে নৌবাহিনীর যাত্রা শুরু হয় এপ্রিলে। নৌ আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য সম্রাট কন্সটান্টিন পোতাশ্রয়ের মুখে কাঠের গুড়ি দিয়ে প্রতিরক্ষা চেইন নির্মাণ করেন। স্থলপথে উসমানীয় বাহিনীকে আটকানোর জন্য দেয়াল মেরামতের কাজও শুরু করা হয়।

উসমানিদের অগ্রযাত্রা

উসমানীয়দের সেনাবাহিনী ছিল অনেক বড়, প্রায় পঁচাত্তর হাজার থেকে এক লক্ষের মতো সেনাসদস্য ছিল তাদের। অন্যদিকে বাইজান্টাইনদের সেনাবাহিনী ছিল অনেক ছোট, মাত্র আট হাজার জনের মতো। বাইজান্টাইনদের সবচেয়ে বড় সুবিধা ছিল তাদের প্রায় অজেয় প্রতিরক্ষা দেয়াল। তবে দুশ্চিন্তার কারণও ছিল তাদের, সেটা হলো, উরবান প্রকৌশলীর তৈরি করা এক বিশাল কামান। মজার ব্যাপার হলো, ধর্মযুদ্ধের রূপ নেয়া এ যুদ্ধে এই কামানের বেশ বড় ভূমিকা ছিল, যা তৈরি করেছিল এক খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী। এই কামান কন্সটান্টিনোপলের দেয়ালের জন্য বড় হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। মারমারা সাগরে উসমানীয়দের বিশাল নৌবাহিনীও প্রস্তুত ছিল জলপথে আক্রমণের জন্য। বসফরাস প্রণালির উপকূলে দুটি দুর্গ বাইজান্টাইনদের নৌপথে চলাচল সীমিত করে দিয়েছিল।

১৪৫৩ সালের ১ এপ্রিল থেকে উসমানীয় সেনাবাহিনী কন্সটান্টিনোপলের চারিদিকে অবস্থান নেয়া শুরু করে। চারদিন পর ৫ এপ্রিল সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মদ যোগ দেন সেনাবাহিনীর সাথে এবং ঠিক পরের দিন অর্থাৎ ৬ এপ্রিল শুরু হয় কন্সটান্টিপোল দখলের যুদ্ধ। শুরুতেই শহরের বাইরে থাকা বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের শক্তিশালী চৌকিগুলো দখল করে নেয় উসমানীয় বাহিনী। এরপরই উসমানীয় বাহিনী নগর থিওডেসিয়ান দেয়ালে কামানের গোলা বর্ষণ শুরু করে। কিন্তু কামানের দুটি গোলা নিক্ষেপের মধ্যবর্তী সময় ছিল তিন ঘণ্টার মতো। ফলে একবার গোলা বর্ষণে যে ক্ষতি হতো, বাইজান্টাইনরা সহজেই সেই ক্ষতি মেরামত করে ফেলত। ফলে উসমানীয় সাম্রাজ্য বলার মতো কোনো সাফল্যের মুখ দেখেনি প্রথম কয়েকদিনে।

অন্যদিকে জলপথে সুলাইমান বাল্টোঘলুর নেতৃত্বাধীন উসমানীয় সাম্রাজ্যের

নৌবাহিনী ছিল বিপর্যস্ত। গোল্ডেন হর্নে দেয়া চেইনের কারণে তারা বেশিদূর এগোতে পারেনি। সবচেয়ে লজ্জাজনক ছিল যখন ২০ এপ্রিল বাইজান্টাইন সাম্রাজকে সাহায্য করার জন্য আসা চারটি জাহাজ প্রায় একশোটি উসমানীয় জাহাজকে বোকা বানিয়ে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে যায়। কিন্তু নৌবাহিনীকে গোল্ডেন হর্নে পৌঁছানোর ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ সুলতান মুহাম্মদ নির্দেশ দেন জাহাজগুলোকে স্থলপথে চালিয়ে দেবার। ঐতিহাসিকদের কারও কারও মতে, জাহাজ তৈরির সময়ই তিনি সেগুলোতে একরকম চাকা লাগিয়ে দিয়েছিলেন। সেগুলোর সাহায্যে তিনি স্থলপথে জাহাজগুলোকে গোল্ডেন হর্নে নিয়ে যান। কবে অধিকাংশ ইতিহাসবিদদের বক্তব্যমতে, এ সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে তিনি আশ্চর্য বুদ্ধিমত্তা এবং অসম্ভব পরিশ্রমের আশ্রয় নেন। প্রথমে জেনিসারি এবং বিশেষ সেনাদের সাহায্যে অল্প সময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ জায়গার মাটিগুলো সমান্তরাল করে নেন। এরপর বড় বড় কাষ্ঠখণ্ড এনে সেগুলোতে তৈল ও চর্বি লাগিয়ে পিচ্ছিল করে ফেলেন। পাশাপাশি বসিয়ে কাঠগুলোকে সেই সমতল মাটিতে বিছিয়ে দেন। এরপর বাইজান্টাইন সেনাদের উদাসীনতার সুযোগে শক্তিশালী তুর্কি সেনাদের সাহায্যে টেনে একে একে সত্তর থেকে আশিটি জাহাজ তিনি গোল্ডেন হর্নে নিয়ে যেতে সক্ষম হন।

২২শে এপ্রিল সকাল। সূর্য চোখের সামনে আলো ছুড়তেই শহরবাসী গা ঝাড়া দিয়ে ওঠে। সামনে তাকিয়ে দেখে উসমানীয় রণতরীগুলো তাদের নৌপথ দখলে নিয়ে নিয়েছে। বারবার চোখ ডলে তারা বাস্তবতা উদ্ধারের চেষ্টা করে, কিছুতেই হিসেব মেলাতে পারে না। কীভাবে একদল সেনাবাহিনীর পক্ষে এমন কাজ করা সম্ভব? ঐতিহাসিকরা এই আশ্চর্য কাণ্ডের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন: ‘এমন বিরল কর্ম আগে কেউ করেছে বা করার চিন্তা করেছে বলে আমাদের জানা নেই। সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ জমিনকে সমুদ্রে পরিণত করেছেন। তিনি উত্তাল ঢেউয়ের বদলে জাহাজ চালিয়েছেন প্রকাণ্ড পাহাড়ের ভেতর দিয়ে। এ-কাজের মাধ্যমে মুহাম্মদ আল-ফাতিহ আলেকজান্ডার দ্যা গ্রেটের উপরেও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন।’

সুলতানের এমন সাহসী কর্ম দেখে অবরুদ্ধ সেনারা ভেবেই নিয়েছিল, উসমানিদের কাছে পরাজিত না হয়ে উপায় নেই। কিন্তু তারা দমে যায়নি একেবারে। বরং উসমানি সেনাদের সামনে গড়ে তুলেছে প্রতিরোধপ্রাচীর। পণ করেছে, জীবন চলে যাওয়া পর্যন্ত কন্সটান্টিনোপল শহরের দখল যেতে দেব না অন্য কারও হাতে। ৮৫৭ হিজরির ১৫ জুমাদাল উলা (২৪শে মে, ১৪৫৩ খ্রি.) তারিখে সুলতান

বাইজান্টাইন সম্রাট বরাবর একটি পত্র লেখেন। তাকে বলেন, 'আমি চাই কোনো রক্তপাত ছাড়াই আপনি শহরটি আমার হাতে তুলে দিন। আপনি, আপনার পরিবার এবং ঘনিষ্ঠজনসহ আরও যারা নিরাপত্তা কামনা করে, আমি তাদের নিরাপত্তা দিতে সম্মত আছি। শহরবাসী যতদিন খুশি নিরাপদে এ শহরে বসবাস করতে পারবে, আমার কোনো আপত্তি নেই। কেউ যেতে চাইলে তাকেও উত্যক্ত করা হবে না, কেউ থাকতে চাইলে তাকেও সামান্য কষ্ট দেয়া হবে না। বাকিটা আপনার মর্জি।'

সুলতানের পত্র পেয়ে সম্রাট বিশিষ্টজনদের একত্র করে পরামর্শ কামনা করেন। কেউ বলে, 'আপনি শহর সুলতানের হাতে সঁপে দিন'; কেউ বলে, 'না, আমরা মরণপণ যুদ্ধ করব, তবু শহর উসমানীয়দের হাতে তুলে দেব না।' সম্রাট দ্বিতীয় পক্ষের মতামতের সাতে একমত হন। যুদ্ধ চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়ে তিনি সুলতান বরাবর চিঠির উত্তরপত্র লিখেন। বলেন: 'শুকরিয়া যে, আপনি শহর সঁপে দেয়ার বা জিযিয়া প্রদানের প্রস্তাব করেছেন; কিন্তু কন্সটান্টিনোপলবাসী শপথ করেছে, তারা মৃত্যু পর্যন্ত শহর রক্ষার চেষ্টা করে যাবে। হয় আমার কুরসি বহাল থাকবে, নতুবা আমি এই শহরের প্রাচীরতলে দাফন হয়ে যাব।'

সুলতান উত্তরপত্রটি হাতে পেয়ে বলেন, 'তাহলে তা-ই হোক। অচিরেই দেখা যাবে, হয় এই কন্সটান্টিনোপলে আমার নতুন মসনদ বসবে, নতুবা এখানে আমার চিরকালের কবর রচিত হবে।'

এরপর ২৮ এপ্রিল সম্রাট কন্সটান্টিন এই নৌবাহিনীকে আক্রমণের জন্য তাদের নৌবহর পাঠায়। কিন্তু আগে থেকেই খবর পেয়ে যাওয়ায় উসমানীয় নৌ সেনারা প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিয়ে রাখে। ফলে সহজেই তারা গোল্ডেন হর্নে বাইজান্টাইন নৌবাহিনীকে পরাজিত করে ফেলে। এতে গোল্ডেন হর্নের দিকে দেয়াল রক্ষার জন্য সম্রাট কন্সটান্টিনকে নতুন করে লোক নিয়োগ দিতে হয়।

অন্যদিকে থিওডেসিয়ান দেয়ালে কামানের গোলা বর্ষণে কোনো কাজ না হওয়ায় সুলতান নতুন পদক্ষেপ নেন। জাগানোস পাশা এবং সার্বিয়ান সৈন্যদের নেতৃত্বে সুড়ঙ্গ তৈরির কাজ শুরু করেন। উদ্দেশ্য ছিল সুড়ঙ্গ দিয়ে সেনা প্রবেশ করিয়ে দেয়াল না ভেঙেই মূল শহরে আক্রমণ করা। উসমানীয়দের নতুন কৌশল ধরতে পেরে বাইজান্টাইন প্রকৌশলী জোহানসন গ্রান্ট পাল্টা আক্রমণ করেন। ১৮ মে গ্রান্টের নেতৃত্বে প্রথম সুড়ঙ্গ দখল করে বাইজান্টাইনরা। এরপর ২১ এবং ২৩ মে আরও দুটি সুড়ঙ্গের পাশাপাশি দুইজন উসমানীয় অফিসারকে গ্রেফতার করতে

সক্ষম হয় তারা। অত্যাচার করে তাদের কাছ থেকে অন্যান্য সুড়ঙ্গের অবস্থান জেনে সবগুলো ধ্বংস করে দেয় ২৫ মে তারিখে। ফলে উসমানীয়দের এই পরিকল্পনাও ফলবিহীন নস্যাৎ হয়ে যায়।

দীর্ঘদিন ধরে কোনো সফলতা না পাওয়ায় উসমানীয় বাহিনী একদিকে মানসিকভাবে ভেঙে পড়ছিল, অন্যদিকে গ্রান্টের সাফল্য পাবার পরেও বাইজান্টাইনরা মানসিকভাবে শক্ত হতে পারছিল না। ভেনিস থেকে সাহায্য আসা সম্ভব না, ততদিনে বুঝে গিয়েছিল তারা। এছাড়াও ২৬ মে ঘন কুয়াশা শহরের অনেকের মনে বিভিন্ন কুসংস্কারের জন্ম দেয়। শহরের অনেকেই ধরে নেয় হাজিয়া সোফিয়া থেকে পবিত্র আত্মার চলে যাওয়া লুকাতেই এই কুয়াশা হয়েছিল।

অন্যদিকে ক্লান্ত, বিধ্বস্ত সুলতান মুহাম্মদ ২৬ মে রাতে তার সেনাপতিদের সাথে আলোচনায় বসেন। সিদ্ধান্ত হয় ২৮ মে রাতে বিশ্রাম এবং নামাযের পর বড় একটি আক্রমণ চালানো হবে। ২৮ মে মাঝরাতের পরপরই পরিকল্পনামতো উসমানীয় বাহিনী আক্রমণ শুরু করে। প্রথমদিকে কিছু সাফল্য পাবার পর উসমানীয়দের এলিট ফোর্স জেনিসারিরা যোগ দেয় আক্রমণে। কিন্তু জিওভানি জিউসটিনিয়ানির নেতৃত্বে প্রতিরোধ করে তাদের আটকে রাখে বাইজান্টাইন সেনারা। কিন্তু উসমানীয় বাহিনীর আক্রমণে জিউসটিনিয়ানি আহত হলে শুশ্রুষার জন্য তাকে শহরের ভেতরে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপরই ক্রমশ প্রতিরক্ষাব্যূহ দুর্বল হতে থাকে বাইজান্টাইনদের।

২৯ শে মে ভোরবেলা। সুলতান চূড়ান্ত আক্রমণের জন্য এক লক্ষ তুর্কি সেনাকে গোল্ডেন হর্নের সামনে জড়ো করেন। দুই পাশে ৫০ হাজার করে সেনা সাজিয়ে মাঝবরাবর দাঁড় করান জেনিসারি সেনাদের। ওদিকে বন্দরে তখন সত্তরটি উসমানীয় রণতরী অপেক্ষমাণ। সুলতানের নির্দেশে জল ও স্থলপথে একসাথে আক্রমণ শুরু হয়। বাইজান্টাইনের সেনারা তাদের মাথার উপরে জাহাজ থেকে ছুড়ে মারা মেঘসদৃশ আগুনের গোলা ছাড়া কিচ্ছু দেখতে পায় না। দু-পাশ থেকে মুসলিম সেনাদের তাকবিরধ্বনি তাদের অন্তরে কাঁপন তুলে দেয়। পাহাড় থেকে সাগর, কেবল আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে গুঞ্জরিত হতে থাকে। প্রতিরোধের সর্বোচ্চ চেষ্টা করেও বাইজান্টাইন সেনারা মনে করে, শেষ রক্ষা বুঝি আর হলো না। একপর্যায়ে সুলতানের নির্দেশে জানবাজ কিছু সেনা শহরের প্রাচীরে লোহার সিঁড়ি বসাতে শুরু করে। শত্রুপক্ষের তিরবৃষ্টি উপেক্ষা করে তারা দেয়ালে ঝুলিয়ে দেয় বেশকিছু অস্থায়ী সিঁড়ি। এরপরই উসমানীয় সেনারা বাইজান্টাইনদের প্রতিরক্ষা ভেদ করে ধীরে ধীরে ভেতরে প্রবেশ শুরু করে। দক্ষিণ দিকে সম্রাট কন্সটান্টিন

নিজেই দেয়াল প্রতিরক্ষায় নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। কিন্তু উত্তর দিকের একটি প্রবেশদ্বার উসমানীয়রা খুলে ফেলায় তিনি চাপে পড়ে পিছিয়ে যেতে থাকেন। একই সময়ে উসমানীয়রা আরও কিছু প্রবেশদ্বার খুলে দলে দলে শহরে ঢুকে পড়তে থাকে। সম্রাট কন্সটান্টিনের ভাগ্যে শেষ পর্যন্ত কী হয়েছিল তা জানা না গেলেও ধারণা করা হয় উসমানীয় বাহিনীকে শেষবারের মতো আটকে দেবার প্রচেষ্টায় মারা গিয়েছিল সে।

শহরে উসমানীয় সেনারা প্রবেশ করলে, মুখোমুখি যুদ্ধে বাইজান্টাইনদের প্রায় চার হাজার সেনা মারা যায়। অন্যদিকে সে-সময় উসমানীয়দের হতাহতের প্রকৃত সংখ্যা জানা যায়নি। দীর্ঘদিন অজেয় থাকা কন্সটান্টিনোপল শহর ১৪৫৩ সালের ২৯ মে মাত্র তিন ঘণ্টার দুর্দমনীয় আক্রমণে দখল করে নেয় উসমানীয় সাম্রাজ্য। আসল রোমের পতন পূর্বে ঘটলেও রোমান সাম্রাজ্যের জৌলুশের ছায়া হয়ে থাকা বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যেরও পতন ঘটে সেদিন। হাজার বছর ধরে চলে আসা রোমান সাম্রাজ্যের পতনের সাক্ষী হয়ে থাকে উসমানীয় বাহিনীর এ বিজয়।

সুলতান যখন শহরে

২০ জুমাদাল উলা, ৮৫৭ হিজরি মোতাবেক ২৯ শে মে ১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দ রোজ মঙ্গলবার, যোহরের সময় সুলতান মুহাম্মদ কন্সটান্টিনোপল শহরে প্রবেশ করেন। বিজয় ও সাফল্যের কৃতজ্ঞতাস্বরূপ প্রথমে আল্লাহর নামে সিজদায় লুটিয়ে পড়েন। এরপর অগ্রসর হন আয়া সুফিয়া গির্জার দিকে। সেখানে বাইজান্টাইন জনগণ এবং তাদের ধর্মীয় পাদরিরা একত্র হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সুলতানের আসার খবর শুনে তারা ভয়ে তটস্থ হয়ে যায়। একজন পাদরি এগিয়ে গিয়ে গির্জার গেট খুলে দিলে সুলতান তাকে বলেন, 'সকলকে শান্ত ও আশ্বস্ত হয়ে নিজ নিজ বাড়িতে ফিরে যেতে বলুন।' সুলতানের সিদ্ধান্তে জনগণ প্রশান্তমনে ফিরে যেতে থাকে। কয়েকজন পাদরি ও বিশপ গির্জায় সুড়ঙ্গপথে লুকিয়ে ছিল। সুলতানের নমনীয়ভাব দেখতে পেয়ে তারা বাইরে বেরিয়ে আসে এবং তৎক্ষণাৎ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে নেয়। সুলতান সকল খ্রিস্টানদেরকে তাদের ধর্ম পালনের স্বাধীনতা দেন। বলেন, 'তোমরা তোমাদের প্রশাসনিক এবং ধর্মীয় নেতাদের নিজেরা নির্বাচন করে নিতে পারো। কিন্তু আমার সাম্রাজ্যকে অবশ্যই জিযিয়া কর দিতে হবে।' এরপর সকল পাদরি ও গির্জারক্ষীদের একত্র করে একজনকে প্রধান নির্বাচনের প্রস্তাব করেন। সকলের সহমতে 'জর্জিস'

নামে একজনকে প্রধান বিশপ হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। সুলতান তাকে বলেন, 'শহরের গির্জাগুলোর অর্ধেক আপনাকে বুঝিয়ে দিলাম; বাকি অর্ধেক মুসলমানদের জন্য রেখে দিলাম। আপনারা আপনাদের ধর্মকর্ম করবেন, মুসলমানরাও তাদের নিজেদের ধর্মকর্ম স্বাধীনভাবে করবে।' এরপর তিনি মুয়াজ্জিনকে যোহরের আজান দিতে বলেন। আয়া সুফিয়া গির্জাটিকে মসজিদ বানিয়ে সেখানে নামাযের আয়োজন করতে বলেন এবং উসমানি সাম্রাজ্যের রাজধানী কন্সটান্টিনোপলে স্থানান্তর করে তিনি এর নতুন নাম দেন 'ইসলামবুল'। যার অর্থ, 'ইসলামের মসনদ' বা 'ইসলামের শহর'। পরবর্তীতে অধিকচর্চাবশত নামটি বর্তমান ইস্তাম্বুলে পরিণত হয়ে যায়।

মুসলিমদের কাছে যা কন্সটান্টিনোপল বিজয়, খ্রিস্টানদের কাছে তা ছিল কন্সটান্টিনোপলের পতন। সেসময় পোপ উসমানীয়দের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধের ডাক দিয়ে কন্সটান্টিনোপল ফিরে পাবার আহ্বান জানান। কিন্তু ইউরোপের কেউই কোনো আগ্রহ দেখায়নি কন্সটান্টিপোল ফিরে পাওয়ার ব্যাপারে। সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মদ উসমানীয় সাম্রাজ্যের রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন কন্সটান্টিনোপলে। প্রাচীন এ শহরকে কেন্দ্র করেই উসমানীয় সাম্রাজ্য পরবর্তীতে বিস্তৃত করে তাদের সাম্রাজ্য। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজয়ের মাধ্যমে পতন ঘটে এই উসমানীয় সাম্রাজ্যের।

উসমানীয়দের এই বিজয় ইউরোপের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। এশিয়ার সাথে সরাসরি বাণিজ্যের পথ হারায় ইউরোপিয়ানরা। ফলে তারা পূর্ব দিক দিয়ে ভারত কিংবা চিনে যাবার রাস্তা খুঁজতে থাকে। সেগুলো আবার জন্ম দেয় নতুন সব অভিযানের। মাত্র একুশ বছর বয়সে প্রায় অজেয় এক শহর দখল করে সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মদ উপাধি পান 'মুহাম্মদ আল-ফাতিহ' বা 'বিজয়ী সুলতান' হিসেবে।

মোহাক্সের যুদ্ধ
BATTLE OF MOHACS

তারিখ:	৯৩২ হিজরি / ১৫২৬ খ্রি.
স্থান:	মোহাক্স, বুদাপেস্ট, হাঙ্গেরি
ফলাফল:	মুসলিম বাহিনীর বিজয়

পক্ষ-বিপক্ষ:	উসমানি সাম্রাজ্য	হাঙ্গেরি সাম্রাজ্য
সেনাপ্রধান:	সুলতান সুলাইমান আল-কানুনি	হাঙ্গেরির রাজা দ্বিতীয় ভ্লাদিস্লাস
সেনাসংখ্যা:	১ লাখ	১ লাখ (মতান্তরে ২ লাখ)
ক্ষয়ক্ষতি:	১৫০ জন শহিদ, কয়েক হাজার আহত	পুরো বাহিনীই প্রায় মোহাক্সের ময়দানে বালুর সাথে মিশে যায়

৯৩২ হিজরিতে (১৫২৬ খ্রি.) উসমানি সম্রাট সুলতান সুলাইমান দ্যা ম্যাগনিফিসেন্ট এবং হাঙ্গেরির রাজা দ্বিতীয় ভ্লাদিস্লাসের মধ্যে মোহাক্স নামক স্থানে সংঘটিত হয় এ যুদ্ধটি। পরিণামে পরবর্তী ১৪০ বছরের জন্য হাঙ্গেরি উসমানীয়দের পায়ের তলে এসে যায়। অভাবনীয় বিজয়ের সংবাদ নিয়ে রাজ্যে ফেরে উসমানীয় সেনাবাহিনী।

পূর্বালাপ

সুলতান সুলাইমানের সভাকক্ষে নেমে এসেছে থমথমে নীরবতা। দরোজার পাশে একটি পাত্রে রাখা আছে কর্তিত মস্তক। রাগে ফুলে উঠছে মহামান্যের নাক মুখ; চোখের ভেতর আহত সিংহের ক্ষুধাতুর হিংস্র নেশা। খবর এসেছে হাঙ্গেরির রাজা দ্বিতীয় ভ্লাদিস্লাস উসমানি সাম্রাজ্যের সাথে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করেছে। সাম্রাজ্যের নামে কটুবাক্য বলেছে এবং চরম ঔদ্ধত্যপূর্ণ শব্দ ব্যবহার করেছে। এমনকি সে নরাধম সুলতানের দূতের কল্লা নামিয়ে উসমানি মহলে উপহার পাঠিয়েছে। নিহত লোকটি গিয়েছিল সাম্রাজ্যের পক্ষ থেকে বাৎসরিক কর আদায় করতে। সুলতানের আত্মমর্যাদা ছলকে উঠল। সভাকক্ষের নীরবতা ছিঁড়ে তিনি চিৎকার করে উঠলেন, 'এখনই বাহিনী তৈরি করো, হাঙ্গেরি আমাদের পায়ের তলে থাকবে, ইনশাআল্লাহ।'

সুলতান সুলাইমান। অটোমান স্বর্ণযুগে সাম্রাজ্যের নায়ক। পিতা সেলিম দ্য গ্রিম এশিয়া ও আফ্রিকায় একচ্ছত্র অধিপতি হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন অটোমানদের। পুত্র সুলাইমান ইউরোপে নিজেদের শক্তিশালী ও উন্নত করে অটোমান মহাকাব্যের বাকি অংশ সমাপ্ত করলেন। সাম্রাজ্যের পরিধি বৃদ্ধি করার জন্য কেবল সামরিক অভিযান নিয়েই ব্যস্ত থাকেননি তিনি। আইন, সাহিত্য, শিল্প এবং স্থাপত্যের যেগুলো পরবর্তীতে অটোমান বৈশিষ্ট্য বলে স্বীকৃত হয়েছে, তার অধিকাংশের

বিকাশ ঘটেছে মূলত তারই আমলে।

কে তিনি?

সুলাইমানের জন্ম ১৪৯৪ সালের ৪ নভেম্বর ট্রাবজোনে। অটোমান সাম্রাজ্যের নবম সুলতান সেলিমের একমাত্র জীবিত পুত্র ছিলেন তিনি। মা আয়েশা হাফসা ছিলেন ক্রিমিয়ার ধর্মান্তরিত মুসলিম। পড়াশোনার হাতেখড়ি হয়েছিল দাদি গুলবাহার খাতুনের কাছে। তারপর, মাত্র সাত বছর বয়সেই ইস্তাম্বুলের তোপকাপি প্রাসাদের রাজকীয় পাঠশালায় তার শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।

মেধার পরিচয় পাওয়া যায় দ্রুতই। খায়রুদ্দিন খিজির এফেন্দির তত্ত্বাবধানে ঘুরে আসেন বিজ্ঞান, ইতিহাস, সাহিত্য, যুদ্ধবিদ্যা ও ধর্মতত্ত্বের চৌহদ্দি। বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান লাভের পাশাপাশি ছয়টি ভাষায় দক্ষতাও অর্জিত ছিল তার—অটোমান তুর্কি, আরবি, সার্বিয়ান, চাগতাই, ফারসি এবং উর্দু। এরপর মাত্র পনেরো বছর বয়সে প্রাদেশিক শাসনকর্তার পদে আসীন হন সুলাইমান। পিতা এবং চাচাদের মধ্যে উত্তরাধিকার নিয়ে গৃহবিবাদ শুরু হয়েছে ইতোমধ্যে। তিনি সেখানে পিতার পক্ষে বিশ্বস্ত সেনাপতির ন্যায় যুদ্ধ করেন এশিয়া মাইনরে, প্রবল বিক্রমে।

সিংহাসনে আরোহণ করলেন সেলিম, পুত্রকে দিলেন ইস্তাম্বুলের ভার। এরপর আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। নিজের যোগ্যতায় সুলাইমান অর্জন করলেন আনাতোলিয়া ও মিশরের শাসনকর্তার পদ। সিংহাসনে বসার আগে থেকেই ঈর্ষণীয় রকমের জনপ্রিয় ছিলেন সুলাইমান। অবশিষ্ট দিন কেমন যাবে, তা নাকি সকাল দেখেই বোঝা যায়? সুলাইমানের ক্ষেত্রেও তা শতভাগ সত্য। দীর্ঘ ৪৬ বছর দোর্দণ্ড প্রতাপে এক বিশাল সাম্রাজ্য শাসন শেষে যখন মৃত্যুবরণ করেন তিনি, ততদিনে তার জনপ্রিয়তা অটোমান-সীমানা ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়েছে পুরো বিশ্বময়।

মসনদে সুলাইমান

লেমান সিংহাসনে আরোহণ করেন ১৫২০ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর। মা আয়েশা কেন তার পরামর্শক হিসেবে। মৃত্যুর আগে বাবা সেলিম অটোমান সাম্রাজ্যকে তশীল একটা ভিতের উপর দাঁড় করিয়ে যান। ভূমধ্যসাগরীয় অর্থনীতি, এশিয়া আফ্রিকার রাজনীতি, এমনকি ধর্মের ক্ষেত্রেও প্রাধান্য নিশ্চিত করে যান তিনি।

কিন্তু অনেক কাজ যেন তখনো বাকি রয়ে যায়। সুলাইমান পিতার সাথেই থাকতেন পুরোটা সময়। তাই হয়তো বুঝতে ভুল করেননি, পরবর্তী কর্মপরিকল্পনা ঠিক কী হতে পারে। মনোযোগ দিলেন সাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত ইউরোপীয় অঞ্চলের দিকে। বলা হয়, খুব বিপজ্জনক গতিতে সুলাইমান তার রাজত্ব শুরু করেছিলেন। বেলগ্রেড, রোডস এবং হাঙ্গেরির মতো শত্রুরাজ্যগুলোকে একে একে নিজের অনুগত করে নিয়েছিলেন। প্রথম জীবনের বন্ধু ইবরাহিম পারগালিকে রেখেছিলেন প্রধানমন্ত্রীর পদে, যদিও প্রাসাদ-ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে বন্ধুত্বের নির্মম প্রতিদানে জীবন দিতে হয়েছিল তাকে। তেমনি জীবন দিতে হয়েছিল সুলাইমানের আরেক পুত্র মুস্তফাকেও।

বেলগ্রেডে সুলতান

হাঙ্গেরির রাজা লুইয়ের তুর্কি-দূত হত্যাই মূলত সংঘর্ষের প্রধান কারণ হিসাবে পরিগণিত হয়। সুলাইমান সেই সূত্রে রাজধানী বেলগ্রেড দখলের প্রস্তুতি নেন। ঠিক এই সময়টাতে অস্ট্রিয়ার রাজা পঞ্চম চার্লস এবং ফ্রান্সের রাজা প্রথম ফ্রান্সিসের মধ্যে যুদ্ধ চলছিল। মার্টিন লুথারের প্রোটেস্ট্যান্ট আন্দোলন ও অন্যান্য কারণে ভেতরে ভেতরেই তখন টানাপোড়েনে ব্যস্ত ইউরোপ। কে কার হয়ে কিংবা কার বিরুদ্ধে লড়ছে, ঠিক নেই। সে যা-ই হোক, দূত হত্যার মতো অপমানে জবাব না দিলে সম্ভ্রম থাকে না কোনো সাম্রাজ্যের, তাই সুলতান রণসাজে সেজে তৈরি হলেন।

তিন হাজার সমরাস্ত্রবাহী বাহন, দশ হাজার রসদবাহী উট এবং সেই সাথে তিনশো কামানধারী গোলন্দাজ নিয়ে অগ্রসর হলেন সুলাইমান। সপ্তাহ তিনেক অবরুদ্ধ থাকার পর প্রাণপণ প্রচেষ্টাতেও তার সামনে টিকতে পারল না শত্রুপক্ষ। ১৫২১ সালের ৩১ আগস্ট পতন ঘটল বেলগ্রেডের। সুলতান একে সামরিক বিভিন্ন প্রাসঙ্গিকতা দিয়ে পরিণত করলেন হাঙ্গেরির অন্যান্য অংশ অভিযানের ঘাঁটি হিসাবে।

উসমানি সুলতান দ্বিতীয় মুহম্মদ ইতিপূর্বে রোডস দ্বীপ অধিকার করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। এই রোডসকে আশ্রয় করে জলদস্যুরা ইস্তাম্বুল ও মিশরে চলাচলকারী তুর্কি বাণিজ্য জাহাজ লুট করে নিত। সুলতান সুলাইমান দেখলেন, উপযুক্ত ব্যবস্থা না নিলে মুখ থুবড়ে পড়বে ভূমধ্যসাগরে অটোমানদের বাণিজ্য। তাই আট হাজার

জেনিসারিসহ তিন হাজার রণতরিসমৃদ্ধ শক্তিশালী নৌবহর রোডস্ অভিমুখে প্রেরণ করলেন সুলতান। নিজে প্রায় এক লাখ সৈন্য নিয়ে এশিয়া মাইনর হয়ে রওনা করলেন। সেন্ট জন-এর নাইটদের বীরত্বপূর্ণ প্রচেষ্টায় ছয়মাস অবরোধেই অতিবাহিত হয়ে গেল তার। সুকঠিন সেই প্রতিরোধ-প্রাচীরে একসময় ফাটল ধরল আর নাইটরাও আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলো। বলছি ১৫২২ সালের ২৫ ডিসেম্বরের কথা।

তবে রোডস্-বাসীর বীরত্বে মুগ্ধ হয়েছিলেন সুলেমান। তাই হত্যাযজ্ঞ নয়, সম্মানসূচক সন্ধি স্থাপিত হলো উভয়পক্ষে। ধর্মীয় ও সামাজিকভাবে পূর্ণ স্বাধীনতা পেলো সেখানকার নাগরিকেরা। তাদেরকে কর থেকে অব্যাহতি দেয়া হলো পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য। এর মধ্য দিয়ে ভূমধ্যসাগরের বুকে অটোমানদের শক্তিশালী ঘাঁটি হিসাবে প্রস্তুত হয়ে উঠল রোডস্।

হাঙ্গেরি অধিকার

রোডস বিজয়ের পর সামরিক বিরতি ছিল বেশ কিছুদিন। অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা—কথাটা যেন আগেকার সেনাবাহিনীর জন্য আরও বেশি করে সত্য ছিল। সবসময় তাদেরকে যুদ্ধ-বিগ্রহে ব্যস্ত রাখতে হতো, নতুবা আলসেমি পেয়ে বসতো তাদের। কখনো-বা সামনে শত্রু না পেয়ে নিজেদের মধ্যেই গোল বাধিয়ে মারবে এবং মরবে। সুলাইমানের সেনাবাহিনীতেও এই সময়টায় তা-ই ঘটেছিল। জেনিসারি বাহিনীতে হঠাৎ অসন্তোষ দেখা দিল তুচ্ছ কিছু বিষয়কে কেন্দ্র করে। কিন্তু সুলতান দক্ষতার সাথে সেনাদের মধ্যকার সেই সমস্যা দমন করলেন।

ইতোমধ্যে ফ্রান্সের সম্রাট প্রথম ফ্রান্সিস ১৫২৫ সালে পাভিয়ার যুদ্ধে পরাজিত হয়েছেন অস্ট্রিয়ার পঞ্চম চার্লসের কাছে। যেহেতু হাঙ্গেরির সম্রাট অস্ট্রিয়ার সম্রাটের আত্মীয়, সেহেতু ফ্রান্সিস এই সুযোগটা লুফে নিলেন। সুলাইমানকে প্ররোচনা দিলেন শত্রুকে জব্দ করার জন্য। প্রধানমন্ত্রী ইবরাহিমও তাকে পরামর্শ দিলেন সুযোগটা কাজে লাগাতে। তাছাড়া হাঙ্গেরি সেই আবহমান কাল থেকেই ইসলামের অন্যতম শক্তি হিসেবে কাজ করছে। যুগ যুগ ধরে সে ক্রুসেডের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হিসেবে ইসলামের বিরুদ্ধে রসদ জুগিয়েছে। ইতিপূর্বে বহুবার বহু বীর তাদেরকে পদানত করতে চেয়েছেন, কিন্তু আস্তিনের এই সাপ যেন সম্রাট বদলের সাথেসাথেই খোলস বদলে ফেলে। পুরাতন সম্রাটের মৃত্যু বা অপসারণ মানে হাঙ্গেরির সাথে ইসলামের

যুদ্ধ অবধারিত। তারপরও সুলতান সুলাইমান অতটা উৎসাহী ছিলেন না। তিনি চাচ্ছিলেন না, খ্রিস্টানদের পারস্পরিক বোঝাপড়ায় তার বাহিনী কারও পক্ষে ব্যবহার হোক। কিন্তু বার্ষিক কর আদায় করতে যাওয়া সুলতানের দূত হত্যার পর তিনি নিজেকে একদমই সংবরণ করতে পারলেন না। বিপুল সেনা এবং বহু যুদ্ধ সরঞ্জাম জোগানোর নির্দেশ করলেন। হাঙ্গেরির সাথে এবার কোনো বোঝাপড়া করেই তবে ফিরবেন তিনি।

বের হলো ঢাল, বের হলো তলোয়ার

১১ই রজব ৯৩২ হিজরি মোতাবেক ১৩ই এপ্রিল ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে সুলতান ১ লক্ষ সেনা, তিনশো গোলা এবং তিনশো রণতরি নিয়ে বেলগ্রেড এসে পৌঁছলেন। সেখানে দুবেন নদীর উপর নবনির্মিত সেতু পার হয়ে সহজেই শত্রুর ভূমিতে পা রাখলেন। নদীর তীরবর্তী শহর পেট্রোভার্দিনসহ আরও কিছু দুর্গ দখল করে ইস্তাম্বুল ছাড়ার ১২৮ দিন পর তিনি মোহাক্স উপত্যকায় গিয়ে পৌঁছলেন। প্রাসাদ থেকে বের হয়ে এখানে আসতে তাকে পাড়ি দিতে হয়েছে প্রায় ১ হাজার কিলোমিটার। (মোহাক্স উপত্যকাটি বর্তমানে বেলগ্রেড থেকে ১৮৫ কি.মি. উত্তর-পশ্চিমে এবং বুদাপেস্ট থেকে ১৭০ কি.মি. দক্ষিণে অবস্থিত) পূর্ব থেকেই সেখানে সুলতানের অপেক্ষায় ছিল হাঙ্গেরির দুই লক্ষ এবং মিত্রনগর আলমানিয়ার আরও ৩৮ হাজার সজ্জিত সৈন্য। এই পুরো বাহিনীর নেতৃত্বে ছিল হাঙ্গেরির রাজা দ্বিতীয় ভ্লাদিস্লাস।

প্রতীক্ষিত মোলাকাত

২৯শে আগস্ট ভোরবেলা। সুলতান সুলাইমান ফজরের নামায পড়লেন। প্রতিদিনকার আমল সেরে সেনাদের সারিতে ঢুকে গেলেন। হেঁটে হেঁটে তাদেরকে যুদ্ধের জন্য উৎসাহ জোগালেন। তাদের হৃদয়ে তুলে দিলেন প্রতিশোধের ঝড়। একজন মুসলিম হত্যার সংবাদে হুদাইবিয়াতে কী হয়েছিল, সেই গল্প শুনিয়ে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করলেন। এরপর মূল বাহিনীর সামনে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রুহ মোবারক রওজা থেকে তোমাদের দিকে তাকিয়ে আছেন, তোমাদের কোনো চিন্তা নেই।' সুলতানের হৃদয়জাগানো বক্তব্যে সেনারা চোখের পানি ধরে রাখছে পারল না। তাদের দাড়ি, গাল এবং গলা বেয়ে অঝোরে ঝরে পড়ল নবীপ্রেমের নজরানা। উত্তপ্ত আঁখিজলের মতো তারা

তপ্ত লহু ঝরানোর শপথ গ্রহণ করল।

সারাদিন গিয়ে বিকেল গড়াল। মুসলিম বাহিনীতে আজান উঠল আসরের। অমনি হাঙ্গেরীয় সেনারা উসমানীয় বাহিনীর মধ্যভাগে আক্রমণ করে বসল। তারা চেয়েছিল, কেন্দ্রীয় অংশ সরিয়ে ফেলে দুইপাশে চূড়ান্ত কোনো হামলা চালাবে। কিন্তু সুলতান তাদের জন্য অন্য ফাঁদ পেতে রেখেছিলেন। তিন ভাগে বিভক্ত সেনাদলে সুলতান ছিলেন ডান পাশে। তার সাথে ছিল স্পেশাল জেনিসারি বাহিনী এবং সারির পেছনভাগে রাখা ছিল সঙ্গে আনা গোলাবারুদ। হাঙ্গেরীয় সেনারা এগিয়ে এলে সুলতান মধ্যভাগের মুসলিম সেনাদের ইঙ্গিতে শত্রুদেরকে ভেতরে ঢুকিয়ে ফেলার নির্দেশ দিলেন। সে-মতে তারা পেছন দিকে সরে হাঙ্গেরীয় সেনাদের মুসলিম বাহিনীর উদরে নিয়ে গেল। অমনি সুলতান গোলার দায়িত্বে থাকা সেনাপতিকে বললেন, গোলা নিক্ষেপ করতে।

আগুন জ্বলে উঠল হাঙ্গেরীয় বাহিনীর ভেতর। সেনাদের নিয়ে ধোঁয়ার ভেতরে ঢুকে গেলেন সুলতান সুলাইমান। যুদ্ধ শুরু হবার ঘণ্টা দেড়েক পেরিয়েছে কেবল, হাঙ্গেরীয়রা হার মেনে নিল। ধোঁয়া সরে এলে দেখা গেল, শত্রুপক্ষ ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই করে নিয়েছে। মাত্র দেড় ঘণ্টার যুদ্ধে মোহাক্স উপত্যকা খেয়ে নিয়েছে দুই লক্ষ সেনাবহর। মারা গেছে সেনাপতি ও রাজা দ্বিতীয় ভ্লাদিস্লাসসহ শত্রুদের নেতৃস্থানীয় সকলে। সুলতানের বাহিনী বন্দি করে নিয়েছে বেঁচে যাওয়া প্রায় পচিশ হাজার সেনাকে। বিপরীতে মুসলমানদের শিবিরে শহিদের সংখ্যা ১৫০, আহত মুজাহিদ কয়েক হাজার।

যুদ্ধের ফল

যুদ্ধের বিবরণই বলে দেয়, মোহাক্সের এই যুদ্ধটি ইতিহাসের অন্যতম বিরল যুদ্ধগুলোর একটি। একই বারের আক্রমণে মাত্র দেড় ঘণ্টায় হাঙ্গেরীয় বাহিনীর দম্ভ ও অহংকার এভাবে মাটিতে মিশে যাওয়া, অনেকটা রূপকথার গল্পের মতো শোনায়।

মোহাক্স যুদ্ধের মাসখানেক পর জিলহজের তিন তারিখ উসমানীয় সেনারা বুদাপেস্ট দখল করে নেয়। এ শহরে চার দিন অবস্থানের পর বেলগ্রেড শহরে ঈদ-উল-আজহা উদযাপন করেন। এরপর সেখানে সুলতান ১৩ দিন অবস্থান করেন।

রাজ্যের প্রয়োজনীয় সংস্কার করে উসমানি সাম্রাজ্যের অনুগত ট্রান্সিলভানিয়ার শাসক কাউন্ট জিপোলিয়ার হাতে হাঙ্গেরির শাসনভার তুলে দেন। এর মধ্য দিয়ে আগামী ১৪০ বছরের জন্য হাঙ্গেরি মুসলমানদের অনুগত রাজ্যে পরিণত হয়।

ফ্রান্সের সম্রাট জেপোলিয়াকে সমর্থন দিলেও হাঙ্গেরির বিরাট অংশ বিষয়টা মেনে নিতে পারেনি। ফলে গৃহযুদ্ধের সূচনা ঘটে। সেই আগুনে ঘি ঢালে অস্ট্রিয়ার সম্রাট চার্লসের ভাই ফার্ডিনান্ড। আত্মীয়তার সূত্রে সে হাঙ্গেরির সিংহাসন দাবি করে বসে। একবছর না যেতেই ১৫২৭ সালে টারকাল এর যুদ্ধে জেপোলিয়াকে হটিয়ে মসনদে বসলেন ফার্ডিনান্ড। পালিয়ে এলেন জেপোলিয়া। সাহায্যের আবেদন জানাতে শরণ নিলেন সুলতান সুলাইমানের ইস্তাম্বুলে।

রাগে ফেটে পড়লেন সুলতান। কালবিলম্ব না করে আবার সজ্জিত হলেন অভিযানের উদ্দেশ্যে। ১৫২৯ সালের প্রায় আড়াই লাখ সৈন্য ও সাতশো কামান নিয়ে আক্রমণ করা হলো। যথারীতি পুনরায় পতন ঘটল হাঙ্গেরির। পরাজিত ফার্ডিনান্ড পালিয়ে আত্মরক্ষা করল। জেপোলিয়াকে সিংহাসনে বসালেন সুলতান। তারপর রওনা হলেন অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনার পথে। তিনি জানতেন, শত্রুর বীজ রাখতে নেই!

অস্ট্রিয়ার সম্রাট চার্লসকে শিক্ষা দেবার জন্যই ১৫২৯ সালে সুলতান পূর্ণ শক্তি নিয়ে ভিয়েনাতে আক্রমণ চালালেন। সমগ্র ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে তুর্কিভীতি। সংস্কার আন্দোলনকারী মার্টিন লুথার নিজে তুর্কিদের 'ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ শত্রু' বলে আখ্যা দিয়ে বসে। দুই সপ্তাহ অবরোধ ও গোলন্দাজ বাহিনীর প্রবল আক্রমণে ভিয়েনা নগরীর পতন ততদিনে অত্যাসন্ন হয়ে উঠেছে।

কিন্তু আকস্মিকভাবেই সুলতান অবরোধ প্রত্যাহার করে নিলেন। প্রত্যাহারের প্রধান কারণ ছিল প্রতিকূল পরিবেশ এবং প্রয়োজনীয় রসদের অভাব। তাছাড়া সৈন্য ও জেনিসারিরাও শীতের আগে ইস্তাম্বুল ফিরতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। তবে কারও কারও মতে, সুলতান জয়ের জন্য না, বরং ভিয়েনা অবরোধ করেছিলেন শিক্ষা দেবার জন্য। আর তাতে তিনি সফলও হয়েছিলেন। এ অভিযানের ফলে অস্ট্রিয়ার সম্রাট ও তার ভাই ফার্ডিনান্ড হাঙ্গেরি ও ট্রানসিলভানিয়ার উপর সুলতানের অধিকার মেনে নিয়ে সন্ধি করে।

দীর্ঘ দিন সবকিছু ঠিকঠাক যাচ্ছিল। কিন্তু ১৫৬৪ সালে ফার্ডিনান্ডের মৃত্যু হলে তার পুত্র ম্যাক্সিমিলিয়ান ক্ষমতায় আসেন। তিনি পিতার নীতি পরিহার করে কর প্রদানে অস্বীকৃতি জানান। সেই সাথে আক্রমণ চালান অটোমান সাম্রাজ্যের বিভিন্ন

অঞ্চলেও।

খবর পৌঁছে গেল ইস্তাম্বুলে। সুলতান সুলাইমানের বয়স তখন সত্তরের কোঠায়। লাল হয়ে গেল তার স্বাভাবিক ফর্সা মুখ। কিছুটা পরিশ্রমে, কিছুটা রাগে। তারপরেও থেমে গেলেন না একটুর জন্যও। বরং বয়সের সাথে সাথে জেদটাও বুঝি বেড়ে গেছে জ্যামিতিক হারে। বাড়বে না-ই বা কেন? এ নিয়ে সাতটা অভিযান হলো খোদ হাঙ্গেরির বিরুদ্ধে। এবার একটা চূড়ান্ত শিক্ষা তাদেরকে দিতেই হবে।

প্রতিপক্ষের সৃষ্ট প্রতিকূলতা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যেই তাই মোকাবেলা হলো। অধিকারে এল হাঙ্গেরির সর্বশেষ দুর্গ সিগেত। দুর্গ পতনের আগের রাতেই আকস্মিকভাবে মৃত্যুবরণ করলেন বৃদ্ধ সুলতান। সময়টা ১৫৬৬ সালের ৫ সেপ্টেম্বর।

সৈন্যদের মনোবল যেন ভেঙে না পড়ে, সেজন্য গোপন রাখা হলো তার মৃত্যুসংবাদ। এমনকি হত্যা করা হলো ব্যক্তিগত হেকিমকেও; সৈন্যদের উপর তার প্রভাব ছিল এতটাই প্রবল। সাম্রাজ্যের বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছিল তার শক্তি ও সক্ষমতার গল্প। ভেতরে সমাদৃত হতেন 'কানুনি' বা আইনপ্রণেতা নামে। আর ইউরোপ তাকে দিয়েছিল Magnificent উপাধি।

সুলতানের সময়কালে অটোমান সাম্রাজ্যের অন্য সব দিকের মতো উৎকর্ষের বিচারে, তার নৌশক্তি ছিল স্থলবাহিনীর মতোই প্রতাপশালী। খায়রুদ্দিন বারবারোসা, দ্রাগুত পাশা, ওলুজ পাশা, পিরি পাশা, পিয়ালি পাশা নামের সুদক্ষ কয়েকজন নৌ-সেনাপতি ছিলেন তার সময়। যাদের মাধ্যমে ভূমধ্যসাগরে, লোহিত সাগর এবং আরব সাগরে তুর্কি নৌ-বাহিনীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। অধিকারে আসে তিউনিশিয়া এবং ত্রিপোলির মতো শহর এবং এডেন উপসাগর, ভূমধ্যসাগরের অনেকগুলো দ্বীপ। সুলাইমানের সময়ে অটোমান বাণিজ্যতরিগুলো মোঘল-ভারতের বন্দরগুলোতে এসেও নোঙ্গর করত। আকবরের সাথে সুলতানের পত্র বিনিময় হবার প্রমাণও ইতিহাসে পাওয়া যায়।

স্বীয় সাম্রাজ্যে কানুনি বা আইনপ্রণেতা হিসেবে খ্যাত হন সুলেমান। প্রধান কারণ, আইন ব্যবস্থায় আমূল সংস্কার। তুর্কি-সাফাভি ব্যবসায় নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে দেন তিনি। অটোমান সৈন্যদের খাদ্য ও সম্পত্তি ক্রয়ের আইন জারি হয়। এমনকি শত্রু অঞ্চলে অভিযানে গেলেও বলবৎ থাকবে সেই আইন। কর ব্যবস্থা সংশোধন ও অতিরিক্ত কর বাতিল করা হয়। রাষ্ট্রীয় নিয়োগে আত্মীয় বা পরিবারের চেয়ে মেধাকে মূল্যায়ন

করার জন্য দেওয়া হয় তাগিদ। উঁচু ও নিচু সমাজের সব তলার সকলের জন্যই আইন ছিল সমান। প্রশাসনব্যবস্থা ও সামরিক শক্তিকে ঢেলে সাজান সুলতান। সমগ্র সাম্রাজ্যকে ২১টি প্রদেশে এবং ২৫০টি সানজাক বা জেলায় বিভক্ত করেন। সানজাককে ভাগ করা হয় কাজাস-এ। কাজাসের শাসনকর্তা ছিলেন কাজ, সানজাকের পাশা এবং প্রদেশের গভর্নর। ইহুদি ও খ্রিস্টানদের অধিকার নিশ্চিত করার জন্যও তার পদক্ষেপ প্রশংসার দাবিদার।

সুলতান সুলাইমানের সময়টি অটোমান ইতিহাসের স্বর্ণযুগ হিসাবে স্বীকৃত। সামরিক ও প্রশাসনিক যোগ্যতা দিয়েই শুধু না, বিজ্ঞান, সাহিত্য, চিত্রকলা, স্থাপত্যের অনন্য উচ্চতায় আসীন হয় সাম্রাজ্য। নির্মাণের অনেক নিদর্শন আজ পর্যন্ত টিকে আছে।

লেপান্টের যুদ্ধ
BATTLE OF LEPANTO

তারিখ:	৯৭৯ হিজরি / ১৫৭১ খ্রি.
স্থান:	অদ্রিয়াটিক সাগরের পাড়, পেট্রাস, গ্রিস
ফলাফল:	মুসলিম বাহিনীর পরাজয়

পক্ষ-বিপক্ষ:	উসমানি খিলাফাহ	ইউরোপিয়ান ক্রুসেড জোট
সেনাপ্রধান:	পোর্ত ও মুয়াজ্জিন পাশা	ডন জন
সেনাসংখ্যা:	২৯০ রণতরি	৪০০ রণতরি
ক্ষয়ক্ষতি:	২০ হাজার শহিদ হয়, ১৪২টি জাহাজ ডুবে যায়; ৬০টি জাহাজ শত্রুদের হাতে চলে যায়	৮ হাজার সানা নিহত হয়, ২০ হাজার আহত হয়; অধিকাংশ জাহাজি ক্ষতিগ্রস্থ হয়

১৫৭১ সালে ইউরোপ ও তার মিত্রশক্তিগুলোর সম্মিলিত বাহিনীর সাথে উসমানীয়দের ঐতিহাসিক এক যুদ্ধ সংঘটিত হয়, ইতিহাসে যা লেপান্টের যুদ্ধ হিসেবে প্রসিদ্ধ। এ যুদ্ধে উসমানীয় বাহিনী পরাজিত হয় এবং এই পরাজয় উসমানি সাম্রাজ্যের দুর্বলতার প্রথম তিলক হয়ে পতনের সূচনা ঘটায়।

পূর্বকথা

সুলতান সুলাইমান দ্যা গ্রেটের মৃত্যুর সময় উসমানি সাম্রাজ্য তার সোনালি সময় পার করছিল। এ সময় পূবে-পশ্চিমে সাম্রাজ্যের জ্যোতি ও গতি দ্রুত ছড়াতে থাকে। সর্বত্র তাদের রাজ্য ও প্রভাব বিস্তারের ধারা নিরবচ্ছিন্ন অগ্রগতি পায়। বিশ্বের প্রধান ইসলামি শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয় উসমানি সাম্রাজ্য। এই অভাবনীয় উন্নতির সাথে সাথে বাড়তে থাকে চারপাশে তাদের শত্রুদের আনাগোনাও; যারা প্রতিমুহূর্তে উসমানীয়দের এমন কোনো দুর্বল জায়গা খোঁজ করে ফেরে, যেখানে ফুটো করে দিয়ে ক্রমবর্ধমান এ সাম্রাজ্যকে একেবারে শূন্যে এনে ঠেকানো যায়।

বাবা সুলতান সুলাইমান আল-কানুনির মৃত্যুর পর ছেলে দ্বিতীয় সালিম মসনদে বসেন ১৫৬৬ সালে। তার ক্ষমতায় আসার সাথেসাথেই সাম্রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ১৫৬৭-তে ইয়েমেনে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠলে সেটা নেভাতে নেভাতেই সাম্রাজ্যের দুই বছর সময় লেগে যায়।

এ সময় খোদ উসমানীয়দের আন্তঃসাম্রাজ্যীয় নানা প্রয়োজনীয় উদ্যোগ সামনে এসে দাঁড়ায়, ফলে সীমান্তের বাহিরে শত্রুদের কলবে চোখ ফেলার সুযোগ খুব একটা হয়ে ওঠে না তাদের। ভেতরের আবেদন পূরণেই কেটে যায় বেশিরভাগ সময়। সাম্রাজ্য তখন চিন্তা করছে, শ্বেত সাগর এবং লাল সাগরের কেন্দ্রগুলোতে

নিয়ন্ত্রণ বসানোর, যাতে উসমানীয়দের বাণিজ্যিক কাঠামো আরও সংহত এবং সংগঠিত হয়ে যায়। মিশরের উপকণ্ঠ পেরিয়ে সাগরপথের এই গুরুত্বপূর্ণ রুটগুলো তখনো পর্তুগালের দখলে রয়ে গিয়েছিল।

১২৬৯ সালে তারা ব্যস্ত হয়ে পড়ে ডোন ও ভলগা নদীর বন্দরগুলো করায়ত্ত করার কাজে। এতে কৃষ্ণ সাগর এবং ক্যাসপিয়ান হ্রদে উসমানীয় কাফেলাগুলোর চলাচল পুরোপুরি নিরাপদ হয়ে যায় এবং এই পথ তুর্কিদেরকে তুর্কিস্তানের সাথে সংযুক্ত করে দেয়, যা ইরান এবং রুশদের আক্রোশ থেকে তুর্কিস্তানকে অনেকাংশে বাঁচিয়ে দিয়েছিল। নদীপথের এই গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট দখল অতটা সহজও ছিল না; যে-জন্য উসমানীয়দেরকে এস্ত্রাখান রাজ্যের সাথে যুদ্ধ করতে হয়েছিল। এর কারণ ছিল, আশপাশে একসাথে বহু রাজ্যের অবস্থান এবং এই সমুদ্রপথের সাথে সকলের স্বার্থের সংশ্লিষ্টতা। উকরাইনের তৎসময়ের খানের কথায় যা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। সে বলেছিল: 'যখন থেকে উসমানীয় সেনারা আজারবাইজানের উত্তরাঞ্চলে আনাগোনা শুরু করেছে, তখন থেকেই উকরাইনে মোঙ্গলদের আধিপত্য কমে গেছে। বরং আমরা আশঙ্কা করছি, উকরাইন যে-কোনো সময় আমাদের হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে।'

সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ এত ব্যস্ততার পরও উসমানীয়রা তাদের মনোযোগ স্থাপন করেছিল সাইপ্রাসের উপদ্বীপ দখলের দিকে। কারণ, মিশর ও ইস্তাম্বুলের বাণিজ্যিক উন্নতির ক্ষেত্রে এই এলাকাটি বিশেষ প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছিল। দ্বীপটি তখন ভেনিসের শাসনাধীন রয়েছে এবং সুলতানের কানে এসেছে, তারা উসমানীয়দের বাণিজ্যিক কার্যক্রমে ইতিমধ্যেই নানান হস্তক্ষেপ শুরু করেছে। এ-জন্য পরিণামে সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে খ্রিস্টানরা জোট করতে পারে জেনেও সুলতান সাইপ্রাসের এ দ্বীপ অভিমুখে অভিযান পরিচালনার নির্দেশ দেন।

খ্রিস্টান জোট

সাইপ্রাসের দ্বীপ ঘিরে উসমানীয়দের চিন্তার খবর চলে যায় ইউরোপে। উসমানি সাম্রাজ্যের সাথে খ্রিস্টানদের বিরোধের অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত হতো এই দ্বীপ। সেটা হাতছাড়া হবার আভাস পেয়েই পোপ পঞ্চম বায়োস স্পেন, ভেনিস এবং অন্যান্য প্রধান সারির খ্রিস্টরাজ্যের সাথে ১৫৭১ সালের ২৫শে মে উসমানীয়দের বিরুদ্ধে এক জরুরি জোট গঠন করে। উসমানি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর

তাদের বিরুদ্ধে এটা ছিল খ্রিস্টানদের তেরোতম সামরিক জোট।

স্পেনের সম্রাটের কাছে পাঠানো পোপের পত্রের ভাষ্য ছিল এরূপ: 'বর্তমান পৃথিবীতে খ্রিস্ট দুনিয়ায় এমন একটি রাষ্ট্র পাওয়া যাবে না, যারা একা উসমানীয়দের সাথে লড়তে পারে। অতএব, এই তুর্কিদের দম্ভ চিরতরে চূর্ণ করতে অনতিবিলম্বে আমাদেরকে এক হতে হবে।' পোপের এমন সম্প্রীতির আবেদনে মুহূর্তেই পুরো ইউরোপ উসমানীয়দের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ শক্তি গঠন করে।

এদিকে উসমানি সাম্রাজ্যের গোয়েন্দারা বাতাসের গতিতে খ্রিস্টানদের সদ্যগঠিত এই জোটের খবর সুলতানের কানে পৌঁছে দেয়। ইস্তাম্বুলের আশপাশে জরুরি সতর্ক অবস্থা জারি করে নৌ বাহিনীকে নির্দেশ দেয়া হয়, নদীপথে খ্রিস্টানদের যে-কোনো তৎপরতার সর্বশেষ খবর রাখতে। আসন্ন সংকট ও সংঘাত মোকাবেলার জন্য নৌপথের পূর্ণ দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয় উজির পোর্ত পাশাকে।

কিন্তু উসমানি সাম্রাজ্যের প্রতি তীব্র ঘৃণা থেকে তৈরি এবারের খ্রিস্টান জোট এত বড় নৌবহর প্রস্তুত করেছিল, যা ছিল সুলতানের ধারণারও বাইরে। ঘন ধোঁয়ার মতো অজস্র ছিল তাদের সেনাসংখ্যা। অভিজ্ঞ প্রাজ্ঞ এবং দক্ষ সেনাপতির সংখ্যা ছিল অগুনতি। ঐতিহাসিকদের বর্ণনামতে, তাদের সেই নৌবহরে সাধারণ জাহাজ ছিল ২৯৫টি। যুদ্ধ জাহাজ ছিল ২০৮টি। সেনাসংখ্যা ছিল ৩০ হাজার এবং অতিরিক্তি ১৬ হাজার ছিল ডুবুরি। এই বিশাল নৌশক্তির সেনাপ্রধান হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছিল স্পেনিশ সম্রাট দ্বিতীয় কার্লোসের অবৈধ সন্তান ডন জনকে। যে তখনকার সময়ে নৌ সেনাপতি হিসেবে ইউরোপে বিখ্যাত ছিল।

তবে উসমানীয়দের নৌ শক্তিতে সাকুল্যে জাহাজ ছিল ৪০০টি। শরৎকালে এই জাহাজগুলি বাণিজ্যিক কাজে বিভিন্ন নৌ ঘাঁটিতে নোঙ্গর করত। যখন খ্রিস্টানদের এই জোট শক্তি উসমানীয়দের বিনাশে এগিয়ে আসছে ক্রমশ, তখন উসমানি সাম্রাজ্যের বন্দরে ভেসে ছিল সর্বমোট ১৮৪টি জাহাজ; বাকিগুলো বাণিজ্যিক কারণে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে গেছে। সুলতানের আদেশের পর পোর্ত পাশা এবং মুয়াজ্জিন পাশা সেগুলো নিয়ে লেপান্টের বন্দরের দিকে গিয়েছেন।

পোর্ত এবং মুয়াজ্জিন পাশার নেতৃত্বে লেপান্টের দিকে যাত্রা করা জাহাজগুলিতে তখন শীত নেমে এসেছে। এমন সময়ে কেউ যুদ্ধ করতে আসবে না ভেবে তারা শীতকাল কাটাতে লেপান্টের বন্দরে জাহাজগুলি নোঙ্গর করিয়ে দেয়। অধিকন্তু পোর্ত এবং মুয়াজ্জিন নৌবহরের নেতৃত্বে ততটা অভিজ্ঞও ছিলেন না; কারণ, তারা

মূলত স্থল-সেনাদের নেতৃত্ব দিয়েছেন সবসময়। জলপথে তারা কখনোই সেনা নিয়ে নামেননি আগে। কিন্তু পরিস্থিতির নাজুকতায় তাদেরকে সুলতানের নির্দেশে এখানে আসতে হয়েছে। তাছাড়া সে-সময় উসমানীয় প্রসিদ্ধ নৌ সেনাপতি হিসেবে বেঁচে ছিলেন দুইজন: হাসান পাশা, যার বয়স তখন ৭১ বছর; আর অলুজ পাশা, যার বয়স তখন ৬৪ বছর। কিন্তু দুঃখজনকভাবে তারা বহরে থাকলেও ঠিকঠাক নিজেরা সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম নন। এদিকে নৌশক্তির বাকি জাহাজগুলোও তখন ইস্তাম্বুলের কাছেপিঠে কোথাও নেই।

আত্মঘাতী ভুল

খ্রিস্টানদের রণতরিগুলো লেপান্টের কাছাকাছি আসতেই পোর্ত পাশা সকল নৌ সেনাপতিদের ডেকে বসালেন; পরবর্তী সিদ্ধান্ত কী হতে পারে, সে ব্যাপারে পরামর্শ করার জন্য। কষ্টের ব্যাপার হলো, এই জমায়েতের আগে আসন্ন যুদ্ধ নিয়ে সেনাপ্রধানের সামান্য কোনো পরিকল্পনা ছিল না। অথচ দৃষ্টির কোণায় শত্রুপক্ষের রণতরিগুলো হিংস্র হয়ে ভেসে আছে। তারপরও, যেহেতু তারা দায়িত্বশীল, যেহেতু তাদেরই জবাবদিহি করতে হবে—তাই অন্তত এই জমায়েতে তাদের নেয়া সিদ্ধান্ত খানিকটা যথোচিত এবং সকলের সম্মতিমূলক হওয়াটাই কি বাঞ্ছনীয় ছিল না?

নৌযুদ্ধে প্রাজ্ঞ এবং অভিজ্ঞদের মতামত ছিল, উভয় বাহিনীতে যেহেতু সেনা ও সরঞ্জামে সমতা নেই, তাই আপাতত সম্মুখ যুদ্ধে না গিয়ে আমাদের উচিত, আশপাশের কেল্লাগুলো থেকে সমুদ্রপৃষ্ঠে ভাসমান শত্রুদেরকে যুদ্ধ শুরুর আগেই নাজেহাল করে ফেলা, যাতে মোকাবেলায় আসতে আসতে এরা আসল শক্তি খুইয়ে আমাদের অনেকটা সমমানে চলে আসে। কিন্তু পোর্ত ও মুয়াজ্জিন পাশার মতামত ছিল সম্মুখ যুদ্ধের। তারা অভিজ্ঞদের কথা না শুনে সরাসরি ক্রুসেডারদের রণতরি লক্ষ করে আক্রমণ করার পক্ষপাতী ছিলেন।

তারপরও, যখন নৌ সেনাপতিরা দেখলেন বাহিনীর প্রধানদ্বয় তাদের কথা শুনছে না, তখন তারা নিরুপায় শুভাকাংখী হয়ে বললেন, তাহলে অন্তত আমাদের উচিত জাহাজগুলো সমুদ্রের মাঝামাঝি নিয়ে যুদ্ধ শুরু করা, যাতে প্রয়োজনে অবস্থাদৃষ্টে বন্দর ব্যবহার করে শত্রুদের লক্ষ করে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করা যায়। কিন্তু পোর্ত ও মুয়াজ্জিন পাশা তাদের কোনো কথাই শুনলেন না। ঘোষণা করলেন, আমরা পাড়ে থেকেই শত্রুদের মোকাবেলা করব। বললেন: 'এই কুকুর কাফেররা কী এমন হয়ে

গেছে যে, আমরা তাদের ভয় পাব? আমি আমার পদ বা প্রাণ হারানোর ভয় করি না। পরিস্থিতি-বিচারে আমাদের যুদ্ধই করা উচিত; প্রত্যেক জাহাজ থেকে পাঁচ-দশজন লোকই উর্ধ্বে কুরবান হবে, ইসলামের সম্মানে এটা কি খুব বেশি কিছু? সালতানাতের সম্মানেও কি এটুকু করা যাবে না?'

এই কথাগুলো বলতে পারে বাস্তবতা সম্পর্কে চূড়ান্ত অজ্ঞ কোনো ব্যক্তি। এটা বিন্দুমাত্র কোনো বীরত্ব বা দ্বীনি দায়িত্ববোধের কথা নয়। কারণ, এটা সাধারণ বিবেকেও সমর্থন করবে না যে, কেউ সামুদ্রিক যুদ্ধে জাহাজগুলো পাড়ে দাঁড় করিয়ে প্রতিপক্ষের মোকাবেলা করার চিন্তাও করতে পারে। সেনাপ্রধানের এমন অজ্ঞতা এবং একগুঁয়ে সিদ্ধান্তের শোচনীয় ফলফলও নিতে হয়েছিল নিতান্ত পরাজয় মেনে। ইতিহাসে এর আগে ক্রুসেডারদের কাছে নৌ পথে মুসলমানদের এমন লজ্জাজনক ভরাডুবি হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই।

যুদ্ধ

যুদ্ধ শুরু হয় ১৫৮১ সালের ৭ই অক্টোবর। এ যুদ্ধ তখনকাল পর্যন্ত ইতিহাসের সবচে বড় নৌ যুদ্ধ হিসেবে পরিচিতি পায়। রক্ত আর লাশে ভরে যায় সমুদ্রের সাদা স্বচ্ছ পানি। যুদ্ধের শুরুতেই মুয়াজ্জিন পাশা ও তার এক ছেলে শহিদ হয়ে যান; তার দ্বিতীয় ছেলে বন্দি হয়ে যায় শত্রুদের হাতে। পোর্ত পাশার অধীনে থাকা বিশেষ সেনাবাহিত উসমানি জাহাজ পানির তলে তলিয়ে যায়। বহু ত্যাগের পর সেটাকে কোনো রকমে পাড়ে টেনে আনা সম্ভব হয়।

ওদিকে উসমানীয় নৌ সেনাপতি ওলুজের নেতৃত্বে থাকা ডান পাশের ৪২টি জাহাজের একটিও সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি; উল্টো তারা বিপক্ষের মাল্টা নৌবহরের ৬টি জাহাজই নিজেদের আয়ত্তে নিয়ে নিয়েছে। অধিকন্তু যখন তিনি দেখলেন পরাজয় অত্যাসন্ন, কৌশলে অবশিষ্ট জাহাজগুলো পরবর্তী যুদ্ধের জন্য অক্ষত রাখতে তিনি সেগুলো দ্রুত নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিলেন।

এ যুদ্ধে উভয়পক্ষের ক্ষয়ক্ষতি ছিল অপূরণীয়। উসমানীয়দের ১৪২টি জাহাজ ডুবে যায়, ৬০টি জাহাজ প্রতিপক্ষের হাতে চলে যায়; ১১৭টি বড় কামান তাদের করায়ত্ত হয়, হস্তগত হয় ছোট আরও ২৫২টি গোলা। পাশাপাশি প্রায় তিরিশ হাজার গোয়েন্দা ডুবুরি, যারা উসমানীয়দের জাহাজে বন্দি ছিল, তাদেরকে মুক্ত

করে নিয়ে যায় প্রতিপক্ষের খ্রিস্টান জোট। যুদ্ধকালে উসমানি নৌ বাহিনীর প্রায় বিশ হাজার সেনা নিহত হয়, বন্দি হয় ৩৪৬০ জন। মুয়াজ্জিন পাশার হাতে থাকা স্বর্ণখচিত রেশমের পতাকাটিও তাদের কাছে চলে যায়, যা পরবর্তীতে শান্তিচুক্তির নমুনাস্বরূপ ১৯৬৫ সালে রোমান পোপ তুরস্কের প্রেসিডেন্টের কাছে হস্তান্তর করে দেয়।

অন্যদিকে এ যুদ্ধে ক্রুসেড বাহিনীর ৮ হাজার সেনা নিহত হয়। প্রায় বিশ হাজার সেনা গুরুতর আহত হয় এবং উসমানীয়দের হাতে বন্দি হয় আরও গুরুত্বপূর্ণ কয়েকজন ক্রুসেড সেনাপতি। তাদেরকে জাযিরা অঞ্চলের কারাগারে আটকে রাখা হয় বহুদিন ধরে।

তবে সবকিছুর ওপরে এ-যুদ্ধে উসমানীয়দের মানসিক পরাজয় ছিল সবচে প্রকট, যা তাদের বাহ্যিক পরাজয়ের চেয়ে অনেক বেশি গভীর এবং আহতকর ছিল। এ যুদ্ধের ফলে ইউরোপের সাথে উসমানীয়দের সম্পর্কে নেতিবাচক প্রভাব স্থায়ী হয়ে যায়। ইউরোপের লোকেরা ভাবতে শুরু করে, উসমানীয়দের অতটা ভয় পাওয়ার আসলে কিছুই নেই। তারা কোনো দুর্লঙ্ঘ্য জাতি নয়। এই ভাবনা থেকে ক্রমশই তাদের পারস্পরিক ঐক্যজোট আরও শক্তিশালী রূপ পরিগ্রহ করে।

কিন্তু এত বড় জয়ের পরও এ যুদ্ধকে কেন্দ্র করে ইউরোপ কোনো স্ট্রাটেজিক ফায়দা তুলতে পারেনি। বরং পরবর্তী এক বছরের মাথায় উসমানীয়রা তাদের ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নিয়ে আগের চেয়ে আরও বড় এবং সমৃদ্ধ নৌ শক্তি তৈরি করে নিতে পেরেছে, যেখানে পূর্বের চেয়ে জাহাজ এবং সেনাদের সংখ্যাও ছিল বেশি, পাশাপাশি সেগুলোর শক্তি ও সামর্থ্যও ছিল ব্যাপক, যা বিশ্বের সামনে প্রমাণ করেছে, উসমানীয়রা তখনকার রাজনীতিতে ঠিক কতটা শক্ত এবং স্থায়ী হয়ে উঠেছে।

পরাজয়: জয়ের সংকল্প

ইউরোপের সম্মিলিত জোট লেপান্টের যুদ্ধে বিজয়ের স্বাদ আস্বাদন করে সেটার স্মরণে বিভিন্ন মূর্তি ও প্রতিকৃতি নির্মাণ করলেও বিজয়ের কোনো উল্লেখযোগ্য ফসল তারা ঘরে তুলতে পারেনি। বরং উসমানি সাম্রাজ্য তাদের পরাজয়ের ক্ষত শুকিয়ে পরবর্তী সময়ের জন্য নিজেদেরকে আরও সংহত করে বিশ্বের সামনে

হাজির হয়েছে। পায়ে পায়ে দাঁড়িয়ে তারা লেপান্টের পরাজয়পরবর্তী শীত আসার আগেই আগের চেয়ে বিশাল নৌ বহর হাজির করেছে। বিষয়টির গুরুত্ব বুঝতে পেরে সম্রাট নিজের বাগিচার এক অংশ জাহাজ তৈরির জন্য দিয়ে দিয়েছেন এবং সেটা দিয়ে প্রায় ৮টি জাহাজ নির্মাণ করা সম্ভব হয়েছে; যার ফলে এক বছর না যেতেই উসমানীয়দের বন্দরে যোগ হয়েছে ১৫৩টি নতুন যুদ্ধ-জাহাজ।

তবে তারা এ সময় নিজেদের জনগণের মানসিক বিকাশ ও মনোবলের কথাও ভুলে থাকেনি। বরং বিভিন্ন কায়দায় তাদেরকে বোঝাতে চেষ্টা করেছে যে, একটি যুদ্ধে পরাজয় মানে প্রতিপক্ষের কাছে হেরে গিয়ে ভেঙে পড়া নয়। নৌ সেনাপতি ওলুজ পাশা সর্বসাধারণের মনোবল অটুট রাখতে দুই মাসে কয়েকবার ইস্তাম্বুলে অবশিষ্ট ৮৭টি রণতরি ভিড়িয়েছেন, যাতে লোকেরা সেগুলো দেখে মনে করে, মাশাআল্লাহ আমাদের তো যথেষ্ট শক্তি এখনো বাকি আছে। পাশাপাশি এ যুদ্ধে অসমান্য অবদান রাখায় ওলুজ পাশাকে নৌ সেনাপ্রধানের দায়িত্বে পদোন্নতি ঘটানো হয়েছে।

১৫৭২ সালের জুন মাসে সেনাপতি ওলুজ আলি পাশা উসমানীয়দের ২৪৫টি জাহাজ নিয়ে সাইপ্রাসের নৌ রুট বাঁচাতে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে ছুটে যান। তারা সেখানে নিয়ন্ত্রণ বসানোর চিন্তা করলে ওলুজ পাশা তাদেরকে শক্ত হাতে দমন করেন। প্রতিপক্ষের সেনাপতি ডন জন যখন উসমানিদের এতবড় নৌ বহর তার দিকে আসতে দেখে, তখনই বুঝে ফেলে, ক্ষতি পুষিয়ে নেবার পর এখন আর উসমানীয়দের মোকাবেলা করার ক্ষমতা তাদের নেই। পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য সে সাফাভি সম্রাট এবং ইয়েমেনের ইমামের কাছে উসমানীয়দের বিরুদ্ধে সাহায্যও কামনা করে।

উসমানীয়রা লেপান্টে তাদের পরাজয়ের কথা ভুলে যায়নি। তাই ইউরোপিয়ানদের সাথে ১৫৭৩ সালের ৭ই মার্চ তারা একটি সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ হয়, যা সাতটি মূল দাবিতে বিভক্ত ছিল; যার একটি হলো, ইউরোপিয়ানরা উসমানি সাম্রাজ্যকে ৩ লক্ষ স্বর্ণলিরা (ইতালিয়ান মুদ্রা) প্রদান করবে এবং সাইপ্রাসে তাদের কর্তৃত্ব মেনে নেবে। এই চুক্তির এক বছর পর সেই টাকা দিয়ে উসমানীয়রা ২২০টি নৌ তরি তৈরি করে ইতালির বন্দরগুলোতে ভাসিয়ে দেয়। ফলে ইতালিতেও উসমানি সাম্রাজ্যের প্রভাব ও কর্তৃত্ব সমানভাবে পরিদৃষ্ট হতে থাকে।

ওয়াদি-আল-মাখাযিন যুদ্ধ
BATTLE OF ALCÁCER QUIBIR

তারিখ:	৯৮৬ হিজরি / ১৫৭৮ খ্রি.
স্থান:	আল-কাসরুল কাবির, ওয়াদি আল-মাখযিন, আলজেরিয়া
ফলাফল:	মুসলিম বাহিনীর বিজয়

পক্ষ-বিপক্ষ:	উসমানি খিলাফাহ	ইউরোপিয়ান ক্রুসেড জোট (পর্তুগাল, স্পেন এবং অন্যান্য)
সেনাপ্রধান:	সুলতান আবদুল মালিক	সেবাস্তিয়ান এবং সুলতান আল-মুতাওয়াক্কিল
সেনাসংখ্যা:	৪০ হাজার	৮০ হাজার (মতান্তরে ১ লাখ ২৫ হাজার)
ক্ষয়ক্ষতি:	সামান্য	বাহিনীর অধিকাংশ সেনাই নিহত এবং বন্দি হয়

১৫৭৮ সালের ৪ঠা আগস্ট সংঘটিত মরক্কো এবং পর্তুগালের মধ্যকার এ যুদ্ধটি ইতিহাসে ওয়াদি আল-মাখাযিন বা ত্রি-রাজার যুদ্ধ হিসেবে পরিচিত। অস্তিত্ব রক্ষার এই ভয়ানক যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে পর্তুগালের উৎসাহের মূল কারণ ছিল, উত্তর আফ্রিকার বন্দর এলাকাগুলোতে নিজেদের একাধিপত্য বিস্তারের নেশ এবং একে একে মুসলমানদের পায়ের নিচ থেকে চাদর গুটিয়ে নিয়ে সেটা খ্রিস্টানদের ঝোলায় পুরে ফেলা; অধিকন্তু উপকূলীয় অঞ্চলের বাণিজ্যিক রুটগুলো দখল করে নেয়া। বিশেষত জিব্রালটার প্রণালি হয়ে ভূমধ্য সাগরে বের হয়ে যাওয়ার পথটি নিজেদের কর্তৃত্বে নিয়ে নেওয়া তাদের অন্যতম লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধের যে আগুন জ্বেলেছিল স্পেন ও ইউরোপের সম্মিলিত জোট, পর্তুগাল সেই অভিজ্ঞতা থেকেই নতুন করে অগ্নিশিখার উৎপাত করতে চাচ্ছিল। তাদের চেষ্টা ছিল, উসমানীয়দের সহযোগিতায় আন্দালুসে কোনোভাবেই যেন সাদিয়া সাম্রাজ্য[১] মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে—সেটা নিশ্চিত করা। এমন ঘোরতর যুদ্ধের ফলাফলে বিজয় হেসেছিল মরক্কোর মুসলমানদের পক্ষে। পর্তুগাল হারিয়েছিল তাদের রাজ্য, সেনা এবং নিজেদের বহু দক্ষ ও যোগ্য দায়িত্বশীল লোকজন।

যুদ্ধের উৎসেচক

১৫৫৭ সালে পর্তুগালের মসনদে বসে নতুন সম্রাট সেবাস্তিয়ান। তার ক্ষমতা গ্রহণের পরই পর্তুগাল, আফ্রিকা, এশিয়া এবং আমেরিকার সমুদ্র এলাকাগুলোর দিকে তাদের লকলকে জিহ্বা উঁচিয়ে দেয়। সেই সূত্রে তারা উত্তর আফ্রিকায় দখল

[১] মরক্কো, ফেয, মালি, ঘানা ও তার আশপাশের কিছু এলাকায় ১৫০৯ থেকে ১৬৫৯ পর্যন্ত বিভিন্ন মেয়াদে এদের শাসন বজায় ছিল। সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা আল-কায়িম বি-আমরিল্লাহ ১৫০৯ সালে এটি প্রতিষ্ঠা করলেও ১৫১৭ সালে এর প্রভাব ও প্রতাপ একেবারে মিইয়ে আসে। এরপর ১৫৫৪ সালে সাদিয়া সাম্রাজ্য তাদের পূর্ব-মহিমা ফিরে পায়। পরবর্তীতে ১৬৫৯ সালে মরক্কোতে এদের সর্বশেষ সুলতানের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে এদের শাসনকাল সমাপ্ত হয়ে যায়।

বসাতে গেলে মুসলমানদের সাথে বিরোধে জড়িয়ে পড়ে। সেই বিরোধ যুদ্ধের আবহ পায় স্পেনের শাসক দ্বিতীয় ফিলিপের উস্কানিতে। সে সেবাস্তিয়ানকে পশ্চিমের এই আরবাঞ্চলের মুসলমানদের বিরুদ্ধে নতুন ক্রুসেডের আয়োজনে শরিক হতে সাদর আহ্বান জানিয়ে পত্র লেখে; তাদের সকলের উদ্দেশ্য ছিল একটা, যাতে উসমানীয়দের মদদে সাদিয়া সাম্রাজ্য আন্দালুসে তাদের আধিপত্যের জন্য নতুন ত্রাস হয়ে দেখা না দেয়।

১৫১৭ সালে পর্তুগালের কতিপয় মুজাহিদ মুসলিমের হাতে প্রতিষ্ঠা পায় সাদিয়া সাম্রাজ্য। ঐতিহাসিক সূত্রমতে, এরা ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশের লোক। এদের নিকটকালীন পূর্বপুরুষের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন মুহাম্মদ ইবনুন নাফিস আয-যাকিয়্যা। আন্দালুসে মুরাবিতিন এবং মুওয়াহহিদিনদের পর বনু মারিন এবং ওয়াতাস সাম্রাজ্যের খণ্ডকালীন শাসনসময় পার করেই ক্ষমতায় আবির্ভূত হয় এই সাদিয়া সাম্রাজ্য। প্রথমেই তারা আটলান্টিক মহাসাগর ধরে বিস্তৃত উপকূলীয় এলাকাগুলো নিজেদের দখলে নিয়ে নেয়, যেগুলো ইতিপূর্বে বেশকিছু যুদ্ধাভিযানের মধ্য দিয়ে দখল করে নিয়েছিল স্পেন। ধীরেধীরে তারা ১৫২৫ সালে মারাকেশ এবং ১৫৫৪ সালে ফেয নগরী দখল করে নেয়। এভাবে প্রভাব ও কর্তৃত্ব বিস্তারের মধ্য দিয়ে শুরু হওয়া এ সাম্রাজ্য পরবর্তীতে ১৬০৩ সাল পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল।

সাদিয়া সাম্রাজ্যের প্রসিদ্ধ সুলতান আবদুল্লাহ আল-গালিব আস-সাদি মৃত্যুবরণ করলে ১৫৭৪ সালে ক্ষমতায় আসে তার ছেলে মুহাম্মদ আল-মুতাওয়াক্কিল। ইতিহাস বলে, সে জনগণের প্রতি অযাচিত কঠোরতাসহ ইসলাম ও সাম্রাজ্যবিরোধী বহু কর্মকাণ্ডে লিপ্ত ছিল। ফলে তারই আপন দুই চাচা আহমদ এবং আবদুল মালিক তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসেন এবং তার হাত থেকে সাম্রাজ্য বাঁচাতে উসমানি সাম্রাজ্যের মধ্যস্থতা কামনা করেন। পুরো ব্যাপারটা অনুধাবন করে উসমানীয়দের মনে হয়, তাদের সহযোগিতা করাটা দরকার। সে-মতে ১৫৭৬ সালে বিচ্ছিন্ন দুটি মুখোমুখি যুদ্ধে আল-মুতাওয়াক্কিলকে পরাজিত করে উসমানীয়রা ক্ষমতায় তুলে দেয় চাচা আবদুল মালিককে। আবদুল মালিক ফেয নগরীকে সাম্রাজ্যের রাজধানী ঘোষণা করে নিজের পক্ষে জনতার বাইয়াত গ্রহণ করে নেন। পাশাপাশি ভাতিজা যে-কোনো ঝামেলা করতে পারে, সেটা মাথায় রেখে আরব, তুর্কি এবং আন্দালুসের সেনাদের সাহায্যে শক্তিশালী সেনাবাহিনী তৈরিতে মনোনিবেশ করেন।

এদিকে আল-মুতাওয়াক্কিল চাচাদের এই আধিপত্য মেনে নিতে না পেরে পর্তুগালের

বন্দর এলাকায় পালিয়ে যায়। সেখানে সে পর্তুগালের রাজা সেবাস্তিয়ানের কাছে সব খুলে বলে এবং নিজের পক্ষে তার সহযোগিতা কামনা করে। শেষমেশ এই বলে তাকে সন্তুষ্ট করায় যে, তার রাজত্ব তাকে ফিরিয়ে দিলে সে আটলান্টিক মহাসাগরীয় মরক্কোর বন্দরগুলো পর্তুগালকে দিয়ে দেবে।

ক্রুসেডের নতুন জোট

পর্তুগালের যুবক ও উদ্যমী শাসক তার বাবার দুর্বলতাগুলো কাটিয়ে ঘুণে ধরা মসনদের স্থিতি মজবুত করার সংকল্প করল। সে চাইল, ইউরোপে তার অবস্থান সবার চেয়ে উঁচু এবং মর্যাদাপূর্ণ হোক। এমনই সময়ে তার হাতে এসে ধরা দিল আল-মুতাওয়াক্কিল। চাচাদের বিরুদ্ধে তাকে সাহায্য করার নামে এক ঢিলে কয়েক পাখি শিকারের পায়তারা করল সেবাস্তিয়ান। আল-মুতাওয়াক্কিলকে তার কুরসি ফিরিয়ে দেয়ার মধ্য দিয়ে সে পেয়ে যাবে মরক্কোর বন্দর এলাকার নিয়ন্ত্রণ। আর সেই পথ ধরে আন্দালুস থেকে ইসলামি শক্তি বিতাড়ন করে রাজনৈতিকভাবে ইউরোপে সে শক্ত শেকড় গেড়ে বসবে—আপাতত এটাই ছিল চিন্তা ও চেষ্টার সবটুকু।

এদিকে স্পেনের সম্রাট দ্বিতীয় ফিলিপ সম্পর্কে ছিল সেবাস্তিয়ানের মামা। সে কোনো রাখঢাক ছাড়াই তার কাছে সাহায্য কামনা করল। ফিলিপ তাকে নিজ শহরের সেনা ও সরঞ্জামের সবটুকু দিয়ে সাহায্যের অঙ্গীকার করল। কারণ, সে মনে করছিল, মরক্কোর সবগুলো বন্দরের অধিকার নিজের করে নেয়ার সক্ষমতা সেবাস্তিয়ানের ছিল। আর ভাগ্নের হাতে কর্তৃত্ব এলে মামার জন্য সার্বিক সুবিধা তো থাকছেই। তাই সে সেবাস্তিয়ানকে ২০ হাজার স্প্যানিশ সেনা সাহায্যস্বরূপ পাঠাল। পূর্ব থেকেই তার কাছে ১২ হাজার পর্তুগিজ সেনা ছিল। স্পেনের পাশাপাশি ইতালি থেকে তিন, আলমানিয়া থেকে তিন এবং অন্যান্য আরও কিছু রাজ্য থেকে বড় সংখ্যার সেনা সাহায্য পেল সেবাস্তিয়ান। এ ছাড়া ইউরোপের পোপ পাঠাল ৪ হাজার সেনা, পনেরোশ ঘোড়া এবং বারোটি বড় কামান। সেবাস্তিয়ান নিজে জুগিয়ে নিল হাজার খানেক যুদ্ধবাহন, যাতে যুদ্ধ সরঞ্জামগুলো সহজে মরক্কো পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া যায়। তবে স্পেনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপ ভাগ্নেকে পশ্চিমাঞ্চলের খুব বেশি ভেতরে ঢুকে যেতে নিষেধ করেছিল; কিন্তু সেবাস্তিয়ান তার কথা খুব একটা আমলে নিল না।

গোপন সূত্রে জাযিরা অঞ্চলে উসমানি সাম্রাজ্যের প্রধান আমির হাসান পাশা জেনে গেলেন সেবাস্তিয়ান ও ফিলিপের মনস্তত্ত্ব। দেরি না করে তিনি সাম্রাজ্যের সদর

দপ্তরে সে সংবাদ সরবরাহ করে দিলেন। ইস্তাম্বুলেও তখন ইউরোপের কিরদার প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। তারা নিজেরাও গোয়েন্দাসূত্রে জেনেছে, ইউরোপের পোপ এবং স্পেনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপ উসমানি সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে জোট ষড়যন্ত্রের নকশা আঁকছে। কিন্তু তারা জানতে পারছিল না, সেবাস্তিয়ানের সাথে ফিলিপের কোন সূত্রে কী যোগাযোগ হচ্ছে। হাসান পাশার পত্র পেয়ে এবার তারা সে বিষয়েও পূর্ণ ওয়াকিবহাল হয়ে গেলেন। গোপনে আলাদা করে রাজা ফিলিপের হাজার বিশেক সেনা প্রস্তুতির রহস্যও তাদের কাছে খুলে পড়ল।

এদিকে সাদিয়া সাম্রাজ্যের নতুন সুলতান আবদুল মালিকের নির্দেশনায় সমুদ্র এলাকায় তাদের সেনারা কড়া নজরদারি করছিল। এরই মধ্যে সেবাস্তিয়ান বরাবর পাঠানো আল-মুতাওয়াক্কিলের একটি দূত তাদের হাতে আসে এবং তারা এতদুভয়ের মধ্যকার চলমান চক্রান্তের খবর জেনে যায়। আল-মুতাওয়াক্কিলের সাথে ঠুনকো ঝামেলায় না গিয়ে তারা তাই সেবাস্তিয়ানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের মানসিকতা থেকে নিজেদের সামরিক প্রস্তুতি শুরু করে দেয়। পাশাপাশি স্থানীয় উসমানি সাম্রাজ্যের প্রতিনিধিদের সাথেও যোগাযোগ অব্যাহত রাখে, যাতে তারা পর্তুগাল তথা ইউরোপের এই জোটবদ্ধ শক্তির বিরুদ্ধে তাদেরকে সহযোগিতা করে।

ওয়াদি আল-মাখাযিনের পথে

লেসবন থেকে ক্রুসেডারদের জাহাজগুলো মরক্কোর উদ্দেশে ছেড়ে যায় ১৫৭৮ সালের ২৪শে জুন। পথে লাগোসে তারা কিছুদিন যাত্রাবিরতি করে। এরপর কাদিযে গিয়ে এক সপ্তাহ অবস্থান করে নোঙ্গর করে টেঙ্গাইরে। সেখানে সেবাস্তিয়ান তার মিত্র আল-মুতাওয়াক্কিলের সাথে মিলিত হয়। সেখানে তারা একদিন অবস্থান করলেওস তাদের জাহাজগুলো কোনো কারণে আসিলায় গিয়ে নোঙ্গর ফেলে। একদিন পর সেবাস্তিয়ান আরও কিছু সেনা নিয়ে আসিলা থেকে মরক্কোর দিকে জাহাজ চালিয়ে দেয়।

এদিকে মরক্কোর সর্বত্র উঁচু হয়ে যায় একই আওয়াজ, 'আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য তোমরা ওয়াদি আল-মাখাযিনের দিকে যাত্রা করো।' সাম্রাজ্যের এমন আহ্বানে ঘর ছেড়ে নেমে আসে বহু জনগণ, তাদের চোখে কেবল বিজয় বা শাহাদাতের তামান্না। সাধারণ জনতার এমন অভূতপূর্ব সাড়া পেয়ে সুলতান আবদুল মালিকের সাহস বেড়ে যায়। তিনি সেবাস্তিয়ানের নামে একটি পত্র লিখেন। সেখানে বলেন: 'বের

হবার সাথেসাথে তোমার চরম ঔদ্ধত্যের প্রমাণ মিলেছে। তোমার প্রতি শত্রুতা পোষণের বৈধ কারণও ইতিমধ্যে তুমি প্রদান করেছ। এবার যদি সত্যিকার সাহসী খ্রিস্টান হয়ে থাক, তাহলে ময়দানে অটল থেকো আমরা আসা পর্যন্ত; আর যদি আমরা এসে তোমাকে না পাই, তাহলে ভাববো, তুমি কুকুরের বেটা কুকুরই।'

পত্র হাতে পেয়েই সেবাস্তিয়ান ক্রোধে কাঁপতে থাকে। সাথিদের সাথে পরামর্শ করে, কী করা উচিত তার। সকলে বলে, সাহস করে সামনে এগোন। মরক্কো ও পশ্চিমের সবগুলো শহর, অঢেল সম্পদ আপনার পায়ের কাছে গড়াগড়ি করবে। কারও কথায় প্রভাবিত না হয়ে আপনি হিম্মত করে সামনে চলুন। কিন্তু সেবাস্তিয়ানের চোখ দেখে মনে হলো, সে সাথিদের কথাগুলো অতটা আমলে নিল না। বরং তার ভেতর কোনো চিন্তা বা কৌতূহল দৌড়ে বেড়াচ্ছে অহর্নিশ। সে সিদ্ধান্তে অটল না, খানিক সময় চাইছে তার দ্বন্দ্বে ভোগা মন।

ওদিকে সুলতান আবদুল মালিক পরবর্তী পত্র পাঠালেন ভাই আহমদের কাছে। বলল, 'ফেয নগরীর সেনাদের নিয়ে যত দ্রুত সম্ভব যুদ্ধের জন্য চলে আসো।' আবদুল মালিক নিজে উত্তর মরক্কো এবং মারাকেশের সকল সেনাদের নিয়ে আল-কাসরুল কাবির এলাকার পাশে ফেয থেকে ভাই আহমদ ও তার বাহিনীর পথ চেয়ে বসে রইলেন।

দুপক্ষের সেনা ও শক্তি

পর্তুগালের বাহিনীতে সেনাসংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ২৫ হাজার। ইতিহাসে বর্ণিত সর্বনিম্ন সংখ্যামতে তারা ছিল ৮০ হাজার সেনাসমৃদ্ধ একটি বাহিনী। স্পেনের ২০ হাজার, ৩ হাজার আলমানি এবং ৭ হাজার ইতালি সেনা। সাথে ছিল কয়েক হাজার ঘোড়া এবং ৪০টিরও বেশি বড় কামান। এদের সাথে যোগ হয়েছিল বিশ্বাসঘাতক আল-মুতাওয়াক্কিলে ৩ কি ৬ হাজার অতিরিক্ত সেনা। এই পুরো বাহিনীর অগ্রাধিনায়ক ছিল পর্তুগালের সদ্য ক্ষমতা পাওয়া সেবাস্তিয়ান।

এদিকে মরক্কোর সবচে বড় শক্তি ছিল তাদের জিহাদের প্রেরণা। ছিল ৪০ হাজার মরক্কোর স্থানীয় মুজাহিদ, যারা অশ্বারোহণে বেশ দক্ষ এবং সামর্থ্যবান ছিল। এদের কাছে কামান ও গোলা ছিল ৩৪টি। তবে মনস্তাত্ত্বিকভাবে এরা ছিল খুবই প্রফুল্ল; কারণ, ইতিপূর্বেও তারা পর্তুগালকে একবার সম্মুখযুদ্ধে পরাজিত করেছে। তাছাড়া

এবারের যুদ্ধের পরিণতি তারা জানত। তারা জানত, যুদ্ধে হেরে গেলে তাদের নিজেদের বাড়িঘরও অন্যের হাতে তুলে দিতে হবে। অধিকন্তু এ যুদ্ধে আহলে সুন্নাহর অনুসারীদের সাথে যোগ হয়েছিল শিয়া মতাবলম্বীরাও; ফলে ধর্মীয় এবং সামাজিকভাবে তারা উঁচু মানসিকতা লালন করছিল।

যুদ্ধ তখনো আসি আসি

পর্তুগালের সেনাদের দেখে মনে হচ্ছিল, তারা মরক্কোর সমুদ্রের পাড়ে কোনো আনন্দভ্রমণে যাচ্ছে। যুদ্ধের কোন ছাপ বা সামান্য চিন্তা তাদের চেহারায় শোভা পাচ্ছিল না। তারা মুসলিম বাহিনীকে খুবই হালকাভাবে নিচ্ছিল। নিজেদের সামর্থ্য ও সরঞ্জামের প্রতি তাদের ভরসার মাত্রা ছিল অতিমাত্রিক। তারা জাহাজে ক্রুশ নিয়ে এসেছিল, যাতে মরক্কোর মসজিদ এবং মহলগুলোতে সেগুলো টাঙাতে পারে। ফেয এবং মারাকেশের স্থাপনাগুলোকে গির্জায় পরিণত করার সমূহ ব্যবস্থা তারা করে নিয়েছিল। মরক্কোর ঐতিহাসিক জামে আল-কারাউইয়্যিনকে প্রধান চার্চ বানাবার জন্যও তারা মানসিকভাবে চিন্তা করে রেখেছিল। পুরুষদের সাথে যুদ্ধ দেখার জন্য আসা কতক পর্তুগিজ মহিলাকে খুবই প্রফুল্ল দেখাচ্ছিল। তাদের কেউ কেউ নিজেদের সুন্দর কাপড়গুলো একে অপরকে দেখাচ্ছিল, যেন সামনে কোনো ধর্মীয় বা সামাজিক উৎসব অপেক্ষা করছে।

কিন্তু সুলতান আবদুল মালিক যখন শুনলেন, পর্তুগিজরা কাছাকাছি কোথাও এসে গেছে, তখন তিনি এক দারুণ পরিকল্পনা করলেন। তিনি স্থানীয় মুজাহিদদের কয়েকটি ছোট ছোট টিম গঠন করে বিভিন্ন ফাঁকফোকর থেকে তির এবং গোলা বর্ষণের মাধ্যমে পর্তুগিজ বাহিনীকে সমুদ্রপথ ছেড়ে কোনো মরু অঞ্চলে টেনে আনার চিন্তা করলেন। কারণ, এতে তারা আটলান্টিক সাগর উপকূল থেকে নতুন কোনো সাহায্যের সরবরাহ নিতে পারবে না এবং স্থানীয় হবার সুবাদে মরক্কোর সেনারা ময়দানে বাড়তি সুবিধা নিতে পারবে।

আবদুল মালিকের পরিকল্পনা সফল হলো। পর্তুগিজ বাহিনীর অতি উৎসাহের দরুন খুব সহজেই তাদেরকে উত্তেজিত করে পাড়ে ভিড়ানো সম্ভব হলো তার জন্য। তারা অনেকটা আত্মতাড়িত হয়েই যুদ্ধের জন্য আল-কাসরুল কাবিরের কাছাকাছি একটি সমতলের দিকে আসতে লাগল। লুকোস নদীর অববাহিকার যে জায়গাটিকে ওয়াদি আল-মাখাযিন নামেও পরিচয় করানো হয়। মরক্কোর মরু অঞ্চল পার হয়ে

এ জায়গাটায় আসতে একটিমাত্র সেতু ছিল, পর্তুগিজদেরকে সেটা পার হয়েই মরক্কোর বাহিনীর সামনে আসতে হবে।

যুদ্ধের জন্য আবদুল মালিক যে চিন্তা করে রেখেছিলেন, তার প্রথমিক দিক ছিল এমন যে, পর্তুগিজ বাহিনী সেতু পার হয়ে উপত্যকায় ঢুকে যেতেই মরক্কোর সেনারা সেতুটি ভেঙে ফেলবে। যাতে পেছনে নদী রেখে যুদ্ধ শুরু করে প্রতিপক্ষ এবং যুদ্ধ প্রতিকূল দিকে প্রবাহ নিলে তারা পালানোর কোনো পথ খুঁজে না পায়। একান্ত নদী পার হতে গেলে তাদের ভারী অস্ত্র ও হরিণের কারণে নদীতে ডুবেই জীবনের সমাপ্তি হয় কুকুরগুলোর। আর সেনাবিন্যাসের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম কামানদাজদের সারি, এরপর পদাতিক তিরন্দাজ, তাদের দুপাশে অশ্বারোহী দল এবং একদম পেছনে জিহাদের জন্যে স্বেচ্ছায় ময়দানে আসা সাধারণ জনগণ। তাদেরকে আপাতত মূল পরিকল্পনার বাইরে রিজার্ভ বাহিনী হিসেবে রাখা হবে। যে-কোনো প্রয়োজনে সুযোগ বুঝে তাদেরকে যুদ্ধের সহসা দিকবদলের জন্যে ময়দানে নামিয়ে দেয়া হবে।

যুদ্ধ তবে শুরু

১৫৭৮ সালের ৪ঠা আগস্ট, রোজ সোমবার। ভোরবেলা ফজরের নামাযান্তে সুলতান আবদুল মালিক সেনাদের উদ্দেশ্যে জিহাদ ও শাহাদাতের প্রতি উৎসাহমূলক বক্তৃতা দিলেন। ওদিকে ক্রুসেড সেনাদেরকেও তাদের ধর্মীয় পণ্ডিতরা নানাভাবে উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করল। বলল, 'এ যুদ্ধে যারা নিজেদের জীবন কুরবান করতে পারবে, আমাদের মহান পোপ তার জীবনের সকল পাপ ও ভুল-ত্রুটির দায়ভার নিজে নিবেন এবং তাদেরকে পঙ্কিলতা মুক্ত করে প্রভুর সামনে দাঁড় করাবেন।'

উভয় পাশ থেকে দশটি করে অগ্নিতির নিক্ষিপ্ত হলো। যার অর্থ ছিল, উভয় পক্ষই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছে। তবে দুঃখজনকভাবে সুলতান আবদুল মালিক মারাকেশ থেকে আল-কাসরুল কাবিরে আসার পথে অসুস্থ হয়ে যান। এরপরও ময়দানে যুদ্ধের সূচনা হলে তিনি নিজেই প্রথম বাহিনীর সাথে আক্রমণে অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু কিছুদূর গিয়েই তিনি নিজেকে সামলাতে ব্যর্থ হন এবং পুনরায় তার তাঁবুতে ফিরে আসেন। দ্বাররক্ষীর হাতের উপর মাথা রেখে সেখানেই তার মৃত্যু এসে যায়, তিনি মারা যান। তবে সেই কঠিন মুহূর্তেও তিনি হাতের আঙুল মুখে চেপে ইশারায় বলে যান, কেউ যাতে না জানে যে, তিনি মারা গেছেন। দ্বাররক্ষী

তার ইঙ্গিত বুঝতে পেরে তার মৃত্যুর খবর সবার থেকে গোপন রাখেন। বরং দরোজায় দাঁড়িয়ে বলতে থাকেন: 'সুলতান অমুককে ওদিকটায় যেতে বলছেন, অমুককে পতাকা ধরতে বলেছেন, অমুককে সামনে আর অমুককে পেছনে যেতে বলেছেন', যাতে সেনারা কেউ তাকে দেখে অন্তত বুঝতে না পারে যে, সুলতান আর দুনিয়াতে নেই।

কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে, মূলত আল-মুতাওয়াক্কিল তার গুপ্তচরের মাধ্যমে ময়দানে আসার আগেই গোপনে সুলতানকে বিষ পান করিয়েছিল, যাতে তিনি ময়দানে মারা পড়েন এবং তাতে মুসলিম বাহিনীর মনোবল ভেঙে পড়ে।

সুলতানের ভাই আহমদ নিজেও জানতেন না, তার ভাই আর দুনিয়াতে নেই। তিনি তার অগ্রবর্তী সেনাদের নিয়ে গিয়েছিলেন সেতু ভাঙার কাজে। সেখান থেকে ফিরেই তিনি পর্তুগিজ বাহিনীর পেছনভাগে আক্রমণ করেন। এদিকে মুসলিম বাহিনীর সম্মুখভাগ থেকে অবিরত তির ও কামান নিক্ষিপ্ত হতে থাকলে সেবাস্তিয়ানের বাহিনী দিশেহারা হয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। দ্বিতীয়বার ঘুরে দাঁড়ানোর কোন চিন্তা না করে তারা পালানোর জন্য ছোটাছুটি করতে থাকে। স্বাভাবিকভাবেই দৌড়ে সেতুর দিকে যেতে থাকলে সেখানে সেতুটি ভেঙে পড়ে থাকতে দেখে তারা। অগত্যা সেনাপতি সেবাস্তিয়ানসহ বহু সেনা পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। নদীর গভীরতা পূর্ব থেকেই অতিরিক্ত করে রাখায় সেবাস্তিয়ানসহ অনেকেই প্রথমবারেই ডুবে মারা যায়। ওদিকে ময়দানে মুসলিম বাহিনীর তরবারি সাঙ্গ করে দেয় হাজার হাজার ক্রুসেড সেনার প্রাণ। তদুপরি যারা সাঁতরে পার হয়ে গিয়ে জাহাজে উঠে পালাতে চেষ্টা করে, সেখানে উসমানি সাম্রাজ্যের আঞ্চলিক আমির হাসান পাশা তার বাহিনী নিয়ে তাদেরকে ধাওয়া করেন এবং প্রায় ৫০০ সেনাকে আটক করতে সক্ষম হন।

বিশ্বাসঘাতক আল-মুতাওয়াক্কিল যখন বিধর্মী মিত্রদের এমন ভীতিপ্রদ পলায়ন দেখে, তখন জীবন বাঁচাতে সে উত্তর দিকে দৌড়ে পালাতে থাকে। সেখানে ওয়াদি আল-মাখাযিনের নদীতে পড়ে মরে যায়। কয়েকদিন পর তার ফুলে যাওয়া লাশ পানিতে ভেসে ওঠে। লোকেরা সেটা উপরে তুলে চামড়া ছিলে পেটের ভেতর খড়কুটো আবর্জনা ভরে আবার পানিতে ফেলে দেয়। নিকৃষ্টতম পরিণতিতে মরক্কোর প্রান্তে প্রান্তে ভাসতে ভাসতে একসময় তা ফেটে পচে গলে সমুদ্রে মিশে যায়।

যুদ্ধ চলমান ছিল সবমিলিয়ে সোয়া চার ঘণ্টা। পুরোটা সময় বিজয়ের পাল্লা ছিল একদিকেই। নিজেদের উঁচু হিম্মত, শাহাদাতের তামান্না এবং সূক্ষ্ম, সুনিপুণ

পরিকল্পনার উত্তম বাস্তবায়নের স্পষ্ট চিত্র দেখা গেছে পুরোটা সময়জুড়েই। ফলাফলে, মুসলমানদের পক্ষে এসেছে গৌরবের বিজয়।

যুদ্ধ শেষে

এ যুদ্ধ ইসলামি ইতিহাসের অন্যতম বিজয়ের ঘটনার সাক্ষী হয়ে আছে। সাক্ষী হয়ে আছে একই যুদ্ধে তিনজন রাজা বা রাষ্ট্রপ্রধানের মৃত্যুর: পর্তুগালের রাজা সেবাস্তিয়ান, বিশ্বাসঘাতক সাবেক সুলতান আল-মুতাওয়াক্কিল এবং সাহসী শহিদ সুলতান আবদুল মালিক রহিমাহুল্লাহ। একজনকে ইতিহাস চিনেছে ইসলামের শত্রু হিসেবে, আরেকজন চূড়ান্ত লাঞ্ছনাকর মৃত্যুতে বুঝে নিয়েছে নিজের গাদ্দারির পরিণাম আর তৃতীয়জনকে পৃথিবী জেনেছে সৎ এবং সাহসী একজন সুলতান ও সেনাপতি হিসেবে। পাশাপাশি পর্তুগাল হারিয়েছে তার সামরিক শক্তির প্রায় পুরোটাই। সুযোগ কাজে লাগিয়ে স্পেনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপ পর্তুগালকে ১৫৮০ সালে নিজের দখলে নিয়ে নিয়েছে এবং সাদিয়া সাম্রাজ্যের মসনদে উঠে এসেছেন আবদুল মালিকের অপর ভাই আহমদ। তিনি ক্ষমতায় এসেই বিজয়ের সুসংবাদ জানিয়ে উসমানি সাম্রাজ্যে চিঠি পাঠান। সাথেসাথে সাদিয়া সাম্রাজ্যকে উসমানি সাম্রাজ্যের অন্তর্গত করে নেয়ার আবেদন জানান।

বিজয়ের কারণগুলো

- কিছুদিন আগেই গ্রানাডার পতনের দাগ তখনো মুসলমানদের বুকে লেগে ছিল। তারা ভুলতে পারছিল না আন্দালুসের পতনের কথা। ক্রমাগত আঘাতের ঘা তখনো তাদের আহত করছিল কদমে কদমে। তারা কোনো বিজয়ের জন্য চোখ মেলে তাকিয়ে ছিল যুদ্ধের ময়দানে। পিপাসার্ত হৃদয়জমিন সিক্ত করার অদম্য লালসাই পর্তুগিজ বাহিনীকে তাদের সামনে দাঁড়াতে দেয়নি।

- যুদ্ধের নির্ভুল পরিকল্পনা এবং তার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন। প্রয়াত সুলতান আবদুল মালিকের দক্ষ পরিকল্পনার কারণে পর্তুগিজরা সবরকম সাহায্যপ্রাপ্তির সুযোগ হারিয়েছে। পাশাপাশি মুসলিম বাহিনীর নির্ধারণ করা জায়গায় নিজেদের দম্ভে অন্ধ হয়ে এগিয়ে গিয়ে ফাঁদে পড়েছে করুণ আকারে। পেছনে কাটা পড়েছে সেতু, ফিরে যাবার সামান্য সুযোগও রুদ্ধ হয়ে গেছে যদ্দরুন। শুরু থেকে

শেষ, নিখুঁত এ পরিকল্পনার বাস্তবায়নও জয়ের অন্যতম প্রধান কারণ বলে বিবেচিত হবে।

- এ যুদ্ধে আলিম এবং শাইখদের আহ্বানে কেবল জিহাদের চেতনা ও শাহাদাতের তামান্নায় কার্যত অংশগ্রহণ করেছে মরক্কোর সাধারণ জনগণ। যাদের হিম্মত ছিল উঁচু, হৃদয় ছিল ঈমানি শক্তিতে বলীয়ান। এমনকি, ঘরের কাস্তে-কুড়াল এবং লাঠিসোটা নিয়েই তারা অস্ত্রধারী শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য হাজির হয়ে গেছে।

- লক্ষ্যভেদকরণে এবং সঠিক নিশানা বরাবর আক্রমণ করার বিবেচনায় পর্তুগিজদের গোলন্দাজদের চেয়ে এ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর গোলন্দাজরা ছিল যোগ্য এবং সফল। যার ফলে যুদ্ধের পূর্বেই সুলতানের পরিকল্পনার প্রথমভাগ সফলভাবে বাস্তবায়ন করা গেছে।

- এ যুদ্ধে শত্রুপক্ষের চেয়ে মুসলমানদের ঘোড়া ছিল বেশি। অধিকন্তু মুসলিম বাহিনীর ঘোড়াগুলো মরু অঞ্চলে চলাচলসিদ্ধ ছিল। তাছাড়া সুলতান আগে যথেষ্ট সময় হাতে পাওয়ায় সেগুলোকে যথাযথ প্রশিক্ষণও দিয়ে রেখেছিলেন।

- যুদ্ধপ্রস্তুতির একেবারে শুরু থেকেই সেবাস্তিয়ান ছিল খুবই জেদি এবং একগুঁয়ে। সে শুভাকাঙ্ক্ষী, পরামর্শক এবং বাহিনীর অন্য গুণীজনদের কোনো কথাই কানে তোলেনি। বরং তা-ই করেছে, যা করা তার একার চিন্তায় জরুরি মনে হয়েছে।

ভিয়েনার যুদ্ধ

BATTLE OF VIENNA

তারিখ:	১০৯৪ হিজরি / ১৬৮৩ খ্রি.
স্থান:	ভিয়েনা
ফলাফল:	খ্রিস্টান জোটের বিজয়

পক্ষ-বিপক্ষ:	উসমানি খিলাফাহ	খ্রিস্টান জোট (পোল্যান্ড, আলমানিয়া, এবং অস্ট্রিয়ার সম্মিলিত বাহিনী)
সেনাপ্রধান:	কারা মুস্তাফা পাশা	রাজা তৃতীয় জন সোবিয়েস্কি
সেনাসংখ্যা:	১ লক্ষ ২০ হাজার	৭০ হাজার
ক্ষয়ক্ষতি:	১৫ হাজার শহিদ হয়	৪০ হাজার

১০৯৪ হিজরি মোতাবেক ১৬৮৩ সালে উসমানীয় সেনারা দুই মাস ভিয়েনা অবরোধ করে রাখে। এরপর ২০ শে রমাদান (১২ই সেপ্টেম্বর) পোল্যান্ড, আলমেনিয়া এবং অস্ট্রিয়ার জোটসেনারা পোল্যান্ডের রাজা তৃতীয় জন সোবিয়েস্কির নেতৃত্বে উসমানীয়দের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। শেষপর্যন্ত উসমানীয় সেনাপতি কারা মুস্তাফা পাশার নেতৃত্বাধীন বাহিনী খ্রিস্টানদের কাছে পরাজিত হয়ে ফেরে এবং এ পরাজয় ইউরোপে উসমানীয়দের অগ্রযাত্রা থামিয়ে দেয়।

উসমানি সাম্রাজ্য এবং ভিয়েনা

ইউরোপের অভ্যন্তরে বাণিজ্য সুবিধার অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে ভিয়েনা বেশ পরিচিত হয়ে উঠেছিল। উসমানীয়দের ব্যবসায়িক স্বার্থে ভিয়েনা অধিকারের চিন্তা করছিলেন ধারাবাহিকভাবে বেশ কয়েকজন সুলতান। সে লক্ষ্যে অভিযানও পরিচালিত হয়েছে বেশ কয়েকবার। কিন্তু প্রতিবারই ভিয়েনার প্রাচীর থেকে কিছু গনিমতের সম্পদ হাতে পেয়েই সেনারা ফিরে এসেছে অথবা অস্ট্রিয়ার সম্রাটের সাথে চুক্তি করে ইউরোপের অন্য কোনো রাজ্য অর্জনকেই যথেষ্ট মনে করে চলে এসেছে।

উসমানীয়রা প্রথমবার ভিয়েনা অবরোধ করে প্রায় দেড় শতাব্দী আগে সুলতান সুলাইমান আল-কানুনির আমলে। মোহাক্সের যুদ্ধে হাঙ্গেরির উপর বিজয় লাভ এবং ১৫২৬ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর রাজধানী বুদাপেস্ট সাম্রাজ্যের করতলগত করার কিছুদিন পর সুলাইমান ভিয়েনা অবরোধ করেন। কিন্তু বুদাপেস্টকে মধ্য ও উত্তর ইউরোপে উসমানীয়দের কেন্দ্রীয় শহর নির্ধারণ করে আকস্মিকভাবে সুলতান ভিয়েনার অবরোধ প্রত্যাহার করে ফিরে আসেন। প্রত্যাহারের প্রধান কারণ ছিল প্রতিকূল পরিবেশ এবং প্রয়োজনীয় রসদের অভাব। তাছাড়া সৈন্য ও জেনিসারিরাও

শীতের আগে ইস্তাম্বুল ফিরতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। তবে কারও কারও মতে, সুলতান জয়ের জন্য না, বরং ভিয়েনা অবরোধ করেছিলেন শিক্ষা দেবার জন্য। আর তাতে তিনি সফলও হয়েছিলেন। এ অভিযানের ফলে অস্ট্রিয়ার সম্রাট ও তার ভাই ফার্ডিনান্ড হাঙ্গেরি ও ট্রানসিলভানিয়ার উপর সুলতানের অধিকার মেনে নিয়ে সন্ধির আবেদন করে।

এরপর ১৬৮৩ সালে তুর্কিরা দ্বিতীয় বার ভিয়েনা অবরোধ করে। কিন্তু কালিনবার্গ পাহাড়ের কাছে এক শক্তিশালী যুদ্ধে গ্রাফ স্টারহামবার্গ তুর্কিদের প্রতিহত করতে সক্ষম হন। এবং এ পরাজয়ের কারণে ১৬৮৬ সালে ১৪৫ বছর উসমানীয়দের নিয়ন্ত্রণে থাকার পর হাঙ্গেরির রাজধানী বুদাপেস্টও স্টারহামবার্গের দখলে চলে যায়।

যুদ্ধপূর্ব অবস্থা

১৬৬০ সালের দিকে হাঙ্গেরি এবং স্লোভাকিয়াতে উসমানি সাম্রাজ্যের কাজে-কর্মে দখলদারিত্ব দেখানোর পাঁয়তারা করছিল আলমেনিয়া। ক্ষেত্রবিশেষ তারা উসমানীয় আঞ্চলিক প্রধানের সিদ্ধান্তের উপরও ক্ষমতা দেখানোর চেষ্টা করলে কারা মুস্তাফা পাশা ব্যাপারটা ভালোভাবে নেন না। তিনি মনে করেন, এদেরকে এখনই প্রতিহত না করলে এরা বড়ধরনের ঝামেলা পাকাবে। তিনি আলমেনিয়াতে আক্রমণের পক্ষে সুলতান চতুর্থ মুহাম্মদ এবং দিওয়ানে হুমায়ুনির (মন্ত্রিপরিষদ) সম্মতি আদায় করে নেন। এরপর যুদ্ধ পরিকল্পনার অংশ হিসেবে এদির্ন থেকে ১ লক্ষ ২০ হাজার সেনা নিয়ে হাঙ্গেরির দিকে রওনা করেন আহমেদ পাশা। সাথে ৬০ হাজার উট এবং দশ হাজার খচ্চরের পিঠে করে নিয়ে নেন যুদ্ধপ্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি। স্লোভাকিয়ার পথ মাড়িয়ে এগিয়ে চলেন নুহযেল দুর্গের দিকে। দুর্গটি ছিল বুদাপেস্টের উত্তরে, ভিয়েনা থেকে ১১০ কি.মি. এবং ব্রাতিস্লাভা থেকে ৮০ কি. মি. পূর্বে অবস্থিত। সে-সময় দুর্গটি শাসন করছিল আলমেনিয়া। তারা এটাকে অন্যতম প্রশাসনিক ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করছিল। ১৬৬৩ সালের ১৭ই আগস্ট উসমানীয়রা দুর্গটি অবরোধ শুরু করেন।

দীর্ঘ ৩৭ দিন অব্যাহতভাবে উসমানি সেনারা দুর্গটি ঘিরে রাখে। একসময় বাধ্য হয়ে দুর্গপতি তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং নিরাপত্তা কামনা করে। সেনাপতি আহমেদ পাশা তার আবদার মঞ্জুর করেন এবং শর্ত দেন, দুর্গরক্ষী সকলকে খালি

হাতে নিরস্ত্র হয়ে অনতিবিলম্বে দুর্গ ত্যাগ করতে হবে। এ ঘটনা পুরো ইউরোপে দ্রুত চাউর হয় এবং তারা উসমানীয়দের এ আচরণ নিজেদের জন্য ব্যাপক ভয়ের কারণ বলে মনে করে। এদিকে একে একে অস্ট্রিয়ার আরও তিরিশটি দুর্গ উসমানীয়দের অধিকারে চলে আসে। এরপর আহমেদ পাশা মধ্য ইউরোপের মুরাভিয়া এবং সিলিসিয়া রাজ্যও উসমানি সাম্রাজ্যের দখলে নিয়ে আসতে সক্ষম হন।

যুদ্ধ পরিষদের বৈঠক

কারা মুস্তাফা পাশা জরুরি ভিত্তিতে যুদ্ধ পরিষদের সভা আহ্বান করেন। সেখানে তিনি এ বছরই ভিয়েনা আক্রমণের প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন, ভিয়েনা অধিকারের পর আমরা বেশকিছু শর্তসম্বলিত পত্র পাঠাব আলমেনিয়া বরাবর, যাতে তারা হাঙ্গেরিতে আমাদের কোনো কাজে বাধা না হয়, যদিও ভিয়েনার মূল শহর ইয়ানেককিলা দখল করতে হলে আলমেনিয়াকে প্রতিহত করাই লাগবে আমাদের। অধিকন্তু হাঙ্গেরিতে উসমানি সাম্রাজ্যের কর্মকাণ্ডে নানামাত্রিক হস্তক্ষেপ করে, তারা ইতিমধ্যেই আমাদের বিরাগভাজনে পরিণত হয়ে গেছে।

কিন্তু মুস্তাফা পাশার এমন সিদ্ধান্তে পরিষদে মতানৈক্য দেখা দেয়। উজির ইবরাহিম পাশা দাঁড়িয়ে বলেন, সুলতান চতুর্থ মুহাম্মদ চান ভিয়েনা উসমানীয়দের দখলে আসুক। কিন্তু তিনি এ বছর অন্যান্য কাজে ব্যস্ত থাকায় চাচ্ছেন পরবর্তী বছর ভিয়েনা অভিযান করা হোক। অতএব, এখনই আপনার এমন সিদ্ধান্ত সুলতানের মনোবাঞ্ছার অনুগামী হবে না।

মুস্তাফা পাশা বলেন, আগামী বছর দ্বিতীয়বার এত বড় সেনা জমায়েত করা আমাদের জন্য কঠিন। বরং আমাদের উচিত এ-বছরই আলমেনিয়া এবং ভিয়েনার কোনো একটা সমাধা করে ফেলা। নতুবা যুদ্ধ অত্যাবশ্যকীয়ভাবে দীর্ঘ হতে থাকবে। তাছাড়া আমরা জানতে পেরেছি, আলমেনিয়া তাদের পশ্চিম সীমান্ত নিরাপদ করতে ফ্রান্সের সাথে সন্ধি করতে যাচ্ছে। ওদিকে লিওপল্ডের রাজা সোবিয়েস্কির কাছে বাদুলিয়া রাজ্য ফেরত দিতে সম্মত হয়ে গেছে। সংগত কারণেই ভেনিস এ সিদ্ধান্তে নাক গলাবে না, রাশিয়াও এ ঐক্যে ন্যূনতম অমত করবে না। অতএব, বসে বসে তাদেরকে শক্তিশালী হতে দেখার চেয়ে আমাদের উচিত শুরুতেই তাদের এ ঐক্য ভেঙে দিয়ে তাদেরকে দুর্বল করে ফেলা, নতুবা ভেনিস অর্জনের স্বপ্ন আমাদের জন্য স্বপ্নই থেকে যাবে এবং এ যুদ্ধ অনির্দিষ্টকালের জন্য বিলম্বিত হতে থাকবে।

ইউরোপের হালচাল

উসমানীয়দের তৎপরতার কথা জানতে পেরেই ইউরোপীয়ান রাজ্যগুলো ভিয়েনাকে বাঁচাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। রোমান পোপ পুরো ইউরোপে উসমানীয়দের বিরুদ্ধে নতুন ক্রুসেডের ডাক দেয়। পোল্যান্ডের রাজা সোবিয়েস্কি উসমানি সাম্রাজ্যের সাথে চুক্তি ভঙ্গ করে বাভারিয়া, সেক্সোনি এবং আলমেনিয়াকে যত দ্রুত সম্ভব যুদ্ধের জন্য ভিয়েনার দিকে যাত্রা করার নির্দেশ দেয়। তার নির্দেশে আলমেনিয়া, পোল্যান্ড এবং অস্ট্রিয়ার সতের হাজার সেনা একত্র হয়ে যায়। প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করে তৃতীয় জন সোবিয়েস্কি। ১১ই সেপ্টেম্বর নাগাদ সবরকম প্রস্তুতি শেষ করে তারা দ্রুত রওনা করে। তারা বুঝতে পারে, ভিয়েনাকে বাঁচাতে হলে সামান্য বিলম্ব করা যাবে না। চলতে চলতে তারা দাওনা সেতুর কাছাকাছি চলে আসে। পূর্ব থেকেই সেতুটির প্রহরায় ছিল উসমানীয় সেনারা। ইউরোপিয়ান বাহিনী সেখানে হাজির হলে সেতু পার হওয়া নিয়ে দুপক্ষে সংঘাত দেখা দেয় এবং ক্রুসেডারদের বেশ ক্ষয়ক্ষতি হয়ে যায়। অথচ এই সেতু পার হওয়া ছাড়া ভিয়েনা পৌঁছার অন্য কোনো পথও তাদের সামনে খোলা নেই।

গাদ্দারি

পশ্চিম দিক থেকে ভিয়েনা পৌঁছার একমাত্র পথ ছিল এই একটি সেতুই। কারা মুস্তাফা পাশা তাই সেখানে একটি বড় সেনাদল পাঠিয়েছিলেন সেতুটি আটকে রাখার জন্য, যাতে ইউরোপের বাহিনীর এ দিকটা দিয়ে প্রবেশ করতে না পারে। এই সেনাদলের প্রধান হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছিল পেনিনসুলার আমির মুরাদ গিরেইকে। মুস্তাফা পাশার নির্দেশ ছিল, শত্রুদের আসতে দেখলেই যেন সেতুটি ভেঙে ফেলা হয়।

কিন্তু এখানে এমন এক ঘটনা ঘটে যায়, যা কেউ ভাবতেও পারেনি। না ভেবেছে কোনো ইউরোপিয়ান, না উসমানি সাম্রাজ্যের কেউ। প্রথমে এক দফা সংঘর্ষের পরই মুরাদ ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে গাদ্দারি কর ইউরোপিয়ানদেরকে সেতু পার হয়ে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দিয়ে দেয়। সে এমনটা করেছিল মুস্তাফা পাশার প্রতি ঘৃণা ও অসন্তুষ্টি থেকে। কারণ, বিভিন্ন কারণে মুস্তাফা তাকে পছন্দ করতেন না এবং তার সাথে সদাচার দেখাতেন না। সেই ক্ষোভ থেকে মুরাদ চিন্তা করেছিল,

যদি ভিয়েনার পতন ঘটাতে মুস্তাফা ব্যর্থ হয়, তাহলে সে তার পদ এবং সম্মান দুটোই হারাবে। কিন্তু এই গর্দভ একটিবার চিন্তা করেনি, ভিয়েনার এই পরাজয়ের মধ্য দিয়ে পুরো উসমানি বিশ্বের পরিস্থিতি বদলে যেতে পারে। মুস্তাফার প্রতি অনিয়ন্ত্রিত ক্ষোভ তাকে এতটুকু ভাবার সুযোগ দেয়নি যে, এই ভুলের মাশুল কত লম্বা এবং সুদূরপ্রসারী হতে পারে।

সে সেতুর নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দিলে ইউরোপিয়ানরা সহজে তাদের সেনাদল নিয়ে ভিয়েনার সীমান্তে প্রবেশ করে এবং অবরোধ তুলে নিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার সুযোগ পেয়ে যায়। ঘটনা কেবল মুরাদেই থেমে ছিল না; ইতিহাস বলে, সেই সেনাদলে আরও কিছু নির্বোধ লোকের উপস্থিতি ছিল। যারা ভাবছিল, যে ভিয়েনার সামনে ব্যর্থ হয়েছেন উসমানি সুলতান সুলাইমান দ্যা ম্যাগনিফিসেন্ট, সেই ভিয়েনাকে তারা মুস্তাফার কাছে নত হতে দিবে না। সুলতান সুলাইমানের প্রতি অযাচিত আবেগ তাদেরকে অন্ধ করে দিয়েছিল।

অবশেষে যুদ্ধ

১৬৮৩ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর, রোজ শনিবার। দীর্ঘদিন ধরে ভিয়েনা দুর্গের সামনে অবরোধ টেনে রেখেছে উসমানীয় সেনারা। শক্তিশালী তুর্কিদেরকে দুর্গের প্রাচীর ভাঙার দায়িত্ব দিয়ে রেখেছেন সেনাপতি কারা মুস্তাফা পাশা। তারা তাদের কাজ করে যাচ্ছে। থেকে থেকে মিনজানিক থেকে ছোড়া হচ্ছে বিশাল বিশাল অগ্নিগোলা, কিন্তু দুর্গের দেয়াল এতটাই শক্ত যে, কিছুতেই যেন হার মানতে চাইছে না, তা। উসমানি সাম্রাজ্যের স্পেশাল জেনিসারি বাহিনীকে কাজে লাগানো হলো। চেষ্টা চলছে। অবরোধ প্রলম্বিত হয়ে গেছে প্রায় ৫৯ দিন। দুর্গবাসীর রসদ ফুরিয়ে এলে তারাও অনেকটা অবনমিত হয়ে গেছে। যে-কোনো সময় ভিয়েনা চলে আসবে উসমানীয়দের হাতে।

এমন সময় তাদের কানে এল সেতুপাড়ের ঘটনা। তারা শুনতে পেল, ইউরোপিয়ান বাহিনী ভিয়েনার সীমান্তে ঢুকে গেছে। গাদ্দারি করেছে মুরাদ গিরাই। মুস্তাফা পাশার মাথা কাজ করছে না, কীভাবে যুদ্ধের পরিকল্পনা ভেস্তে দিয়ে মুরাদ এটা করতে পারল। সেনাদের হাত অবশ হয়ে আসছে। তাদের চিন্তা ছিল, সোবিয়েস্কি আসার পূর্বেই দুর্গের পতন ঘটিয়ে ফেলবে। কিন্তু মনে হচ্ছে, সব পরিকল্পনা মাঠে মারা যাচ্ছে। প্রায় দুই মাস এখানে অমানবিক খাটুনির পর এখনই সম্মুখযুদ্ধে নামার মতো

শক্তি সেনাদের বাহুতে অবশিষ্ট নেই। তারপরও মুস্তাফা সেনাদেরকে উৎসাহিত করলেন। জিহাদ ও শাহাদাতের কথা বলে তাদেরকে যুদ্ধের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত করলেন।

ঠিক রোদ তাতানো দুপুর। দিগন্ত চিরে ফেটে বেরিয়ে আসছে ইউরোপের সেনারা। সেনাপতি মুস্তাফা পাশা যুদ্ধের পজিশন নিলেন। এমন সময় উসমানীয় বাহিনীতে ঘটল আরেক বিপর্যয়। বাহিনীর ডান অংশের সেনাপতি ওঘলু ইবরাহিম তার বাহিনী নিয়ে ময়দান থেকে চোপাট নিল। চোখের সামনে কারা মুস্তাফা পাশা তাদেরকে পালিয়ে যেতে দেখলেন। একে একে তার সেনারাও পরিস্থিতির নাজুকতা বুঝতে পেরে সরে যেতে লাগল। মুস্তাফা দেখলেন, জয়ের সম্ভাবনা ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছে। তাই তিনি সামনের শত্রুদের চিন্তা বাদ দিয়ে ভেতরের শত্রুর হেস্তনেস্ত করার নিয়ত করলেন।

দীর্ঘ ৫৯ দিনের মেহনত ময়দানে ফেলে পালালেন মুস্তাফা পাশা। ধাওয়া করলেন মুরাদ আর ইবরাহিমকে। পথিমধ্যে হাতের কাছে পেয়ে তাদের দুজনের ইহকাল সাঙ্গ করে দিলেন। রাগে ক্ষোভে এবং পরাজয়ের কষ্টে তার বুক তখন ফেটে যাচ্ছিল। এই অবস্থায় তিনি উসমানি সুলতান চতুর্থ মুহাম্মদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। ক্লান্ত, ভঙ্গুর এবং বিধ্বস্ত। সুলতানকে সব খুলে বললে তিনি বুঝতে পারলেন এবং দুই গাদ্দারের মৃত্যুর দায় মুস্তাফা থেকে সরিয়ে নিলেন।

পেছন থেকে আক্রমণের শিকার হলে এ যুদ্ধে উসমানীয়দের প্রায় ১৫ হাজার সেনা নিহত হয়। প্রতিরোধমূলক যুদ্ধে নিহত হয় ইউরোপিয়ান ৪ হাজার সৈন্যও। ইতিহাসবিদদের মতে, ৮১ হাজার উসমানি সেনা এ যুদ্ধে রাজা সোবিয়েস্কির হস্তগত হয়। দুইজন নেতৃস্থানীয় লোকের বিশ্বাসঘাতকতায় ভিয়েনার প্রান্তরে ডুবে যায় পুরো উসমানি সাম্রাজ্য।

লজ্জাজনক পরাজয়

ভিয়েনার প্রান্তরে উসমানীয়দের এমন পরাজয় পুরো তিনশো বছরের ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। ইউরোপে শাসকের চেয়ার থেকে উসমানীয়রা নেমে আসে শোষিতের আসনে। অনির্দিষ্টকালের জন্য ইউরোপে উসমানি সাম্রাজ্যের প্রভাব ও প্রসার ব্যহত হয়। ১০৯৪ হিজরির ২০শে রমাদান উসমানীয়দের অগ্রগতি বাধা

পড়ে যায় ভিয়েনার প্রাচীরের সামনে। এই অধরা অস্পৃশ্য দুর্গ, যেন উসমানীয়দের হাত থেকে চিরতরেই ফসকে চলে যায়। খুব স্বাভাবিকভাবেই রাজা সোবিয়েস্কি এই জয়ের মাধ্যমে ইউরোপে হিরো হিসেবে আবির্ভূত হয়। একে একে আশপাশের বহু মুসলিম রাজ্য তার করতলগত হতে শুরু করে। এক ভিয়েনা আনতে গিয়ে, দুই কাপুরুষের গাদ্দারিতে বছরে বছরে উসমানীয়রা হারাতে থাকে আরও কত ভিয়েনা!

ফ্রেজারের আক্রমণ এবং রশিদের যুদ্ধ

ALEXANDRIA EXPEDITION OF 1807

পূর্ব-পরিকল্পনা

মুহাম্মদ আলি পাশা মিশরের মসনদে বসেছেন দুই বছরও হয়নি। চারপাশে শত্রুরা জোঁকের মতো লেগে আছে তার পেছনে। কিলবিলে সে-সব শত্রুদের তাড়াতে যখন তিনি হিমশিম খেয়ে উঠছেন, তখনই ইংরেজরা ছলে বলে কৌশলে মামলুক সুলতান মুহাম্মদ বেক আল-আলফিকে পাশার বিরুদ্ধে উস্কে দেয়ার অপচেষ্টা করছে। এভাবে দুই মুসলিম নেতার পরস্পরে বৈরিতা ও শত্রুতা তৈরি করতে তারা সাফল্যও পেয়ে গেল বলা যায়। মুহাম্মদ বেক ইংল্যান্ডের সাথে জোট করে মুহাম্মদ আলি পাশার বিরুদ্ধে আক্রমণ করতে সম্মত হয়ে গেলেন। শর্ত হলো, ইংরেজরা তাকে মিশর ও আশপাশের শহরগুলোর ক্ষমতা হস্তান্তর করবে। কিন্তু এই ষড়যন্ত্রমূলক আক্রমণের সূচনা হবার আগেই সহসা মুহাম্মদ বেকের মৃত্যু হয়ে যায়।

তবে তার মৃত্যুতে থেমে থাকেনি আক্রমণ। পরিকল্পনা ছিল এমন যে, মামলুকরা কায়রোতে আক্রমণ করে সেটা দখল করে নেবে; আর ইংরেজরা মিশরের বন্দর এলাকাগুলো নিয়ন্ত্রণে নেবে তাদের নৌশক্তি ব্যবহার করে। হামলা শুরু হবে বন্দর নগর রশিদ দিয়ে, এরপর আক্রমণ হবে ডেলটার পাড়ে, তারপর কায়রোতে। এভাবে ইউরোপিয়ানরা মুহাম্মদ আলি পাশার পতন ঘটাবে। আর তাতে সর্বোত সহযোগিতা করবে মামলুকরা, প্রথমত মিশরে; বিশেষত আলফির সীমান্তবর্তী শহরগুলোতে।

পরিকল্পনা অনুযায়ী জেনারেল ফ্রেজার তার নৌ বহর নিয়ে আলেকজান্দ্রিয়ার উদ্দেশে বের হয়ে যায়। তার সাথে ছিল ২৫টি রণতরি, যাতে যাত্রা করেছিল ৭ হাজার প্রশিক্ষিত যোদ্ধা। ১৮০৭ সালের ১৭ই মার্চ ফ্রেজার আলেকজান্দ্রিয়ার পূর্ব পাশে জাহাজ নোঙ্গর করায়। ২১শে মার্চ সে আলেকজান্দ্রিয়া শহরে প্রবেশ করে। সেখানকার শাসক আমিন আগা সাম্রাজ্যের সাথে গাদ্দারি করে শহর ফ্রেজারের

হাতে তুলে দেয়। সাধারণ রক্ষীরা নিরুপায় হয়ে ইংরেজদের কাছে অসহায় আত্মসমর্পণ করে।

সেখানে বসে ফ্রেজার রশিদে[১] অবস্থানরত ইংরেজ রাষ্ট্রদূতের সাথে যোগাযোগ করে। মিশরের পরিস্থিতি এবং নিরাপত্তাকর্মীদের অবস্থা জেনে স্থলপথে সে প্রথমে রশিদ শহরে আক্রমণের চিন্তা করে। সে ভাবছিল, রশিদ দখল করে সেটাকে ইংরেজ সেনাদের ঘাঁটি বানিয়ে পুরো মিশরে অভিযান পরিচালনা করবে। তাই গুরুত্বপূর্ণ এ শহরটি দখলের দায়িত্ব দিয়ে জ্যাকব নামের এক সেনাপতিকে রওনা করিয়ে দেয় ফ্রেজার।

রশিদের পথে

২৯শে মার্চ, ১৮০৭ সাল। ১৬০০ সেনা আলেকজান্দ্রিয়া থেকে বের হয়ে রশিদ শহরের দিকে পায়ে হেঁটে যাত্রা শুরু করল। ভূ-মধ্য সাগরের পাড় হয়ে বালুকাময় প্রান্তর মাড়িয়ে, খেজুর গাছের ছায়ায় লুকিয়ে লুকিয়ে তারা পথ চলতে থাকে। বড় কোনো জাহাজ বা ট্রলার ব্যবহারের অনুমতি তাদের ছিল না। রশিদ শহরের প্রশাসন কিছু জানতে না পারে, এমনভাবে অকস্মাৎ পৌঁছে যাবার নির্দেশ নিয়ে নদী পাড়ের ছোট ছোট নৌকায় উঠে পড়ে ইংরেজ সেনারা।

ওদিকে শহরপতি আলি বে জেনে গেছেন আলেকজান্দ্রিয়ায় কী ঘটেছে। সতর্কতাবশত তিনি ৭০০ সেনা জমায়েত করে তাদেরকে বলে দিয়েছেন, আমরা শক্ত হাতে ইংরেজদের মোকাবেলা করব। পাশাপাশি রশিদ নগরের প্রখ্যাত আলিম শাইখ হাসান ক্রেত আল-আহালি জনগণকে জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে তাদেরকে নিয়ে চলে যান বন্দর এলাকায়। রশিদ শহর সংলগ্ন নীলনদের তীর থেকে জাহাজগুলোকে আলজেরিকার দিকে সরিয়ে তিনি উত্তর দিক দিয়ে পাড়ে উঠিয়ে ফেলেন, যাতে শহরের সেনারা আলেকজান্দ্রিয়ার মতো সহজেই আত্মসমর্পণ না করে বা পালিয়ে যাবার কোনো চিন্তা করতে না পারে। তাদের সামনে শত্রু আর পেছনে সমুদ্র—যুদ্ধ আর প্রতিরোধ ছাড়া তাদের জন্য অন্য কোনো উপায় যেন বাকি না থাকে।

---

[১] মিশরের আলেক্সান্দ্রিয়া থেকে ৬৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ঐতিহাসিক একটি বন্দর এলাকা। নয়ের দশকে গড়ে ওঠা এই বন্দর বর্তমানে রোসেটা নামেও পরিচিত। ১৫১৭ সালে উসমানীয়দের অন্যতম নৌ বন্দর হিসেবে স্বীকৃত এ-এলাকাটি বর্তমানে নেইল ডেল্টা শহরের অন্তর্গত।

এমন সময় গোয়েন্দাসূত্রে খবর আসে, লুকিয়ে কিছু লোককে সাগরে ছোট নৌকা করে পার হতে দেখা গেছে। সন্দেহ করা হচ্ছে, এরা ইংরেজ সেনা হতে পারে। এ খবর পাওয়ামাত্র শহরপতি আলি বে রশিদ শহরের সকল সেনা এবং জনগণকে বলে দেন, অনুমতি ছাড়া যেন কেউ কোনো আওয়াজ না করে এবং কারও ঘরে যেন আগুন না জ্বলে।

তারপর...

ইংরেজ সেনারা রশিদে প্রবেশ করল। সেখানে সামান্য কোনো প্রতিরোধব্যবস্থা তাদের চোখে পড়ল না। তারা ভাবল, আলেকজান্দ্রিয়ার মতো এরাও বুঝি বিনা প্রতিরোধে আত্মসমর্পণ করে নিয়েছে। দীর্ঘ মরুপথ পাড়ি দিয়ে তারা ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিল। এবার স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে রশিদের পথেঘাটে বিশ্রাম নিতে বসে পড়ল তারা। তাদের চোখে কোনো শঙ্কা নেই। আস্থা ও নিশ্চয়তার সাথে তারা বিনে কষ্টে বিজয়ের আনন্দ অনুভব করতে লাগল। শহরের বাজারগুলোতে ঢুকে বিভিন্ন দোকানে বসে পড়ল। সাজানো ফল-ফলাদি পেয়ে সেগুলোতে শান্তির কামড় বসাতে লাগল।

হঠাৎ সুনসান নীরবতা ভেদ করে মসজিদের মিনার থেকে ভেসে এল মুয়াজ্জিনের আওয়াজ: 'আল্লাহু আকবার', 'হাইয়া আলাল জিহাদ'। ঘরে ঘরে জ্বলে উঠল আগুন। লোকেরা তাকবিরধ্বনিতে নাড়িয়ে তুলল ইংরেজ সেনাদের ভেতরজগত। ছাদের ওপর থেকে উড়ে আসা মরণঘাতি তির, ভেদ করে গেল আপেলে কামড় বসানো সুখের প্রহর। নগরে সহসা মৃত্যুর ফারিশতাদের উৎপাতে ইংরেজরা দিকশূন্য হয়ে দৌড়ে পালাতে লাগল। মুহূর্তেই ১৭০ জন ব্রিটিশ শাদা ভল্লুকের লাশ পড়ে গেল রশিদের মাটিতে। ২৫০ জন আহত হলো গুরুতরভাবে। ১২০ জনকে হাত পা বেঁধে আটকে ফেলল শহরের সাধারণ জনগণ।

ফ্রেজার এ সময় আক্রমণ করে হাম্মাদ শহরে। আরেক বাহিনী যায় বাহিরায়, তেমনি কিছু সেনা এগিয়ে যায় কায়রোর দিকে। একইসাথে ইংরেজদের সবগুলো টিম শোচনীয় পরাজয়ের মুখে বিভ্রান্ত হয়ে যায়। চার চারটি শহর থেকে বিতাড়িত হয়ে সন্ত্রস্ত মনে তারা আশপাশের মরু এলাকায় হারিয়ে যায়।

ফিরতি পথে ফ্রেজার

চার শহর থেকে একসাথে ধাওয়া খেয়ে ফ্রেজারের চোখমুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়। উপায়ান্তর না পেয়ে বাঁচার তাগিদে সে মামুলকদের কাছে সাহায্য কামনা করে। কিন্তু নিজেদের সুলতানের মৃত্যু এবং পারিপার্শ্বিক নানা কারণে, তারা কোনো সাহায্য করতে পারবে না বলে সাফ জানিয়ে দেয়। মামলুকদের কাছ থেকে আশাহত হয়ে ফ্রেজার বুঝে নেয়, মিশরের ভূমিতে এভাবে যাযাবর হয়ে ঘুরে বেড়ানোয় কোনো লাভ নেই। সে লুকিয়ে পালিয়ে আবারও আলেকজান্দ্রিয়ায় গিয়ে আশ্রয় নেয়। সেখান থেকে অনেকটা অবদমিত ভাষায় আকুতি জানিয়ে মুহাম্মদ আলি পাশা বরাবর সন্ধির জন্য একটি পত্র লেখে। সেখানে বলে, 'আলেকজান্দ্রিয়া আপনাকে ফিরিয়ে দিচ্ছি, আপনি আমাদের নিরাপদে ফিরে যেতে দিন।'

এদিকে মুহাম্মদ আলি পাশা তার বাহিনী নিয়ে আলেকজান্দ্রিয়া পুনর্দখলের জন্যই বের হয়েছিলেন। তখন তিনি ইমবানা এবং রাহমানিয়া পার হয়ে ১২ই আগস্ট নাগাদ দামানহোরে এসে পৌঁছেছেন। সেখানে ইংরেজ জেনারেল শেরব্রুকের সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। শেরব্রুকই ফ্রেজারকে সন্ধির জন্য প্ররোচিত করেছে, যাতে মিশর ও ব্রিটেনের শত্রুতা আপাতত বন্ধ হয়ে যায়। সামান্য বাক্যবিনিময়ের পর ১৪ই সেপ্টেম্বরে এই দামানহোরেই উভয়পক্ষের সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির দাবি মতে ১৯ সেপ্টেম্বরের ভেতর ফ্রেজার ও তার বাহিনী আলেকজান্দ্রিয়া ছেড়ে তার জাহাজগুলো নিয়ে সিসিলির দ্বীপে যাত্রা করে। এদিকে মুহাম্মদ আলি পাশা আলেকজান্দ্রিয়াকে পুনরায় বুঝে নিয়ে সরাসরি উসমানি সালতানাতের আনুগত্যে দাখিল করে দেন। পাশাপাশি শহরবাসীর মধ্য হতেই যোগ্য জন বেছে তাকে সেখানকার প্রধান হিসেবে নিয়োগ করেন।

নাভারিনোর যুদ্ধ
BATTLE OF NAVARINO

তারিখ:	১২৪৩ হিজরি / ১৮২৮ খ্রি.
স্থান:	নাভারিনো উপসাগর, গ্রিস
ফলাফল:	মুসলিম বাহিনীর পরাজয়

পক্ষ-বিপক্ষ:	উসমানি খিলাফাহ; (মিশর, তিউনিসিয়া এবং আলজেরিয়া)	ইউরোপিয়ান ক্রুসেড জোট (ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং রাশিয়া)
সেনাপ্রধান:	ইবরাহিম পাশা	এডওয়ার্ড কোড্রিংটন
ক্ষয়ক্ষতি:	৪১০৯ জন শহিদ	৬৬১ জন হতাহত

২৯শে রবিউল আউয়াল, ১২৪৩ হিজরি মোতাবেক ২০শে অক্টোবর ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত নাভারিনোর যুদ্ধটি নিকট ইতিহাসের অন্যতম বৈপ্লবিক নৌ যুদ্ধ হিসেবে পরিচিত। এ যুদ্ধে একপাশে ছিল উসমানি সাম্রাজ্য, মিশর এবং আলজেরিয়া; অপরপাশে ছিল ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং রাশিয়া। যুদ্ধটি সংঘটিত হয় গ্রিসের নাভারিনো উপসাগরে। অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে এ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর পরাজয় ঘটে। ফলাফলে উসমানীয়দের নৌ শক্তির অবনতির সূচনা হয়, ১৮৩০ সালে আলজেরিয়া চলে যায় ফ্রান্সের দখলে আর উসমানি সাম্রাজ্যের শেকল ছিঁড়ে স্বাধীন হয়ে যায় গ্রিস।

গ্রিসের বিদ্রোহ

সুদীর্ঘকাল ধরে গ্রিস ছিল উসমানি সাম্রাজ্যেরই একটি অনুগত অঙ্গরাজ্য। ১৮১৪ সালের দিকে হঠাৎ গ্রিসের জনমনে উসমানীয়দের প্রতি ঘৃণা উস্কে ওঠে। ঐতিহাসিকদের বর্ণনামতে, এ-সময়টায় হুট করে বেশকিছু জাতীয়তাবাদী সামাজিক সংগঠন গড়ে উঠলে গ্রিস আচমকা বদলে যেতে শুরু করে। এ-সব সংগঠনের মাধ্যমে তাদের ভেতর স্বায়ত্ত স্বাধীনতার দাবি ছড়িয়ে পড়ে এবং তারা মুসলিমদের অধীনতা থেকে বেরিয়ে আসতে উদগ্রীব হয়ে ওঠে। তাছাড়া বেশকিছু বছর ধরে গির্জাকেন্দ্রীক ধর্মীয় সংগঠনগুলোও তাদের মধ্যে প্রবল জাতীয়তাপ্রেম জাগ্রত করার চেষ্টা করে যাচ্ছিল। সাধারণ জনগণের মন-মগজে দেশপ্রীতি তুলে দেয়ার জন্য তারা বিশেষ লোক এবং বিশেষ দল তৈরি করে রেখেছিল। ভাষা, সাহিত্য, শাসন এবং ধর্মীয় দিক থেকে চার্চগুলো ছিল গ্রিসের জনগণের শেষ ঠিকানা। তাই সময়ে অসময়ে, কাজে অ-কাজে, তাদেরকে চার্চে বা গির্জায় ধর্ণা দিতেই হতো। আর জনমানুষের সেই দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়েই পোপরা তাদের অন্তরে গেঁথে

দিচ্ছিল উসমানীয়দের ঘৃণা এবং স্বদেশ জাতীয়তাবাদ।

এদিকে হঠাৎ করে গ্রিসের অর্থনৈতিক উত্থান হতে থাকে। সম্পদে সাফল্য এবং স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে থাকা জনগণ তাই অন্য ধর্মের, অন্য জাতির এবং অন্য দেশের পরাধীনতা মানতে নারাজ হয়ে যায়। তাছাড়া পশ্চিমাদের সংশ্রব এবং মনস্তাত্ত্বিক প্রভাবে গ্রিসের জনমানুষের মনেও স্বদেশপ্রেম চিড়িক দিয়ে ওঠে।

মনোজাগতিক এমন অন্তর্দ্বন্দ্বের পাশাপাশি সে বছর উভয় পক্ষে ঘটে যায় কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা। সিওয়াসে উসমানি সেনাদের সাথে কোন্দল করতে গিয়ে ২৫ হাজার গ্রিক সেনা নিহত হয়, অপরদিকে পিলোপনিস উপসাগরপাড়ে পারস্পরিক বিবাদে গ্রিক সেনাদের হাতে মারা যায় প্রায় ১৫ হাজার উসমানি সেনা। যদিও ইবরাহিম পাশা আঞ্চলিক বিদ্রোহ ঠেকাতে দ্রুত মধ্যস্থতা করে ব্যাপারটার একটি সুরাহা টানেন, কিন্তু এই ঘটনাগুলো উভয়পক্ষে দীর্ঘস্থায়ী ক্ষত তৈরি করে দেয়।

এ-সময় রাশিয়া দেখল, গ্রীক জনগণকে উসমানি সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে দাঁড় করাতে পারলে, প্রকারান্তরে তা রাশিয়ার স্বার্থকেই ত্বরান্বিত করবে। এ-জন্য রুশ সম্রাট প্রথম আলেক্সান্ডার হঠাৎ করে বিশ্বের সকল অর্থডক্স খ্রিস্টানদের প্রতি সহমর্মিতা এবং সহযোগিতার ঘোষণা দিয়ে বসে। এতে উসমানি সাম্রাজ্যের অন্তর্গত অর্থোডক্স চার্চগুলোতে সোৎসাহে প্রচার হতে থাকে জাতীয়তাবাদী চেতনা। পাশাপাশি গ্রিসের সাথে রাশিয়ার ধর্মগত বিভেদ ঘুচে গিয়ে সেটা পারস্পরিক সম্প্রীতির রূপ পরিগ্রহ করে। এদিকে ভৌগলিকভাবে সাইপ্রাস ও ক্রেত নগর রাশিয়ার কাছাকাছি হওয়ায় সেখানে অবস্থানরত গ্রিক নাগরিকদের নানান কৌশলে ক্রমাগত ফুসলে যাচ্ছিল রাশিয়া। পুরো গ্রিসের প্রায় অর্ধেক নাগরিকের এই শরহদুটিকে উসমানিদের বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে পারলেই যেন রাশিয়া তাদের স্বার্থপূরণের হাতছানি দেখতে পাচ্ছিল।

মিশরের নৌবহর এবং যুদ্ধ

মিশরের সুলতান মুহাম্মদ আলি পাশা ইতিমধ্যে তার মসনদ শক্ত ও সংহত করে নিয়েছেন। এবার সেটাকে আরও সমৃদ্ধ এবং বিস্তীর্ণ করার পালা। এদিকে সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদ তার বাহিনীর সাহায্য নিয়ে গ্রিসের চলমান বিদ্রোহ দমনের জন্য মুহাম্মদ আলি পাশার কাছে আবেদন করলেন। এটা ছিল তার জন্য অপ্রত্যাশিত

সুযোগ। তিনি ভাবছিলেন, এই দায়িত্বে বিজয় মানে অচিরেই আমি এতদাঞ্চলের সবচে ক্ষমতাধর এবং যোগ্য ব্যক্তি হিসেবে আবির্ভূত হবো। অধিকন্তু সুলতান মাহমুদের ক্ষমতা খানিক দুর্বল হয়ে এলে আমি হতে পারব এতদাঞ্চলের খলিফাতুল মুসলিমিন। তাই তিনি সুলতান মাহমুদের আবেদনের প্রেক্ষিতে একটি শর্ত দিয়ে ফিরতি পত্র পাঠালেন। বললেন, 'এ অভিযানে সফল হলে ক্রেত এবং গ্রিসের অধিকার আমাকে দিতে হবে।' সুলতান মাহমুদ বিনা বাক্যে তার আবেদন মেনে নিলেন।

মুহাম্মদ আলি পাশা তার ছেলে ইবরাহিম পাশাকে গ্রিসের বিদ্রোহ দমনের দায়িত্ব দিয়ে মিশরের বাহিনী নিয়ে অবিলম্বে বেরিয়ে পড়তে বললেন। ইবরাহিম তার উপদেষ্টা সুলাইমান পাশাকে সঙ্গে নিয়ে ১৮২৩ সালে আলেকজান্দ্রিয়ার সমুদ্রে নেমে পড়লেন। গন্তব্য ক্রেত এবং ক্রুসেডারদের নতুন কেন্দ্র হয়ে ওঠা পিলোপনিস উপদ্বীপ। ১৮২৪ সালে নাভারিনো জয় করে তিনি গ্রিসের এথেইনসে ঢুকে গেলেন। ইংরেজ সেনাপতি লর্ড কোসরানের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা সত্ত্বেও ইবরাহিম এথেইনস জয় করে নিলেন। গ্রিসের ক্রুসেডার দ্রোহ নিভাতে গিয়ে মুসলিম বাহিনীর সামনে ইউরোপের কুৎসিত চেহারা প্রকাশ হয়ে যায়। তারা ঘোষণা দিয়ে গ্রিসের বিদ্রোহীপ্রধান শহরগুলো বাঁচাতে সহযোগিতায় নেমে আসে। বরং রাশিয়া সামনের সারিতে এসে উসমানীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের পায়তারা শুরু করে দেয়। তারা ভাবছিল, এটাই ইস্তাম্বুলে ঢোকার এবং সেটাকে পুনরায় অর্থোডক্সের কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার সবচে উপযোগী সুযোগ। রাশিয়ার এমন আবেদন ও কর্মের পাশে সমর্থন ও মদদে দাঁড়িয়ে যায় পুরো ইউরোপ।

গ্রিসের স্বাধীনতা এবং স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে, উসমানি সাম্রাজ্যকে চাপ দিতে থাকে রাশিয়া, ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ড। তারা অনেকটা হুমকির ভাষায় গ্রিসের পক্ষে তাদের সমর্থন এবং ঐক্যের কথা জানান দেয়। কিন্তু উসমানি সুলতান তাদের আবেদন এবং হুমকি, দুটোই উড়িয়ে দেন। ইউরোপ কেন্দ্রীয় উপায়ে সমাধা না পেয়ে তাদের নৌ বাহিনী পাঠিয়ে দেয় গ্রিসের বন্দরগুলোতে। তারা এসে ইবরাহিম পাশাকে যুদ্ধ বন্ধ করার আবদার জানায়। কিন্তু ইবরাহিম জানান, আমি আমার সুলতান বা আমার পিতার পক্ষ থেকে আদিষ্ট হয়েছি, অন্য কারও কথায় বা হুকুমে—আমি যুদ্ধ বন্ধ করতে পারি না। কিন্তু এরপরও, এই পরস্পর দ্বিধাচড়াকালে বিশ দিনের মতো যুদ্ধ বন্ধই থেকে যায়।

এ-সময় ইউরোপের নৌ সেনারা ভারী কোনো অস্ত্র ছাড়াই ১৮২৭ সালের ২০শে

অক্টোবর নাভারিনো বন্দরে প্রবেশ করে। তাদের হাতে যুদ্ধের কোনো পতাকা ছিল না। কিন্তু তারা স্থানীয় বিদ্রোহীদের সাথে ষড়যন্ত্র করে নিয়েছিল আগেই। সে-মতে ইবরাহিম ও তার সেনাদের প্রতারিত করে তাদের চোখে ধুলো দিয়ে এরা ভেতরে চলে যায়। এরপর একে একে উসমানীয়দের সবগুলো জাহাজে আগুন জ্বেলে দেয় ইউরোপিয়ানরা। চোখের সামনে সবকিছু পুড়ে ছাই হয়ে যায়। পুড়ে যাওয়া ছাইগুলোও পানির তলে ডুবে যায় ধীরেধীরে। শোচনীয় এক পরাজয় মুসলিম বাহিনীর ভেতর-বাহির জাপটে ধরে। এ ঘটনা এতটাই আকস্মিক এবং অপ্রত্যাশিত ছিল যে, দক্ষ সেনাপতিরাও তা ধরতে পারেনি। তাদের চিন্তায়ও আসেনি যে, এমন কিছু ঘটতে পারে।

ফলাফল

ইতিহাস বদলে দেয়া নৌ-যুদ্ধগুলোর অন্যতম হিসেবে স্মরণ করা হয় ১৮২৭ সালের এই নাভারিনোর যুদ্ধকে। সমসময়ের সবগুলো শক্তিতেই এ যুদ্ধের প্রভাব সমানভাবে প্রভাবিত করে। আগে পরে যা হয়, হয়েছে; কিন্তু সারকথা ছিল উসমানি সাম্রাজ্যের লজ্জাজনক পরাজয়। এ যুদ্ধের পরই মুসলমানদের সর্ববৃহত সাম্রাজ্য পতনের দিকে ঝুঁকতে থাকে। বিজয় ও গৌরবের আসন থেকে তারা নেমে যেতে থাকে পরাজয় ও অবনতির দিকে। ইউরোপের জনমনে এ বিজয় ছড়িয়ে দেয় সীমাহীন আনন্দের বাতাস। নাভারিনোর বন্দরে শেষ হাসি হেসে যায় মুসলমানদের চিরশত্রুরা। দমে যান মিশরের সুলতান মুহাম্মদ আলি। মাঝখানে গ্রিস মুসলমানদের হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায়, তিনি উসমানি সাম্রাজ্যের অংশবিশেষে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েন। ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ড এরপর একসাথে কাজ শুরু করে। তারা গ্রিসে সম্মিলিত সেনা প্রেরণ করে ধীরে ধীরে সেটাকে নিজেদের পকেটে পুরে নেবার ফন্দি করতে থাকে।

মুহাম্মদ আলি পাশা নিজের নৌ শক্তির করুণ পরিণতি দেখে দ্রুত ইবরাহিম পাশাকে মিশরে ফিরে আসতে বলেন। পেছনে ফ্রান্সের সেনারা ইবরাহিম পাশা ও তার জীবিত সেনাদের খোঁজে চোখ-কান খোলা রেখে চারপাশে বিচরণ করতে থাকে। ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ড একত্রে জোট করে গ্রিসকে আনুষ্ঠানিকভাবে উসমানি সাম্রাজ্যের শেকল থেকে মুক্ত করে দেয়। এরপর সেখানে নিজেদের পছন্দমতো একজন খ্রিস্টান শাসন নিয়োগ দিয়ে এবারের মতো তৃপ্তির হাসি হেসে নেয়।

এ যুদ্ধে উসমানি নৌবহরের পরাজয়ে সবচে বেশি বিপদে পড়ে যায় আলজেরিয়া। রাজ্যটির অধিকাংশ বন্দরগুলোতে বাড়তে থাকে শত্রুদের যাতায়াত। এরই মধ্যে এতবড় পরাজয়, মানসিকভাবে রাজ্যটিকে শত্রুর কোঁচড়ে ফেলে দেয়। পরিশেষে ফ্রান্সের সম্রাট দশম চার্লস সমুদ্রপথে রাজ্যটিকে ঘেরাও করে ফেলে এবং ১৮৩০ সালে তথা নাভারিনো যুদ্ধের তিন বছরের মাথায়, আলজেরিয়া উসমানি সাম্রাজ্যের শৃঙ্খল থেকে বের হয়ে ইউরোপের দখলে চলে যায়।

গ্রন্থপঞ্জি

- আল-কুরআনুল কারিম
- *মুসনাদে আহমাদ*: ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (২৪১ হি.)
- *সহিহ বুখারি*: মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল বুখারি (২৫৬ হি.)
- *সহিহ মুসলিম*: মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরি (২৬১ হি.)
- *সুনানে ইবনে মাজাহ*: মুহাম্মদ ইবনু মাজাহ (২৭৩ হি.)
- *সুনানুত তিরমিজি*: মুহাম্মাদ ইবনে ইসা তিরমিযি (২৭৯ হি.)
- *সুনানুন নাসায়ি*: আহমাদ ইবনে শুআইব আন-নাসায়ি (৩০৩ হি.)
- *মুসতাদরাকে হাকেম*: মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ হাকেম (৪০৫ হি.)
- *কানযুল উম্মাল*: আলাউদ্দিন আলি মুত্তাকি (৯৭৫ হি)

নববি যুগ

- *আল কামিল ফিত তারিখ*, ইবনুল আসির জাযারি (৬৩০ হি.), দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৪০৭ হিজরি
- *আল-ইসাবা ফি-তাময়িযিস সাহাবা*: ইবনু হাজার আসকালানি রহ., দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৪১৫ হিজরি
- *আর-রাহিকুম মাখতুম*: সফিউর রহমান মুবারকপুরি রহ., আত তাবআতুশ শারইয়্যাহ, মিশর, ১৪১৪ হিজরি
- *আল-ইসতিয়াব*: ইবনু আবদিল বার রহ., দারুল জাইল, কায়রো, ১৪১২ হিজরি
- *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ইমাদুদ্দিন ইবনু কাসির (৭৭৪ হি.), দারুল হিজর, ১৪১৯ হিজরি
- *উসদুল গাবাহ ফি মারিফাতিস সাহাবা*: ইবনুল আসির রহ, দারু ইবনে হাযম, বৈরুত, ২০১২ খ্রিষ্টাব্দ
- *তারিখুত তাবারি*, মুহাম্মাদ ইবনু জারির তাবারি (৩১০ হি), দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৪১৫ হিজরি

- *যাদুল মাআদ*: ইবনুল কাইয়িম আল-জাওযিয়্যাহ রহ., মুয়াসসাসাতুর রিসালা, ১৪০৫ হিজরি
- *সিরাতে হালাবিয়্যাহ*: ইবনু বুরহানুদ্দিন রহ., দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৪১১ হিজরি
- *সিরাতে ইবনে হিশাম*: আবু মুহাম্মদ আবদুল মালিক ইবনু হিশাম রহ., দারুল কুতুবিল আরাবি, মিশর, ১৪১০ হিজরি
- *কিতাবুত তাবাকাত*: আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে সাদ, দার সাদের, বৈরুত, ১৪২১ হিজরি
- *আদ-দুরার ফি ইখতিসারিল মাগাজি ওয়াস-সিয়ার*: ইবনু আবদিল বার রহ., আল মাজলিসুল আলা, মিশর, ১৩৮৬ হিজরি
- *কিতাবুল মাবআস ওয়াল মাগাজি*: ইসমাইল ইবনু মুহাম্মদ আত-তামিমি রহ., দারুল ওয়ালিদ, তারাবলুস, লিবিয়া, ১৪৩১ হিজরি
- *কিতাবুল মাগাজি*: মুহাম্মদ ইবনু উমর আল-ওয়াকিদি রহ, কলকাতা, ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দ
- *ফিকহুস সিরাহ*: ইবনুল আসির রহ., দারুল কুতুবিল হাদিসিয়্যাহ, মিশর, ২০০৮ খ্রিষ্টাব্দ
- *ফিকহুস সিরাহ*: মুহাম্মদ আল-গাযালি রহ, দারুল কলম, দামেশক, ১৪১২ হিজরি
- *সিরাতে মুগলতায়ি*: হাফিজ মুগলতায়ি রহ,, দারুল কলম, দামেশক, ১৪১৬ হিজরি
- *সিরাতে ইবনে ইসহাক*: মুহাম্মদ ইবনু ইসহাক মুত্তালিবি রহ., দারুল ফিকর, ২০০৮ খ্রিষ্টাব্দ
- *মুখতাসারুস সিরাহ*: শাইখ আবদুল্লাহ রহ., ওয়াজারাতুশ শুউনিল ইসলামিয়া, ১৪১৮ হিজরি
- *তালকিহুল ফুহুম*: ইবনুল কাইয়িম, শারাকাতু দারিল আরকাম, বৈরুত, ১৪১৮ হিজরি
- *আস-সিরাহ আন-নববি*: মুহাম্মদ আবু শাহবাহ রহ., দারুল কলম, দামেশক, ১৪১২ হিজরি
- *সিরাতুন নবি*: ইবনু কাসির রহ., দারুল মারিফা, বৈরুত, ১৩৯৫ হিজরি
- *মানহাজুর রাসূল ফি গারছির রূহিল জিহাদিয়্যাহ*: ড. মুহাম্মদ সাইয়েদ নূহ, জামিয়াতুল ইমারাত আল ইসলামিয়া, ১৪১১ হিজরি
- *রাহমাতুল্লিল আলামিন*: সুলাইমান মনসুরপুরি রহ, দারুস সালাম, বৈরুত, ১৪১৮ হিজরি

খিলাফতে রাশেদা

- *আল ইসাবা ফি তাময়িযিস সাহাবা*: ইবনে হাজার আসকালানি রহ., কায়রো ১৩২৩ হিজরি
- *তারিখু বাগদাদ*, খতিব বাগদাদি (৪৬৩ হি.), দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৪১৭ হিজরি
- *তারিখুত তাবারি*, মুহাম্মাদ ইবনু জারির তাবারি (৩১০ হি.), দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৪১৫ হিজরি
- *আল কামিল ফিত তারিখ*, ইবনুল আসির জাযারি (৬৩০ হি.), দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৪০৭ হিজরি
- *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ইমাদুদ্দিন ইবনু কাসির (৭৭৪ হি.), দারুল হিজর, ১৪১৯ হিজরি
- *ওফায়াতুল আইয়ান ওয়া আনবাউ আবনায়িয যামান*: ইবনু খাল্লিকান, দারুস সাকাফা, বৈরুত, ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দ
- *তারিখুল খুলাফা*: ইমাম সুয়ূতি রহ., দারুল কিতাবিল আরাবি, বৈরুত, ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দ
- *তারিখু মাদিনাতি দিমাশক*: ইবনে আসাকির, দারুল ফিকর, বৈরুত, ১৯৯৫
- *তারিখু খলিফা ইবনু খইয়াত*, খলিফা ইবনু খইয়াত (২৪০ হি.), দারু তাইবা, রিয়াদ, ১৪০৫ হিজরি
- *তারিখু ইবনু খালদুন*, আবদুর রহমান ইবনু খালদুন (৮০৮ হি.), দারুল ফিকর, বৈরুত, ১৪২১ হিজরি
- *মুরুজুজ্জাহাব ওয়া মাআদিনুল জাওহার*: আবুল হাসান আলি ইবনুল হুসাইন আল-মাসউদি, দারুল উনদুলুস, বৈরুত, ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দ
- *সিরাতে ইবনে হিশাম*: আবদুল মালিক ইবনে হিশাম, মাকতাবাতুল কুল্লিয়াতিল আযহারিয়্যাহ, কায়রো
- *কিতাবুত তাবাকাত*: আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে সাদ, দার সাদের, বৈরুত, ১৩৯৮ হিজরি
- *কিতাবুল মাগাজি*: মুহাম্মদ ইবনু উমর আল-ওয়াকেদি, আলামুল কুতুব, বৈরুত, ১৪০৩ হিজরি
- *আল মাওয়ায়িজ ওয়াল ইতেবার*: তকিউদ্দিন মাকরেজি, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দ
- *আল মুখতাসার ফি আখবারিল বাশার*: আবুল ফিদা ইমাদুদ্দিন ইসমাইল, আল মাতবাআতুল হুসাইনিয়া, কায়রো

- *আল-ইমামা ওয়াস সিয়াসা*: ইবনু কুতাইবা, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দ
- *ফুতুহুল বুলদান: আহমাদ ইবনু ইয়াহইয়া বালাজুরি, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দ*
- *কিতাবুল বাদয়ি ওয়াত তারিখ*: আহমাদ ইবনু সুহাইল বালাখি, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দ
- *ফুতুহুশ শাম*: লুত ইবনে ইয়াহইয়া আল-আযদি রহ., মুয়াসসাসা সিজিল্লিল আরব, কায়রো, ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দ
- *মাআরিকি খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ*: ইয়াসিন সুয়াইদ, আল মুয়াসসাসাতুল আরাবিয়্যাহ, বৈরুত,১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দ
- *আবকারিয়্যাতু খালিদ*: আব্বাস মাহমুদ আক্কাদ, দারুল হিলাল, কায়রো, ১৪২২ হিজরি
- *সিরাতে ফারুক*: শিবলি নামোনি, আল মাজলিসুল আলা, কায়রো, ২০০০ খ্রিষ্টাব্দ
- *আস সিদ্দিক আবু বকর*: মুহাম্মদ হুসাইন হাইকেল, কায়রো, ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দ

উমাইয়া খিলাফত

- *আল বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব*, ইবনুল আযারি মারাকেশি (৬৯৫ হি.), দারুস সিকাফাহ, বৈরুত,
- *আল কামিল ফিত তারিখ*, ইবনুল আসির জাযারি (৬৩০ হি.), দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৪০৭ হিজরি
- *আন নুজুমুয যাহিরা ফি আখবারি মিসর ওয়াল কাহিরাহ*, ইবনু তাগরি বারদি (৮৭৪ হি.), দারুল কুতুব, মিসর
- *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ইমাদুদ্দিন ইবনু কাসির (৭৭৪ হি.), দারুল হিজর, ১৪১৯ হিজরি
- *তারিখু ইবনু খালদুন*, আবদুর রহমান ইবনু খালদুন (৮০৮ হি.), দারুল ফিকর, বৈরুত, ১৪২১ হিজরি
- *আল মুকাদ্দিমা*, আবদুর রহমান ইবনু খালদুন (৮০৮), দার ইয়ারাব, দামেশক
- *তারিখু খলিফা ইবনু খইয়াত*, খলিফা ইবনু খইয়াত (২৪০ হি.), দারু তাইবা, রিয়াদ, ১৪০৫ হিজরি
- *আল ইকদুল ফরিদ*, ইবনু আবদি রব্বিহি (৩২৮ হি.), দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৪০৪ হিজরি
- *আল বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব*, ইবনুল আযারি মারাকেশি (৬৯৫ হি), দারুস সিকাফাহ, বৈরুত

- *ফুতুহুল বুলদান*, বালাজুরি (২৭৯ ই.), লাজনাতুল বায়ান, কায়রো
- *আল আখবারুত তিওয়াল*, আহমাদ ইবনু দাউদ দিনাওয়ারি (২৮২ হি.), দার এহইয়ায়িল কুতুবিল আরাবি, কায়রো, ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দ
- *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, হাফেজ শামসুদ্দিন যাহাবি (৭৪৮ হি.), মুআসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত, ১৪১৭ হিজরি
- *আল ফুতুহ*: আবু মুহাম্মদ আহমাদ আল-কুফি, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৯৮৬
- *কিতাবুত তাবাকাত*: আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে সাদ, দার সাদের, বৈরুত
- *আল ফাখরি ফিল আদাবিস সুলতানিয়া*: দার সাদের, বৈরুত, ১৯৬৬
- *আল আওয়াসিম মিনাল কাওয়াসিম*: আবু বকর ইবনুল আরাবি, লাজনাতুশ শাবাবিল মুসলিম, ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দ
- *তারিখু ইফতিতাহি উনদুলুস*: আবু বকর মুহাম্মদ আল কুরতুবি, দারুন নাশর, বৈরুত, ১৪১১ হিজরি
- *তারিখে ইয়াকুবি*: আহমাদ ইবনু আবি ইয়াকুব আল ইয়াকুবি, মুয়াসসাসাতুল আলামি, বৈরুত, ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দ
- *দিরাসাত ফি তারিখিল হাদ্বারাতিল ইসলামিয়া*: হাসসান হাল্লাক, দারুন নাহদ্বা, বৈরুত, ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দ

আব্বাসি খিলাফত

- *তারিখুত তাবারি*, মুহাম্মাদ ইবনু জারির তাবারি (৩১০ হি.), দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৪১৫ হিজরি
- *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ইমাদুদ্দিন ইবনু কাসির (৭৭৪ হি.), দারুল হিজর, ১৪১৯ হিজরি
- *ফুতুহুল বুলদান*, বালাজুরি (২৭৯ হি.), লাজনাতুল বায়ান, কায়রো
- *আল আখবারুত তিওয়াল*, আহমাদ ইবনু দাউদ দিনাওয়ারি (২৮২ হি.), দার এহইয়ায়িল কুতুবিল আরাবি, কায়রো, ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দ
- *তারিখু খলিফা ইবনু খইয়াত*, খলিফা ইবনু খইয়াত (২৪০ হি.), দারু তাইবা, রিয়াদ, ১৪০৫ হিজরি
- *আল ইকদুল ফরিদ*, ইবনু আবদি রব্বিহি (৩২৮ হি.), দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৪০৪ হিজরি
- *তারিখু বাগদাদ*, খতিব বাগদাদি (৪৬৩ হি.), দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৪১৭ হিজরি
- *কিতাবুল ফুতুহ*, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দ

- *আল মুন্তাজাম ফি তারিখিল মুলুকি ওয়াল উমাম*, ইবনুল জাওযি (৫৯৭ হি.), দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৪১৫ হিজরি
- *যুবদাতুল হালাব ফি তারিখি হালাব*, ইবনুল আদিম, দামেশক, ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দ,
- *আল কামিল ফিত তারিখ*, ইবনুল আসির জাযারি (৬৩০ হি.), দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহহ, বৈরুত, ১৪০৭ হিজরি
- *যাইলু তারিখি বাগদাদ*, ইবনুন নাজ্জার বাগদাদি (৬৪৩ হি.), দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৪১৭ হিজরি
- *আল বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব*, ইবনুল আযারি মারাকেশি (৬৯৫ হি.), দারুস সিকাফাহ, বৈরুত
- *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, হাফেজ শামসুদ্দিন যাহাবি (৭৪৮ হি), মুআসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত, ১৪১৭ হিজরি
- *তারিখুল ইসলাম ওয়া ওয়াফায়াতুল মাশাহিরি ওয়াল আ'লাম*, হাফেজ শামসুদ্দিন যাহাবি(৭৪৮ হি.), দারুল কিতাবিল আরাবি, বৈরুত, ১৪১১ হিজরি
- *দুওয়ালুল ইসলাম*, হাফেজ শামসুদ্দিন যাহাবি (৭৪৮ হি.), দার সাদের, বৈরুত, ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দ
- *আল মুকাদ্দিমা*, আবদুর রহমান ইবনু খালদুন (৮০৮), দার ইয়ারাব, দামেশক
- *তারিখু ইবনু খালদুন*, আবদুর রহমান ইবনু খালদুন (৮০৮ হি), দারুল ফিকর, বৈরুত, ১৪২১হিজরি
- *আস সুলুক লিমারিফাতি দুওয়ালি ওয়াল মুলুক*, মাকরেজি (৮৪৫ হি.), দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৮১৮ হিজরি
- *আন নুজুমুয যাহিরা ফি আখবারি মিসর ওয়াল কাহিরাহ*, ইবনু তাগরি বারদি (৮৭৪ হি), দারুল কুতুব, মিসর
- *তারিখুল খুলাফা*, জালালুদ্দিন সুয়ুতি (৯১১ হি.), মাকতাবাতু মিসর, ১৪২৮ হিজরি
- *আখবারুদ দুওয়াল ওয়া আসারুল উওয়াল ফিত তারিখ*, আহমাদ বিন ইউসুফ কিরমানি (১০১৯ হি.), আলামুল কুতুব, ১৪১২ হিজরি
- *আদ দাওলাতুল আব্বাসিয়্যাহ*, শায়খ মুহাম্মদ আল খুদারি বেক (১৩৪৫ হি.), মাকতাবাতুত তাওফিকিয়্যাহ, কায়রো
- *দুহাল ইসলাম*, আহমাদ আমিন (১৩৭৩ হি.)
- *মিন রাওয়াইউ হাদারাতিনা*, মুস্তফা আস সিবায়ি (১৩৮৩ হি.), দারুল ওয়াররাক, বৈরুত, ১৪২৩ হিজরি
- *আল-আরব ওয়াস-সিন মুসতাকবিলুল আলাকা*: আল মারকাযুল আরাবি লিল-আবহাস, বদরুদ্দিন হাই আস-সিনি, মাকতাবাতুন নাহজা, মিশর, ১৩৭০ হিজরি

- *তারিখুল হাদ্বারাতিস সিনিয়্যাহ* : জোসেফ নিদহাম, আল হাইয়াতুল আরাবিয়্যাহ ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দ
- *আল আব্বাসিয়ুনাল আকবিয়া*, মুহাম্মদ ইলহামি, মুআসসাসাতু ইকরা, ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দ
- *কাইফা রব্বাল মুসলিমুনা আবনাআহুম*, শাবান আইয়ুব, মুআসসাসাতু ইকরা, ফুস্তাত, ২০১১ খ্রিষ্টাব্দ
- *মাতলাউ আসরিল আব্বাসি সানি*, নাদিয়া হাসানি সকর, দারুশ শুরুক, জেদ্দা, ১৪০৩ হিজরি
- *ওয়াররাকু বাগদাদ ফিল আসরিল আব্বাসি*, খাইরুল্লাহ সাদ
- *মা যা কদ্দামাল মুসলিমুনা লিল আলাম*, রাগেব সিরজানি, মুআসসাসাতু ইকরা, ফুস্তাত, ১৪৩০ হিজরি
- *হারাকাতুল হাশশাশিন*, উসমান খাশত, মাকতাবাতু ইবনি সিনা, কায়রো, ১৪০৮ হিজরি
- *আন নাফাকাত ওয়া ইদারাতুহা ফিদ দাওলাতিল আব্বাসিয়্যা*, যাইফুল্লাহ ইয়াহইয়া যাহরানি, মাকতাবাতুত তালিবিল জামি, মক্কা, ১৪০৬ হিজরি

আন্দালুসের যুগ

- *তারিখু বাগদাদ*, খতিব বাগদাদি (৪৬৩ হি.), দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহহ, বৈরুত, ১৪১৭ হিজরি
- *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ইমাদুদ্দিন ইবনু কাসির (৭৭৪ হি.), দারুল হিজর, ১৪১৯ হিজরি
- *আল কামিল ফিত তারিখ*, ইবনুল আসির জাযারি (৬৩০ হি.), দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহহ, বৈরুত, ১৪০৭ হিজরি
- *আল বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব*, ইবনুল আযারি মারাকেশি (৬৯৫ হি.), দারুস সিকাফাহ, বৈরুত
- *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, হাফেজ শামসুদ্দিন যাহাবি (৭৪৮ হি.), মুআসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত, ১৪১৭ হিজরি
- *তারিখুল ইসলাম ওয়া ওয়াফায়াতুল মাশাহিরি ওয়াল আ'লাম*, হাফেজ শামসুদ্দিন যাহাবি (৭৪৮ হি.), দারুল কিতাবিল আরাবি, বৈরুত, ১৪১১ হিজরি
- *তারিখুল উমাম ওয়াল মুলুক*: ইবনু জারির তাবারি, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৪০৭ হিজরি
- *আয যাখিরাতুস সানিয়্যাহ*: ইবনু আবি জারা', দারুল মানসুর, মরক্কো, ২০০১ খ্রিষ্টাব্দ

- *রাওজুল কিরতাস ফি আখবারি মুলুকিল মাগরিব ওয়া মাদিনাতি ফাস*: দারুল মানসূর, মরক্কো, ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দ
- *তারিখু আসবানিয়া আল ইসলামিয়া*: লিসানুদ্দিন ইবনুল খাতিব, দারুল মাকশুফ, বৈরুত ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দ
- *আল ইহাতা ফি আখবারি গারনাতা*: লিসানুদ্দিন ইবনুল খাতিব, মাকতাবা খানজি, কায়রো, ১৩৯৩ হিজরি
- *তারিখু উলামায়িল উনদুলুস*: ইবরাহিম ইবনুল ফারজি, দারুল কুতুব আল মিসরি, ১৪০৩ হিজরি
- *নাজমুল জুমান লি তারতিবি মা সালাফা মিন আখবারিয যামান*: ইবনুল কাত্তান আল মারাকেশি, দারুল গারব আল ইসলামি
- *খারিদাতুল আজায়েব ওয়া ফারিদাতুল গারায়েব*: ইবনুল ওয়ারদি, বৈরুত ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দ
- *আয যাখিরা ফি মাহাসিনি আহলিল জাযিরা*: ইবনু বাসসাম শান্তারিনি, আদ দারুল আরাবিয়্যাহ
- *ফাজায়িলিল উনদুলুস ওয়া আহলিহা*: ইবনু হাজম জাহিরি, দারুল কিতাব আল জাদিদ, ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দ
- *আল মুকতাবাস মিন আনবায়ি আহলিল উনদুলুস*: ইবনু হাইয়ান, আল মাজলিসুল আলা, মিশর
- *আল মুগরিব ফি হুলিয়িযিল মাগরিব*: ইবনে সাইদ মাগরেবি, আল হাইয়াতুল মিসরিয়্যা, কায়রো
- *আদ দুরার ফি ইখতিসারিল মাগাজি ওয়াস সিয়ার*: ইবনু আবদিল বার, আল মাজলিসুল আলা, কায়রো, ১৪১৫ হিজরি
- *আল ইতিবার*: উসামা বিন মুনকিয, মাতবাআতুল মাদানি, কায়রো, ১৪০৮ হিজরি
- *মাআলিমু তারিখিল মাগরিব ওয়াল উনদুলুস*: হুসাইন মুনিস, দারুর রাশাদ, মিশর ১৪২৬ হিজরি
- *ফাজরুল উনদুলুস*: হুসাইন মুনিস, দারুর রাশাদ, মিশর,২০০৫ খ্রিষ্টাব্দ
- *তারতিবুল মাদারিক ওয়া তাকরিবুল মাসালিক*: ইয়াজ আল কাজি, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দ
- *নাফহুত তিব মিন গুসনিল উনদুলুস আর রাতিব*: আহমাদ ইবনু মুহাম্মদ আল মুকরি, মাকতাবা লাজনাতুত তালিফ ওয়ান নাশর, কায়রো, ১৩৫৮ হিজরি
- *আল উনদুলুস আত তারিখুল মুসাওয়ার*: তারিক আস সুওয়াইদান, শারিকাতুল ইবদা আল ফান্নি, কুয়েত, ২০০৫ খ্রিষ্টাব্দ

- *আত তারিখুল উনদুলুসি:* আবদুর রহমান আলি আল হাজ্জি, দারুল কলম, দামেশক, ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দ

আইয়ুবি যুগ

- *আত তারিখুল বাহির ফিদ দাওলাতিল আতাবিকিয়্যাহ:* ইবনুল আসির, কায়রো, ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দ
- *আন নুজুমুয যাহিরা ফি আখবারি মিসর ওয়াল কাহিরাহ,* ইবনু তাগরি বারদি (৮৭৪ হি.), দারুল কুতুব, মিসর
- *বাদাইয়ুজ জুহুর ফি ওয়াকাইয়িদ দুহুর:* মুহাম্মদ ইবনু আহমাদ ইবনু আয়াস, আল হাইয়াতুল মিসরিয়্যাহ, কায়রো, ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দ
- *আল কামিল ফিত তারিখ,* ইবনুল আসির জাযারি (৬৩০ হি.), দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৪০৭ হিজরি
- *তারিখু ইবনু খালদুন,* আবদুর রহমান ইবনু খালদুন (৮০৮ হি), দারুল ফিকর, বৈরুত, ১৪২১ হিজরি
- *যুবদাতুল হালাব ফি তারিখি হালাব,* ইবনুল আদিম, দামেশক, ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দ
- *আন নুজুমুয যাহিরা ফি আখবারি মিসর ওয়াল কাহিরাহ,* ইবনু তাগরি বারদি (৮৭৪ হি), দারুল কুতুব, মিসর
- *আল ইকদুল ফরিদ,* ইবনু আবদি রব্বিহি (৩২৮ হি.), দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৪০৪ হিজরি
- *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া,* ইমাদুদ্দিন ইবনু কাসির (৭৭৪ হি.), দারুল হিজর, ১৪১৯ হিজরি
- *আল মুন্তাজাম ফি তারিখিল মুলুকি ওয়াল উমাম:* ইবনুল জাওযি, হায়দারাবাদ, ১৩৫৮ হিজরি
- *তারিখুয যামান:* ইবনুল আবারি, দারুশ শারক, বৈরুত ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দ
- *তারিখুদ দুওয়ালি ওয়াল মুলুক:* ইবনুল ফুরাত, জামিয়া আমেরিকা, বৈরুত, ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দ
- *আন নাওয়াদিরুস সুলতানিয়া:* বাহাউদ্দিন ইবনু শাদ্দাদ, মাকতাবাতুল খানজি, কায়রো, ১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দ
- *আর রাওদুজ জাহের ফি সিরাতিল মালিকিজ জাহির:* মুহিউদ্দিন ইবনু আবদিজ জাহের, রিয়াদ, ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দ
- *মাফরাজুল কারুব ফি আখবারি বনি আইয়ুব:* জামালুদ্দিন ইবনু ওয়াসেল, কায়রো, ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দ

- *আর রওজাতাইন ফি আখবারিদ দাওলাতাইন*: মুয়াসসাসা রিসালাহ, বৈরুত, ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দ
- *আল উনসুল জালিল বি তারিখিল কুদসি ওয়াল খালিল*: মুজিরুদ্দিন আবুল ইয়ামান, আল মাতবাআতুল হায়দারিয়যাহ, ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দ
- *তারিখু ফাতিহিল আলম*: আতা মালিক আল জুয়াইনি, দারুল মিলাহ, হালাব, ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দ
- *আদ দুররুল মাতলুব ফি আখবারি বনি আইয়ুব*: ইবনু আইবেক আদ দাওয়াদারি, কায়রো, ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দ
- *মিরআতুয যামান ফি তারিখিল আইয়ান*: ইবনুল জাওযি, ৮ম খণ্ড, দায়িরাতুল মাআরিফিল ইসলামিয়া, হিন্দ
- *তারিখু বাইতিল মাকদিস*: ইয়াকুব আল কাইতারি, দারুশ শারক, ওমান, ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দ

মামলুক যুগ

- *আল মানহালুস সাফি*: ইউসুফ বিন তাগরি বারদি, দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যাহ, ১৩৭৭ হিজরি
- *মাআসিরুল আনাফা ফি মাআলিমিল খিলাফাহ*: আহমাদ ইবনে আবদুল্লাহ কালাকশান্দি, আলামুল কুতুব, বৈরুত, ১৪০০ হিজরি
- *আওজাউদ দুওয়ালিল ইসলামিয়া ফিশ শারকিল ইসলামি*: সাদ ইবনু মুহাম্মদ আল গামিদি, মুয়াসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত, ১৪০১ হিজরি
- *তারিখুল খুলাফা*: আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর আস সুয়ুতি, আল মাকতাবাতুত তিজারিয়া, কায়রো, ১৩৮১ হিজরি
- *তালফিকুল আখবার ওয়া তালকিহুল আসার*: এম. এম. রামযি, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত ১৩২৫ হিজরি
- *আল কামিল ফিত তারিখ*, ইবনুল আসির জাযারি (৬৩০ হি.), দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহহ, বৈরুত, ১৪০৭ হিজরি
- *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ইমাদুদ্দিন ইবনু কাসির (৭৭৪ হি.), দারুল হিজর, ১৪১৯ হিজরি
- *তারিখু ইবনু খালদুন*, আবদুর রহমান ইবনু খালদুন (৮০৮ হি.), দারুল ফিকর, বৈরুত, ১৪২১ হিজরি
- *যুবদাতুল হালাব ফি তারিখি হালাব*, ইবনুল আদিম, দামেশক, ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দ,
- *আন নুজুমুয যাহিরা ফি আখবারি মিসর ওয়াল কাহিরাহ*, ইবনু তাগরি বারদি (৮৭৪ হি.), দারুল কুতুব, মিসর

- *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, হাফেজ শামসুদ্দিন যাহাবি (৭৪৮ হি.), মুআসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত, ১৪১৭ হিজরি
- *আল আসকুর মামলুকি*: সাইদ আবদুল ফাত্তাহ আশুর, দারুন নাহদ্বা, কায়রো, ১৩৯৬ হিজরি
- *আল মুগুডল ফিত তারিখ*: ফুয়াদ আবদুল মুতি সাইয়াদ, দারুন নাহদ্বা, বৈরুত, ১৩৯০ হিজরি
- *আল হিন্দ ফিল আহদিল ইসলামি*: আবদুল হাই আল হাসানি, দায়েরাতুল মাআরিফিল ইসলামিয়া, হায়দারাবাদ, ১৩৯২ হিজরি

উসমানি যুগ

- বাদাইয়ুজ জুহুর ফি ওয়াকাইয়িদ দুহুর: মুহাম্মদ ইবনু আহমাদ ইবনু আয়াস, আল হাইয়াতুল মিসরিয়্যাহ, কায়রো, ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দ
- *তারিখুল উমামি ওয়াল মুলুক*: মুহাম্মদ ইবনু জারির তাবারি, দারুল ফিকর, দামেশক, ১৩৯৯ হিজরি
- *আল কামিল ফিত তারিখ*, ইবনুল আসির জাযারি (৬৩০ হি.), দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহহ, বৈরুত, ১৪০৭ হিজরি
- *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ইমাদুদ্দিন ইবনু কাসির (৭৭৪ হি.), দারুল হিজর, ১৪১৯ হিজরি
- *তারিখুল ইসলাম ওয়া ওয়াফায়াতুল মাশাহিরি ওয়াল আলাম*, হাফেজ শামসুদ্দিন যাহাবি (৭৪৮ হি.), দারুল কিতাবিল আরাবি, বৈরুত, ১৪১১ হিজরি
- *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, হাফেজ শামসুদ্দিন যাহাবি (৭৪৮ হি.), মুআসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত, ১৪১৭ হিজরি
- *কিরাআত ওয়া মুরাজাআতে নাকদিয়্যাহ*: ফারুক ফুজি, দারুল ইলম, দামেশক, ১৪১২ হিজরি
- *জাওয়ানিবে মুদ্বিয়া মিন তারিখিল উসমানিয়্যিন*: যিয়াদ আবু গুনাইমা, দারুল ফুরকান, মিশর, ১৪১১ হিজরি
- *তারিখু খলিফা ইবনু খইয়াত*, খলিফা ইবনু খইয়াত (২৪০ হি.), দারু তাইবা, রিয়াদ, ১৪০৫ হিজরি
- *তারিখু ইবনু খালদুন*, আবদুর রহমান ইবনু খালদুন (৮০৮ হি.), দারুল ফিকর, বৈরুত, ১৪২১ হিজরি
- *ফুতুহুল বুলদান*, বালাজুরি (২৭৯ হি.), লাজনাতুল বায়ান, কায়রো
- *বাদাইয়ুজ জুহুর ফি ওয়াকাইয়িদ দুহুর*: মুহাম্মদ ইবনু আহমাদ ইবনু আয়াস, আল হাইয়াতুল মিসরিয়্যাহ, কায়রো, ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দ

- *তারিখুল উমামি ওয়াল মুলুক:* মুহাম্মদ ইবনু জারির তাবারি, দারুল ফিকর, দামেশক, ১৩৯৯ হিজরি
- *তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া:* মুহাম্মদ ফরিদ বেক, দারুন নাফায়েস, ১৪০৮ হিজরি
- *তারিখু সালাতিনি আলে উসমান:* ইউসুফ আসাফ, দারুল বাসায়ের, ১৪০৫ হিজরি
- *তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া:* আলি হাসসুন, আল মাকতাবুল ইসলামি, ১৪১৫ হিজরি
- *আত তারিখুল উসমানি:* যাহেদ আবদুল ফাত্তাহ, দারুর রায়েদ, ১৪১৭ হিজরি
- *তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া:* ইয়ালমায উজতুনা, মুয়াসসাসা ফায়সাল, তুর্কি, ১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দ
- *জুহুদুল উসমানিয়্যিন লি ইনকাজি আন্দালুস:* নাবিল আবদুল হাই রিদওয়ান, মাকতাবাতুত তালিব আল-জামিয়ি, ১৪০৮ হিজরি
- *ইলামুল মুওয়াক্কিয়িন আন রাব্বিল আলামিন:* ইবনুল কাইয়িম, দারুল জাবাল, বৈরুত
- *আল বুরকুল ইয়ামানি ফিল ফাতহিল উসমানি:* কুতুবুদ্দিন মুহাম্মদ আল মানিক, দারুল ইয়ামামা, রিয়াদ, ১৩৮৭ হিজরি
- *আদ দাওয়াতুল উসমানিয়া কিরাআতে জাদিদা:* কায়স জাওয়াদ আল-আযদি, মারকাযু দিরাসাতিল ইসলাম, ১৪১৪ হিজরি
- *আস সালাতিনুল উসমানিয়্যুন:* কিতাবে মুসাওয়ার, তিউনিস
- *আশ শুউবুল ইসলামিয়া:* ড. আবদুল আজিজ সুলাইমান নাওয়ার, দারুন নাহদা, ১৪১১ হিজরি
- *আল উসমানিয়্যুন ফিত তারিখ ওয়াল হাদ্বারাহ:* ড. মুহাম্মদ হারব, দারুল কলম, দামেশক, ১৪০৯ হিজরি
- *আ ইউয়িদুত তারিখ নাফসাহ:* মহাম্মদ আবদুহু, আল মুনতাদা আল ইসলামি, ১৪১১ হিজরি
- *উরুবা ফিল উসুরিল উসতা:* সাইদ আশুর, মাকতাবাতুল মিসরিয়্যাহ, ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দ
- *বাদরুত তামাম ফি ইখতিসারি ইতিসাম:* আবু আবদুল ফাত্তাহ আল জাযায়িরি, দারুল হান্নান, ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দ
- *ফি উসুলিত তারিখিল উসমানি:* আহমাদ আবদুর রহিম মুস্তাফা, দারুশ শারক, ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দ
- *ফালসাফাতুত তারিখিল উসমানি:* মুহাম্মদ জামিল বাইহাম, শারিকাতু ফারদিল্লাহ, বরুত ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দ

- *কিরাআতে জাদিদা ফিত তারিখিল উসমানি*: ড. যাকারিয়া সুলাইমান বাইওয়ামি, ১৪১১ হিজরি
- *আল মুসলিমুন ওয়া জাহিরাতুল হাযিমাতিন নাফসিয়্যাহ*: আবদুল্লাহ ইবনু হামদ, দারু তাইবা, ১৪১৭ হিজরি

বিবিধ

- *ফাতহুল বারী শারহু সহিহিল বুখারি*, ইবনু হাজার আসকালানি (৮৫২ হি.), আল মাকতাবাতুস সালাফিয়্যাহ
- *শারহু মুসলিম*, ইয়াহইয়া ইবনু শারফ আন-নাবাবি (৬৭৬ হি.), মুয়াসসাসাতু কুরতুবা, ১৪১৪ হিজরি
- *আল ইকমাল ফি আসমাইর রিজাল*, খতিব তিবরিযি (৫০২ হি.), দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৪২২ হিজরি
- *আল মিলাল ওয়ান নিহাল*, শাহরাস্তানি (৫৪৮ হি.), দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৪১৩ হিজরি
- *আল আলাম*, খাইরুদ্দিন যিরিকলি (১৩৯৬ হি.), দারুল ইলম লিল মালায়িন, বৈরুত, ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দ
- *শাজারাতুয যাহাব ফি আখবারি মান যাহাব*, ইবনুল ইমাদ হাম্বলি (১০৮৯ হি.), দার ইবনু কাসির, দামেশক, ১৪০৬ হিজরি
- *লিসানুল মিযান*, ইবনু হাজার আসকালানি (৮৫২ হি.), মুআসসাসাতু আলামি, বৈরুত, ১৪০৬ হিজরি
- *তাহযিবুত তাহযিব*, ইবনু হাজার আসকালানি (৮৫২ হি.), দারুল ফিকর, দামেশক, ১৪০৪ হিজরি
- *মিযানুল ইতিদাল*, হাফেজ শামসুদ্দিন যাহাবি (৭৪৮ হি.)
- *তবাকাতুশ শাফিয়িয়্যাতিল কুবরা*, তাজুদ্দিন ইবনু তাকিউদ্দিন সুবকি (৭৭১ হি)
- *ওফায়াতুল আইয়ান*, কাজি ইবনু খাল্লিকান (৬৮১ হি.), দার সাদের, বৈরুত, ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দ
- *আজাইবুল আসার ফিত তারাজিম ওয়াল আখবার*: দারু ফাস, বৈরুত
- *মুজামুল বুলদান*, ইয়াকুত হামাভি (৬২৬ হি.), দার সাদের, বৈরুত, ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দ
- *লিসানুল আরব*, জামালুদ্দিন ইবনু মানযুর, (৭১১ হি.), দার সাদের, বৈরুত, ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দ
- *কিতাবুল বুলদান*, ইবনুল ফকিহ হামদানি ৩৬৫ হি.), আলামুল কুতুব, বৈরুত, ১৪১৬ হিজরি

- *আহসানুত তাকাসিম ফি মারিফাতিল আকালিম:* মুহাম্মদ ইবনু আহমাদ আল-মাকদিসি, ইয়াহইয়াউত তুরাসিল আরাবি, বৈরুত, ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দ
- *The Battle of Talas*, Barry Hoberman. Saudi Aramco World, (Sept/Oct 1982).
- *A Chinese Expedition across the Pamirs and Hindukush*, A.D. 747
- Aurel Stein. *The Geographic Journal*, (Feb. 1922)
- Man, John (2006). Kublai Khan: *From Xanadu to Superpower. London*: Bantam..
- *The Collins Encyclopedia of Military History* (4th edition, 1993)
- *The Encyclopaedia Of Islam*, EJ Brill, leiden, 1986

এক নজরে

যুদ্ধের সাল হি.	যুদ্ধের নাম	সেনাপতি	পৃষ্ঠা
২ হি.	বদর যুদ্ধ	রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)	১৯
৩ হি.	উহুদ যুদ্ধ	রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)	৩৬
৫ হি.	খন্দক যুদ্ধ	রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)	৫৩
৭ হি.	খাইবার যুদ্ধ	রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)	৯০
৮ হি.	মক্কা বিজয়	রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)	১০৯
৮ হি.	হুনাইনের যুদ্ধ	রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)	১২২
৮ হি.	মুতার যুদ্ধ	যাইদ ইবনু হারিসা জাফর ইবনু আবি তালিব আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ	১৩১
৯ হি.	তাবুকের যুদ্ধ	রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)	১৪৩
১২ হি.	যাতুস সালাসিল	খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ	১৬৩
১২ হি.	ওয়ালাজার যুদ্ধ	খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ	১৭২
১২ হি.	আইন আত-তামর যুদ্ধ	খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ	১৮০
১২ হি.	দাওমাতুল জান্দাল যুদ্ধ	খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ	১৮৫
১৩ হি.	আজনাদাইন যুদ্ধ	খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ	১৯২
১৩ হি.	সেতুর যুদ্ধ	আবু উবাইদ আস-সাকাফি	১৯৯

১৩ হি.	বুওয়াইবের যুদ্ধ	মুসান্না ইবনু হারিসা আশ-শাইবানি	২১৪
১৫ হি.	কাদিসিয়ার যুদ্ধ	সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস	২১৯
১৫ হি.	দামেশক বিজয়	আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ	২২৯
১৫ হি.	ইয়ারমুকের যুদ্ধ	খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ ইয়াযিদ ইবনু আবি সুফিয়ান শুরাহবিল ইবনু হাসানাহ আমর আবনুল আস কাইস ইবনু হুবাইরা	২৩৫
২০ হি.	নাহাওয়ান্দ যুদ্ধ	নুমান ইবনুল মুকরিন	২৫৬
৮৯-৯৪ হি.	দেবল এবং সিন্ধু বিজয়	মুহাম্মাদ ইবনু কাসিম	২৬৬
৯২ হি.	ওয়াদি বারবাতের যুদ্ধ	তারিক বিন যিয়াদ	২৭৮
১১৪ হি.	টুরসের যুদ্ধ	আব্দুর রহমান আল-গাফেকি	২৯০
১৩৩ হি.	তালাস নদীর যুদ্ধ	যিয়াদ ইবনু সালিহ, আবু মুসলিম	৩০১
২২৩ হি.	আম্মুরিয়ার যুদ্ধ	মুতাসিম বিল্লাহ	৩১২
৪১৬ হি.	সোমনাথ অভিযান	সুলতান মাহমুদ	৩২৩
৪৬৩ হি.	মানজিকার্টের যুদ্ধ	আলপ আরসালান	৩৩৭
৪৭৯ হি.	যাল্লাকার যুদ্ধ	ইউসুফ বিন তাশফিন	৩৫০
৫৯১ হি.	আর্কের যুদ্ধ	সুলতান আবু ইউসুফ আল-মানসুর	৩৬৫
৬০৯ হি.	লাস নাভাস ডি টলোসা	সুলতান আন-নাসির মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াকুব	৩৭৪
৫৮৩ হি.	হিত্তিনের যুদ্ধ	সালাহুদ্দিন আইয়ুবি	৩৮৫
৫৮৩ হি.	বাইতুল মাকদিস বিজয়	সালাহুদ্দিন আইয়ুবি	৪০৬
৬৫৮ হি.	আইন জালুতের যুদ্ধ	সাইফুদ্দিন কুতুয	৪১৫
৬৯০ হি.	অ্যাক্রে বিজয়	সুলতান আল-আশরাফ খলিল	৪৩৪
৭৯১ হি.	কসোভো যুদ্ধ	সুলতান ১ম মুরাদ	৪৪৩
৮০০ হি.	নিকোপলিসের যুদ্ধ	সুলতান ১ম বায়েজিদ	৪৫৩

৮০৪ হি.	আঙ্কারার যুদ্ধ ও তৈমুর লং	সুলতান ১ম বায়েজিদ	৪৬৫
৮৪৮ হি.	ভার্নার যুদ্ধ	সুলতান ২য় মুরাদ	৪৮০
৮৫৭ হি.	কন্সটান্টিনোপল বিজয়	সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ্	৪৮৮
৯৩২ হি.	মোহাক্সের যুদ্ধ	সুলতান সুলাইমান আল-কানুনি	৫০০
৯৭৯ হি.	লেপান্টের যুদ্ধ	পোর্ত ও মুয়াজ্জিন পাশা	৫১০
৯৮৬ হি.	ওয়াদি-আল-মাখাযিন যুদ্ধ	সুলতান আবদুল মালিক	৫১৮
১০৯৪ হি.	ভিয়েনার যুদ্ধ	কারা মুস্তাফা পাশা	৫২৯
১২২২ হি.	ফ্রেজারের আক্রমণ এবং রশিদের যুদ্ধ	আলি বে	৫৩৭
১২৪৩ হি.	নাভারিনোর যুদ্ধ	ইবরাহিম পাশা	৫৪২